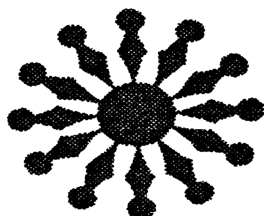
রাজসাহীর ইতিহাস



রাজসাহীর ইতিহাস

(রাজসাহীর প্রাচীন ও বর্তমান বিবরণ)

সংকলন ও সম্পাদনা :
কমল চৌধুরী



র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা
২০০০

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ২০০০

প্রচ্ছদ :
অমিতাভ ভট্টাচার্য

প্রকাশক ও মুদ্রক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
স্মরণে

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি জেলা রাজসাহী পদ্মার উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। সড়ক, নদীপথ ও রেলপথের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে যুক্ত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই গুরুত্বপূর্ণ জেলাটির আয়তন ৯,৪৫৬ বর্গ কিলোমিটার। চারটি জেলা রাজসাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ নিয়ে বর্তমান বৃহত্তর রাজসাহী জেলা। একাধিক বার জেলার আয়তনে পরিবর্তন ঘটেছে। সর্বশেষ পরিবর্তন ঘটে ১৯৪৭ সালে এবং তারপর। দেশভাগের সময় মালদহ জেলার নওয়াবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর ও শিবগঞ্জ থানা যুক্ত হয় রাজসাহীর সঙ্গে। এই পাঁচটি থানা নিয়ে পরবর্তীকালে গঠিত হয় নওয়াবগঞ্জ মহকুমা—এখন জেলা। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার পোরশা, পত্নীতলা ও ধামইরহাট থানা দেশভাগের সময় বগুড়ায় যুক্ত করা হলেও ১৯৪৯ সালে যুক্ত হয় রাজসাহী জেলার সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার ৩৬টি মৌজা (আয়তন ২৪,৭৪০ একর) রাজসাহীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এবং রাজসাহী জেলার ২২টি মৌজা যুক্ত হয় মুর্শিদাবাদের সঙ্গে। প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ছিল রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও মালদহ। এখানকার লালমাটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এর মধ্যে আছে ভারতে মালদহ এবং দিনাজপুর জেলার একাংশ।

রাজসাহীর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল হিন্দু জমিদারদের আধিপত্য। জেলার সার্বিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কালীনাথ চৌধুরীর "রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে। স্থানীয় জমিদার পরিবারের সন্তান কালীনাথ। আত্রাই থানার মির্জাপুরে তাঁর জন্ম। রাজসাহী জেলার ডেপুটি ইনসপেক্টর হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। রাজসাহীর মাটির সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ। বইয়ের আয়তন বড় না হলেও, গ্রন্থটি রচনায় কালীনাথ বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বইটি প্রকাশের পর সেকালের পত্রপত্রিকায় সপ্রশংস আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বইটি সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ "শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। রাজসাহীর কোন ইতিহাস ছিল না, সেই অভাব দূর করিয়া কালীনাথবাবু রাজসাহীবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের উৎসাহ দান করা রাজসাহীবাসী সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের গৌরবের বিষয়। এই গ্রন্থে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বংশের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইয়াছে।"

অক্ষয়কুমারও রাজসাহীর সন্তান। নিজের জন্মস্থানের ইতিহাস জানতে কার না ইচ্ছা করে। কালীনাথের বইটি তাঁকে খুশি করেছিল। আঞ্চলিক প্রীতির থেকেও বড় কথা, বিষয় সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশে কালীনাথ চৌধুরীর দক্ষতা। যা অক্ষয়কুমারের মত ইতিহাস সচেতন মানুষকেও অভিভূত করেছিল।

গ্রন্থটি সম্পর্কে সমকালীন পত্রপত্রিকা ও ব্যক্তিবিশেষের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল।

"এ গ্রন্থ রত্নবিশেষ। এইরূপ গ্রন্থের আমরা চিরপক্ষপাতী ; কিন্তু এরূপ গ্রন্থের গ্রাহক যে অধিক হইবে, তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে। ধৈর্য ধরিতে সক্ষম এবং শিক্ষালাভার্থ যত্নপরায়ণ বাঙালি কয়জন আছে?

"উপক্রমণিকায় রাজসাহীর প্রাচীনত্ব, রাজসাহীর সীমা, রাজসাহীর নদনদী, বাণিজ্য, মৎস্য, আম্র-কাঁঠালাদি ফল, গাঁজার চাষ, শিল্প, হাটবাজার ও মেলা—এই সকল কথা আছে, প্রথম অধ্যায়ে জাতি বিবরণ, কুলীন ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ শ্রোত্রীয়, কষ্ট শ্রোত্রীয়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, বৈদ্য,—ইহাদের কথা আছে। নবশায়কগণেরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। রাজসাহী মুসলমান প্রধান দেশ। তিন ভাগ মুসলমান এবং এক ভাগ হিন্দুর এই জেলায় বাস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্শী, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির লোকসংখ্যার হিসাব দেওয়া আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নগর ও গ্রামের বিবরণ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে স্কুল কলেজ ডাকঘর রাস্তা ঘাটাদির বিবরণ। সপ্তম অধ্যায়ে ভূসম্পত্তির কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজ্য শাসন ও রাজস্ব। সপ্তম অধ্যায়ে রাজসাহীর রাজা ও জমিদার। অষ্টম অধ্যায়ে পুঁঠিয়ার রাজবংশের কথা। নবম অধ্যায়ে সেই সুপ্রসিদ্ধ নাটোর রাজবংশের কথা। সেই ভারত সুপ্রসিদ্ধ রাণী ভবানীর কীর্তিকাহিনী ও ইতিহাস কীর্তিত। দশম অধ্যায়ে দিঘাপতিয়া রাজবংশের কথা। একাদশ অধ্যায়ে দুবলহাটি রাজবংশের কথা। দ্বাদশ অধ্যায়ে জমিদার এবং রায়ত বিষয়ক কথা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রাজসাহীর একাল এবং সেকালের কথা। ইহা ব্যতীত তাহেরপুর রাজবংশের কথা, বলিহার রাজবংশের কথা ইত্যাদি নানা বংশের কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ মুক্তাহার তুল্য, বাঙালির এই হার গলায় পরিবার প্রবৃত্তি হইবে কি?

বঙ্গবাসী, ১৩ জুলাই ১৯০১

"কালীনাথবাবু রাজসাহীর একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কৃতবিদ্য কায়স্থ জমিদার। ইনি বহুকাল রাজসাহীতে ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কার্য করিয়াছেন। ঐরূপ কার্য সময়ে ইনি রাজসাহীর প্রায় সকল স্থানেই গমন করায় এবং তদুপলক্ষে রাজসাহীর সকল ভদ্রলোকের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ায় সকল স্থানের বিশেষ অবস্থা, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুস্থান ভ্রমণ, বহুলোকের সহিত আলাপন, বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা রাজসাহী সম্বন্ধে ইহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাই কালীবাবু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রত্যেক স্থানের বিশেষ বিবরণ ও অবস্থা স্থানীয় লোকের মুখে অবগত হইয়া ইতিহাস সংকলন করা কয়জন ঐতিহাসিকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে ; আর বলিতে কি, এইরূপে অবধারিত সত্যমূলক ইতিহাস পাঠ করিবার সুবিধাও কম পাঠকের অদৃষ্টে হইয়া থাকে। কালীবাবু যেভাবে রাজসাহীর ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন এভাবে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা স্বীকার করিতে কে কুণ্ঠিত হইবে?

সুবিখ্যাত হন্টার সাহেবের বাংলা প্রদেশের স্টেটিষ্টিক্স যে প্রণালী অবলম্বনে লিখিত এ গ্রন্থও সেই প্রণালী অবলম্বনে লিখিত—ইহাতে কেবল রাজসাহী সম্বন্ধীয় বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে হেতু ইহাতে অনেক অনেক অধিক বিবরণ লিখিত হইয়াছে এবং প্রতি বিষয়ের তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জেলার মধ্যে ছোট বড় নামিক অনামিক নদ নদী আছে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এবং জেলার শিক্ষা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও রাস্তার আমূল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। রাজসাহীতে যত প্রকারের জাতি আছে ও যত প্রকারের ধর্ম আছে প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি ও পরিণতি বিবরণ ও প্রত্যেক ধর্মালোচনকারিগণের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, কোন গ্রামে কত পণ্ডিত ছিলেন, কে কি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কে কোন্ বিষয়ে কতদূর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, জেলার মধ্যে কোথায় কত রাজবংশ আছে তাহাদের ধারাবাহিক নাম ও পারিবারিক ইতিহাস এবং দেশের অনেক স্থানের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রমণ্ডলীর বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। দেশের মৃত্তিকা অবস্থা, ফসলের অবস্থা, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অবস্থা

সমস্তই বিশদরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এক কথায় আমরা এইমাত্র বলিতে পারি রাজসাহী সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা সমস্তই ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে রাজসাহীর যাহারা অধিবাসী, রাজসাহীর বিষয় জানিতে যাহারা সামান্য মাত্রও ব্যগ্র তাহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। রাজসাহীর শাসন ও শিক্ষা ভার যাহাদের হস্তে অর্পিত আছে তাহাদিগকে আমরা গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি, রাজসাহীর যাহারা রাজা ও জমিদার তাহারা এ গ্রন্থ পাঠে নিজের সমস্ত অবস্থা ও আপন আপন পারিবারিক অবস্থা জানিতে পাইবেন। সাধারণ পাঠক ইহাতে জ্ঞান ও আনন্দ একত্রে লাভ করিবেন। হায় দেশের এমনি দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে যে দেশের অধিকাংশ লোক নাটক নভেল ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রন্থ পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাহারা জানে না, তাহারা বুঝে না যে মানব জীবনের সত্য ঘটনা কল্পনা প্রসূত ঘটনা হইতেও বিস্ময়কর এবং অধিক চিত্তাকর্ষক। বাংলা ভাষার সমগ্র পাঠক নভেল খুঁজিয়া দেখুন একটি রাণী ভবানী একটি মহারাণী শরৎসুন্দরীর চিত্র তাহাতে মিলিবে না। যে সকল অলৌকিক কীর্তিকলাপে এই দুই পুণ্যময়ী দেববালার জীবন উদ্ভাসিত তাহার কল্পনা করিতেও অলৌকিক প্রতিভার আবশ্যক হয়। তাই বলিতেছি গ্রন্থখানি ইতিহাস হইলেও নভেল নাটক অপেক্ষা অনেক সুন্দর চিত্র ইহাতে অঙ্কিত আছে। রাজসাহীবাসীগণের তো কথাই নাই বাঙালির ঘরে ঘরে থাকা কর্তব্য।

Truth is stranger than fiction. এ গ্রন্থে তাম্রফলকাদির বিষয় যাহা বর্ণিত হয় নাই তৎসমস্ত পরিশিষ্টে লিখিত হইবে এমত আশা করিবার আমাদের সঙ্গত কারণ আছে।

হিন্দুরঞ্জিকা, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮

Hoogly,
The 5th July, 1901

"Much credit is due to Babu Kalinath Choudhury for compiling a short history (in Bengali) of the district of Rajshahi [from the establishment of the British Government in Bengal down to the present time.] He has sketched in it not only the physical features and peculiarities of the tract but almost every thing pertaining to as people, the various classes of which they are composed, the astes into which a certain section of them are divided ; their occupations, arts, manufactures, their modes of life, their religion, the state of learning among them and various other particulars have been all included in it, so that the volume may be well regarded a faithful picture of the distirct. The task which the Author under took was not an easy one. There being no publication of the kind instant, he had to compile the materials by personal researches, and references to stray journals and record... This disquisition on the distinction of casts among the Hindoos, is an able and learned composition ; and his genealogical and historical narratives of the Rajas and Zemindars of the District will be appreciated not only by the aristocracy but by the general reader too."

HARAGOBINDA SEN
Late Professor of Rajshahi College.

"আপনার প্রেরিত রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম, আপনি যেমন গম্ভীর প্রকৃতি ; সদ্বুদ্ধিশালী, বিবেকী, চিন্তাশীল, স্বদেশ প্রেমিক এবং স্বধর্মনিষ্ঠ আপনার পুস্তকখানি তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বোধ হয় আপনি ইহার উপকরণ সংগ্রহে অনেক দিন হইতে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে আপনার যেরূপ সময় ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে, সেইরূপ ইহার জন্য আপনাকে যথেষ্ট চিন্তা এবং পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ; কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে আপনার এ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে। রাজসাহীর প্রাচীন এবং বর্তমান অবস্থা রাজসাহীবাসীর গৌরবের জিনিস ; রাজসাহীর বিবরণ বাংলার ইতিহাসে একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং গৌরবসূচক অধ্যায়। মহারাণী ভবানী এবং মহারাণী শরৎসুন্দরীর ন্যায় রাজতাপসী আদর্শ রমণী আরও কোথাও দেখি না ; বৎসাচার্যের ন্যায় গৃহস্থ সন্ন্যাসী এবং মহারাজ রামকৃষ্ণের ন্যায় সিংহাসন সমলোষ্ট্রকাঞ্চন যোগীর কথা আর ত কোথায়ও শুনি নাই! এমন স্থানের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস এ পর্যন্ত কেহ যে প্রণয়ন করেন নাই ; ইহাই আশ্চর্য। আপনি এই পুস্তক লিখিয়া কেবল রাজসাহীর উপকার করেন নাই ইহা দ্বারা আপনি সমগ্র বাঙালি জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতে কত সময়ে এইরূপ একখানি পুস্তক দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং যত্ন করিয়া নিরাশ হইয়াছি। আজ আপনার কৃপায় বিনা যত্নে সেই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল ; সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

১৪ আষাঢ় ১৩০৮ — শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্মণ

Late Editor of শিক্ষা পরিচয় ও দেবী যুদ্ধ প্রণেতা

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে কতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল।

দীর্ঘকাল বাদে বইটির পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। এই কালসীমায় জেলা রাজসাহীর পরিবর্তন ঘটেছে বিপুল। সনাতন জীবন ধারার শেষ রেখাটুকুও ম্লান হয়ে এসেছে। শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক জীবনধারার প্রভাবে জনসাধারণের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটেছে। বহু স্মৃতি বিজড়িত রাজসাহীর ইতিহাস আজও বাঙালি মাত্রেরই পাঠযোগ্য। কালীনাথের রচনার সঙ্গে কিছু মূল্যবান আলোচনা ও তথ্য বর্তমান সংস্করণভুক্ত করা হয়েছে।

কমল চৌধুরী

২৩৩ বিবেকানন্দ সরণি
কলুপুকুর, বারাসত
২৪ পরগণা (উত্তর)
কলকাতা ১২৪
দূরভাষ ২৫৬২ ৪৯৫৯

সূচিপত্র

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিজ্ঞাপন

—(০)—

"রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রকাশিত হইল। বর্তমানে বঙ্গভাষায় ভারতের বা বঙ্গদেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সাধারণ ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু বঙ্গদেশান্তর্গত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেশের রাজা-মহারাজার বংশগত ইতিহাস অতি বিরল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাজসাহী একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান, এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ ক্ষেত্র। সেই প্রাচীন রাজসাহীর ইতিবৃত্ত প্রচার জন্য মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ায় অনেক দিন পূর্ব হইতেই যত্ন ও পবিশ্রম সহকারে তত্তাবৎ বিষয় সমূহ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই। মনের দুর্দম্য আবেগে ঐ কার্য দুরূহ ও কষ্টসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলাম। দৈবাৎ সংসার চক্রের ঘোরতর আবর্তনে পতিত হইয়া আমার হৃদয়তন্ত্রী একবারে ছিন্ন প্রায় হয়, তৎসঙ্গে হৃদয়ের আশা, ভরসা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি শিথিল হইয়া পড়ে। বহুকষ্টে ও ভগবৎ কৃপায় কিঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইলে মন পুনরায় স্বদেশের এবং স্বদেশীয় স্বর্গীয় ও বর্তমান মহাত্মাদের গুণকীর্তন করিতে অগ্রসর হয়। এরূপ ভগ্ন হৃদয়ে যে গ্রন্থ লিখিত হইল তাহা পাঠ করিয়া, শব্দ বিন্যাস ও ভাষার পরিপাট্যে পাঠকবৃন্দ যে সুখী হইতে পারিবেন, আমার সে আশা নিতান্ত কম। তবে একমাত্র ভরসা যে এই পুস্তকখানিতে রাজসাহী প্রদেশের প্রাচীন ও বর্তমান পণ্ডিত, মহারাজা, রাজা, জমিদারদিগের বংশাবলী ও কীর্তি এবং অন্যান্য যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সহৃদয়-গুণগ্রাহী পাঠকবৃন্দ কিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব করিতে পারিবেন।

যেরূপ ইংলন্ডের প্রত্যেক প্রদেশের বা জেলার ব্যক্তিগত ইতিবৃত্ত রক্ষিত হয়, সেরূপ ভারতে লক্ষিত হয় না। অতএব রাজসাহীর মহাত্মাদের বংশগত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা কেবল যে বহু শ্রমসাধ্য ব্যাপার তাহাই নহে ;— যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেও, একবারে নির্ভুল ইতিবৃত্ত সংকলিত করা দুঃসাধ্য।

সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, কুলজ্ঞ গ্রন্থ, হন্টারের স্টেটীস্‌টীকাল একাউন্ট, কলিকাতা রিবিউ, সরকারি পুরাতন কাগজপত্র, ও মৌখিক কাহিনী প্রভৃতির উপর রাজসাহী সম্বন্ধীয় ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইতিহাস সংকলিত ; মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমি যে সময়ে রাজসাহীর স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর ছিলাম, সেই সময়ে রাজসাহী সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের কোন কোন বিষয় ও কোন কোন বংশের বিবরণ বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ লোকদের নিকট বা পুরাতন কীর্তি দৃষ্টে সংগ্রহ করি।

যাহাদের নিকট উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করিয়া এই রাজসাহীর ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছি, তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া বাহ্যাড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। যাহাদের নিকট আমি সামান্য সাহায্যও পাইয়াছি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

পাঠকবৃন্দ-সমীপে প্রার্থনা যে, এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠকালে ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করিয়া তৎসংশোধনে যত্নবান হইলে কৃতার্থ হইব। নিবেদন মিতি।

ভবানীপুর
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থকার।

সূচিপত্র

অষ্টম অধ্যায় ঃ পুঁঠিয়ার রাজবংশ

নবম অধ্যায় ঃ নাটোর রাজবংশ

দশম অধ্যায় ঃ দিঘাপতিয়া-রাজবংশ

একাদশ অধ্যায় ঃ দুবলহাটি রাজবংশ

চৌগ্রাম রাজবংশ

মুসলমান জমিদারগণ

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

উপসংহার

উপক্রমণিকা

রাজসাহীর প্রাচীনত্ব ঃ

রাজসাহী অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই স্থান ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজদিগের শাসনাধীন হইয়াছে। মহাভারতে উত্তর 'গো-গৃহের" উল্লেখ আছে। সেই "গো-গৃহ" রাজসাহী প্রদেশের উত্তরভাগে ছিল। আবার উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে স্টেশন পাঁচবিবি হইতে পূর্ব মুখে ১২ মাইল পথ যাইলে মাগুরা এবং ঐ মাগুরা হইতে দক্ষিণ পূর্ব মুখে ৫ মাইল যাইলে বিরাট নগর। এই নগর মৎস্যদেশীয় নরপতি বিরাট স্থাপিত করেন। এই বিরাট নগরে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস করেন। এই নগরের দুই মাইল দক্ষিণে বিরাট রাজার সেনাপতি কীচকের বাসভবন ছিল। ইহার অনতিদূরে মহাভারতীয় "সমীবৃক্ষ" স্থান। রাজসাহী "মৎস্য" দেশের অর্ন্তগত এবং রাজসাহী যে মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের রাজ্য ছিল, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের অধিকার অনেকদিন গত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ধ্বংসকাহিনী এখনও পুরানে ও ইতিহাসে কীর্তিত হইতেছে। যে পাণ্ডবগণের বীরত্বে ভারত কেন সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল; সেই পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসে বিরাট রাজ্যের অন্তর্গতি রাজসাহী প্রদেশ পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্তিত হইতেছে। বিরাটের রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং তন্নিকটবর্তী কীচকের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ রাজসাহী প্রদেশে বিদ্যমান থাকিয়া পাণ্ডবগণের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দিল্লির সম্রাট আকবরের সময়ে রাজস্বমন্ত্রী রাজা তোডরমল যে সকল "সরকার" নামক বিভাগে বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "তাহিরপুর" ও "সাঁতুল" রাজসাহীর অন্তর্গত। "তাহিরপুর" ও "সাঁতুল" রাজাদ্বয় একাদশ ভৌমিক মধ্যে দুইটি ভৌমিক বাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রাজসাহী বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। পদ্মা নদীর উত্তর এবং করতোয়া ও মহানন্দা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ বরেন্দ্রভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই বরেন্দ্র ভূমিতে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বাস। বারেন্দ্র শ্রেণি ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য প্রথানুসারে তাহিরপুর "অস্তাচল" এবং শুশুঙ্গ "উদয়াচল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রাজা বিরাটের সময় হইতে প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় রাজাদের সময় পর্যন্ত রাজসাহী হিন্দু রাজার শাসনাধীন ছিল; তাহার পর মুসলমান রাজা রাজসাহী অধিকৃত করেন। বাগার জায়গির মোঘলসম্রাট সাজাহান প্রদত্ত। আমরুল পরগণার অন্তর্গত "নবাবের তাম্বু" নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা কথিত আছে যে রাজসাহী জরিপ সময় রাজা তোডরমল ঐ গ্রামে নিজ তাম্বু স্থাপিত করেন। মোঘলবংশীয় সম্রাটের শাসনাধীনেও রাজসাহী ছিল। হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের রাজসাহীর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইংরেজরা মুসলমানদিগকে পরাভব করিয়া এপর্যন্ত রাজসাহীর অধিস্বামী হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের যে কোন ঘটনা জানা যাইবে, তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

রাজসাহীর নাম ঃ

পদ্মা নদীর দক্ষিণে "নিজ চাকলা রাজসাহী" নামে একটি ভূভাগ রাজসাহী প্রদেশের

অন্তর্গত ছিল। ইংরেজদের অধিকার সময়ে বোধ হয় ঐ চাকলার নামে রাজসাহী জেলার নাম হয়। কেহ কেহ বলেন এই ভূখণ্ডে অনেক রাজার বাসস্থান। এই জন্য জেলার নাম "রাজসাহী" হয়। পূর্বের নামই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

রাজা মানসিংহের সহিত রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। রাজসাহী নাম "শাহী" রাজা মানসিংহের প্রদত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজসাহী নাম "শাহী" রাজা মানসিংহের প্রদত্ত বলিয়া কথিত।[১] এ অনুমান আমি সঙ্গত মনে করি না, যেহেতু "শ" "স"-য়ে বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

বর্তমান রাজসাহীর সীমা ঃ

রাজসাহীর উত্তরে দিনাজপুর ও বগুড়া ; পূর্বে বগুড়া ও পাবনা ; দক্ষিণে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ ; পশ্চিমে মুরশিদাবাদ ও মালদহ। মহামান্য গ্রান্ট সাহেব বলেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষ মধ্যে পূর্বে রাজসাহী একটি বিস্তৃত জেলা ছিল।

এলাকা ঃ

যে সময় মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, সেই সময়ে উদিত (উদয়) নারায়ণ এক বিস্তীর্ণ জমিদারি শাসন করিতেন। সমগ্র "রাজসাহী চাকলা" তাহার দ্বারা শাসিত হইত। তাহার জমিদারি পদ্মা নদীর উভয় পারে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুরশিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং রাজসাহী বিভাগস্থ মুরশিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং রাজসাহী বিভাগস্থ বগুড়া, পাবনা, মালদহ প্রভৃতি জেলার অধিবাসী উদিত (উদয়) নারায়ণকে রাজস্ব প্রদান করিত; তাহার সমস্ত জমিদারির নামই "রাজসাহী" ছিল। এই সমস্ত রাজসাহী জমিদারি নাটোরের প্রসিদ্ধা মহারাণী ভবানীর অধিকৃত হয়। বর্তমান মুরশিদাবাদের অধিকাংশই সেই রাজসাহী চাকলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে মুরশিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজসাহী নামে পরগণা দৃষ্ট হয়।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব সময়ে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত স্থানসমূহের অনেক পরিবর্তন হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজসাহী এরূপ একটি বৃহৎ ও প্রধান জেলা ছিল যে, উহার পশ্চিমসীমা ভাগলপুর ও পূর্বসীমা ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পদ্মা নদীর দক্ষিণে 'নিজ চাকলা রাজসাহী' নামে একটি ভূভাগ রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল। সেই স্থান এক্ষণে জেলা মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম ও বর্ধমানের অন্তর্গত। কিন্তু পদ্মা নদীর উত্তর ভাগে যে লস্করপুর ও তাহিরপুর পরগণা এক্ষণে রাজসাহীর অন্তর্গত, তাহা পূর্বে মুরশিদাবাদ জেলার অধীন ছিল।[২] ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে রাজসাহী জেলা হইতে অনেক স্থান বাহির হইয়া যায়। তথাপি উহার পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিম সীমা গঙ্গা ছিল। এ প্রকার একটি বিস্তৃত জেলা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের শাসন করা কঠিন ছিল। সুতরাং চুরি, ডাকাইতি এত বেশি হইত যে জেলার আয়তন আরও সঙ্কুচিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি রাজসাহী হইতে বাহির করিয়া মালদহ, বগুড়া ও পাবনা এই তিনটি নতুন জেলার সৃষ্টি হয়।

(১) ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী হইতে থানা রোহনপুর ও চাঁপাই এবং দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া হইতে কতকগুলি স্থান লইয়া মালদহ একটি নতুন জেলা হইয়াছে।

(২) ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী হইতে থানা আদমদিঘি, নওখিলা, সেরপুর ও বগুড়া এবং রঙ্গপুর হইতে দুই থানা এবং দিনাজপুরের তিন থানা বাহির করিয়া লইয়া নূতন বগুড়া জেলা স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) আবার প্রায় ৮ বৎসর পর, রাজসাহী হইতে থানা সাহজাদপুর, খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, মথুরা ও পাবনা লইয়া পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। যশোহর জেলা হইতে কতকগুলি স্থান বাহির করিয়া লইয়া নতুন পাবনা জেলায় ভুক্ত করা হয়।

এইরূপে জেলার আয়তন কমাইয়া দুইটি মাত্র মহকুমা রহিল, সদর ও নাটোর। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে নওগাঁ মহকুমা স্থাপিত হওয়ায় জেলার আয়তন আবার বৃদ্ধির সূত্রপাত হইল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেলা দিনাজপুর হইতে সমগ্র থানা মহাদেবপুর ও জেলা বগুড়া হইতে আদমদিঘি ও নবাবগঞ্জ থানার কিয়দংশ রাজসাহী জেলায় ভুক্ত হইয়া নওগাঁ মহকুমার অধীন হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ১৪টি থানা লইয়া রাজসাহী জেলা গঠিত ঃ

১) বোয়ালিয়া। ২) চারঘাট। ৩) পুঁঠিয়া। ৪) গোদাগাড়ি। ৫) তানোর। ৬) বাগমারা।	সদর মহকুমা।
৭) নাটোর। ৮) লালপুর (বিলমাড়িয়া)। ৯) বড়াই গ্রাম। ১০) সিংড়া।	নাটোর মহকুমা।
১১) পাঁচপুর। ১২) নওগাঁ। ১৩) মহাদেবপুর। ১৪) মাঁদা।	নওগাঁ মহকুমা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা ঃ

সময় সময় জেলার আয়তন যেরূপ হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান গেল ঃ

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে	...	...	...	১২,৯৯৯	বর্গমাইল
১৭৮৬ ”	...	...	...	১২,৯০৯	”
১৮৮২ ”	...	...	...	২,২৩৪	”
১৮৯১ ”	...	...	...	২,৩৩০	”
১৮৯৭ ”	...	...	...	২,৫৯৮	”

পূর্বাপেক্ষা এখন জেলার আয়তন প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জেলার জনসংখ্যা ১০৬৪৯৫৬ ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যা রিপোর্টে লোকসংখ্যা ১৩১০৭২৯ ছিল। কিন্তু ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যার রিপোর্টে লোকসংখ্যা ১৩১৩৩৩৬ হয়। আয়তন পরিবর্তনে লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি।

সাধারণ বিবরণ ঃ

রাজসাহী একটি বিস্তৃত জেলা। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশের আকৃতি, প্রকৃতি, শস্য, জলবায়ু প্রভৃতি ভিন্ন প্রকার। সাধারণত ভূমি উর্বরা। শস্যক্ষেত্র নিম্ন। নদীর তীরে গ্রামসমূহ বৃক্ষ শ্রেণিতে শোভিত। উত্তর ও পশ্চিম ভাগে মালদহ, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার

সংলগ্নস্থান বরেন্দ্র ভূমি। এই বরেন্দ্র ভূমি সমতল নহে—উচ্চ ও নীচ ; এবং ইহার মৃত্তিকা অনেক স্থানে রক্তবর্ণ ; বৃক্ষ অতি কম, কেবল স্থানে স্থানে তালবৃক্ষ দেখা যায়। পশ্চিম হইতে পূর্বদিক পর্যন্ত বিল। পশ্চিমে মাঁদার বিল, পূর্বে চলনবিল এবং উত্তরে রক্তদহের বিল। মাঁদার বিল ও রক্তদহের বিল হইতে বরেন্দ্র ভূমি আরম্ভ। বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই মাস হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত জেলাটির প্রায় সকল স্থান জলে পরিপূর্ণ থাকে। বর্ষাকালে বিলের মধ্যে এক একটি গ্রাম এক একটি দ্বীপের ন্যায় জলে চারিদিকে পরিবেষ্টিত হয়। নদীর তীরে গ্রাম সমূহের জলবায়ু, সাধারণত স্বাস্থ্যকর ; কিন্তু বিলের নিকটবর্তী গ্রামসমূহের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। পদ্মা নদী স্ফীত হইয়া জলপ্লাবনে গ্রাম সমূহ প্রপীড়িত হয়। ১৮৩৮ ও ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের জল প্লাবন বিখ্যাত।

নদী ঃ

বড় ছোট নদী ও জলাশয় দ্বারা জেলা আবৃত। এই সকল দ্বারা যেন একখানি জাল বুনিয়া সমস্ত জেলাকে আবৃত করিয়াছে। জেলাব প্রায় সকল স্থানেই সকল সময় নৌকাপথে যাতায়াত করা যায়। প্রধান প্রধান নদীগুলি উল্লেখ করা গেল।

(১) **পদ্মা নদী**—ভাগীরথী হইতে বহির্গত। জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। সকল সময় বিশেষত বর্ষাকালে এ নদী ভয়ঙ্কর দেখায়। বর্ষাকালে এই নদীর তরঙ্গ দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। যে স্থানে বৃহৎ চর হইয়া শস্য হইতে লাগিল কিছুদিন পরে আবার সেই স্থানে, সে চর নাই, সে বৃক্ষ নাই, সে শস্য নাই, কেবল অতলস্পর্শ জলরাশি। এই নদীর রেতী মৃত্তিকা এত উর্বর যে, চরে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, কলাই, পটল, তরমুজ প্রভৃতি জন্মে। ইহার তীরে প্রধান নগর গোদাগাড়ি, রামপুর-বোয়ালিয়া, সরদহ, রাজাপুর, লালপুর, দামুকদিয়া ও সাঁড়া।

(২) **মহানন্দা**—হিমালয় পর্বত হইতে বহির্গত। জেলার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত। বাসুদেবপুর দিয়া গোদাগাড়ির নিকট পদ্মা নদীতে পতিত হইয়াছে। পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এ নদী বিস্তৃত ও গভীর। বোঝাই নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

(৩) **আত্রাই**—তিস্তা বা তিস্রোতা নদী হইতে বহির্গত। এ নদী অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। দিনাজপুর হইয়া রাজসাহী জেলায় প্রবিষ্ট। দিঘাপতিয়ার অনতিদূরে বাকসর গ্রামের নিকট বন্ধ। নতুন জোলা অথবা পুঁঠিয়ার জোলা নাম গ্রহণে লালোরের পূর্ব দিক দিয়া পুনরায় আত্রাইতে মিশিয়া বিল চলনে পতিত হইয়াছে। আবার সেই জোলা সেরকোলের নিকট আত্রাই হইতে পৃথক হইয়া কলম দিয়া বিল চলনে মিশ্রিত হইয়াছে। আত্রাইর তীরে প্রধান নগর—মহাদেবপুর, কালিকাপুর (মাঁদা পুলিশ স্টেশন), প্রসাদপুর, বান্দাইখাড়া, আত্রাই রেলওয়ে স্টেশন, সাহেবগঞ্জ (মোহিনীমোহন রায়ের জমিদারি কাছারি), খাজুরা, ডাঙাপাড়া, আত্রাইকুলা, লালোর। এই নদীর উপর উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ের একটি লৌহসেতু আছে। সেতু হইতে আত্রাই স্টেশন অতি নিকট।

(৪) **বড়ল**—সরদহের নিকট পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া হুড়া সাগরে পতিত। কেবল বর্ষার সময় নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়। অন্য সময় সরদহর নিকট মুখ বন্ধ থাকে। ইহার তীরে বা নিকটে প্রধান গ্রাম—চারঘাট, আড়ানী, পাঁকা, গালিমপুর, মালঞ্চি (রেলওয়ে স্টেশন), ধুপৈল (এই গ্রামের নিকট নন্দাকুজা নদীর মুখ), ওয়ালিয়া, জোয়াড়ী, হরিপুর, চাটমোহর, নুননগর (এই স্থানে বিল চলনের সহিত মিশ্রিত)। এই নদীর উপর উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের লৌহ সেতু আছে। সেতু হইতে মালঞ্চি স্টেশন অতি নিকট।

(৫) **মুষাখাঁ**—বড়ল নদীর একটি শাখা। আড়ানীর অনতিদূরে বড়ল নদী হইতে বহির্গত। আত্রাই নদীতে বাকসরের নিকট মিশ্রিত। কেবল বর্ষার সময় নৌকা যাতায়াত করে। ইহার তীরে বা নিকটে প্রধান গ্রাম—পুঁঠিয়া রাজধানী, ঝলমলিয়া হাট, মধুখালী, ভাবনী, ছাতনী, বেলঘরিয়া, দিঘাপতিয়া রাজধানী।

(৬) **নারদ**—এক্ষণ মুষাখাঁ নদীর শাখা। পূর্বে পদ্মা নদী হইতে রামপুর বোয়ালিয়ার নিকট দিয়া বহির্গত হইয়া প্রসিদ্ধ নাটোর নগর দিয়া প্রবাহিত। পুঁঠিয়ার নিকট নারদের মুখ বন্ধ। নারদ নদী ধরাইল গ্রাম দিয়া গুনাইখাড়ার নিকট আত্রাই নদীর সহিত মিশ্রিত। গুনাইখাড়ার মুখ হইতে নাটোর নগর পর্যন্ত বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

(৭) **নাগর**—করতোয়া নদীর একটি শাখা, বগুড়া জেলা হইতে রাজসাহী প্রবিষ্ট। তেমুখ-নওগাঁও গ্রামের নিকট যমুনা বা গুড় নদীতে পতিত। নাগর নদীর গতি নিতান্ত বক্র। সকল সময় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। নদীর তীরে প্রধান গ্রাম—পতিসর, কুসুম্বী, চাঁপাপুর, দুপচাঁচিয়া। সুলতানপুর—বগুড়া রেলপথ এই নদী পার হইয়া গিয়াছে।

(৮) **যমুনা**—দিনাজপুর হইতে আসিয়া প্রথমে বালুভরা, নওগাঁও, কাসিমপুর ও ভবানীপুর গ্রামের নিচ দিয়া প্রবাহিত হয়। ভবানীপুরের নিকট আত্রাই ও যমুনা একত্রিত হইয়া আত্রাই রেলওয়ে স্টেশনের নিকট যমুনা পূর্বদিকে এবং আত্রাই দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। আত্রাই স্টেশন হইতে যমুনা নদী গুড় নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং গুমানীর নিকট বিল চলনে পতিত হইয়া পাবনা জেলায় প্রবিষ্ট। এই নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গ্রাম গুড়নই ও কলম।

(৯) **বারানই**—মাঁদার বিল হইতে বহির্গত হইয়া পিপরুল গ্রামের মধ্যে কালীগঞ্জ নামক হাটের নিকট আত্রাই নদীতে পতিত। আবার মাঁদা বিল হইতে নন্দিপুরের দাঁড়া দ্বারা বেজোড়া গ্রামের নিকট আত্রাই নদীর সহিত মিশ্রিত। রামপুরবোয়ালিয়া হইতে নওহাটা ১০ মাইল দূর। এই নওহাটা বারানই নদী তীরে। এই স্থান হইতে নদী বেশি গভীর। ইহা অপ্রশস্ত কিন্তু অত্যন্ত গভীর। এই নদীর তীরে প্রসিদ্ধ তাহিরপুর রাজার বাসস্থান। বাগমারা পুলিশ স্টেশনও এই নদীর তীরে। এই নদীর উপর উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের নলডাঙার লৌহ সেতু নির্মিত আছে। এই সেতু হইতে মাধনগর স্টেশন অতি নিকট।

বিল* ঃ

জেলায় ছোট বড় অনেক বিল আছে, তন্মধ্যে বিল চলন বৃহৎ এবং সকল সময় নৌকায় যাতায়াত করা যায়। বিল চলনের আয়তন প্রায় ১৫০ বর্গ মাইল। নাটোর হইতে বগুড়া পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, সেই রাজপথের উপর সিংড়া থানা। সেই সিংড়া হইতে বড়ল নদীর তীরে পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহর পর্যন্ত বিল চলন ২১ মাইল বিস্তৃত। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় বিলের আয়তন হ্রাস হয়। মাঁদা, রক্তদহ এবং সতীর বিলও নিতান্ত ছোট নহে।

নৌকাপথে বাণিজ্য ঃ

অনেক নদনদী ও বিল থাকায় এ জেলার বাণিজ্য প্রধানত জলপথে চলে। শকটে বাণিজ্য দ্রব্য যাতায়াত অতি কম। পদ্মা নদীর তীরে সুলতানগঞ্জ ও গোদাগাড়ি অঞ্চল হইতে পশ্চিম বরেন্দ্রের চাউল চালান হয়। গোবিন্দপুর, লালোর, হাতিয়ানদহ, সাঐল, আঞ্চলকোট, গাঙ্গৈল, বরবাড়ি, ধরাইল, তেমুখ নওগাঁ, সিংড়া, সেরকোল, প্রভৃতি স্থানের লোকেরা নৌকাপথে ধান্য, চাউল ও পাটের ব্যবসা করে। আজকাল পাট ও তামাকের ব্যবসাও কম নহে।

* ৩৭৪ পৃঃ দেখুন।

মৎস্য* ঃ

রাজসাহী মহাভারতোক্ত মৎস্যদেশের অন্তর্গত ; সুতরাং রাজসাহীতে মৎস্য প্রচুর। এমন গ্রাম এমন নগর নাই যেখানে কেবল জেলে বাস করে না। গ্রাম গ্রাম একত্র করিয়া মোট জেলায় ৭ কি ৮ হাজার ঘর জেলে বাস করে। মোট ২৩,০০০ কি ২৪,০০০ জেলের বাস রাজসাহী জেলায় হইবে। ইহা ব্যতীত চণ্ডাল ও মুসলমান জাতীয় মৎস্যজীবী "ধাওয়া" নামক কতকগুলি লোক হাতাস, চলনবিল প্রভৃতির নিকট বাস করে। ইহাদের সংখ্যাও ২৪,০০০ কি ২৫,০০০ হইবে। ইহারা বিলে ও ধান্যক্ষেত্রে মৎস্য ধরে। বোয়ালিয়া, পুঁঠিয়া, নাটোর, সরদহ, লালপুর, কলম প্রভৃতি স্থানে মৎস্য বেশি পরিমাণে বিক্রয় হয়। পদ্মা নদীতে ও বড়ল নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মৎস্য পাওয়া যায়। রাজসাহী জেলায় মস্যের দর এত কম যে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় সের দরে বিক্রয় হয় না।

ফল ঃ

ফলের মধ্যে আম্র ও কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জেলার উত্তর ও দক্ষিণভাগে কাঁঠাল বেশি ; পূর্ব ও পশ্চিমভাগে কাঁঠাল কম। বাগা ও রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী স্থানের এবং মাধবনগরের আম্র ভাল এবং এই সব স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাগার আম্রই অতি প্রসিদ্ধ। সমুদ্র নিকটবর্তী স্থানের ন্যায় নারিকেল বৃক্ষ সকল স্থানে হয় না। বোয়ালিয়া ও পুঁঠিয়াতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে। বেল, জাম, নেবু, কলা, আনারস প্রভৃতি ফলও কম নহে। অধুনা অনেক স্থানে লিচু ফলও জন্মিতেছে।

চাষ পদ্ধতি ঃ

বিলে বা বিলের নিকটবর্তী স্থানে বোরো ধান্য হয়। বরেন্দ্রে, রোপা আর ভড়ে মোটা বুনা আমন ধান্য জন্মে। পলিভূমিতে হরিদ্রা ও আখ জন্মে। পদ্মা ও বড়ল নদীর চরে নীল হয়। তাহিরপুর ও লস্করপুর পরগণায় তুঁতের চাষ বেশি ; কিন্তু তুঁতের চাষ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কেবল নওগাঁ মহকুমায় গাঁজার চাষ।

১৩১৩৩৩৬ লোকসংখ্যা মধ্যে ৪২৬,২৭৮ জন কৃষক। কৃষকের অবস্থা সাধারণত ভাল ছিল ; কিন্তু কৃষক বিলাসপরায়ণ হওয়ায় দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত হইতেছে। রাজসাহীতে কৃষিকার্য লাভজনক তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজসাহীর অনেক ভদ্রলোক চাকর দ্বারা বা বর্গা প্রণালীতে কৃষিকার্য নির্বাহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে এবং সুখস্বচ্ছন্দে বাস করে। এইজন্য রাজসাহীর ভদ্রলোক মধ্যে চাকরি ব্যবসায়ী অতি কম।

কৃষি ঃ

ধান্যই প্রধান—আউশ ও আমন। ইহারা রোপা ও বুনা। বরেন্দ্র ভূমিতে রোপা ও ভড় অর্থাৎ নিম্নস্থানে বুনা ধান্য হয়। যে স্থানে স্বভাবত পূর্বেই বর্ষা হয়, সেই স্থানেই বোরো ধান্য হয়। নিকটে জল না থাকিলে বোরো ধান হয় না। পাট চাষ ও আজকাল কম নহে। অনেক স্থানে ধান্যের জমিতে পাট চাষ করিতেছে।

প্রায়	শতকরা	৬০	..	আমন ধান্য
"	"	২২	...	আশু "
"	"	৫	...	বোরো "
"	"	১৩	...	অন্যান্য শস্য।
		১০০		

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৪,৩৩৩ একর জমিতে পাট চাষ হয় , এক্ষণে ধান্য চাষের জমি কম হইয়া পাট চাষের জমি প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

রাজসাহীতে নীল ও রেশম যথেষ্ট জন্মে। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে নীল ১,০৬২ মন এবং রেশম ১৫৫,৪২২ পাউন্ড উৎপন্ন হয়।[৩]

১৮৪৮ খিস্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত "রেভিনিউ সর্ভে" হয়। জরিপ শেষ হওয়ার সময় জেলার আয়তন প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল ছিল, তন্মধ্যে অর্ধেকের বেশি জমিতে চাষ হইত, অবশিষ্ট জমি চাষের অনুপযুক্ত বা পতিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে জেলায় আয়তনের এক চতুর্থাংশ জমি পতিত আছে কিনা সন্দেহ।

গাঁজার চাষ ঃ

রাজসাহী জেলার কেবল নওগাঁও মহকুমায় গাঁজা জন্মে। এই চাষে ব্যয় ও পরিশ্রম বেশি। গাঁজার জমির প্রধান সার খোল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১২০০ বিঘা বা ৪০০ একর জমিতে গাঁজার চাষ হয়। কিন্তু ১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২১০৮ বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ হয় এবং ৫৭৯৩ মন গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫৩১ বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ হয় এবং ৫,৪১৭ মন গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছে। এই ২৫/২৬ বৎসরে গাঁজার জমির চাষ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দুবলহাটি রাজ্যেই গাঁজার চাষ বেশি। এই ২১০৮ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় ১৮০০ বিঘা জমি দুবলহাটি রাজ্যের অন্তর্গত। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৫৮৬৭ মন

ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত ঃ

বাংলা	...	৪৬৭২
উড়িষ্যা	...	২৫৫
আসাম	...	৫৪৫
কোচবিহার	...	৬৭
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ	...	৩২৮
		৫৮৬৭

উপরের তালিকায় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বঙ্গদেশে গাঁজা বেশি পরিমাণে প্রচলিত।

পান ঃ

পরগণে তাহিরপুর ও তপ্পে চাপলায় পান জন্মে। সাঁচি পানই সুখাদ্য। মাধনগর রেলওয়ে স্টেশন হইতে উত্তর প্রদেশে প্রতিদিবস বিস্তর পান বিক্রয়ার্থ যায়।

পরিচ্ছদ ঃ

সাধারণত ধুতি, চাদর ও পীরাণ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রামপুরবোয়ালিয়া ও নাটোরে বালাপোষের ব্যবহার আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় হইতে ক্রমে পরিচ্ছদের পরিবর্তন হইতেছে। আজকাল কৃষকের পরিচ্ছেদেরও বিস্তর পরিবর্তন।

বাসগৃহ ঃ

শহরে ও রাজা জমিদারদিগের গৃহ প্রায় ইষ্টকনির্মিত। বাঁশ ও খড় নির্মিত গৃহই অধিক। বরেন্দ্রভূমিতে মৃত্তিকানির্মিত দেওয়াল হয়। আজকাল অনেক টিনের ও খাপরার গৃহ স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। রাজসাহীর "উলুখড়ের ছাওয়া বেঁকান ঘর, যাহাতে বাঁশের ছেচার বেড়া, দেখিতে সুন্দর।"[৫] এই বেঁকান ঘরকে রাজসাহীতে "বাঙ্গালাঘর" বলে। রাজসাহীর বাঙ্গালা ঘর ও আটচালা অতি সুন্দর।

শিল্প* ঃ

রেশমের সূতা প্রস্তুত জন্য ওয়াটসন কোম্পানির অনেক কুঠি আছে। সরদহের কুঠিই প্রধান। ডাকরা, চারঘাট, মীরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মটকার ধুতি চাদর প্রস্তুত হয়। কলমে ও বুধপাড়ায় নানাবিধ কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিলমারি ও খাগড়ার থালা, গেলাস, বাটি আদির ন্যায় কলমে থালা আদি প্রস্তুত হইতেছে। কলমে এত কাঁসারি আছে যে (তাহারা দিবা রাত্রি এরূপ কার্য করে যে,) তাহাদের কার্যের শব্দে আগন্তুক ব্যক্তির রাত্রিতে নিদ্রা হওয়া কঠিন। রামপুরবোয়ালিয়াতে একটি রেশমি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম "জুবিলি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল"। রাজসাহী জেলার বোর্ডের সাহায্যে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময় মধ্যে জাপান, ইতালি, ইংলন্ড এবং ভারতের স্থানে স্থানে ইহার উপকারিতা অনুভূত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য* ঃ

জেলাতে কাপড়, কার্পাস, চিনি, ঘৃত, শালকাষ্ঠ, লবণ, মশলা আদি আমদানি হয় এবং জেলা হইতে ধান্য, চাউল, হরিদ্রা, রেশম, নীল, পাট ও গাঁজা রপ্তানি হয়। জেলায় যে কেবল কৃষিকার্যের সুবিধা এমন নহে ; ব্যবসা বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সুবিধা। রাণী ভবানীর সময় রাজসাহী রাজ্যে কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরেজ, ফরাসি এবং ওলন্দাজ বণিকগণ রাজসাহীর অনেক স্থানে হইতে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া ইউরোপে বিক্রয় জন্য প্রেরণ করিতেন। আবার আবশ্যকমত ক্রয় করিতে পারেন, এই বিবেচনায় বণিকগণ তন্তুবায়গণকে "দাদন" অর্থাৎ অগ্রিম কতক মূল্য প্রদান করিতেন। ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" লিখিত আছে—'ইংরেজেরা লিখিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক আড়ং হইতে তাহারা বৎসরে ১৪৮১০০ খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন। রাজপুরুষেরা বলেন যে, রাণী ভবানীর রাজ্যে বংশতি লক্ষ লোকের বসতি ছিল। যে রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া লক্ষ লক্ষ বস্ত্র ইউরোপীয় বণিকের নিকট বিক্রিত হইত সে, রাজ্যে প্রজার লক্ষ্মীশ্রী কিরূপ ছিল? সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই ; এখন রাজসাহীতে বিলাতি কাপড়েরই একাধিপত্য।" বিলাতি কাপড় সুলভ বিক্রয় হওয়াতে, তন্তুবায়গণ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কেহ কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং কেহ বা অন্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এ জেলার পাঁচুপুর থানার অন্তর্গত পাঁচুপুর নিবাসী বেণী সাহা ও বাহারু সাহা, বিলমাড়িয়া (লালপুর) থানার অন্তর্গত বাগার নিকট হরি সাহা এবং লালোরের নিকট হাতিয়ানদহের বকসু প্রামাণিকের ব্যবসাই প্রধান। ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যে বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

হাট, বাজার ও মেলা** ঃ

হাট ও মেলার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বারইয়ারী কালীপূজা যে যে স্থানে হয়, প্রায় সেই সকল স্থানেই মেলা হয়। মেলায় আয় দ্বারা কোন কোন স্থানে বারইয়ারী কালীপূজা হয় এবং কোন কোন স্থানে পূজার ব্যয় সংকুলান হইয়া যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট থাকে। দৈনিক বাজার অল্প স্থানেই হয়। রামপুরবোয়ালিয়া, নাটোর, সরদহ, চারঘাট, পুঁঠিয়া, দিঘাপতিয়া, হাতিয়ানদহ, কলম, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে দৈনিক বাজার হয়। হাটের সংখ্যা অনেক ; তন্মধ্যে তাহিরপুর ও নওগাঁয়ের হাট প্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান মেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

* ৩৫২ পৃঃ দেখুন।
** ৩৫৮ ও ৩৮০ পৃঃ দেখুন।

(১) **প্রেমতলী**—ইহাকে ক্ষেতবের মেলা বলে। রামপুর বোয়ালিয়ার ১০ কি ১২ মাইল পশ্চিম। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মেলা হয়। চৈতন্যদেব গৌড় যাওয়া উপলক্ষে এই মেলা হয়।

(২) **মাঁদা**—মাঁদার বিলের ধারে। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে মেলা আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের পূজা হয়। নাটোরের রাজা সেবাইত। এই মেলার সময় বহুদূর হইতে অনেক লোকের সমাগম হয় ; বৈরাগীর সংখ্যাই বেশি।

(৩) **কুজাইল**—যমুনা নদীর তীরে। কাসিমপুর গ্রামের নিকট। বারইয়ারী কালীপূজা উপলক্ষে মেলা হয়। প্রায় এক মাস মেলা থাকে।

(৪) **নওগাঁ, কালীতলা**—যমুনা নদীতীরে। নওগাঁ মহকুমার নিকট। দুবলহাটি রাজা দ্বারা এ মেলা স্থাপিত। এ মেলা প্রায় ২০ দিন থাকে। কুজাইলের মেলার সময় এই মেলা আরম্ভ হয়।

(৫) **ভবানীপুর**—যমুনা নদীর তীরে, শুকটিগাছা হাটের নিকট, বারইয়ারী কালীপূজা উপলক্ষে মেলা হয়। প্রায় ১৫ দিন মেলা থাকে।

(৬) **বুধপাড়া**—লালপুরে বিলমাড়িয়া থানার নিকট। দুর্গোৎসব পরে দীপান্বিতা উপলক্ষে যে শ্যামাপূজা হয়, সেই সময় এই মেলা হয়।

(৭) **বাগা**—এটি মুসলমানের মেলা। রমজান ঈদ উপলক্ষে মেলা হয়।

ইহা ব্যতীত রথযাত্রা উপলক্ষে তাহিরপুর, বলিহার ও দুবলহাটির মেলাও কম প্রসিদ্ধ নহে।

১ উৎসাহ, শ্রাবণ ১৩০৫।

২. *Hunter's Statistical Account*

৩. "The production of indigo is practically limited to Rajshahi, only a few maunds being manufactured in the District of Rangpur The two small factories that exist in Dinajpur did not work during the year. The outturn of indigo in Rajshahi was, 1,062 maunds against 734 maunds and 29 seers in the preceding year The yield of silk was 155,422 the against 135, 831 lbs in the previous year."—*Administration Report of Rajshahi Division for 1898-99.*

৪. "Ganja is cultivated in a tract of country about 64 square miles in area lying within Thanahs Naugaon and Mohadevpur in the Naugaon Sub-Division of the Rajshahi District. In consequence of the destruction of the plants in the nurseries by heavy rains, the area under the crop decreased from 2108 Bighas to 1531 , the number of cultivators growing the drug from 1892 to 1834 ; and the produce from 5793 manuds to 5417. The average out-turn of the crop was 3 maunds 20 seers per bigha against 2 maunds 30 seers in the previous year."

"The total quantity of Ganja exported from Naugaon was 5867 maunds against 5966 in the preceding year. The distribution of the export was as follows :

Bengal	4,672
Orissa	255
Assam	545
Cooch Behar	67
North-West Provinces	328
	5,867

—*Administration Report of the Rajshahi Division for 1898-99.*

৫. "The cottage of Bengal, with its trim curved thatched roof and cane walls, is the best looking in India." — *The Elphiniston's History of India.*

প্রথম অধ্যায়
জাতি বিবরণ

রাজসাহী জেলা প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস। হিন্দু জাতিকে নিম্নের আট শ্রেণিতে বিভাগ করা যাইতে পারে ঃ

১) ব্রাহ্মণ।	৫) কায়স্থ।
২) ক্ষত্রিয়।	৬) নবশাক বা জল-আচরণীয় হিন্দু।
৩) বৈশ্য।	৭) জল-আচরণীয় হিন্দু অথচ নবশাক নহে।
৪) বৈদ্য।	৮) জল-অনাচরণীয় হিন্দু।

পুরাকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ ছিল না। প্রথম তিন বর্ণের মাতৃগর্ভে প্রবেশ হেতু এক জন্ম এবং সংস্কার হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন বলিয়া আর এক জন্ম হয়। এই হেতু ঐ প্রথম ত্রৈবর্ণ দ্বিজ বলিয়া পরিচিত। শূদ্রের কেবল মাতৃগর্ভে প্রবেশকে এক জন্ম বলিয়া "একজ" নামে খ্যাত। শূদ্রেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না। এই চারি জাতি ব্যতীত বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি যে জাতিগুলি দেখা যায়, ইহারা শূদ্রজাতির অন্তর্ভূত কি প্রথম তিন বর্ণের অন্তর্গত ইহা তর্ক বিতর্কের কথা। যদি বৈদ্য ও কায়স্থ শূদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত না হয়, তবে তাহারা কি প্রথম তিন বর্ণের কোন একটি বর্ণ হইতে উৎপন্ন? তবে কি তাহারা বর্ণসঙ্কর? এ প্রশ্নগুলির ঠিক মীমাংসা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। অতি প্রাচীনকালে আর্যজাতিদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হয়। প্রথমে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর আহার, বিহার, উপবেশন প্রচলিত ছিল। সমাজের কাজকর্ম সুবিধামত চালাইবার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণিতে আর্যজাতি বিভক্ত হয়। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং পরে পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির সৃষ্টি হইয়া জাতিভেদ হইল। জাতিভেদ হওয়ার পরেও উচ্চ জাতিয়েরা নীচ জাতির কন্যার পানিগ্রহণ করিতে পারিতেন। ইহাও নিয়ম ছিল যে নীচ জাতিয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান হইলে তাহাকে সংস্কার করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করান হইত এবং ঋষিরা তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণ করিতেন। ইহাতে এই বলা যাইতে পারে যে, শূদ্র যদিও ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞানী ও ধার্মিক হইত, তবে সে শূদ্রও ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত হইত।[১] "যাহারা বেদহীন ও আচার ভ্রষ্ট হইয়া সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান ও সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে তাহারাই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।"[২] এই মহাভারতীয় বাক্যের উপর নির্ভর করিলে, ইহা বলা যাইতে পারে যে পুরাকালে আর্যসন্তান বেদহীন আচার ভ্রষ্ট হইলেই শূদ্র এবং সদ্‌গুণানুসারে ও ব্যবসানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অধুনা আর্যজাতি পুর্বের ন্যায় বেদজ্ঞ না হওয়ায় এবং কালক্রমে জাতিভেদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুর্বের ন্যায় জ্ঞান চর্চা বিহীনে, সকল জাতিরই হীন অবস্থা এবং জাতিভেদেবও বেশি বাড়াবাড়ি হইয়াছে। অতএব নানা জাতির ও বর্ণের সৃষ্টি এবং নানা পরিবর্তন জন্য কোন বিষয়ে ঠিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন।

এই রাজসাহী জেলায় ১৫০০ বা ১৬০০ ব্রাহ্মণের বাস। সাধারণত রাজসাহীর ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচশ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(ক) বারেন্দ্র, (খ) রাঢ়ী, (গ)

বৈদিক, (ঘ) বর্ণ, (ঙ) কনৌজ। রাজা আদিশূরের পুত্রেষ্টি, যাগ সম্পন্ন জন্য কান্যকুব্জ হইতে দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামে সাগ্নিক, বেদজ্ঞ ও সৎক্রিয়াশালী পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া রাজপ্রদত্ত পঞ্চগ্রামে বাস করেন। ইহাদের বংশধরেরা কতকগুলি রাঢ়দেশে, ও কতকগুলি বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। যাহারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন, তাহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলেন।

(ক) **বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ**—এই শ্রেণি ব্রাহ্মণ প্রায়ই ধনী। জেলার বড় বড় রাজা জমিদার প্রভৃতি এই শ্রেণির ব্রাহ্মণ। তাহিরপুর, পুঁঠিয়া, নাটোর, বলিহার, চৌগ্রাম, লালোর, কাসিমপুর, পানশীপাড়া, জোয়াড়ী, দারীকুশী, আটগ্রাম, ইসলামগাতি, খাজুরা প্রভৃতি স্থানের রাজা ও জমিদারেরা এই শ্রেণির ব্রাহ্মণ। বর্তমান আয়তন অপেক্ষা পূর্বে এই জেলার আয়তন পাঁচগুণ বেশি ছিল। এইরূপ বৃহৎ জেলা ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাহিরপুর, পুঁঠিয়া, নাটোর প্রভৃতি রাজার হস্তে ছিল। মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় লিখিয়াছেন যে—"রাজসাহী জেলার বর্তমান আয়তন সঙ্কীর্ণ হইলেও অনেক স্থানে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব পুরুষদিগের বসতি-চিহ্ন, অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। কুলজ্ঞ গ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজের উল্লেখ আছে তাহার অধিকাংশ বর্তমান রাজসাহী জেলার সীমা মধ্যে দেখা যায়। তবে দীর্ঘকালে নামের অপভ্রংশ মাত্র হইয়াছে; যথা—মধ্যগ্রাম (মাঝগ্রাম), গুড় নদী (গুড়নই), গুণিগাছা, ভাদুড়ি (ভাতুড়িয়া), মধুগ্রাম (মৌগ্রাম), বালষষ্টিক (বালশাটিয়া), মঠগ্রাম (মঠগাঁ), গঙ্গাগ্রাম (গাঙ্গইল), বিশাখা (বিশা), রাণীহারি (রায়না), কুড়মুড়ি (কুড়মইল বলিহার), শীতলী (শীতলাই), তালড়ি (তানোর), দেবলী (দেউলা), নিদ্রালী (নিন্দাইল), কালিগ্রাম (কালিগ্রাঁ), খর্জ্জুরী (খাজুরিয়া), পঞ্চবটি (পাঁচবাড়িয়া), চম্পটি (চামটা), বোড়গ্রাম (বড়াইগাঁ), করঞ্জ (করঞ্জা), বোখড়ি (বোথড়) ইত্যাদি নাম ও সমাজের চিহ্ন দেখা যায়।" সুষেণাদির পুত্রগণ[৩] বরেন্দ্রভূমিতে একশত গ্রাম (গাঁই) প্রাপ্ত হইয়া বাস করেন। ইহারাই বারেন্দ্র শ্রেণি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ প্রধানত তিন শাখায় বিভক্ত, যথা—(১) কুলীন, (২) সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, (৩) কষ্ট শ্রোয়িত্র। কোন্ শাখায় কত গাঁই তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(১) সুষেণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ—নায়ারণ ভট্ট, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম।

সংখ্যা	শাখা	কোন শাখায় কত গাঁই
১	কুলীন	৮
২	সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ...	৮
৩	কষ্ট শ্রোত্রীয় ...	৮৪
	মোট	১০০

কুলীন ব্রাহ্মণ—এই বারেন্দ্র শ্রেণি কুলীন ব্রাহ্মণের ৮ গাঁই, যথা—মৈত্র, ভীম, রুদ্র ও সাধু (বাগচি), সংযামিনী (সান্যাল), লাহিড়ি, ভাদুড়ি ভাদড়া[৩]। কুলশাস্ত্র বিশারদ উদয়নাচার্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র শ্রেণি কুলীন ব্রাহ্মণগণের দোষ গুণ বিচার করিয়া তাহাদিগকে আট পটিতে বিভক্ত করেন, যথা—(১) নিরাবিল, (২) ভূষণা, (৩) রোহিলা, (৪) ভবানীপুর, (৫) বেণী, (৬) আলেখানি, (৭) কুতুবখানি, (৮) জোনালী। এইরূপ কৌলীন্য প্রথা বল্লালসেনের সময় হইতে প্রচলিত। কিন্তু বল্লালসেনের অধিকারের পূর্বে, ঠিক এই প্রকার না হউক, কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। মনুর কন্যা দেবহূতি। এই দেবহূতির সহিত কর্দম মুনির বিবাহ হইয়া নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই নয় কন্যার বিবাহ নয় ব্রহ্মর্ষির সহিত হওয়ার সময় কৌলীন্য প্রথা প্রথমে প্রচলিত

হয়। বল্লালসেন নবগুণ[৪] বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে কুলীন করেন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গুণানুসারে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয় করেন। বর্তমান প্রথানুসারে ব্রাহ্মণগণের সেই গুণ না থাকিলেও কুলীন ও শ্রোত্রিয় বলিয়া কথিত হন। এইরূপ বংশগত কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং বল্লালসেনেরও এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। কৌলীন্য প্রথায় যেমন দোষ আছে, তেমন গুণও আছে। সমাজ বন্ধনীর শিথিলতাতেই দোষের ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বল্লালসেন প্রচলিত কৌলীন্য প্রথানুসারে খাজুরা, চৌগ্রাম বর্তমান তাহিরপুর (বংশ), পাটুল, বলিহার প্রভৃতি স্থানের কুলীন ব্রাহ্মণ নিরাবিল পটিভুক্ত এবং ইহারাই সমাজে শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়—সিদ্ধ শ্রোত্রিযের ৮ গাঁই যথা—করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলি, চম্পটি, ঝম্পটি, (ঝামাল), কামদেব (কামদেবতা), আদিত্য। যাহারা কন্যা গ্রহণে ও কন্যা সম্প্রদানে বিশেষ সাবধান ছিলেন, তাহারাই উৎকৃষ্ট শ্রোত্রিয় হইলেন। চম্পটি, নন্দনাবাসী প্রভৃতি গাঁই অতি প্রসিদ্ধ। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নন্দনাবাসী (গাঁই) গ্রামের মৌনভট্ট বংশে প্রসিদ্ধ "মুক্তাবলী" প্রণেতা কুল্লুকভট্ট এবং তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ কংসনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

কষ্ট শ্রোত্রিয়—যাহারা কন্যা গ্রহণে ও সম্প্রদানে নিতান্ত অসাবধান, তাহারাই কষ্ট শ্রোত্রিয় হইতেন। এই কষ্ট শ্রোত্রিয়ের ৮৪ গাঁই। ইহাদের মধ্যে ৮ ঘর প্রসিদ্ধ। যথা ঃ— শীহরি, রাইগাঁই, কুড়িমুড়িয়া, গোস্বা, খর্জ্জুরী, বিশি, উচ্চরিক ও জামরিক। স্বর্ণদেব শীহরি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া কষ্ট শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হন। রাইগাঁই রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও দেখা যায়।

বারেন্দ্র শ্রেণি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন্ গোত্রে কত গাঁই, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

সংখ্যা	গোত্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা (গাঁই)
১	কাশ্যপ	১৮
২	শাণ্ডিল্য	১৪
৩	বাৎস্য	২৪
৪	ভরদ্বাজ	২৪
৫	সাবর্ণ	২০
	মোট	১০০

ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের বংশোদ্ভব মৈত্রেয় ও ক্রতু, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের বংশোদ্ভব সাধু, রুদ্র, লোকনাথ[৫] ও বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধরের বংশোদ্ভব লক্ষ্মীধর, জয়মণি মিশ্র, বল্লালের নিকট কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট সমুদয় শ্রোত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

রাজসাহীতে নাটোর (রাজবংশ), পানশীপাড়া, ইসলামগাঁতি, আটগ্রাম প্রভৃতি স্থানের শ্রোত্রিয় অতি প্রসিদ্ধ।

কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটি কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় (করণ) হইবার পর, দৈবাৎ যদি বিবাহের পূর্বেই বরের মৃত্যু হয়, তবে ঐ অবিবাহিতা কন্যাকে অন্যপূর্বা কহে। বারেন্দ্র শ্রেণি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই অন্যপূর্বা বিবাহ প্রচলিত আছে বটে ; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ এই কন্যাকে বিবাহ করে, সে সমাজে অতি ঘৃণিত হইয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট কুলে আদান প্রদান করিতে পারে না। এই দোষ নিবারণ জন্য এক্ষণে বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে করণ হয়।

কাপ (কাচ)—রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কাপ নাই। বারেন্দ্র শ্রেণি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে

কাপের সৃষ্টি হয়। সাধারণ কথায় কুলভ্রষ্ট ব্যক্তিকে কাপ বলা যায়। শান্তিপুর নিবাসী নৃসিংহ লাড়ুলি সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ছিলেন না। তাহার কন্যাকে কুলীন শ্রেষ্ঠ মধু মৈত্রেয় বিবাহ করিলে, মধুর পূর্ব পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, পিতা নীচ বংশের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল এবং বাটির মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া পৃথক বাস করিতে লাগিল। ধেঁই বাগচি মৈত্রেয়ের ভগিনীপতি। ধেঁই বাগচি, তাহার পত্নীর অনুরোধে, মধু মৈত্রের বাটিতে তাহার পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আসিয়া দেখিলেন, মধুর পুত্রগণ চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া পৃথক বাস করিতেছেন। ধেঁই বাগচির নানা উপদেশে পুত্রগণ পিতার সহিত একত্রিত হইল না। তৎপর ধেঁই বাগচি মধুর পুত্রগণকে বলিলেন, তোরা বাটির মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া এ একটি "কাচ" করিয়াছিস্। এই "কাচ" শব্দ হইতে "কাপ" হইল। মধু মৈত্রের প্রথম বনিতার তিন পুত্র রক্ষতাই, নন্দাই, গদাই এই তিন সহোদর কুলভ্রষ্ট কাপ হইলেন। তাহারা বারি-বিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা অন্যেকেও কাপ করিয়া লইতে লাগিল। মধু মৈত্রেয়ও সমাজে পতিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু রাজা কংসনারায়ণ মধু মৈত্রকে কন্যা দান করিয়া, তাহার সমাজের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, রাজা কংসনারায়ণ শ্রোত্রিয় হইলেন, কিন্তু নৃসিংহ লাড়ুলির ও রাজা কংসনারায়ণের দৌহিত্রগণ কুলীন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন। এই সময় হইতে কুশবারি সংযুক্ত না হইলে, কেবল শয়নে, ভোজনে, স্পর্শে, বারি-বিন্দু প্রক্ষেপে কুলীনের কুলপাত হইবে না বলিয়া স্থির হইল। কাপের সহিত শ্রোত্রিয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইল, কাপ স্বধর্মে পুষ্ট রহিলেন। এ বিষয় তাহিরপুর ও নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইবে।

কাপগণের অনেক শাখা। প্রধানত তিন শাখা প্রসিদ্ধ যথা—(১) বারবকাবাদ, (২) সুলতান প্রতাপ, (৩) গঙ্গাতীর। প্রথম দুই শাখা—রাজসাহী প্রদেশের (রাজসাহী ও পাবনা জেলার) অন্তর্গত এবং তৃতীয় শাখা মুরশিদাবাদের অধীন।

(১) হরিপুর, লালুর (লালোর), কাসিমপুর, হাঁসপুর প্রভৃতি স্থানগুলি বারবকাবাদ সমাজের অধীন।

(২) বাক্, কাবারি, কোলা, নয়াবাড়ি, ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলি সুলতান প্রতাপ সমাজের অধীন।

(৩) খাগড়া, ব্যাসপুর, আচার্যপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলি গঙ্গাতীর সমাজের অধীন।

রাজসাহী প্রদেশের কাপ মধ্যে হরিপুর, লালুর, কাসিমপুরের চৌধুরীরা, হাঁসপুরের ভট্টাচার্যেরা, ক্ষেতুপাড়ার রায়েরা এবং কাসিমপুরের লাহিড়িবংশীয়েরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাপ ক্রমাগত কুলীনে কন্যাদান করিতে পারিলেই কাপের মর্যাদা বৃদ্ধি হইল।

বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ কুলভ্রষ্ট হইলে কাপ হন এবং কুলীন বলিয়া আর গৌরব রাখিতে না পারিলেও কুলকার্যদ্বারা সর্বদা তাজা থাকেন ; কিন্তু রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণ কুল ভঙ্গ করিলে, তিন পুরুষ পর্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে কুলীনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াও কুলকার্য দ্বারা আর তাজা থাকিতে পারে না।

(খ) রাঢ়ী ব্রাহ্মণ—পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন জন্য আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদজ্ঞ পঞ্চ গোত্রিয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন। তাহাদের নাম দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। ইহাদের সন্তান সন্ততি কেহ রাঢ়দেশে এবং কেহ বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। যাহারা রাঢ় দেশে বাস করেন, তাহারাই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইলেন। কিন্তু হন্টার সাহেব বলেন, যে মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণ সময় রাঢ়ীশ্রেণি ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে আসিয়া রাজসাহী জেলায় বাস করে। রাজসাহী বরেন্দ্রভূমি এবং হন্টার সাহেবের "পশ্চিম-বাঙ্গালা" বোধ হয় রাঢ়দেশ। এই দুই প্রদেশ পদ্মা নদী দ্বারা বিচ্ছেদ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষে পদ্মানদী পার হইয়া রাজসাহী আক্রমণ করা কঠিন বিবেচনায়, পশ্চিমবাঙ্গালা হইতে রাঢ়ীশ্রেণি ব্রাহ্মণ যে

রাজসাহীতে বাস নির্দেশ করেন, তাহা হন্টার সাহেবের অসঙ্গত কথা বলিয়া বোধ হয় না। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে দক্ষের ১৬, ভট্টনারায়ণের ১৬, শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২ এবং ছান্দড়ের ৮ সন্তান জন্মে। অতএব রাঢ়ীশ্রেণি ব্রাহ্মণেরা বলেন, "পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।" বারেন্দ্রশ্রেণি ব্রাহ্মণের একশত গাঁই এবং ইহাদের আদিপুরুষ সুষেণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ। ইহারাও কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান।[৬] "কালক্রমে যখন ভ্রাতৃগণ মধ্যে অপ্রণয় ও বিদ্বেষ জন্মিল তখনই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর পৃথক হন। তৎকালে যাহারা পৃথক হইলেন, তাহারা পুনর্বার রাজার নিকট নিজ নিজ বাসের জন্য আরও কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। সেই গ্রামগুলি বরেন্দ্রভূমের মধ্যে নির্দিষ্ট হইল ; সুতরাং উহা রাঢ়দেশের ছাপান্ন গ্রাম নামমালার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।"[৭] রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গাঁই মধ্যে আট গাঁই নবগুণ বিশিষ্ট এবং কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা বন্দো, চট্ট, মুখুটি, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী। এই আট বংশে সর্বসমেত উনিশ জন কুলীন হইলেন। ইহাদের অধস্তন সন্তানগণ মধ্যে পালধি, পাকড়াশি, বটব্যাল প্রভৃতি বংশগুলি অষ্টগুণবিশিষ্ট হওয়াতে শ্রোত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। আবার আদানপ্রদানে অসাবধান থাকায় দীর্ঘাঙ্গী, ঘণ্টেশ্বরী প্রভৃতি বংশ গৌণ কুলীন বলিয়া পরিচিত হইল। এই রাঢ়ীশ্রেণি ব্রাহ্মণগণের কোন শাখায় কত গাঁই তাহা নিম্ন তালিকায় জানা যাইবে।

সংখ্যা	শাখা	কোন শাখায় কত গাঁই
১	কুলীন	৮
২	সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ...	৩৪
৩	গৌণ শ্রোত্রীয় ...	১৪
	মোট	৫৬

কুলীনেরা কুলীনের সঙ্গে আদান প্রদান করিবেন এবং কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিতে পারিবেন না, যদি করেন, তাহারা কুলভ্রষ্ট হইয়া বংশজ নামে পরিচিত হইবেন। যাহারা বংশজ হইলেন, তাহারা মর্যাদায় গৌণ কুলীনের সমতুল্য হইবেন।

এই রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা রাজসাহীতে অতি অল্প। রাজসাহীতে আড়ানী, পাঁকা, কামারগাঁ, দমদমা, বান্দাইখারা, মহাদেবপুর, প্রভৃতি স্থানে অল্প সংখ্যক রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণ বাস করে। পাঁকার রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা পুঁঠিয়া রাজার গুরুবংশ। মহাদেবপুরের ও ডিহিবিসার জমিদারগণ রাঢ়ীশ্রেণি ব্রাহ্মণ।

(গ) **বৈদিক ব্রাহ্মণ**—আদিশূর যে ৫ জন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনেন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা তাহাদের বংশীয় নহে। ইহারা বঙ্গদেশের আদিম নিবাসীও নহে। ইহাদের বল্লালসেন প্রদত্ত কৌলীন্য মর্যাদা না থাকিলেও ইহাদের কোন একপ্রকার কৌলীন্য মর্যাদা আছে। যাহারা সৎক্রিয়ান্বিত তাহারাই কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের গাঁই নাই ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক গোত্র আছে তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য প্রভৃতি ২৪টি গোত্র প্রসিদ্ধ। ইহা কথিত আছে যে, বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইবার পর সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব হইলে রাজা শ্যামলবর্ণ কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন। তাহাদেরই বংশে বৈদিক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। এই বৈদিক ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কেশরীবংশীয় রাজাদের সময় উৎকল হইতে বাঙ্গালায় আইসেন। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা আবার

দুইভাগে বিভক্ত—জোঁয়াড়ি ও কোঁয়াড়ি। জোঁয়াড়ির অপভ্রংশে জোয়াড়ি একটি গ্রাম রাজসাহী জেলায় আছে এবং সেই গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণেরা প্রসিদ্ধ। জোঁয়াড়িদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট ও মৌদগল্য গোত্রীয় বংশগুলি কুলীন। রাজসাহীতে বৈদিক শ্রেণি ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি কম। জোঁয়াড়ি (জোয়াড়ি), লালুর, বান্দাইখারা প্রভৃতি স্থানে অল্প সংখ্যক মাত্র আছে। ইহারা প্রায়শ দাসত্ব স্বীকার করে না। কেহ কেহ গুরুর কার্য এবং যাজকের কার্য নির্বাহ করিয়া থাকে।

(ঘ) **বর্ণ ব্রাহ্মণ**—রাজসাহী জেলায় এ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি কম। নীচ শূদ্রের যাজক কার্য করিয়া ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা অপকৃষ্ট শূদ্রের দান গ্রহণে পতিত হয়। এ শ্রেণির ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত দরিদ্র।

(ঙ) **কনৌজ ব্রাহ্মণ**—এ ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত কম যে দুই শতের বেশি হইবে না। ইহারা কান্যকুব্জাগত পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের অনেকে পশ্চিম দেশ হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ করেন এবং পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আছেন। ইহাদের অনেক স্ত্রীলোক হিন্দিতে স্বামীর সহিত কথোপকথন করেন। ইহাদের রীতিনীতি প্রায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এবং ইহাদের পুরোহিতও বাঙালি ব্রাহ্মণ। ইহারা উত্তর কি পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়া সম্ভবত বাণিজ্য উপলক্ষে মুসলমানদের রাজত্ব সময় হইতে রাজসাহীতে বাস করিতেছেন। ইহাদের অবস্থা মন্দ নহে। ইহাদের সামান্য ভূ-সম্পত্তি আছে এবং ইহারা বাণিজ্যও করিয়া থাকে।

উপরের লিখিত ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত "সাতশতী" ও "মধ্য শ্রেণি" ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া কথিত। কিন্তু এই দুই প্রকার ব্রাহ্মণ রাজসাহী জেলায় দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের বিবরণ লেখা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

(২) **ক্ষত্রিয়**—পৌরাণিক মতে ইহারা ব্রহ্মার বাহু হইতে জাত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের নীচে ও অন্যান্য বর্ণের উপরিভাগে আসন প্রাপ্ত হন। পুরাকালে এই জাতিই রাজা এবং যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। ইহার পর কোন কোন ক্ষত্রিয়পত্নীরা বংশরক্ষার্থে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লন। এই ব্রাহ্মণ ঔরসজাত ক্ষত্রিয়গণ ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত।[৮] এইরূপ ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ক্ষত্রিয় অতিবিরল। রাজসাহী জেলায় যাহাদের ক্ষত্রিয় বলা যায়, তাহারা দুই কি তিন শতের বেশি হইবে না। ইহারা পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়া এ জেলায় বাস করে। ইহাদের অধিকাংশ ধনী মহাজন। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যাণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে "রাজপুত" বলে। রাজপুত ও ঘাটওয়াল বর্তমান ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভূত বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জেলায় "রাজপুতের" সংখ্যা প্রায় ১৫০০ বা ১৬০০ হইবে। ইহারা প্রায়ই দ্বারবানের কার্য করে। "ঘাটওয়ালের" সংখ্যা প্রায় ২০০ হইবে। ইহারা প্রায়ই চৌকিদারের কার্য নির্বাহ করে।

(৩) **বৈশ্য**—পৌরাণিক মতে এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা দ্বিজ বলিয়া কথিত ছিল। ইহাদের জাতীয় ব্যবসা কৃষি, বাণিজ্য ও কুশীদব্যবহার। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণের শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার। বঙ্গে প্রকৃত বৈশ্য অতি বিরল। মাড়ওয়ারী এই জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু মাড়ওয়ারীরা নিজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। রামপুরবোয়ালিয়াতে কতকগুলি মাড়ওয়ারী ব্যবসা বাণিজ্য জন্য বাস করে। ইহাদের সংখ্যা ২০০ কি ২৫০ মাত্র হইবে।

(৪) **বৈদ্য**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই। ইহা ব্যতীত সকল জাতি সঙ্কর জাতি বলিয়া পরিচিত। স্কন্দ পুরাণ-মতে অম্বাকুলোদ্ভব বৈশ্যকন্যা বীরভদ্রার গর্ভে বেদমন্ত্রের বলে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন। বেদমন্ত্রবলে বালকের জন্ম হয়

বলিয়া "বৈদ্য" এবং অম্বাকুলে জন্ম হয় বলিয়া "অম্বষ্ঠ" এ জাতির নাম "বৈদ্য" বা "অম্বষ্ঠ" হইল। ধন্বন্তরি অশ্বিনীকুমারের মানুষী কন্যা সিদ্ধ বিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, ধরাতলে চিকিৎসাবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সিদ্ধবিদ্যার গর্ভে এবং ধন্বন্তরির ঔরসে সেন, দাস ও গুপ্ত এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন জনের বংশধরেরা বৈদ্য জাতিরূপে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া পড়ে। পৌরাণিক মত ছাড়িয়া দিয়া পুরাণের সারভাগ গ্রহণ করিলে, ইহা প্রতীতি হইবে যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র "বৈদ্য" বা "অম্বষ্ঠ" হইয়া বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ইহা মনুর ব্যবস্থানুসারে সিদ্ধান্ত। ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইল যে বৈদ্যেরা শূদ্রজাতীয় নহে ; এবং বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে যাহারা উপনীত, তাহারা ১৫ দিন এবং যাহারা উপনীত নহে, তাহারা একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। কোন স্থলে ইহাদের আচার ব্যবহার প্রায় ব্রাহ্মণ সদৃশ এবং কোন স্থলে কায়স্থের মত। ইহাদের জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা এবং ইহারা স্মৃতিশাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া থাকে। আদিশূর, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, রাজবল্লভ প্রভৃতি রাজগণ এই বংশোদ্ভব। "দানসাগর" নামক গ্রন্থে, সেনবংশের তাম্রশাসনে ও প্রস্তরফলকে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে বল্লালসেন চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম-ক্ষত্র-কুলোদ্ভব বিজয়সেনের পুত্র।[৯] ইহাতে বৈদ্যজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। এইরূপ বৈদ্যজাতি সাধারণত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা—(১) বঙ্গজ, (২) রাঢ়ী, (৩) পঞ্চকোটি। রাজসাহীর বৈদ্যগণ বঙ্গজ শ্রেণিভুক্ত। ইহাদের অনেকে যশোহর জেলার অন্তর্গত সেনহাটি সমাজভুক্ত। যদিও ইহারা চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত, ইহাদের অনেকেই চাকরি করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল। রাজসাহীতে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১১০০ কি ১২০০ হইবে। বেলঘরিয়া, পুঁঠিয়া, মরকটি প্রভৃতি গ্রামে বৈদ্যের বাস।

(৫) **কায়স্থ কি শূদ্র?**—অগ্নিপুরাণ মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদপদ্ম হইতে শূদ্রমণি উৎপন্ন হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। শূদ্রমণির পুত্র হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, এবং প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। এই পুরাণমতে শূদ্রমণি হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইল। এই কায়স্থমণির তিন বিখ্যাত পুত্র—চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গমন করিয়া যমের সভায় লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে গমন করেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশবিস্তার করেন। চিত্রসেনের দুইপক্ষ—এক পক্ষ হইতে করণ ও অনুকরণ এবং অপর পক্ষ হইতে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, করণ ও মৃত্যুঞ্জয় এই ৭ জন পুত্র জন্মিল। আবার করণ হইতে ঘোষ, সিংহ, মিত্র, দাস, দত্ত এই পাঁচজন পুত্র এবং অনুকরণ হইতে দেব, কর, পালিত, সেন. সিংহ, দাস, গুহ, নন্দী, চাকী এই নয়জন পুত্র জন্মে। এই বংশ হইতে ৭২ ঘর কায়স্থ উৎপন্ন হয়।[১০] কিন্তু অন্যান্য পুরাণ মতে চিত্রগুপ্ত দেবই চতুর্দশ যম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যমতর্পণের মন্ত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতামহ ব্রহ্মা আপন শরীর হইতে যম, ধর্মরাজ, বৈবস্বত, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিকে উৎপন্ন করেন।[১২] তপন (তৃপ্ = প্রীতি করা + অনট্) পিতৃপুরুষদিগের প্রীতির নিমিত্ত জল দান করাকে বুঝায়। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল জাতিই তর্পণ করিয়া থাকে। উচ্চজাতি অধস্তন জাতির প্রীতির জন্য স্বপিতৃ লোকের পূর্বে অপর বর্ণকে জল দান করিতে কোন মতে পারে না। অতএব চিত্রগুপ্ত শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয়। "এই চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ দেব। ইনি চিত্রকূট পর্বতের রাজা ছিলেন। গৌতম ঋষি ইহার উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন।"[১২] মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থগণের ৪১টি উপাধি আছে, তন্মধ্যে গড়করী, রণদিবে, বিবাদে ও চৌবল উপাধি দেখা যায়। "গড়করী" শব্দে দুর্গরক্ষক, "রণ-দিবে" শব্দে রণবিজয়ী ; "বিবাদে" শব্দে রাজদূত, "চৌবল" শব্দে চারি প্রকার সৈন্যের নায়ক বুঝায়। "কায়স্থ বংশাবলীর" সংগৃহীতা বলেন—পরাশরীয় কুলার্ণবে কায়স্থ শব্দের বুৎপত্তি এইরূপ লিখিত

হইয়াছে যে, ক—শব্দে প্রজাপতি, আয়—শব্দে বাহু, স্থ—শব্দে স্থিত, অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহুতে স্থিত থাকিয়া উদ্ভূত। এই হেতু কায়স্থ বলিয়া কীর্তিত। যথা ঃ—

কঃপ্রজাপতি ব্যাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থস্তং সমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্তিতঃ।

বাহুজাত ক্ষত্রিয় সমাজ হইতেই চিত্রগুপ্ত নামে একজন লেখাপড়ার আবিষ্কার করিয়া, কায়স্থ আখ্যায় স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন ; সুতরাং কবি কল্পনার দ্বারা ঐরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। কায়স্থ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা "কায়েস্থিত"।[১৩]

ভরতের দেশ বলিয়া আমাদের বাসস্থানকে "ভারতবর্ষ" বলে। এক সময়ে এদেশ কেবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কোন কোন স্থানে দুই এক ঘর ভীল, খন্দ, সাঁওতালদের মত অসভ্য জাতীয় লোক বাস করিত। অতি পূর্বকালে এশিয়ার মধ্যদেশে "আর্য" নামে একজাতি বাস করিতেন। তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করেন। তাহাদের এক দল ইউরোপে প্রবেশ করেন, একদল পারস্য দেশও ছাড়িয়া আইসেন এবং তৃতীয় দল সিন্ধু নদী পার হইয়া পাঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহারাই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর নিকটবর্তী ব্রহ্মাবর্ত নামক জনপদে বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই ভারতবর্ষের আর্য জাতি। ইহারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। ইংরেজ, ফরাসি, জর্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকেরা এবং আরবি ও পারসি প্রভৃতি এশিয়া-দেশবাসীরাও আর্য বংশসম্ভূত। অতএব, বর্তমান ইংরেজ, ফরাসি, মুসলমান, পারসি, হিন্দু সকলেই এক জাতি ছিল। এই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা স্বীকার করিলে সকলেই বলিতে পারে যে আর্যদিগের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। এই আর্যজাতিরা গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া, সেই দেশকে আর্যবর্ত নাম দিলেন। এই বঙ্গবাসীরাও আর্য সন্তান। আর্যজাতিরা স্বভাবত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাহারা এদেশে আসিয়াবধি আদিমবাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া, নিজে সকল সময় যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, এই বিবেচনায় তাহারা পুরোহিত নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ কার্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তজ্জন্য আর্যেরা নিজ বাসস্থান ছাড়িয়া দূরদেশে অনেক সময় থাকিতে লাগিলেন। দৈবকার্য ও পরিবারের ভরণপোষণ জন্যও কৃষিকার্য আবশ্যক হইয়া উঠিল। আর্যজাতির কৃষি প্রিয় কার্য ছিল। যাহারা যুদ্ধে পটু নহে, তাহারাই বাটিতে থাকিয়া কৃষি ও বাণিজ্য এবং যাগ-যজ্ঞাদি নির্বাহ করিতেন। এই সময় সমাজের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে একজাতি থাকিলে কাজকর্মের সুবিধা হয় না। অতএব কালক্রমে আর্যজাতির মধ্যে যাহারা পুরোহিত অর্থাৎ বেদজ্ঞ জ্ঞানী এবং যাগযজ্ঞের ভার গ্রহণ করিলেন, তাহারা ব্রাহ্মণ ; যাহারা যুদ্ধ করিয়া শত্রু হইতে দেশরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তাহার বৈশ্য বা বণিক নাম প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সকলকে বন্দি করিয়া আনিতে লাগিলেন, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র[১৪] নাম প্রাপ্ত হইল। প্রভুর সেবা করা এবং কৃষি দ্বারা তাহাকে প্রতিপালন করা শূদ্রের কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত হইল। এখন বলা যাইতে পারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর্যবংশ সম্ভূত, শূদ্র বা দাস আর্যবংশ-সম্ভূত নহে। এই ত জাতিভেদের সৃষ্টি হইল। এইরূপে জাতিভেদের সৃষ্টির পর হইতে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ বিদ্যায় এত পটু হইলেন যে সমুদয় রাজ্য তাহাদের করতলস্থ। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে অনভ্যাসবশত তাদৃশ যুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন না আবার ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং অস্ত্রধারণ না করিয়া ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা প্রবল এবং ব্রাহ্মণেরা হীনবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে সংগ্রাম করিতে লাগিল। ভুজবলে ক্ষত্রিয়েরা এবং তপোবলে ও ব্রাহ্মণ্য বলে ব্রাহ্মণেরা তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। আবার এই সময়ে পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশও

প্রায় ধ্বংস করেন, এবং তৎপরে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ক্ষত্রিয় বংশ বিস্তার করেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া ক্ষত্রিয় জাতিকে যেরূপ দুর্দশায় পাতিত করেন, তাহা নিম্নোদ্ধত শ্লোকে প্রতিপন্ন হইবে।

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ।।
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দালভ্যঃ প্রতুবাচ দদামি তব বাঞ্চিতং।। স্কন্দ পুরাণ।

রাজা চন্দ্রসেন নিহত হইলে পর, তাহার গর্ভবতী পত্নী মহর্ষি দালভ্যের শরণাপন্ন হইলেন। পরশুরাম জানিতে পারিয়া, ঋষির নিকট হইতে রাজমহিষীকে প্রার্থনা করেন। ঋষি বলিলেন, শাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে যে স্ত্রী ও বালক অবধ্য। অতএব স্ত্রীলোককে ক্ষমা করা উচিত। পরশুরাম ক্ষমা করিলেন এবং বলিলেন যে রাজমহিষীর গর্ভজাত সন্তান "কায়স্থ" নামে পরিচিত এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। এই সময় হইতে চন্দ্রসেনের পুত্র "কায়স্থ" নামে খ্যাত এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম বর্জিত হইলেন। মহর্ষি দালভ্য কায়স্থকে ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বর্জন করিয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম প্রদান করেন। এই ঘটনার পর হইতে চন্দ্রসেন বংশ ও চিত্রগুপ্ত বংশ এক হইয়া গিয়াছে। "মহর্ষি দালভ্যের অনুগ্রহে কায়স্থগণ ধার্মিক, সত্যবাদী, সদাচার পরায়ণ হইয়াছেন"।[১৫] এই বিপ্লব সময়ে সকল জাতির বিশেষত ক্ষত্রিয় জাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, নাম উপাধি ও সামাজিক নিয়মাদির ব্যতিক্রম ঘটিল। অতএব এই সময় হইতে অনেক ক্ষত্রিয় পরশুরামের ভয়ে বা ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে শূদ্রের মত আচার গ্রহণ করিলেন। তপোবলে ব্রাহ্মণেরা তেজস্বী হইলে, তাহারা ক্ষত্রিয়দের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য নির্বাহ করিতেন না। অতি প্রাচীন কালে জাতিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পরেও, বেদানুযায়ী সকল কার্য নির্বাহ হইত। পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়নের পর হইতেই বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অনেক শিথিলভাব অবলম্বন করিল এবং হিন্দু শাস্ত্র ক্রমে জটিল রূপ ধারণ করিল। যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বেশি, এবং ক্ষত্রিয়ের কোন প্রাধান্যই নাই, তখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অনুগত এবং দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার ব্যবস্থানুযায়ী জাতিভেদ একবাবে দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক পরে সেন বংশীয় রাজাদের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হয়। নবগুণ বিশিষ্ট হইলেই কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য কুলীন হইল। এস্থলে জাতিভেদে নবগুণের তারতম্য হইল না। এই নয়টা গুণ মধ্যে একটি গুণ আবৃত্তি। আবৃত্তি শব্দে বেদপাঠ বুঝাইত। শূদ্রের যে কেবল বেদপাঠের অধিকার নাই এমন নহে ; বেদ পাঠ শুনিবারও অধিকার নাই।[১৬] এমতাবস্থায় কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইলে কি প্রকারে নবগুণের অন্তর্গত আবৃত্তি (বেদপাঠ) কায়স্থের কুলীনদের পক্ষেও সম্ভব হইল? সেনবংশীয় রাজাদের সময় পর্যন্তও কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সম্মানিত হইতেন।

উপরে যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহার বলে, আমরা বলিতে পারি যে আদিতে কায়স্থ ত্রিবর্ণের সেবক ছিল না। "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা কায়স্থা জগতীতলে। চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে।" এই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের উপর নির্ভব করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত বংশোদ্ভব। "কায়স্থ শব্দ জাতি বাচক নহে, উহা লিপি-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দিগের উপাধি মাত্র। কালক্রমে ঐ উপাধিই জাতিগত হইয়া কায়স্থগণ এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইয়াছেন। এইরূপে চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থ শ্রেণি গঠনের পর পরশুরামের বিপ্লব সময়ে চন্দ্রসেন রাজর্ষির সন্তানও কায়স্থ আখ্যা গ্রহণ করিয়া চিত্রগুপ্ত বংশধরদিগের শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন।"[১৭] আরও প্রতীতি হয় যে, এককালে কায়স্থ ঋষির শিষ্য হইয়া উপনয়ন

সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকার্যে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, লিপিকর ছিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিৎ ও রাজকর্মচারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আদিশূরের সময় পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আইসেন। এ সময়ও কায়স্থ-কুলদীপিকার "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে" বচনে কায়স্থ রক্ষক বলিয়া কথিত। এই কায়স্থগণ সম্বন্ধে দেবীবর নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আর কয়েকজন ব্যক্তির ব্রাহ্মণের চিহ্ন ছিল না, তাহারা অসি কবচ ধনুর্ধারী হইয়া অশ্বারোহণে বীরবেশে আগমন করাতে রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তজ্জন্য তিনি একি একি বলিয়া ভয়ে অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন।"[১৮] দেবীবরের মতে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ রক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। রঘুনন্দনের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় কায়স্থগণের সম্মান খর্ব হইলেও, "ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি নবদ্বীপাধিপতি সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর তাহার অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ সময়ে সভামণ্ডপে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়ের আসন প্রদান করিয়াছিলেন।"[১৮] "কায়স্থ ব্রাহ্মণের দাস।" যে প্রভুর সেবা করে, যে প্রভুকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করে, যে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করে, সেই তাহার দাস। ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের যে দাসত্বসম্বন্ধ, সে আর্থিক সম্বন্ধ নহে ; সে পরমার্থিক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর অর্থদ্বারা সৃষ্টি হইবার নহে। কায়স্থ ব্রাহ্মণের সেবা করিবে বলিয়া শিষ্য, শত্রুহস্ত হইতে যাগযজ্ঞাদি রক্ষা করিবে বলিয়া মোক্ষ্যাভিলাষী হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।" এবাক্য কায়স্থের শিরোধার্য। যে ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলে পরব্রহ্ম ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিপথে দণ্ডায়মান হওয়া যায়, সেই ব্রাহ্মণের দাস হওয়া কায়স্থের গৌরবের কথা। কোন বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সময় কায়স্থ নিজ নামের পরে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, সে বেতনভোগী চাকরের চিহ্ন নহে ; সে ব্রাহ্মণের ও দেবতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন। যে ব্রাহ্মণের প্রতি সগর, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি ক্ষত্রিয় মহাত্মাগণ বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার ধর্মোপদেশ গ্রহণে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করা চিত্রগুপ্ত বংশোদ্ভব কায়স্থের প্রার্থনীয় এবং প্রশংসনীয়। এখন বঙ্গদেশে সে ব্রাহ্মণও নাই। সে কায়স্থও নাই,—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সুতরাং কলির ব্রাহ্মণ সমাজেই কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এই কলির কায়স্থ তমোগুণবিশিষ্ট শূদ্রবৎ ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কায়স্থ যে শূদ্র নহে, তাহা হারিতবচনে প্রমাণিত হইবে।

'গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবোনগাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।।

হারিত বচনং।

গঙ্গা জল নহে ; কনক ধাতু নহে ; কুশ তৃণ নহে ; গো সকল পশু নহে ; এবং প্রজাপতির কায় হইতে সমুদ্ভূতহেতু কায়স্থ শূদ্র নহে।

মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন জন্য যে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আইসেন, তাহাদের রক্ষক[১৯] হইয়া গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, কাশ্যপ গোত্রীয় দাশরথি গুহ, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র এবং মৌদগল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত, এই পঞ্চ কায়স্থ তাহাদের সহিত আগমন করেন। যাগ সমাপন হইবার পর যেমন ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তেমনই পঞ্চ কায়স্থও তাহাদের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু স্বদেশীয় কান্যকুব্জ সমাজে অপরিগৃহীত হওয়ায়, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয়বার আসিবার সময়ে তাহাদের সঙ্গে নাগ ও নাথ উপাধিধারী আর দুইজন কায়স্থ আইসেন। এই ৭ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমনের পূর্বে গৌড়দেশে কতকগুলি কায়স্থ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গৌড় দেশীয় কায়স্থ মধ্যে বসু উপাধির কায়স্থ ছিল না। কান্যকুব্জাগত কায়স্থের গৌড়

দেশীয় কায়স্থের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই প্রকারের কায়স্থ ৯৯ উপাধিধারী ছিল। এই সমুদয় কায়স্থগণকে বল্লালসেন চারি ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ বঙ্গে, দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণ রাঢ়ে, তৃতীয় ভাগ উত্তর রাঢ়ে এবং চতুর্থ ভাগ গৌড় দেশের বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করেন। সেই সময় হইতে কেবল কান্যকুব্জাগত কায়স্থদিগের বংশধরগণের মধ্যে কেহ বঙ্গে, কেহ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। কিন্তু গৌড়দেশীয় কায়স্থ ঐ চারি খণ্ডে বাস করিয়া বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণিতে বিভক্ত হন। ইহাদের কুলের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

বঙ্গজ কায়স্থ—ঐ ৯৯ পদ্ধতির কায়স্থবংশ মধ্যে যাহারা বঙ্গে বাস করেন, তাহারা কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের বংশধর। তাহাদিগের গুণানুসারে কৌলীন্য মর্যাদা প্রদান করেন। এই নিয়মানুসারে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র উপাধিধারী কায়স্থ বঙ্গের কুলীন হইলেন। দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস উপাধিধারী কায়স্থ মধ্যল্য এবং সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য এবং নন্দন এই ১৯টি উপাধিধারী কায়স্থ মহাপাত্র নামে পরিচিত হইল। অবশিষ্ট সর্বগুণবিহীন কায়স্থগণ যথা—হোড়, স্মর, ধরণী, আইচ, শূর, শর্মা, বর্মা, গুপ্ত প্রভৃতি দ্বিসপ্ততিবংশ "বাহাত্তরে কায়স্থ" বলিয়া কীর্তিত হন। বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পরে, বঙ্গজশ্রেণি কায়স্থগণের মেল বদ্ধ এবং তাহাদের মধ্যে কুলপ্রথার পরিবর্তন ঘটে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখা বাহুল্য বিবেচনায় এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল না। এই সম্বন্ধে কেবল দুই একটি কথা উল্লেখ করা গেল। কুলীনের সমঘরে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ করাই উত্তম কার্য। কুলীনের সকল সন্তান পিতার মত কুলমর্যাদা পাইয়া থাকেন, যদি আদান প্রদানে কুলভ্রষ্ট না হইয়া থাকেন। বল্লাল সেনের পর "বংশজ" নামে একটি শ্রেণি গঠিত হয়। যাহারা কুলীনের বংশজাত অথচ কুলহীন, তাহারাই "বংশজ" নামে প্রসিদ্ধ হইল।

দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ—কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আইসেন, তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে কেহ বঙ্গে এবং কেহ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। যাহারা দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন, তাহারাই দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এই পঞ্চ কায়স্থের অধস্তন সন্তানের কয়জন রাঢ়ে এবং কয়জন বঙ্গে বাস করেন, তাহারা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

সংখ্যা	কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ	মোট পুত্র	দক্ষিণ রাঢ়		বঙ্গ	
১	মকরন্দ ঘোষ	২	১	(১) ভবনাথ (ক)	১	(১) সুভাষিত
২	দশরথ বসু	২	১	(১) কৃষ্ণ (খ)	১	(১) পরম
৩	কালিদাস মিত্র	২	১	(১) শ্রীধর (গ)	১	(১) অশ্বপতি (গ)
৪	বিরাট বা দাশরথি গুহ	২	১	(১) বিরাজ (ঘ)	১	(১) নারায়ণ (ঘ)
৫	পুরুষোত্তম দত্ত	২	১	(১) নারায়ণ (ঙ)	১	(১) অর্ক (ঙ)

(ক) "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" ভবনাথ মকরন্দ ঘোষের পুত্র বলিয়া স্থির হইয়াছে, কিন্তু "কায়স্থ বংশাবলীতে" মকরন্দ ঘোষের সুভাষিত ও পুরুষোত্তম, এই দুই পুত্র লিখিত আছে। ভবনাথ পুরুষোত্তমের পুত্র। এই ভবনাথের বংশধরগণ দক্ষিণ রাঢ় সমাজে ঘোষ বংশীয় কুলীন।

(খ) কৃষ্ণ বসুর তিন প্রপৌত্র, শুক্তি, মুক্তি, অলঙ্কার। শুক্তি ও মুক্তি রাঢ় ভূমে বাস করেন। অলঙ্কার পুনর্বার বঙ্গে আগমন করেন। শুক্তি ও মুক্তির বংশধরগণ দক্ষিণ রাঢ় সমাজে বসুবংশীয় কুলীন।

(গ) দক্ষিণ রাঢ় সমাজের মিত্রগণ শ্রীধরের বংশধর। অশ্বপতির অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়ী মিত্রের ঔরস পুত্র না হওয়াতে "পোষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি" এই নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে জয়ী মিত্রের বংশের কুল নাই।

(ঘ) বিরাজ বিরাটের পুত্র নহে। বিরাটের একজন অধস্তন সন্তান। "কায়স্থ বংশাবলীতে" বিরাজের কোন উল্লেখ নাই। দক্ষিণ রাঢ় সমাজে বিরাজের বংশধর কুলীন নহে। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে নারায়ণের বংশধরগণ গুহবংশীয় কুলীন।

(ঙ) "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" পুরুষোত্তমের নারায়ণ নামে এক পুত্র ছিল বলিয়া কীর্তিত হয় ; এবং পুরুষোত্তম বা তাহার বংশধরগণ মধ্যে কেহ বঙ্গে যান নাই। কিন্তু "কায়স্থ-বংশাবলীতে" দেখা যায় যে পুরুষোত্তমের অন্যতম পুত্র অর্ক দত্ত বঙ্গে বাস করেন। নারায়ণ দত্ত হাবড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামে বাস করেন।

"ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি।।"

এই বালির দত্ত নারায়ণের বংশধর।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হন। কিন্তু দত্ত কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হন না। এই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে দত্ত ও গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য। দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রায় এক প্রকার। তবে যে সামান্য বিভিন্নতা কোন কোন স্থলে দেখা যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস জন্যই। আজিকালি বঙ্গজ সমাজের সঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের কায়স্থগণ বৈবাহিক সূত্রে সম্বন্ধ বিস্তারের সূত্রপাত করিতেছেন। ইহা অযুক্তির কথা নহে, যেহেতু দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের আদি বংশের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ বলিয়া পরিচয় দেন না। ইহারা গৌড় দেশীয় কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত নাই। এই শ্রেণি কায়স্থ সর্বসমেত সাড়ে সাত ঘর। এই সাড়ে সাত ঘরে করণকারণ হয়। এই শ্রেণি কায়স্থ মধ্যে দুই প্রকার ঘোষ এবং দুই প্রকার দাস আছে। এক শ্রেণির ঘোষ সৌকালীন গোত্র আর এক শ্রেণির ঘোষ শাণ্ডিল্য গোত্র। এক শ্রেণির দাস মৌদগল্য গোত্র এবং আর এক শ্রেণির দাস কাশ্যপ গোত্র। আবার ভরদ্বাজ গোত্রীয় সিংহ এক পোয়া এবং মৌদগল্য গোত্রীয় কর এক পোয়া। দুই শ্রেণির ঘোষ ২, দুই শ্রেণির দাস ২, মিত্র ১, সিংহ ১, দত্ত ১, সিংহ ।০, কর ।০, এই মোট ৭।।০ ঘর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ আছে। এই ৭।।০ ঘর মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ এবং বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ শ্রেষ্ঠ। ইহাদের আচার ব্যবহার বঙ্গজ বা দক্ষিণ রাঢ়ীর বা বারেন্দ্র কায়স্থদের অপেক্ষা অনেক প্রভেদ।

বারেন্দ্র কায়স্থ—এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বারেন্দ্র কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদের কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধর বলিয়া পরিচিত করা কঠিন। কিন্তু ঢাকুর গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে যে "সিদ্ধ-সাধ্যভাবে সাতটি বংশ লইয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সামাজিকগণই উপনিবেশি বারেন্দ্র কায়স্থ। ইহাদের পূর্বপরুষগণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড় দেশে আগমন করেন। বরেন্দ্র আদি নিবাসী আচারভ্রষ্ট কায়স্থদের সহিত ইহাদের সংস্রব নাই।" যে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে প্রথমবার আগমন করেন, তাহাদের উপাধি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত। যাহারা দ্বিতীয়বারে ঐ পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে বঙ্গদেশে আইসেন তাহাদের উপাধি নাগ ও নাথ। কিন্তু বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র উপাধি দেখা যায় না ; কেবল নাগ ও দত্ত উপাধি দেখা যায় এবং তাহারা বারেন্দ্র কায়স্থ

সমাজে কুলীন নহে। দত্ত বংশের আদি পুরুষ পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তম দত্তের বংশসম্ভূত যে বারেন্দ্র কায়স্থের দত্ত, তাহারাও কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐরূপ নাগবংশেরও কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত গৌড়দেশীয় কায়স্থগণের বংশধরেরা বরেন্দ্রভূমে বাস নিবন্ধন বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ন্যায় বারেন্দ্র কায়স্থের বল্লালী মর্যাদা নাই। পদ্যস্কুল পঞ্জিকাতে ইহা লিখিত আছে যে ভৃগু নন্দী, নরহরি দাস ও মুরারি চাকী বল্লাল সেনের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বরেন্দ্র প্রদেশে আইসেন এবং শৌল-কুপায় নাগবংশীয় জমিদারদিগের সাহায্যে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সংস্থাপিত করেন। এই ভৃগু, নরহরি ও মুরারির বংশধরগণ বরেন্দ্রভূমে (রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, মুরশিদাবাদ জেলা) ব্যাপিয়া পড়েন। রাজসাহী বিভাগ বান্দ্রে কায়স্থের প্রধান স্থান। এই বারেন্দ্র কায়স্থের সংখ্যা সর্বসমেত সাড়ে সাত ঘর, যথা—দাস, নন্দী, চাকী, শর্মা, নাগ, সিংহ, দেব, দত্ত ; তন্মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। ইহা কথিত আছে "শর্মা" পূর্বে নাপিত ছিল, তাহাকে কৌলীন্য মর্যাদা দিয়া অর্ধঘর কুলীন করা হয়। এই "শর্মা" সম্বন্ধে ঢাকুর গ্রন্থে যেরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। "কেহ কেহ এই সমাজকে সাড়ে সাত ঘর বলেন এবং ঈর্ষাপরবশ হইয়া এই সমাজের অযথা কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে 'নরসুন্দর শর্মা' নামে একজন নিচবৃত্তি পরায়ণ কায়স্থ বহুদিন ভৃগুনন্দীর বৈতনিক ভৃত্য ছিল। যৎকালে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি সমাজ বন্ধন করেন সেই সময় শর্মা, সমাজপতিদিগকে বলেন, আমি আপনাদিগের আশ্রয়ে বহুকাল আছি এবং যাহা অনুমতি করিতেছেন তাহাই সম্পাদন করিতেছি কিন্তু আপনাদিগের দ্বারা আমার কিছুই উন্নতি হইল না। অতএব আমি আর এখানে থাকিব না। শর্মার এই কথা শুনিয়া সমাজপতিগণ কৌতুক করিয়া বলেন আচ্ছা তোমাকেও আমরা সমাজে গ্রহণ করিয়া অর্ধভাবাপন্ন করিব। শর্মা এই কথা সর্বত্র প্রচার করাতে প্রবল প্রতাপ জটাধর নাগ মহাশয় তাহাকে দূর করিয়া দেন। শ্রুত হওয়া যায় নাটোর ডাঙাপাড়া[২০] গ্রামে শর্মার বংশ আছে। শর্মা যে সমাজে গৃহীত হয় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" শর্মা বাহাত্তরে কায়স্থের অন্যতম উপাধি।[২১] আমাদের বিশ্বাস বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সাতঘর।

নরহরি দাস, ভৃগু নন্দী, মুরারি চাকী ও জটাধর নাগের বংশবিস্তার বর্ণন করিলে রাজসাহী প্রদেশের বারেন্দ্র কায়স্থের ঐতিহাসিক বিবরণ অনেক জানা যাইবে।

নরহরিদাসের বংশ—নরহরির তিন পুত্র। তাহারা কনিষ্ঠ পুত্র বগুড়ায় বাস করেন। এই নরহরি দাসের বংশধরেরা ময়দান দিঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চি, কেচুয়াডাঙা, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে বসতি বিস্তার করেন। ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিত।

ভৃগুনন্দীর বংশ—ভৃগুনন্দীর কালু ও মাধব দুই পুত্র। ইহারা পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়ার নিকট অষ্টমনিষা গ্রামে বাস করেন। কালু ও মাধবের বংশধরেরা পোতাজিয়া, অষ্টমনিষা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া বিখ্যাত হয়। এই বংশের গোবিন্দ রায় নামক একজন পোতাজিয়া গ্রামে একটি বৃহৎ নবরত্ন নির্মাণ করেন। সেই জন্য ইহার বংশধরেরা "নবরত্নপাড়ার রায়" নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় রূপরাম রায় নামে একজন পারসি ও আরবি ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর অধীনে কোন প্রধান পদে রূপরাম ছিলেন। পিতার সহিত মনান্তর হওয়ায় ইনি পোতাজিয়া ত্যাগ করিয়া রাজসাহীর অন্তর্গত ডিহি কাশীপুরের মধ্যে বাসভবন নির্দেশ করেন। কাশীপুর প্রভৃতি ২৭ খান গ্রাম রূপরামের সম্পত্তি ছিল।

মুরারি চাকীর বংশ—মুরারি চাকীর দুই স্ত্রী। প্রথম পক্ষের বণিতার সন্তানেরা অষ্ট মণিষা, মেদবাড়ি, কেচুয়াডাঙা প্রভৃতি গ্রামে এবং শেষ পক্ষের বণিতার সন্তানেরা দুর্লভপুর, ঢাকঢোর, দিলপসার প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন।

জটাধর নাগের বংশ—জটাধর নাগের সন্তানেরা মালঞ্চি, গাঁড়াদহ, সরগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। জটাধর নাগের সন্তানগণ মধ্যে সরগ্রামের নাগবংশই শ্রেষ্ঠ। ইহারা সোনাবাজু পরগণার বিখ্যাত জমিদার ছিল। এই বংশের রূপরাম নাগ সমাজে বিশেষ সম্মানিত হন।

জটাধর নাগের বংশের এক ব্যক্তি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ডাঙাপাড়া গ্রামে বাস করেন। ডাঙাপাড়াদিগর একটি বিস্তৃত জমিদারি লাভ করিয়া, ইনি বিশেষ বিখ্যাত হন। ইহার বংশধরেরা সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং গৌরবান্বিত। এই বংশে অনেকে সুশিক্ষিত। ইহাদের ডাঙাপাড়াদিগরের জমিদারি এখনও আছে। ইহারা ডাঙাপাড়ার চৌধুরি বলিয়া পরিচিত। ইহারা চৌদ্দ চৌধুরির এক চৌধুরি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গশবাড়ির নাগবংশও বিশেষ মাননীয়।

তাড়াষের জমিদার বংশ—তাড়াষ বিল চলনের নিকটবর্তী গ্রাম। পূর্বে এই গ্রাম রাজসাহী প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এইক্ষণ এই গ্রাম পাবনা জেলার অন্তর্গত। চড়িয়ার দেব বংশোদ্ভব বলরাম নামক এক ব্যক্তি বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই ব্যক্তি নাটোর রাজ সংসারে প্রধান কার্যকারক ছিলেন। এই সময় কুসুম্বি পরগণা প্রভৃতি বিস্তর জমিদারি লাভ করেন। "ধনেনকুল" এই বাক্যের সার্থকতা লাভ করেন। সুতরাং সমাজে বিশেষ পরিচিত হইলেন। রাজসাহী ও পাবনা জেলায় বিস্তৃত জমিদারি লাভ করিয়া তাড়াষ গ্রামে বাস নির্দেশ করেন। বর্তমান তাড়াষের প্রধান জমিদারগণ এই বলরাম রায়ের বংশ সম্ভূত।

রঙ্‌পুর জেলার অন্তর্গত বর্ধন কুঠির জমিদার দেব বংশীয়। এই বংশে ভগবান নামক এক ব্যক্তি মানসিংহের সময় রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ জেলার অন্তর্গত কাকিনার জমিদারও কুলীন নহে। কিন্তু বিস্তৃত জমিদারি লাভ করিয়া, সমাজে এ বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

এই বারেন্দ্র শ্রেণি কায়স্থগণের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় শ্রেণি কায়স্থগণের সঙ্গে কোন অংশ মিল নাই। রাজসাহীতে ২/৪ ঘর বঙ্গজ কায়স্থের বাস ; অবশিষ্ট কায়স্থ সমুদয় বারেন্দ্র শ্রেণি। এই রাজসাহীতে আচার ভ্রষ্ট কায়স্থও কম নহে। ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণি সদাচারী সদ্বংশজাত কায়স্থগণের সহিত ইহারা আহার ব্যবহার করণকারণ কিছুই করিতে পারে না। ইহারা প্রায়ই অশিক্ষিত। রাজসাহীতে সর্বসমেত বারেন্দ্র কায়স্থ ১০০০ ঘরের কম হইবে না। ডাঙাপাড়া, মাঝগ্রাম, বারিয়াহাটি, ঢাকঢোর, ছাতারপাড়া, করচমাড়িয়া, মুরাদপুর প্রভৃতি স্থানে সদাচারী সদ্বংশজাত ধনী বারেন্দ্র কায়স্থের বাস। ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিত।

৬। **নবশাখ বা নবশায়ক**—শূদ্রজাতি নয় শাখায় বিভক্ত বলিয়া এই জাতির নাম নবশাখ হয়। তিলি, মালি, তামুলি, গোপ, নাপিত, গোছালি, কামার, কুমার, পুঁটুলি এই নয় জাতি নবশাখ আখ্যায় পরিচিত।[২২] ইহাদের ব্যবসায় অনুযায়ী জাতি নির্ণয় করা হইয়াছে। অতিপুরাকালে আর্যজাতিরা যাহাদের পরাজিত করিয়া বন্দি করেন, তাহারা আচারভ্রষ্ট শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈবর্ণের কার্যে নিযুক্ত হয়। তখন সংসার যাত্রা নির্বাহ জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী জাতিরও প্রয়োজন হইল। সে সময় ত্রৈবর্ণের নিচে শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি ছিল না। সুতরাং শূদ্রগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের সৃষ্টি হইল। এই আচারভ্রষ্ট শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা ত্রৈবর্ণের সেবায় বা সংস্রবে জ্ঞান লাভ করেন, তাহারা শূদ্র মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন এবং যাহারা অজ্ঞানই রহিল বা নিকৃষ্ট কর্মে রত হইল, তাহারা নিকৃষ্ট শূদ্র শ্রেণিতে পরিগণিত হইল। এই অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী শূদ্রগণ উল্লিখিত নয় শাখায় বিভক্ত হইয়া ব্যবসানুযায়ী নবশাখ বলিয়া পরিচিত হইল। ইহাই বেশি সম্ভব। কিন্তু "সম্বন্ধ নির্ণয়ের" গ্রন্থকার পণ্ডিত প্রবর লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় নবশাখের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। "যৎকালে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন তৎকালে

এই কয়েক জাতির সাহায্য লইয়া তিনি ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। ইহাদিগেরই সাহায্যে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ বিষয়ে ইহারা শায়ক (বান) স্বরূপ হয়)। ইহারা পূর্বে কায়স্থের তুল্য ছিল না ; ঐ সময়াবধি কায়স্থের তুল্য হয়। পরশুরাম দ্বারা সমাজ মধ্যে এতাদৃশ মর্যাদা পাইয়াই ইহারা ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল"। এই উদ্ধৃত অংশ পৌরাণিক কথা। ইহার সারাংশ গ্রহণ করিলে, ইহা প্রতীত হইবে নবশাখ শূদ্রজাতি এবং ক্ষত্রিয়ের নিচ বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থান হয়। এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইয়া নবশাখের মত শূদ্রজাতি হইত, তাহা হইলে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস জন্য পরশুরামকে সাহায্য করিত। আবার "শায়ক" শব্দের সহিত "নব" শব্দ সংযোজিত করিলে "নবশায়ক" হইল। তবে কি "নবশায়ক" শব্দে "নূতনবান" কি "নয়বান" বুঝাইবে? "নবশায়ক" শব্দে নূতন বান বা নয়বান বুঝাইতে পারে। শূদ্রেরা নূতনবান গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা শূদ্রের নয় শ্রেণি একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করে এই হেতু ইহারা নবশায়ক বা নবশাক নাম ধারণ করিল। অতএব উদ্ধৃত অংশের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া নবশাক না বলিয়া নবশায়ক বলিলেও কোন বিশেষ ক্ষতি দেখি না। আবার বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন নবশাকেরা "সচ্ছূদ্র বলিয়া পরিগণিত"। আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলাম না। ধরণীকোষ মতে সচ্ছূদ্র কেবল ক্ষত্রিয়কেই বুঝায়। ইহা নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোকে প্রমাণ হইবে।—

"সচ্ছূদ্র, মসীশদেব কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরীভট্টঃ সূর্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ।।"

ধরণী মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় সচ্ছূদ্র। আবার স্কন্দপুরাণ মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সচ্ছূদ্র এবং ইহারা শালগ্রামশীলা স্পর্শ করিতে সক্ষম। এ বিষয়ে নিম্নবচনে প্রমাণ হইবে ঃ—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রানা মথাপিবা।
শালগ্রামেহধিকারোস্তি নচান্যেষাং কদাচন।।"

নবশাখ যে সচ্ছূদ্র নহে তাহার সন্দেহ রহিল না। নবশাখ শূদ্রজাতীয়। কিন্তু ইহারা ভাল শূদ্র এবং ইহাদের স্পর্শীয় জল সকল জাতিই পান করিতে পারে। "নবশাখেরা কায়স্থ সদৃশ সদাচার সম্পন্ন। ইহাদিগের পুরোহিত ও কায়স্থদিগের পুরোহিত এক।"[২৩] একথা কতদূর ঠিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। পূর্ববঙ্গে যে সকল বঙ্গজ কায়স্থ বসতি করিতেছেন, তাহাদের এবং সেই দেশবাসী নাবশাখ বিধবা রমণীদের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ দেখিলে "নবশাখেরা কায়স্থ সদৃশ সদাচার সম্পন্ন" বলা ভ্রমপদ হইবে। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে বিধবা রমণীদের আচার ব্যবহার ঠিক ব্রাহ্মণ বিধবা রমণীর ন্যায়। বঙ্গের কায়স্থ বিধবা রমণী ব্রহ্মচর্য-ব্রত-চারিণী। পক্ষান্তরে নবশাখ বিধবা রমণীগণেরা ব্রহ্মচর্য ব্রতচারিণী নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাচারিণী। এই রূপে কায়স্থ ও নবশাখ পুরুষদের আচার ব্যবহারে অনেক প্রভেদ আছে। পূর্ববঙ্গে নবশাখেরা বঙ্গজ কায়স্থদের ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু রাজসাহীতে এরূপ ভাব দেখা যায় না। এজেলায় নবশাখদের মধ্যে অনেক বিধবা রমণী ব্রহ্মাচর্য-ব্রত-চারিণী নহে এবং পুরুষেরাও যথেষ্ট আচার ভ্রষ্ট। রাজসাহীর নবশাখেরা কায়স্থদের ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করে না। ইহার কারণ এই যে রাজসাহীতে বারেন্দ্র কায়স্থের সমাজ প্রধান, বঙ্গজ কায়স্থ দুই চারি ঘর মাত্র আছে। বারেন্দ্র কায়স্থের আচার ব্যবহার বঙ্গজ কায়স্থের সদৃশ নয় বলিয়াই নবশাখেরা রাজসাহীর কায়স্থদের বঙ্গজ কায়স্থদের ন্যায় সম্মান করে না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কাল হইতে নবদ্বীপ এবং তন্নিকটবর্তী স্থানের নবশাখগণের আচার ব্যবহার অনেক সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া সেই প্রদেশের নবশাখদের আচার ব্যবহার দক্ষিণ

রাঢ়ীয় কায়স্থ সদৃশ দেখা যায়। আমরা স্বীকার করি নবশাখের শিক্ষা, সভ্যতা, ধন ও সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন হইতেছে। এমতাবস্থায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক স্থলে বঙ্গজ কায়স্থের ও নবশাখের পুরোহিত এক নহে। অনেক বঙ্গজ কায়স্থও নবশাখের পুরোহিত দ্বারা ক্রিয়া কলাপ নির্বাহ করান না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের পুরোহিত এক। তাই বলিয়া কি কায়স্থ ব্রাহ্মণ সদৃশ হইতে পারে?

(১) **তিলি**—তিল শস্য বিক্রেতাকে আদিতে তিলি জাতি বলিত। এক্ষণ ব্যবসায়ী জাতিকে তিলি বলে। রাজসাহীতে পাঁচুপুর, গোবিন্দপুর, হাতিয়ানদহ, আড়ানী, মালঞ্চি প্রভৃতি স্থানে তিলি জাতীয় অনেক ধনী লোক আছে। তিলি জাতির মধ্যে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসিদ্ধ। এই তিলি জাতিতে প্রায়শই দরিদ্র নাই। এই জাতির আর একটি শ্রেণি তেলি নামে কথিত আছে। ইহারা তৈলবিক্রেতা। কোন কোন স্থানে তেলি জল-অনাচরণীয় জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(২) **মালি**—ইহারা মালকার নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যবসা পুষ্পচয়ন করা এবং মালা গ্রন্থন দেওয়া। অধুনা ইহারা বিবাহ, চূড়াকরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্যে শোলার মুকুট ও ফুল প্রস্তুত এবং দেবপ্রতিমাদি চিত্র করিয়া থাকে।

(৩) **তামুলি**—ইহাদের আদি ব্যবসা পান বিক্রয় করা। এই রাজসাহীতে গোয়ালকান্দি ও আমরাইল গ্রামে যে তামুলি আছে তাহারা জমিদার। তামুলিরা কুসিদজীবী। ইহা কথিত আছে যে তামুলিরা এত বেশি হারে সুদ গ্রহণ করিত যে অধমর্ণেরা এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে প্রায় ৬৫ কি ৭০ বৎসর পূর্বে 'তামুলি লুট' নামে একটি বৃহদাকারে বড়গাছিতে তামুলির বাড়ি লুট হয়। বড়গাছি রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তর। তাহিরপুর পরগণার প্রজারাই বেশি প্রপীড়িত হয়। ইহারা ও অন্যান্য প্রজারা লুট করে। খত, খাতা, ও যাবতীয় কাগজপত্র অগ্নিসাৎ করে। এই ঘটনা হইতে তামুলি জাতিকে সেক্সপিয়ারের সাইলক (Shylock) বলিলে অত্যুক্তি হইত না। এক্ষণ তামুলি জাতির কুসিদ ব্যবসায় উন্নতি নাই। এক্ষণ প্রায় সকল জাতিই কুসিদজীবী।

(৪) **গোপ**—শব্দার্থে গো রক্ষককে গোপ বলে। বঙ্গের দক্ষিণ ভাগে সদ্‌গোপকে গোপ বলে। ইহাদের সাধারণ ব্যবসা কৃষি। হুগলি জেলাতে অনেক সদ্বংশজাত শিক্ষিত সদ্‌গোপের বাস। কিন্তু ঐ দেশে যাহাদের গোয়ালা বলে তাহারা নবশাখ নহে এবং তাহারা অনাচরণীয়। রাজসাহীতে যাহাদের গোপ বলে তাহারা দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী এবং তাহারা জল আচরণীয়। রাজসাহীতে দক্ষিণ দেশের ন্যায় গোয়ালা নাই। দক্ষিণদেশ সদৃশ সদগোপ এ জেলায় অতি অল্প সংখ্যক। ইহাদের ব্যবসা কৃষি। ইহাদের কুটুম্ব হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আছে।

(৫) **নাপিত**—ইহাদের ব্যবসা ক্ষৌর কার্য। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ সময় মধু নাপিত তাহার মস্তক মুণ্ডন করে। এই সময় হইতে মধু নাপিতের বংশধরেরা ক্ষৌর কর্ম ত্যাগ করিয়া মোদকাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে। রাজসাহীর অন্তর্গত কলম, ডায়া প্রভৃতি গ্রামে কতিপয় মধুবংশীয় নাপিত আছে।

(৬) **গোছালি**—ইহারা পান প্রস্তুত করে এবং বিক্রয় করে। ইহাদের সাধারণত 'পানতীয়া' বা বারুই বলে। গুচ্ছ শব্দে আঁটি বুঝায়। যে পানের আঁটি বা গুচ্ছ বাঁধে তাহাকে গোছালি বলা যায়।

(৭) **কামার**—ইহারা লৌহদ্রব্য প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে।

(৮) **কুমার**—ইহারা মৃণ্ময় ঘটাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে।

(৯) **পুঁটুলি**—গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তন্তুবায়[২৪], ময়রা এই কয়েক জাতি পুঁটুলি বলিয়া

প্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যবসায়ী দ্রব্য পুঁটুলি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে হয়; এই জন্য ইহাদের পুঁটুলি বলে।

৭. জল আচরণীয় হিন্দু অথচ নবশাখ নহে—জল আচরণীয় হিন্দুর মধ্যে কতকগুলি জাতি আছে যাহাদের জল এ জেলায় প্রচলিত আছে অথচ তাহারা নবশাখ নহে, যথা—১. কৈবর্ত, ২. দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ (গোয়ালা)। কৈবর্ত জাতির উল্লেখ বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে দেখা যায়। রাম বনবাস সময়ে কৈবর্তরাই তাহাকে গঙ্গানদী পার করিয়াছিল। এটি পুরাতন জাতি। 'কৈবর্তে দাস দাস-ধীবরৌ', এরূপ কৈবর্ত রাজসাহীতে নাই। কৈবর্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত যথা—১. হেলে কৈবর্ত ২. জেলে কৈবর্ত। যাহারা কৃষি কর্ম ও দাসবৃত্তি করে, তাহারা হেলে কৈবর্ত। যাহারা মৎস্য ধরে এবং নাবিকের কার্য করে, তাহারা জেলে কৈবর্ত। রাজসাহীতে দ্বিতীয় শ্রেণির কৈবর্ত নাই। এই জেলায় হেলে কৈবর্তই সমুদয়। ইহারা জল আচরণীয় কিন্তু ইহাদের পুরোহিতের জল ব্যবহার নাই। দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ (গোয়ালাদের) এবং তাহাদের পুরোহিতের জল প্রচলিত আছে। এই দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ দুই ভাগে বিভক্ত যথা—একভাগ দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত করে; ইহাদের কাড়িয়া গোয়ালা বলে এবং ইহারা কৃষিকর্মও করে। অপরভাগ দধি মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত করে; ইহাদের বারেন্দ্র বা বাথানীয়া গোপ বলে। ইহারা পূর্বে একটি বিস্তৃত মাঠে বহুসংখ্যক গাভি রাখিয়া দধি দুগ্ধের ব্যবসা করিত। কৃষি কার্যের উন্নতিতে গাভী পোষণের জন্য মাঠ আর পাওয়া যায় না। যে মাঠে গাভীগণ থাকিত, তাহাকে বাথান বলিত। এক্ষণ রাজসাহীতে আর বাথান নাই। এক্ষণ গ্রাম গ্রাম হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া ব্যবসা করে।

কৈবর্তের সংখ্যাই বেশি। কৈবর্ত প্রায় ৬০,০০০ কি ৭০,০০০; গোয়ালা প্রায় ৯০০০ কি ১০,০০০ হইবে। কৈবর্ত প্রায়ই কৃষক। গোয়ালা ও কৈবর্তের অবস্থা সাধারণত মন্দ নহে। রাজসাহীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই কৈবর্তের সংখ্যা বেশি। পদ্মানদীর তীবরর্তী বেঙ্গগাড়ি গ্রামে যে সকল কৈবর্ত আছে; তন্মধ্যে ভৌমিক বংশীয়েরা শিক্ষিত। ইহারা জমিদার ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

৮। জল অনাচরণীয় হিন্দু—এই প্রকার হিন্দুর মধ্যে নানা শ্রেণি। রজক, হেলে রজক, তাঁতি, যোগী, শুঁড়ি বা সাহা, ছুতার, চণ্ডাল, জালিয়া, হকার প্রভৃতি অনাচরণীয় হিন্দুর বাস। হেলে রজক ও সাহা জাতির মধ্যে কতকগুলি ধনী মহাজন ও জমিদার আছে। ইহাদের সংখ্যা অতি কম। পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়নের সময় হইতে হিন্দু সমাজ হীন অবস্থায় পতিত। এসময় হইতে এদেশীয় অসভ্য জাতিদের আর্যগণ বিবাহাদি করিতে লাগিলেন বা দ্বিজাতীরা অসবর্ণা ভার্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, যুগী, হেলে রজক প্রভৃতি নিচ জাতি সকলের উৎপত্তি হইল। ইহারাই সঙ্কর জাতি বলিয়া একটি সাধারণ নাম ধারণ করিল। রাজসাহীতে সঙ্কর জাতি নিতান্ত কম নহে।

রাজসাহীতে বৈষ্ণবের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার বা ১৫ হাজার হইবে। ইহারা কোন জাতির অন্তর্গত নহে। মহাত্মা চৈতন্যদেবের সময় হইতে এই জাতির উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ নাই। অধুনা অধিকাংশই ভিক্ষা ব্যবসায়ী। কেহ কেহ অন্য ব্যবসা করে এবং লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া চাকরিও করিয়া থাকে।

মুসলমান—রাজসাহী জেলার মোট লোক সংখ্যার তিন ভাগের অধিক মুসলমান, প্রায় এক ভাগ হিন্দু। রাজসাহীর মুসলমান সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণির মুসলমান কোরাণের প্রকৃত ধর্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। অপর শ্রেণি মুসলমান উভয় হিন্দু ও মুসলমান দেবতাকে কোন কোন স্থানে সমানভাবে ভক্তি করে। প্রথম শ্রেণি মুসলমানের সংখ্যা অতি কম। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত। দ্বিতীয় শ্রেণি মুসলমানের

রীতিনীতি ও ধর্মপ্রণালী কোন কোন অংশে ইতর হিন্দুর ন্যায়। ইহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, ইহারা পূর্বে ইতর হিন্দু ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময় ইহারা মুসলমান হয়। ইহারা প্রায়ই অশিক্ষিত। আজি কালি এই দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমান মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান মধ্যে যদিচ জাতিভেদ নাই, তথাপি দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমানদিগকে ৫ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১. **কৃষক**—এই শ্রেণি মুসলমানের মধ্যে অনেকে ভদ্রবংশীয়। ইহাদের ব্যবসা অতি পবিত্র। রাজসাহীর কযৃকদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরাণের প্রকৃত ধর্ম আচরণ করে। আজকাল কৃষক সন্তানেরাও সুশিক্ষিত হইতেছে।

২. **বার মাসিয়া**—ইহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। প্রায় নৌকাই ইহাদের বাসস্থান। সূচ, সুতা, চিরণী, আয়না ইত্যাদি দ্রব্য লইয়া হাটে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

৩. **জোলা**—ইহারা মোটা কার্পাস বস্ত্র এবং মোটা মশারি প্রস্তুত করে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

৪. **নলুয়া**— ইহারা নলের দড়মা প্রস্তুত করে এবং কেহ কেহ সময় সময় কৃষিকার্যও করে।

৫. **ঢুলি ও বেহারা**—রাজসাহী জেলার দক্ষিণভাগে কতকগুলি মুসলমান আছে। তাহারা বিবাহ আদিতে ঢোল বাজায় এবং পালকি আদি বহন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

বার মাসিয়া, জোলা, নলুয়া, ঢুলি ও বেহারা এই প্রকার নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের সহিত প্রথম শ্রেণির বা কৃষকশ্রেণি ভদ্রবংশজাত মুসলমানদের বিবাহ বা আহারাদি প্রচলিত নাই। এই সকল নিম্ন মুসলমানের ব্যবহার ও ব্যবসা কোন কোন অংশে ইতর হিন্দুর সমান। মুসলমান রাজত্বকালে কতকগুলি ইতর হিন্দু মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়। নিম্ন শ্রেণি ও অনেক কৃষক মুসলমানদের আচার, নীতি ও ধর্মপ্রণালী দেখিয়া ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে নিম্ন শ্রেণি ও কতকগুলি কৃষক শ্রেণির মুসলমানেরা ইতর হিন্দুর বংশধর হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেকে ইতর হিন্দুদের আচার ব্যবহার ও ধর্মপ্রণালী ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মুসলমানের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছে।

মুসলমান অধিকাংশই কৃষক। নাটোর, বাগা, বাঘধনী, তারাটিয়া প্রভৃতি স্থানে কতিপয় মুসলমান জমিদার আছে।

১. "তখন আবো নিয়ম ছিল যে নিচ জাতীয় লোক উচ্চজাতির মত কাজ করিতে পারিলে তিনি উচ্চ জাতি হইতেন। আবার একজন উচ্চ জাতির লোক নিচ কাজ করিলে সেও নিচ জাতি মধ্যে গণ্য হইত , অর্থাৎ একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের মত আচরণ করিতেন, তার মত ধর্মশাস্ত্র পড়িতেন ও দেবারাধনা করিয়া জীবন কাটাইতেন, তিনিও ব্রাহ্মণ পদ পাইতেন। এবং ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে গণ্য হইতেন। ব্রাহ্মণ সন্তান আবার যদি মাদক সেবনাদি অপকর্ম করিত সেও শূদ্রের মধ্যে গণ্য হইত।"—প্রিয়নাথ মল্লিক প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

২. "মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্বান্তর্গত প্রজাগর পর্ব, ৩৬ অধ্যায়—"কায়স্থ বংশাবলী" সংগৃহীতা দ্বারা উদ্ধৃত।

৩. ভাদড়াকেও কেহ কেহ কুলীন বলেন।

৪. "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।।

৫. সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ এই তিন ভ্রাতা পীতাম্বরের পুত্র, লোকনাথ লাহিড়ি গাঁই এবং রুদ্র ও সাধু বাগচি গাঁই নামে পরিচিত।

৬. কেহ কেহ বলেন সুষেণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে আনেন।

৭. শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়"।

৮. ক্ষত্রিয় ঔরসজাত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ঔরসজাত ক্ষত্রিয় নিকৃষ্ট—মহাভারত, সভাপর্ব।

৯. বল্লালসেনকে কেহ বৈদ্য, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

১০. "আদৌ প্রজাপর্তেজাতা মুখ্যদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়জাতা উর্ব্বোবৈশ্যা বিজজ্ঞিরে।। ১
পাদতশ্চশূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ত্রিবর্জ্জস্যচ সেবকাঃ।
হীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপ-স্তস্য পুত্রকঃ।। ২
কায়স্থ-স্তস্য পুত্রোভুদ্ভুব লিপিকারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে।। ৩
চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চতর্ব্বেবচ।
চিত্রগুপ্তো-গতঃ স্বর্গে, বিচিত্রো নাগ-সন্নিধৌ।। ৪
চিত্রসেনো পৃথিব্যাং বৈ ইতিশাস্ত্রঃ প্রচক্ষতে।
বসু ঘোষো-গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এবচ।
মৃত্যুঞ্জয়া-নুকরণৌ চিত্রসেনসুতা ভুবি।। ৫
মৃত্যুঞ্জয়া-দুদ্ভুতা দেবসেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথাপশ্চাদ্ জাতাশ্চবসু সংখ্যকাঃ।।" ৫
অগ্নিপুরাণ।

১১ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
হৈবস্বতা-কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।।
ঔড়ম্বরায় দঘ্নায় নীলায় পরমেস্টিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।।
নমতর্পণ।

১২ "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতা কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে।।
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভুতো গৌতম নাম সত্তমঃ।।
তস্য শিষ্যো মহাপ্রজ্ঞঃ চিত্রকূটা-চলাধিপঃ।
বেদানাং আপস্তম্ভশাখা।।"

১৩. কায়স্থবংশাবলী।

১৪. শ্রীমদ্ভাগবত। .

১৫. ঢাকুর গ্রন্থ।

১৬. "A Brahmin must not read the veda, even to himself, in the presence of a Sudra."
—Elphinistone's History of India, Book I, Chapter I.

১৭. কায়স্থ বংশাবলী।

১৮. কায়স্থ বংশাবলী—১৩ পৃষ্ঠা।

১৯. "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে।" —কায়স্থ-কুলদীপিকা।

২০. ডাঙাপাড়া—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত।

২১. "কায়স্থ বংশাবলী" ও শব্দকল্পদ্রুম।

২২. গোপ মালী কথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।।

২৩. সম্বন্ধ নির্ণয়।

২৪. এক শ্রেণি তন্তুবায় আছে, যাহারা নবশাখ বলিয়া পরিচিত নহে এবং তাহারা জল আচরণীয় জাতি নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ধর্ম

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জন সংখ্যায় ধর্মানুসারে রাজসাহীর মনুষ্যদের যেরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে ঃ

(১)	হিন্দু	...	...	...	২৭৮,৯৩৮
(২)	মুসলমান	...	...	...	১০৩৩,৯২৭
(৩)	খ্রিস্টিয় ধর্মাবলম্বী	...	...	...	১০৫
(৪)	পারশি	...	...	...	১
(৫)	বৌদ্ধ ও জৈন	...	...	...	৪৬
(৬)	অসভ্য জাতি	...	...	...	২৯৮
(৭)	অন্যান্য	...	...	...	২১
					১৩১৩,৩৩৬

মোট জনসংখ্যায় শতকরা প্রতি

হিন্দু	...	...	...	২১.২২
মুসলমান	...	...	...	৭৮.৭২
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী	...	...	...	.০৬
				১০০.০০

পর্বের তালিকায় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোকই প্রায় সমস্ত। আবার হিন্দুর তিনগুণেরও বেশি মুসলমান। রাজসাহী জেলায় মুসলমান অধিক এবং মুসলমানেরা প্রায়ই চাষী ; এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহাতে এই অনুমিত হয়, যে কেবল বাহুবলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এমত নহে। রাজসাহী এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যার বৃদ্ধির অন্য কারণ হইতে পারে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত বোধ হয়। "অনার্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া, পূর্ব বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীরা বহুপরিমাণে অনার্য বংশ সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নিচ শ্রেণিতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময়ে দেশের রাজার সহিত সমধর্মা হইতে তাহারা উৎসাহ সহকারে ইচ্ছাপূর্বক যাইবে, ইহা আশ্চর্য নহে।"[১]

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যা শতকরা ২১.৯ জন হিন্দু এবং ৭৭.৭ জন মুসলমান ছিল। এই বিংশতি বৎসরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমিয়াছে এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশি হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান হইয়া যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এমন নহে ; স্থানে স্থানে 'ম্যালেরিয়া' দোষে ব্রাহ্মণ ভদ্রের অনেক বংশের ধ্বংস দেখা যাইতেছে। রাজসাহীর কৃষক মুসলমানদিগের অবস্থা উন্নত।

হিন্দু—হিন্দুদিগের ধর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন। বেদই হিন্দুধর্মের মূল। বেদের অপর নাম শ্রুতি। ঈশ্বর প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া ইহার অন্য নাম শ্রুতি। সমুদয়ে চারি বেদ—(১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) অথর্ব বেদ। বেদের দুই অংশ—(১) জ্ঞানকাণ্ড,

(২) কর্মকাণ্ড। এই চতুর্বেদ দ্বারা সর্ব ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত ; এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই বেদোক্ত যোগ যজ্ঞাদিরূপ কর্ম সকল দ্বারা মরণ ধর্মশীল মানবগণ পুণ্যবল হইয়া স্বাধ্যায়, ধ্যান, তপস্যা, দয়া ও দানাদি কর্মদ্বারা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং দেবতুল্য ছিলেন। অতি পূর্বকালে অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব আচারের অনুবর্তী হইয়া নিজ নিজ বর্ণ বিহিত ধর্মানুষ্ঠানপূর্বক প্রায় সকলেই মুক্তির পথ প্রাপ্তির জন্য, বিশেষ যত্নবান হইতেন। সত্যযুগ অতীত হইলে, ধর্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মানবগণ বৈদিক কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকল প্রকাশ হইল। এই শাস্ত্র নিহিত কর্মদ্বারা দুঃখ, শোক, রোগপ্রদ পাপ হইতে, তপস্যা স্বাধ্যায় বিষয়ে দুর্বল মানবগণ পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা ইতিহাস যুক্ত পুরাণ সকল প্রকাশ পাইল। তৎপর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের স্মৃত্যুক্ত সুকৃতি ত্যাগ হইল ; ধর্মাৰ্দ্ধ লোপ পাইল। মনুষ্য মনোব্যথা ও ব্যাধি দ্বারা আকুল হইল। তখন ব্যাসাদিরূপে সংহিতা শাস্ত্রের প্রকাশ হইল। তৎপর পাপরূপী, সর্বধর্ম বিলোপকারী ও দুষ্ট কর্ম-প্রবর্তক কলিযুগ আগমন করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি কার্যের লোপ হইতে লাগিল। যুগধর্ম প্রভাবে স্বভাবতই মনুষ্যগণ অতি দুর্বৃত্ত ও সর্বদা পাপকাবী হইতে লাগিল। তখন বেদোক্ত জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের চর্চা প্রায় একবারে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই কালে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংখ্যা একবাবে কম হইয়া পড়িল। তখন নানা তন্ত্রের প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রাজসাহী জেলার হিন্দুরা তিন ভাগে বিভক্ত যথা—(১) বৈদান্তিক, (২) পৌরাণিক, (৩) তান্ত্রিক। বৈদান্তিক হিন্দুরা পুরাকালেব হিন্দুদিগের মতাবলম্বী এবং তাহাদিগের আচার পবিত্র। অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণেরা এই মতাবলম্বী। হিন্দু সমাজে ইহাদের সম্মান বেশি ; কিন্তু ইহারা বড়ই দরিদ্র। রাজসাহী জেলার অধিকাংশ হিন্দু পৌরাণিক মতাবলম্বী। ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত যথা—(১) পশ্বাচার, (২) যোত্যাচার। পশ্বাচারেরা আমিশভোজী এবং সুতরাং ঘৃণিত। যোত্যাচারেরা নিরামিশভোজী। যোত্যাচারীদের পঞ্চ শাখা, যথা—(১) গীর, (২) ভারতী, (৩) নাড়া, (৪) বাউল, (৫) দরবেশ। ইহাদের মধ্যে গীর ও ভারতীর মতে স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং সাংসারিক কার্যে নির্লিপ্ত। কিন্তু কার্যে দেখা যায় যে অর্থোপার্জনে বিরত নহে। যদিচ ইহারা বিবাহ করে না, তথাপি অনেকেই কোন না কোন প্রকার স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর দুই সম্প্রদায় নাড়া ও বাউল বৈরাগী বলিয়া খ্যাত। ইহাদের কতকগুলি ভিক্ষুক এবং কতকগুলি দোকানদার। ১৬০০ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব স্বীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। নাড়া ও বাউলেরা চৈতন্যদেবের শিষ্য। ইহারা এবং অন্যান্য শিষ্যেরা চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। ইহারা স্বাধীন। এই স্বাধীনতা দ্বারা তাহারা অনেক দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন। বৈরাগিণীদের আচার ব্যবহার হিন্দু স্ত্রীলোকদের হইতে অনেক বিভিন্ন। ইহারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পতি স্থির করিয়া লয় এবং ইহাদের বিধবা বিবাহে বাধা নাই। দরবেশরাও ভিক্ষুক কিন্তু ইহারা চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া অর্চনা করে না।

বেদে নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান, মনন, অর্চনা বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞ মানবের হিতার্থ সেই বেদের সার ভাগ লইয়া তন্ত্রসমূহে সৃষ্টি হইয়া আগমোক্ত কার্যের বিধান হইয়াছে। যেমন মনুষ্য মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন দেবগণের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদয় আগমশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ। এই মহানির্বাণতন্ত্রে রূপ-কল্পনা করিয়া পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। শিব দুর্গাকে বলিতেছেন যে এই "পরমব্রহ্ম সকল প্রাণীর একমাত্র কারণ এবং হেতুভূত হওয়াতে সেই পরমব্রহ্ম হইতে আমরাও জাত হইয়াছি। ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক সকলকে সৃষ্টি করণ হেতু স্রষ্টা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহারই ইচ্ছা প্রযুক্ত বিষ্ণু

এই জগৎকে পালন করাতে পালয়িতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারই ইচ্ছায় সংহার করণ প্রযুক্ত শিব জগতে সংহারকর্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা অন্তর্যামী। তাহারই আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহারই আদেশে বিষ্ণু পালন করিতেছেন, তাহারই আদেশে শিব সংহার করিতেছেন, তাহারই আদেশে সূর্য তাপ দান করিতেছেন, তাহারই আদেশে বায়ু বাতাস দান করিয়া জগৎ শীতল করিতেছেন, এইরূপ সকল দেবতাই তাহারই দ্বারা সৃষ্টি হইয়া তাহারই আদেশমত আপন আপন কার্যে নিযুক্ত আছেন।" এই আগমোক্ত প্রণালীতে যাহারা শক্তিকে পরমব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারাই প্রকৃত তান্ত্রিক। কিন্তু যাহারা কেবল পৌত্তলিকজ্ঞানে সৌভাগ্য ইচ্ছায় দুর্গাকে উপাসনা করে, তাহারা প্রকৃত তান্ত্রিক নহে। মহানির্বাণতন্ত্রে এক স্থানে লিখিত আছে যে শিব দুর্গাকে উল্লেখ করিয়া পরমব্রহ্মের স্তব করিয়াছিলেন। "তুমি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের পরম প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। তুমি নিরাকার হইয়াও সাকারা।" দুর্গাকে শক্তি রূপে কল্পনা করিয়া পরমব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে। এই তান্ত্রিকদের মত। তান্ত্রিক মতের উপাসনা একপ্রকারে কঠিন, আর এক প্রকারে নিতান্ত সহজ। চিত্তশুদ্ধি করিয়া এবং মন পবিত্র করিয়া, একাগ্র চিত্তে উপাসনা করিলে, উপাসনা প্রণালী নিতান্ত সহজ হয়। বর্তমানে তান্ত্রিকেরা যেরূপ প্রণালীতে উপাসনা করে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের আশা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে অধিকাংশ তান্ত্রিকদের বাহ্যিক আড়ম্বরই যথেষ্ট। রাজসাহীতে তান্ত্রিকমতের উপাসকও কম নহে। পূর্বে রাজসাহী দেশের অধিকাংশ লোকই শাক্ত মতাবলম্বী ছিল। ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' রাজসাহীতে শাক্তমতের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। "নদীয়া ও নাটোর রাজবংশ শাক্তমতাবলম্বী বলিয়া রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে—'রাজসাহী শাক্তসমাজের লীলাভূমি ; ইহার গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল ; এবং তদুপলক্ষে সুরার উপাসনা বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল।' রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপিও শাক্তমতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।" আজিকালি রাজসাহীর শাক্ত সম্প্রদায়ের অনেককে সুরাপনে বিরত দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে শক্তি উপাসক দেখা যায়। অন্য হিন্দুদের মধ্যে প্রায়ই শক্তি উপাসক দেখা যায় না। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রাজসাহীতে তান্ত্রিক হিন্দুদের অবস্থা ভাল এবং তাহারা সমাজে সম্মানিত। নাটোর রাজবংশীয় পুণ্যবতী মহারাণী ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক মতে মহাযোগী ছিলেন। রাজা হইয়াও তাহার বিষয় বাসনা ছিল না। তিনি রাত্রিতে শ্মশানে শ্মশানে যোগসাধন করিয়া ফিরিতেন। তাহার উত্তর সাধক ভোলা সঙ্গে ফিরিত। করতোয়া নদী তটে ভবানীপুরের পীঠস্থানে সাধকপ্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ তপস্যা করিতেন। এক্ষণ পর্যন্ত তাহার যজ্ঞকুণ্ড, তপস্যাসন ও পঞ্চমুন্ডি বিদ্যমান আছে। বাক্সরের শ্মশানভূমিও তাহার তপস্যা স্থান ছিল। মহারাজা রামকৃষ্ণই প্রকৃত তান্ত্রিক উপাসক, প্রকৃত তান্ত্রিক মতের যোগী।

মুসলমান—মধ্য এশিয়ায় 'আর্য' নামে এক জাতি ছিল। এই আর্যদের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষে এবং কেহ আরবদেশে যাইয়া বাস করেন। এই কথা বিশ্বাস করিলে, ভারতবর্ষীয় হিন্দু সন্তান এবং আরবীয় মুসলমান সন্তান আর্য জাতিসম্ভুত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। আচারভেদ ও ধর্মভেদ হওয়াতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। হিন্দুরা মুসলমান জাতিকে যবন বা ম্লেচ্ছ নামে প্রসিদ্ধ করেন। যবনের উৎপত্তিবিষয়ক নানামত দেখা যায়। মহাভারতে দেখা যায়, নহুষ তনয় যযাতি নামে ভারতবর্ষে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হন। তাহার পাঁচ পুত্র যথা—(১) যদু, (২) তর্ব্বসু, (৩) দ্রুহ্য, (৪) অনু, (৫) পুরু। যদু সর্বজ্যেষ্ঠ এবং পুরু সর্বকনিষ্ঠ। যযাতি ক্রমে পাঁচপুত্রকে ডাকিয়া জরার সহিত পাপভোগ করিতে আদেশ

করেন। প্রথম চারিপুত্র অস্বীকার করায়, কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া জরার সহিত পাপগ্রহণ করিলেন। ঐ চারিপুত্রকে যযাতি শাপ দিলেন এবং পুরুকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে যযাতি এই শাপ দিলেন যে যাহারা মাংসাশী, পশুধর্মী ও ম্লেচ্ছ, তুমি তাহাদের রাজা হইবে। যাহারা অসভ্য এবং যাহাদের আচার কুৎসিত, তাহাদিগকে আদি সভ্য হিন্দুরা বিধর্মী ম্লেচ্ছ বা যবন বলিত। ইহাও কথিত আছে যে যদুর এক সন্তান শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ ইংলন্ডে বাস করেন। পুরাণের মতও ভিন্ন। যে সময় বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের যুদ্ধ হয়, সেই সময় বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভব করিবার মানসে বশিষ্ঠের গাভীর যোনিদ্বার হইতে কতকগুলি লোক বাহির হয়। তাহারাই পরে যবন নামে খ্যাত হন। যোনি হইতে জাত বলিয়া যবন হইল। আবার বিষ্ণু পুরাণে ইহা বর্ণিত আছে যে, সগর রাজা কোন বিশেষ অপরাধ জন্য কতকগুলি লোকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দেন ; তাহারাই পরে যবন নাম ধারণ করে। মুসলমানদের উৎপত্তি পৌরাণিক মতে বা মহাভারতের মতে সকল শ্রেণির লোকেরা বিশ্বাস যোগ্য না হইবারই সম্ভব। হিন্দুরা যাহাকে বিধর্মী, কুৎসিতাচারী জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহারাই সম্ভবত যবন বা মুসলমান নামে অভিহিত হইলেন। আদিতে আরব দেশীয় লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। আরব দেশে মহম্মদ নামে একজন ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদী। তিনি পৌত্তলিক ধর্ম রহিত করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করেন। যাহারা মহম্মদের এই মত গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে তিনি মুসলমান অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসী নাম দেন।

যবনাক্রান্তের পর হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানের বাস। রাজসাহীতে যে সকল যবন দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকে পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জানা যায় কোন হিন্দু অর্থের লোভে, কোন হিন্দু মুসলমান সরকারে চাকরির প্রলোভনে, কোন হিন্দু ভূসম্পত্তির আশায়, কোন হিন্দু সুন্দরী মুসলমান রমণীরত্ন লালসায়, কোন হিন্দু রাজার সহিত সমধর্মা হইয়া সম্মানিত হইবার অভিলাষে ; স্বীয় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কোন কোন হিন্দুকেও মুসলমানেরা কৌশলে ও বলে মুসলমান করেন। এই জাতিভ্রষ্ট হিন্দুগণকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা উচ্চ জাতীয় হিন্দু ছিল পরে মুসলমান হয় তাহারা প্রায়ই উচ্চশ্রেণির মুসলমান হইল , এবং যাহারা নিচ শ্রেণি হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হয়, তাহারা প্রায়ই কৃষক এবং তাহারাই নিম্নশ্রেণির মুসলমান হইল। যাহারা উচ্চশ্রেণির মুসলমান তাহারা সকলেই একেশ্বরবাদী এবং তাহারা কোরাণের আদেশে সকল কার্য করেন বলিয়া পরিচিত। উচ্চশ্রেণি মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী, কিন্তু রাজসাহীতে উচ্চশ্রেণি মুসমানের সংখ্যা অতি কম ; এবং নিম্নশ্রেণির পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী মুসলমানই বেশি। এই নিম্নশ্রেণির মুসলমানেরা পীরের সিন্নি দেয়, পীরের বাঁশ ও গঙরা আদি করিয়া সেবা ও পূজা করে। আবার কেহ কেহ উচ্চশ্রেণি মুসলমানদের ন্যায় দিবা রাত্রিতে পাঁচবার নমাজ করে এবং রোজাআদিও করে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এত কম যে তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মই রাজসাহী জেলার প্রধান আলোচ্য বলিয়া তাহারই উল্লেখ করা গেল।

১. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়
নগর ও গ্রামের বিবরণ

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যায় রাজসাহী জেলায় ৫,২১৯ নগর ও গ্রাম ছিল। দিনাজপুর জেলায় মহাদেবপুর থানার অন্তর্গত ৪৪৪ গ্রাম রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ভুক্ত হইয়াছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামও রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার সামিল হইয়াছে। রাজসাহীতে ৫৬৬৩ নগর ও গ্রামেরও বেশি আছে। সকল নগর ও গ্রামের বিবরণ লেখা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামের বিবরণই দেওয়া গেল।

নগর ঃ

রাজসাহী জেলায় দুইটি মাত্র নগর আছে, যাহাদের লোকসংখ্যা ৫ হাজারের বেশি। এই দুই নগর, রামপুরবোয়ালিয়া ও নাটোর। এই দুই নগরে মিউনিসিপাল নিয়ম প্রচলিত আছে।

রামপুরবোয়ালিয়া—চারিশত কি পাঁচশত বৎসর পূর্বে বোয়ালিয়ার প্রায় চারি মাইল দক্ষিণভাগে মহানন্দা নামে একটি নদী ছিল। তাহার কিছু দূর দক্ষিণে পদ্মা নদী প্রবাহিত হইয়া সবদহের নিকট, পদ্মা ও মহানন্দা একত্রিত হইয়াছিল। কালে দুই নদী এক হইয়া পদ্মা নদী নাম ধারণ করে। বোয়ালিয়ার নিকট মহানন্দার নাম লুপ্ত হয়। বর্তমান বোয়ালিয়া নগর পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। "বর্তমান বোয়ালিয়া নগরীতে ৭০ বৎসরের পূর্বে, দুই চারি ঘর রেশম ব্যবসায়ী ব্যতীত, কোন ভূম্যধিকারীর নিবাস চিহ্ন লক্ষিত হয় না। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা বোয়ালিয়াতে একটি কুঠি নির্মাণ দ্বারা, রাজসাহী অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই কুঠি ওলন্দাজদিগের নিকট ক্রয় করেন। সম্প্রতি তাহা 'বড়কুঠি' নামে ওয়াটসন কোম্পানির সম্পত্তি।"[১] নারদ নদীর মুখ বন্ধ হইয়া নাটোর অস্বাস্থ্যকর স্থান হইলে, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোর হইতে রামপুরবোয়ালিয়াতে রাজসাহী জেলাব সদর আফিস উঠিয়া আইসে। সেই হইতে বোয়ালিয়াতে জেলার সদর আফিসসমূহ আছে এবং নাটোর মহকুমা হইয়াছে! বোয়ালিয়া পূর্বে বাণিজ্যস্থান ভিন্ন কোন পুরাতন রাজবংশ বা বিশিষ্ট ভদ্রবংশীয়ের বাস ছিল না। নাটোর হইতে জেলার সদর আফিস বোয়ালিয়াতে উঠিয়া আসিবার পর হইতে স্থানের গৌরব ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জেলা স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ঐ স্কুলে কলেজের চারিটি শ্রেণি প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। তাহিরপুরের স্টেটের সাহয্যে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একটি 'সদাব্রত' স্থাপিত হইয়া দৈনিক আহার, মাসিক দান ও পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন বার্ষিক দান দিবার নিয়ম হইয়াছে; তদ্দারা দরিদ্রদিগের মহোপকার হইয়াছে। ধর্মরক্ষার্থ হিন্দুরা 'ধর্মসভা' এবং ব্রাহ্মেরা 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপিত করিয়াছেন। দীন দরিদ্র রোগীদিগের চিকিৎসা জন্য দিঘাপতিয়া স্টেটের সাহায্যে 'দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপিত হইয়াছে। এই নগরটির দৃশ্য অতি সুন্দর, কিন্তু সময় সময় পদ্মা নদীর দৌরাত্ম্যে নগরের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। নগরের লোকসংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশি।

নাটোর*—বর্তমানে রাজসাহী জেলার একটি মহকুমা; কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, এই স্থানে জেলার সদর আফিস ছিল। এই নগরটি নারদ নদীর তীরে এবং

* ৩৬২ পৃঃ দেখুন।

রামপুরবোয়ালিয়া হইতে ৩০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই নগরের নিকট দিয়া উত্তরবঙ্গ রেলপথ দার্জিলিং গিয়াছে। এই স্থানে অনেক রাজা ও জমিদারের বাস। বিখ্যাত নাটোর রাজবংশের বাসস্থান এই নগরে। নাটোর রাজবাটি চারিদিকে 'চৌকি' বা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। ইহা কথিত আছে যে স্থানে রাজবাটি ও নাটোর শহর অবস্থিত সে স্থান পূর্বে 'ছাইভাঙ্গার' বিল বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৮ শতাব্দীতে নাটোর রাজবংশ ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া রাজসাহী জেলার প্রায় সমুদয় স্থান অধিকৃত করে। দশশালা বন্দোবস্ত সময় দানশীলা দীন দুঃখী পালয়িত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী নাটোর বংশ উজ্জ্বল করিয়া, এই নগরে বাস করিতেন। যে নাটোর রাজবংশের রাজত্ব প্রায় সমস্ত রাজসাহী এবং অন্যান্য জেলারও ভূরি ভূরি ভূমি অধিকৃত ছিল, এইক্ষণ সেই বংশের রাজত্ব আকৃতিতে চতুর্থ স্থান আধিকার করিয়াছে ; কিন্তু সম্মানে সর্বোচ্চ এখনও আছে। নাটোর মহারাজার সাহায্য প্রদত্ত একটি উচ্চশ্রেণি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া দরিদ্র সন্তানদিগের মহোপকার হইয়াছে। আবার দিঘাপতিয়া রাজার সাহায্যে একটি 'দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপিত হইয়া দীন দুঃখী রোগীদের প্রাণরক্ষার উপায় হইয়াছে। নাটোর স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। নগরের জলবায়ু কোন প্রকারেই ভাল নহে। তথাপি এই নগরে ১০ হাজার লোকের বাস। নাটোরের নিকটবর্তী হরিশপুর, আমহাটি, ভাবণী প্রভৃতি অনেক ভদ্রপল্লি আছে।

গ্রাম ঃ

(১) **নওগাঁ**—১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানে একটি মহকুমা স্থাপিত হয়। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের সুলতানপুর স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। এস্থানের হাট অতি প্রসিদ্ধ। এবং একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। ইহা গাঁজার জন্য বিখ্যাত। এই নওগাঁ হইতে প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষে গাঁজা রপ্তানি হয়। এখানে মিউনিসিপাল নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। বিদ্যা শিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণির একটি ইংরেজি বিদ্যালয় এবং দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহকুমা স্থাপিত হইবার পর হইতে স্থানের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কালে ইহা একটি সুন্দর নগরে পরিণত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(২) **বলিহার**—ঐ স্থান বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি প্রধান সমাজ। কুলজ্ঞ গ্রন্থে ইহার নাম 'কুড়মুড়ি' বা 'কুড়মৈল' বলিয়া পরিচিত। আত্রাই নদী হইতে প্রায় আট মাইল দূর। এই গ্রামে বলিহার পরগণার রাজাদের বাড়ি। এই পরগণার এক অংশের জমিদার রঙ্পুর জেলার অন্তর্গত দিনহাটায় নিয়তকাল বাস করেন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণের সাহায্যে একটি মধ্যশ্রেণি ইংরেজ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) **দুবলহাটি**—এ গ্রামটি বিলের মধ্যে ; নওগাঁ হইতে ৫ মাইল দূর। এখানে বারবকপুর পরগণার রাজার বাস। রাজা হরনাথের সাহায্যে একটি মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল[২] স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) **মহাদেবপুর**—আত্রাই নদীর তীরে ; বলিহার হইতে ৫ কি ৬ মাইল দূর। রাঢ়ী শ্রেণি ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের বাস।

(৫) **মাঁদা**—মাঁদার বিলের তীরে, আত্রাই নদী হইতে প্রায় ৬ মাইল দূর। এই স্থান রামনবমীর মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানে মাঁদা পরগণার জমিদারদিগের কাছারি আছে।

(৬) **তালন্দ**—মাঁদার বিলেব শেষ ভাগে দক্ষিণদিকে এবং তানোর থানার প্রায় ৪ মাইল উত্তরে। ধনী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের বাস। ইহাদের দ্বারা একটি মধ্যশ্রেণি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(৭) **তাহিরপুর**—বারাহি (বারানই) নদী তীরে। এই নদীর পূর্ব তীরে রামরামা গ্রামে তাহিরপুরে প্রসিদ্ধ ভৌমিক বংশের রাজধানী ছিল। এই স্থানে বিখ্যাত রাজা কংসনারায়ণের

বাস ছিল। এই রামরামার পশ্চিমে বারানই নদীর অপর পারে তাহিরপুরের বর্তমান রাজবাটি। তাহিরপুর বাগমারা থানার প্রায় ৫ মাইল পূর্বে এবং উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের মাধবনগর স্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল পশ্চিম। এই স্থানের হাট অতি প্রসিদ্ধ।

(৮) **দিঘাপতিয়া**—নাটোরের ২ মাইল উত্তর। এই গ্রামে দয়ারাম রায়ের বংশধর দিঘাপতিয়া রাজার বাস। জেলার মধ্যে এই রাজার জমিদারি সকলের অপেক্ষা বেশি। এই রাজার রাজত্ব রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, মুরশিদাবাদ, যশোহর, হুগলি, হাবড়া প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত। রাজবাটির চারিদিকে 'চৌকি' বা পরিখা আছে, রাজবাটির সম্মুখেই দৈনিক বাজার হয়। স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অভাব নাই।

(৯) **লালুর**—আত্রাই নদীর তীরে। এই গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণি কাপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাস। এ স্থানের বারইয়ারী কালীপূজা আদিও প্রসিদ্ধ। এ স্থানের চৌধুরীগণ চৌদ্দ চৌধুরীর একতর বংশীয় বলিয়া কথিত হয়। এই চৌধুরী জমিদারগণ আপাল[২] সরস্বতীর বংশ সম্ভূত। আপাল কুলজ্ঞ ছিলেন। ইহার কুলশাস্ত্রের অভিজ্ঞতাই ভূসম্পত্তি লাভের প্রধান কারণ।

(১০) **জোয়াড়ি**—বড়ল নদীর তীরে। এই গ্রামে কতকগুলি সদ্বংশজাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারগণের বাস। বৈদিক ব্রাহ্মণগণেরও একটা প্রধান সমাজ।

(১১) **কমল**—বিল চলনের নিকট। রাজসাহী জেলায় এই গ্রামের ন্যায় বৃহৎ গ্রাম আর নাই। বহুতর কাঁশারী, কুমার ও জালিয়ার বাস। ইহা একটি বাণিজ্য স্থান। কলমের বারইয়ারী কালীপূজা অতি প্রসিদ্ধ। অতি পূর্বকালে এই গ্রামে প্রায় ৪০/৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ঘরে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। অধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকে কবি ছিলেন। সংস্কৃতের আলোচনা এত বেশি ছিল যে কলম দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজসাহীর জজ আদালতের প্রধান উকিল বাবু ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রাধানাথ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ দয়ারাম রায়ের আদি বাস এই কলম গ্রামে ছিল।

(১২) **সিংড়া**—নাগর নদী দুই দিক দিয়া গুড় নদীর সহিত একত্রিত হইয়াছে—একদিকে তেমুখের নিকট, অপর দিকে তাজপুর দিয়া সিংড়ার নিকট। সিংড়া এই নদীর সঙ্গম স্থান। এই স্থানে পুলিশ স্টেশন। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে বগুড়া পর্যন্ত যে রাজপথ আছে, তাহার এক পার্শ্বে পুলিশ স্টেশন। সিংড়া একটি বাণিজ্য স্থান। শালকাষ্ঠ এই স্থানে বিক্রয় হয় এবং এস্থানের হাটও প্রসিদ্ধ।

(১৩) **চৌগ্রাম**—সিংড়া হইতে চারি মাইল উত্তর। এই গ্রামে চৌগ্রাম পরগণার জমিদারের বাস। মহারাণী ভবানী কৃত যে 'জাঙ্গাল' অর্থাৎ পথ ভবানীপুরের তীর্থস্থান পর্যন্ত নির্মিত হয়, তাহা চৌগ্রাম হইতে এক প্রহরের পথ হইবে।

(১৪) **পতিসর***—নাগর নদীর তীরে। কালীগাঁও পরগণার জমিদারের সদর কাছারি। কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা এই পরগণার জমিদার। এই পতিসরের অনতিদূরে ১০১টা পুষ্করিণী আছে। ইহা কথিত আছে যে মাতার উদ্ধার জন্য কোন ব্রাহ্মণ জমিদার এক দিবসে ১০১টা পুকুর খনন করেন। ইহার কোন কোনটিতে জল থাকে না। ১০১টা পুষ্করিণী এক দিবসে উৎসর্গ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(১৫) **কালীগঞ্জ**—নাগর নদীর তীরে। কুসুম্বি পরগণার সদর কাছারি। এই পরগণা তাড়াষেব জমিদারের অধিকৃত। এই স্থানের হাটও প্রসিদ্ধ। এই তাড়াষ বংশীয় রামরায় নাটোরের রাজার দেওয়ান ছিলেন।

* ৩৬৫ পৃঃ দেখুন।

(১৬) **করচমাড়িয়া**—পতিসর বা কালীগঞ্জ হইতে প্রায় ২ মাইল দূর। বারেন্দ্র কায়স্থ জমিদার নিমাই সরকারের বাস ছিল। ইহার বংশধরেরা এক্ষণে রামপুর বোয়ালিয়াতে বাস করিতেছেন।

(১৭) **কাসিমপুর**—যমুনা নদীর তীরে। এই গ্রামের চৌধুরীগণ চৌদ্দচৌধুরীর এক চৌধুরী বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধান কাপ। মৃত কালী লাহিড়ির ভ্রাতুষ্পুত্র রায় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুরের বাসস্থান। এ বংশও কাপ প্রধান। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে রাণিগঞ্জ স্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূর।

(১৮) **আটগ্রাম**—যমুনা নদীর তীরে। নিরাবিলপটির শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বাস। মহারাজা রামকৃষ্ণকে এই বংশ হইতে দত্তক গ্রহণ করা হয়।

(১৯) **ভবানীপুর**—এই গ্রামের নিকট আত্রাই ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থান। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে আত্রাই স্টেশন হইতে ৩ মাইল দুর। এই গ্রামে বঙ্গজ শ্রেণি কায়স্থ জমিদারগণের বাস। ইহারা শূরবংশীয় কায়স্থ। ইহারা ভুলুয়ার রাজা লক্ষণমাণিক্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। রাজা লক্ষণমাণিক্য দ্বাদশ ভৌমিকের এক ভৌমিক।

(২০) **পাঁচুপুর**—গুড় নদীর তীরে। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে আত্রাই স্টেশন হইতে ২ মাইল দূর। এই গ্রামে অনেক ধনবান তিলির বাস। একটি বাণিজ্য স্থান। এই গ্রামে পুলিশ স্টেশন।

(২১) **পাথাইল ঝাড়া**—এই স্থানে আত্রাই নদী যমুনা হইতে বিভিন্ন হইয়া খাজুরা দিয়া প্রবাহিত। এই স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল মৃত মোহিনীমোহন রায়ের আমরুল পরগণার সদর কাছারি ও ফরাসি একটি সাহেবের রেশম কুঠি আছে। ইহার অনতিদূরে আত্রাই রেলওয়ে স্টেশন এবং রেলী ব্রাদার্সের পাটের কারবার স্থান।

(২২) **খাজুরা**—আত্রাই নদীর তীরে কুলজ্ঞ গ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজ আছে, তন্মধ্যে 'খর্জুরী' অধুনা খাজুরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে অনেক ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণগণেব বাস।

(২৩) **ইসলামগাঁতি**—গুড় নদীর তীরে। সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস।

(২৪) **গুড়নই**—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ। এই গ্রাম গুড় নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া, গুড়নই নামে খ্যাত। এই গ্রামের মৈত্রেয় বংশীয়েরা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ।

(২৫) **বিশা**—আত্রাই নদীর তীরে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি প্রসিদ্ধ সমাজ বলিয়া খ্যাত। কুলজ্ঞগ্রন্থে এ গ্রাম "বিশাখা" বলিয়া পরিচিত।

(২৬) **ডাঙাপাড়া**—আত্রাই নদীর তীরে। এই গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থ চৌধুরীগণ চৌদ্দ চৌধুরীর একতর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষিত।

(২৭) **বান্দাইখাড়া**—আত্রাই নদীর তীরে। একটি বাণিজ্য স্থান। নওগাঁও মহকুমা স্থাপিত হওয়ার সমসাময়িককালে বান্দাইখাড়া পুলিশ স্টেশন নওগাঁওতে উঠিয়া যায়।

(২৮) **ক্ষেতর**—গৌড়ে যাইবার সময় চৈতন্যদেব এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তাহার স্মরণার্থ একটি মন্দির প্রস্তুত হয়, তাহাতেই গৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। এই মেলায় বৈরাগীর সমাগমই বেশি। রামপুরবোয়ালিয়ার পশ্চিমে। এই স্থানে নরোত্তম ঠাকুরের মহোৎসব প্রসিদ্ধ।

(২৯) **বাঘা**—লালপুর (বিলমাড়িয়া) থানার অন্তর্গত। এই স্থানে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। ঈদের সময় এই স্থানে মেলা হয়। এই মসজিদ রক্ষা জন্য এবং অন্যান্য ব্যয় জন্য মোঘল সম্রাট সাহজাহান বহুতর নিষ্কর ভূমি দান করেন। উদ্বৃত্ত আয় হইতে মুসলমান বালকদের ধর্মশিক্ষা হয়।

(৩০) **কুসুম্বি**—মাঁদা থানার অন্তর্গত এবং কালীগাঁয়ের নিকট এই গ্রামে একটি পুরাতন

জলাশয় আছে, উহার এক পার্শ্বে জঙ্গল মধ্যে একটি মন্দির আছে। ইহা কথিত আছে যে মজুমদার বংশীয় জনৈক হিন্দুর দ্বারা উহা নির্মিত হয় এবং সেই হিন্দু মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে। মন্দির প্রস্তর দ্বারা এরূপভাবে প্রস্তুত যে মন্দিরের গঠনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভাবই লক্ষিত হয়। এক্ষণ মুসলমানের মসজিদ বলিয়া পরিচিত। ঈদের সময় সেস্থানে 'কোরবানি' হয়।

(৩১) **পুঁঠিয়া**—"দক্ষিণে নারদ, পূর্বে মুসাখাঁ, উত্তরে হোজা, এই নদীত্রয়ের বেষ্টনের মধ্যে রাজসাহী জেলার প্রধান নগর রামপুর-বোয়ালিয়ার ৮ ক্রোশ পূর্বদিকে পুঁঠিয়া গ্রাম। বারেন্দ্র শ্রেণির প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী বংশের বসতির জন্য পুঁঠিয়া বিখ্যাত। চতুর্দ্দশ খ্রিস্টাব্দের শেষ অথবা পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের প্রথমেই পুঁঠিয়া রাজধানীর গঠন হয়। এই গ্রামে, রাজধানীর সংশ্রবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং গোপ ইত্যাদি নবশাখের পুরুষানুক্রমিক বসতি আছে।"[৪] রাজাদের কৃত অনেক দেবমন্দিরে ও দেবালয় স্থাপিত আছে এবং উচ্চশ্রেণি ইংরাজি স্কুলও আছে। এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস।

(৩২) **গোদাগাড়ি**—পদ্মানদীর তীরে। বর্গীর হেঙ্গামার সময় এই গ্রামে নবাব আলিবর্দ্দী বাস ভবন নির্মাণ করেন এবং এই গ্রামে 'কেল্লা বারুইপাড়া' নামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।[৫]

(৩৩) **সুলতানগঞ্জ**—পদ্মা ও মহানন্দার সম্মিলন স্থান। নবাব আলিবর্দ্দী এই গঞ্জ স্থাপিত করেন বলিয়া ইহার নাম 'সুলতানগঞ্জ' হয়।

(৩৪) **হরিণা**—এই গ্রাম কলমের নিকট। এই গ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয়েরা অর্ধকালীর সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহারা মিতড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়দের বংশসম্ভূত। হিন্দু সমাজে ইহাদের সম্মান যথেষ্ট।

---

১. শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত।

২. বর্তমানে উচ্চশ্রেণি স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

৩. কেহ আবাল বলে। তাহিরপুরের রাজা ইন্দ্রজিতের সহিত সুসঙ্গের মল্লিক জানকীবল্লভের কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহে আপাল কুলজ্ঞ মধ্যস্থ ছিলেন।

৪. মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত।

৫. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা'।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস ও রাস্তা

যে কোন বিষয় অভ্যাস করি কিংবা অন্যের নিকট উপদেশ পাইয়া থাকি, তাহাকে শিক্ষা বলা যায়। আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুই জানিতে পারি না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রথমে মাতা পিতা, তদ্‌পর অন্যান্য মানবের নিকট হইতেও নানা উপায়ে ক্রমে নানা বিষয় অভ্যাস করিতে শিখি এবং উপদেশ প্রাপ্ত হই। এই নানা বিষয় এবং নানা উপদেশ বহুবিধ ভাষায় ও গ্রন্থে শিখিবার প্রয়োজন হয়। যেমন আহার না করিলে শরীর ক্রমে পুষ্ট, কান্তিযুক্ত ও বলশালী হয় না, তেমনই নানাবিধ বিষয়ের শিক্ষা ও উপদেশ লোক প্রমুখাৎ ও নানা ভাষার গ্রন্থে প্রাপ্ত না হইলে মানবের মানসিক প্রবৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট, মার্জিত বা কার্যক্ষম হয় না। অভ্যাস ও উপদেশের বলে মানব সংসারে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হয়। শিখিবার ইচ্ছা মানব হৃদয় মাত্রেই নিহিত রহিয়া আছে। সুতরাং কোন না কোন প্রকার শিক্ষা মানব প্রাপ্ত হয়। তবে কাল ও অবস্থা ভেদে সকল মানব সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কেহ সংস্কৃত ভাষায়, কেহ গ্রিক ভাষায়, কেহ লাটিন ভাষায়, কেহ ইংরাজি ভাষায়, কেহ দর্শন শাস্ত্রে, কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে, কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রে, কেহ অঙ্ক শাস্ত্রে, কেহ সাহিত্যে, কেহ কৃষি বিদ্যায়, কেহ শিল্পকার্যে, কেহ স্থাপত্য বিদ্যায়, কেহ যুদ্ধ বিদ্যায়, কেহ সঙ্গীত বিদ্যায় পণ্ডিত হয়। এইরূপে মানবের শিক্ষা।

এই স্বাভাবিক শক্তি বলে পুরাকালে পিতা মাতা বালক বালিকাদের সমানভাবে লেখাপড়া, জ্ঞান, ধর্ম ও নীতি শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। মধ্য এশিয়া হইতে একদল আর্য জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে। এই আর্য জাতিরা ভারতবর্ষের আদিমবাসীদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। এই আর্য জাতির ভাষা সংস্কৃত। আর্য সন্তানেরা, ধর্ম, নীতি, রাজকার্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, যুদ্ধ বিদ্যা, সকল বিষয়ই বেশ ভাল জানিতেন এবং সংস্কৃত ভাষায় সকল বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এই সংস্কৃত একটি অতি প্রাচীন পবিত্র সম্পূর্ণ ভাষা। একজন ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে কিরূপ উচ্চ আসন দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত অংশে পরিচয় পাওয়া যাইবে।[১] সংস্কৃত অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। "সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে।"[২] পুরাকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ভারতের দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, সাহিত্য, বেদবেদান্ত প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার বলে আর্য ঋষিরা ভারতকে আচার, ব্যবহার, ধর্ম, নীতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসনে উপনীত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ঋষি ও পণ্ডিতেরা আদিকাল হইতে ঐ দেব ভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন। অতএব আদিম নিবাসীরাও ঐ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বেদ হইতে মনু পর্যন্ত, মনু হইতে পুরাণ পর্যন্ত, পুরাণ হইতে তান্ত্রিক সময় পর্যন্ত, তান্ত্রিক সময় হইতে বৌদ্ধদের সময় পর্যন্ত, যেমন আচার, ব্যবহার, ধর্ম, নীতি ও সভ্যতার পরিবর্তন হয়, তেমনই সংস্কৃত ভাষারও বিস্তর পরিবর্তন হয়। অশোক রাজার রাজত্ব সময়ের একশত বৎসরেরও অধিককাল পরে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে প্রচলিত

হয়। ঐ প্রাকৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইবার সময় হইতে বা উহার ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব হইতেই সংস্কৃত ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল না। তখন কথোপকথন আদি সংস্কৃত ভাষায় রহিত হইয়া তৎসময়ের প্রচলিত ভাষায় কথোপকথন আদি হইতে লাগিল। এখন বাংলা ভাষাতেই কথোপকথন আদি সম্পন্ন হয়।

এমন দুর্দিনে ভারত যবনাক্রান্ত হইলে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চারও হ্রাস হইতে লাগিল। সংস্কৃত ভাষার চর্চার হ্রাসে বঙ্গদেশে বাংলা ও যাবনিক রাজভাষার চর্চার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশ যবনাক্রান্ত হওয়ার পরেও পাঠানদিগের রাজত্বকালে বাংলার সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও ধর্ম শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা চণ্ডীদাসের 'পদাবলী', বিদ্যাপতির কবিত্ব, বসুবংশ গুণরাজ খাঁর "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিজয়," রূপ সনাতনের ধর্মভাব ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন, "চিন্তামণি দীধিতি" প্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় শাস্ত্র বিচারের প্রাধান্য, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রেম-ভক্তির তরঙ্গ, বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য ভাগবত", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত", উদয়নাচার্য ভাদুড়ি, পুরন্দর বসু ও পরমানন্দ রায়ের কুলশাস্ত্র প্রণয়নে প্রকাশ পাইতেছে এবং আজিও বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ ভাব আর অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। ক্রমে বঙ্গদেশ যবনের পদানত। রাজ দরবারে যবন ভাষারই প্রাধান্য। সুতরাং বঙ্গবাসীরা বিশেষত কায়স্থেরা নিজ নিজ সন্তানকে মুসলমান রাজদরবারের কর্মোপযোগী করিবার জন্য যবন ভাষা শিক্ষা দিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। যবন ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সন্তানেরা যবন ভাবাপন্নও হইতে লাগিলেন এবং মুসলমান ও কায়স্থের হস্তেই পারসি ভাষায় (যবন ভাষা) রাজকার্য নির্বাহের ভার অর্পিত হইতে লাগিল। রাজসাহী বঙ্গদেশের অন্তর্গত ; সুতরাং রাজসাহীতেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইল।[৩]

সেনবংশীয় রাজাদের সময়েও রাজসাহীতে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেবল সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা হইত। মুসলমান রাজত্বকালেও যাহারা মুসলমান রাজদরবারে দাসত্ব করিবার প্রয়াসী হইতেন অথবা মুসলমান রাজদরবারের সংস্রবে থাকিবার আবশ্যক মনে করিতেন অথবা কোন কারণে বাধ্য হইতেন, তাহারা সংস্কৃত, বাংলা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার একটি শাখা বিশেষ।[৪] এই বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা সম্ভূত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বাংলা ভাষা বর্তমান কালের ন্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল না। সংস্কৃত, মৈথিল, কান্যকুব্জ, হিন্দি, পারসি প্রভৃতি মিশ্রিত বাংলাই বেশি প্রচলিত ছিল। রাজসাহীতে রাজা, জমিদারের বাসই বেশি ; অতএব রাজভাষা শিক্ষা দেওয়ারই বেশি প্রয়োজন হইয়া উঠে। তথাপি ইংরাজ রাজত্ব সময় পর্যন্তও রাজসাহীতে বহুবিধ সংস্কৃত "চতুষ্পাঠী" ছিল। সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঁঠিয়া, নাটোর ও দিঘাপতিয়া বংশের রাজাদের রাজত্ব সময়ে তাহাদের রাজ্যে বিস্তর "চতুষ্পাঠী" ছিল এবং ঐ চতুষ্পাঠীগুলি রক্ষার জন্য রাজারা বহু অর্থ ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার নির্দশন এখনও রাজসাহীতে এবং অন্যান্য জেলার অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। ইহা কথিত আছে যে রাজসাহী প্রদেশের চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য মহারাণী ভবানী বৃত্তি দান করিয়া যান এবং এই দান স্থির রাখিবার জন্য জেলার কালেক্টর সাহেবের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, বার্ষিক রাজস্বের সহিত রাণীর বার্ষিক বৃত্তিদানের টাকা সংযোজিত হইল। বৃত্তিদানের টাকার সহিত নির্ধারিত রাজস্ব মহারাণী ভবানী কালেক্টর সাহেব সমীপে বার্ষিক দাখিল করিবেন এবং কালেক্টর সাহেবযোগে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ নির্ধারিত বৃত্তি পাইবেন। এই প্রকারে মহারাণীর জমিদারির রাজস্ব বর্ধিত হারে নির্ধারিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সে সকল চতুষ্পাঠী প্রায় না থাকায় এবং চতুষ্পাঠীর আদি পণ্ডিতের

উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকায় বা অন্য কোন কারণে মহারাণী ভবানীর প্রদত্ত বৃত্তি রহিত হইয়া গিয়াছে।[৫] ইহার বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে।

এই সময় সাধারণ বাংলা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে "সরকার" (যাহারা পরে "গুরুমহাশয়" বলিয়া পরিচিত) জমিদারি ও মহাজনী কার্যনির্বাহ উপযোগী শিক্ষা দিতেন। জমিদারের পাটওয়ারী, আমিন, শুমারনবীশ, জমানবীশ প্রভৃতিও পাঠশালার কার্যও নির্বাহ করিতেন। গুরুমহাশয়ের মাসিক ৫ টাকার বেশি আয় ছিল না। স্বতন্ত্র পাঠশালা গৃহ ছিল না। গুরুমহাশয় নিজগৃহে, কি কোন চণ্ডীমণ্ডপে, কি কাহার বৈঠকখানায় পাঠশালার কার্য নির্বাহ করিতেন। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার ন্যায় রাজসাহীতে প্রকৃত উপযুক্ত "গুরুমহাশয়ের" পাঠশালার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এ প্রণালীর শিক্ষা রাজসাহীতে নিতান্ত কম ছিল।

উপরের লিখিত চতুষ্পাঠীতে দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং কোন কোন স্থানে বেদ বেদান্ত পড়ান হইত। সেকালের রাজসাহীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পুঁঠিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা বৎসাচার্য, রাজা কংসনারায়ণের আদিপুরুষ পুরুষোত্তম বেদান্তী এবং তাহার সহোদর কুল্লুকভট্ট[৬] ও উদয়নাচার্য ভাদুড়ির পাণ্ডিত্যে রাজসাহীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কুল্লুক স্বকৃত মন্বার্থ মুক্তাবলী নামক টীকায় কেবল যে তাহার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও স্থির গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এমন নহে ; একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশান্তর্গত টীকাকারগণ মধ্যে কুল্লুককে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। ইহা রাজসাহী প্রদেশের পক্ষে অসীম গৌরবের কথা। এস্থলে আর কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গুণকীর্তন করা প্রয়োজন বোধ করিলাম। যে যে পণ্ডিতগণ রাণী ভবানী প্রদত্ত দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হইতেছেন তাহারও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইবে।

থানা চৌগ্রামের অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ছিল। উহার অধ্যাপক শ্রীপতি বিদ্যালঙ্কার ছিলেন। এই চতুষ্পাঠী রক্ষা জন্য মহারাণী ভবানী বার্ষিক ৯০ টাকা দান করিতেন। শ্রীপতি বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র চন্দ্রশেখর তর্কবাগীশ ঐ দান ভোগ করেন। আবার চন্দ্রশেখরের পরলোক গমনের পর, তাহার তিন পুত্র কাশীশ্বর বাচস্পতি, গোবিন্দরাম সিদ্ধান্ত এবং হররাম ভট্টাচার্য ঐ বৃত্তির উত্তরাধিকারী হন। ইহাদের বৃত্তি রহিত হইলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুরোধ ক্রমে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বৃত্তি দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট আদেশ করেন। কিন্তু এক্ষণে বৃত্তি রহিত হইয়া আছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আগদিঘার ভট্টাচার্য মহাশয়দের বংশে পণ্ডিতপ্রবর গদাধর ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়ার নিকট কোন একটি গ্রামে গদাধরের জন্ম হয়। ইনি রাজসাহী ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ভুবনবিদ্যারত্ন গদাধরের বংশসম্ভূত। গদাধর ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিবাদ ও শক্তিবাদ গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশের ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠীতে আদরের সহিত প্রচলিত আছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুড়ির ভাগ গ্রামে পুরুষোত্তম দেব তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রস্তুত করেন। ঐ বৃত্তি "ভাষাবৃত্তি" নামে প্রসিদ্ধ। বেলঘরিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত অতি শ্রদ্ধার সহিত "ভাষাবৃত্তি" অধ্যয়ন করেন এবং তাহার নিজ চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত করিয়া ছাত্রবৃন্দদের রীতিমতো শিক্ষা দিতেন। পাণিনি ব্যাকরণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ।[৭] এই ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ অথচ সম্পূর্ণ। ইহাতে শব্দ, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি যে রূপ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, সেরূপ কোন ব্যাকরণে লিখিত হয় নাই। এই ব্যাকরণ সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিলে,

সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাও উৎকৃষ্ট হয়। বেদের ভাষা এত কঠিন, যে অনেক শব্দের বা পদের ব্যাখ্যা পাণিনি ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে করিতে পারা যায় না। বেদের ভাষা শিক্ষার জন্য পাণিনিতে একটি পরিচ্ছেদ আছে। "ভাষা-বৃত্তি" প্রণয়নে এই দুরূহ ব্যাকরণ শিক্ষার এত সুবিধা হইয়াছিল এবং তাহাতে তর্কালঙ্কার এত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন যে, শিবচন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত অবশ্যই গ্রন্থের সমাদর করিবেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মাটিকোপা গ্রামে রমানাথ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহাব প্রণীত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি মহারাণী ভবানীর সময় বর্তমান থাকিয়া তাহার বৃত্তি ভোগ করিতেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরের নিকট আমহাটি গ্রামে কালিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী নামে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জনৈক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজসাহী জেলার মাটিকোপা গ্রামের প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীতে তিনি অধ্যয়ন করেন। ইহারই একজন অধস্তন সন্তান গদাধর সিদ্ধান্ত পাণিনি ব্যাকরণে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইনি ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর অনুগ্রহে নিজ বাটি আমহাটিতেই একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন এবং মাসিক ১০।০ টাকা বৃত্তি ব্যতীত সেকালে মহারাণীর নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তাহার প্রণীত কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারই পৌত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহারাণী প্রদত্ত মাসিক ১০্ টাকা বৃত্তি এখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইতেছেন এবং পূর্বপুরুষের অক্ষয় কীর্তি স্থির রাখিয়াছেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোবের নিকট আমহাটি গ্রামে কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন নিজ বাটিতে এক চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন। তাহার চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী মাসিক ১০্ টাকা বৃত্তি দান দিতেন। ন্যায়পঞ্চাননের পরলোক গমনের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমলে ঐ বৃত্তি রহিত হয়।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চৌগ্রামের নিকট "বড়ে" গ্রামে রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্যের এক চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী মাসিক ৫্ টাকা বৃত্তি দিতেন। ভট্টাচার্যের পরলোক গমনের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমলে ঐ বৃত্তি রহিত হয়।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁঠিয়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাহার প্রণীত কাব্য চন্দ্রিকার টীকা অতি প্রসিদ্ধ।

প্রায় ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত নামে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম শিব আবার আকৃতিতেও ঠিক শিবের ন্যায় ছিলেন। স্বদেশে সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পুঁঠিয়ার রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সাহায্যে নিজ পুঁঠিয়াতেই চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন। শিবচন্দ্র একজন শ্রুতিধর ছিলেন এবং পাঠ্যাবস্থা হইতে তাহার অতি সরল, সুমিষ্ট ও পবিত্র শ্লোক রচনা করিবার শক্তি হয়। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শিবচন্দ্রের জ্ঞান পিপাসার শান্তি হইল না। ব্রাহ্মণের বেদবেদান্ত শিক্ষাই প্রধান। অতএব বেদবেদান্ত অধ্যয়নের জন্য টোল ত্যাগ করিয়া তিনি বারাণসী ধামে গমন করেন। তথায় তিনি অনেকদিন বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া একজন বেদজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হন। বারাণসী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ জন্ম স্থান বেলঘরিয়া গ্রামেই তিনি চতুষ্পাঠী করিলেন। ইনি বেদান্ত আদি নানা শাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার কবিতা ও বিচারশক্তি অতি প্রশংসনীয়। লেখক অনেকবার ইহার শাস্ত্র বিচার সময় কোন কোন সভায় উপস্থিত ছিল। ইহার শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী অতি সুন্দর এবং ন্যায়সঙ্গত। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ।

(১) সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, (২) সুধাসিন্ধু, (৩) কাশিনী নাম্নী রুদ্রাধ্যায়ের টীকা, (৪) বিদ্বন্মনোরঞ্জন

কাব্য, (৫) বাসুদেব বিজয় কাব্য, (৬) কালীয়দমন কাব্য। এই সকল গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ মত খণ্ডন করিয়া শিবচন্দ্র যে "বিধবা বিবাহ খণ্ডন" পুস্তক লিখেন, সেই পুস্তক কেবল বাংলা ভাষায় লিখিত হয়। তাহার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠে ইহা বেশ প্রতীত হয় যে তিনি নানা শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। আবার কাব্যাদিতেও তিনি বেশ রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন[৮]।

রাজসাহী জেলা ব্যতীতও অন্য জেলার সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী বৃত্তি দিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। বীরভূম জেলার একটি পণ্ডিত রাণী ভবানী প্রদত্ত বার্ষিক ১০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন। রাণীর মৃত্যুর পর বৃত্তি রহিত হয়।[৯]

যে সময়ে মহাত্মা আডাম সাহেব রাজসাহীর শিক্ষা বিষয় অনুসন্ধান করেন, সে সময়ে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের এই বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে অনুসন্ধান হইতেছে এবং গবর্ণমেণ্ট কিছু কবিরার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই পণ্ডিতগণ অতি সরল, বাসগৃহ ও পরিচ্ছদ নিতান্ত সামান্য; কিন্তু তাহারা পাণ্ডিত্যে ও মন পবিত্রতায় উচ্চাসন প্রাপ্ত হন। আডাম সাহেব পণ্ডিতগণকে ইংলণ্ডের এবং স্কটলণ্ডের কৃষকদের ন্যায় অসভ্য বলিয়াও তাহাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে আমরা আডাম সাহেবের সহিত ঐক্য হইতে পারি না। বিদেশীয়ের চক্ষুতে পণ্ডিতগণ পরিচ্ছদে ও বাসগৃহে অসভ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের সংস্কৃত ভাষায় ও ব্যাকরণের পাণ্ডিত্যে; দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রে গবেষণায় ও বেদের তত্ত্বানুসন্ধানে ধর্মের ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ সর্বত্র বিকীর্ণ করিয়াছে এবং যাহারা ধর্ম ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তাহারাই প্রকৃত সভ্য। গৃহ ও পরিচ্ছদ বাহ্যিক সভ্যতার লক্ষণ। ধর্ম ও জ্ঞানই আভ্যন্তরিক সভ্যতার লক্ষণ। উদ্ধৃত অংশ পাঠে আডাম সাহেবের মত জানা যাইবে।[১০]

মহারাণী ভবানী রাজত্বের পরে কিছুদিন রাজসাহীতে সংস্কৃত চর্চা বিলুপ্তপ্রায় দেখা যায়। কিন্তু এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের বেদবেদান্তের জ্ঞানে রাজসাহীর নষ্ট গৌরবকে কিয়দংশে উদ্ধার করিয়াছিল। অধুনা রাজসাহীতে সেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব। রাজসাহী আর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের গৌরব করিতে পারে না।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে প্রাকৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ক্রমে পরিবর্তনে বর্তমান বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় এবং ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগর অক্ষর হইতে বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি হয়। বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাদের গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার আদিগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন লাউসেনের মনসার গানই আদিগ্রন্থ। ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয় এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাহার অন্তর্ধান হয়। তাহার সময় হইতেই বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্তন হয়। কিন্তু সেকালে এই বঙ্গভাষার উন্নতিস্রোত রাজসাহীতে প্রবাহিত হয় নাই। চৈতন্যদেব গৌড়ে গমনকালে রাজসাহীস্থ এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র স্পর্শ করেন। রাজসাহীতে তান্ত্রিক মতেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুতরাং চৈতন্যের প্রেম উঠল জ্বলদাক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য রাজসাহীর ব্রাহ্মণ মধ্যে তাহার কোন শিষ্যের নাম পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ বঙ্গভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়া যান। গোবিন্দ দাস, জীব গোস্বামী, রূপসনাতন প্রভৃতির লেখনীতেই বঙ্গভাষা উন্নতশালিনী হয়। এই শিষ্য সম্প্রদায় মধ্যে "চৈতন্যদেবের ৮২ বৎসর পরে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুধরী গ্রামে বৈদ্য জাতীয় পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে এক গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন।"[১১] ইহার প্রণীত গ্রন্থের নাম পদমালা। ইহার পদাবলী বাংলা ও হিন্দীভাষায় মিশ্রিত। এই গোবিন্দদাসের পর রাজসাহীতে কোন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবির পরিচয় পাওয়া যায় না। একখণ্ড

"উৎসাহে" রাজসাহীর প্রাচীন গ্রাম্য কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "জয়গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ি নাটোরের নিকটবর্তী বাজুরভাগ গ্রামে ছিল। হাস্যরসের কবিতায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এদেশে তাহার রচিত অনেক কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত আছে। তাহার যে সকল কবিতা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্য হইতে হারু নাপিতের কবিতা পাঠাইলাম। অনুমান ৩০ বৎসর হইল ইহার প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। রাজসাহীর অন্তর্গত উঁপৈলসর গ্রামে গোস্বামী মহাশয় তাহার ভগিনীর বাড়িতে গিয়াছিলেন। হারু নাপিত তাহাকে যে রূপ ক্ষৌরি করে তাহাতে তিনি নরসুন্দরাজকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।"

"উঁপৈলসরের নরসুন্দর নামটি তার হারু।
পাশস্পার্শের যত নাপিত সকল হতে মারু।।
লোক মুখেতে নাম রটিল শব্দ গেল দূরে।
নিত্য রুধির ভোজন করে হারুনাপিতের ক্ষুরে।।
ক্ষুর হয়েছে কালের খাঁড়া সর্বলোকের হন্তা।
নরুণ নিলে জ্ঞান যেন ভালুকের হাতে খন্তা।।"

বিস্তার হইবে বিধায় কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইহাতে প্রাচীন গ্রাম্যকবিতা এবং সেকালের গ্রাম্যভাষার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে "বাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক থাকিয়া রচনা-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তৎপ্রণীত সভ্যতার ইতিহাস একখানি প্রশংসার্হ গ্রন্থ।"[১২] "জ্ঞানাঙ্কুর" বঙ্গদর্শনের ন্যায় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা ছিল। এই পত্রদ্বারা বঙ্গভাষার বিস্তর উপকার সংসাধিত হইয়াছে। এই জ্ঞানাঙ্কুরে নূতন নূতন বিষয় লিখিত হইত এবং অনেক অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব তত্ত্বের আবিষ্কার ও আলোচনা হইত। কিন্তু এইরূপ উন্নতশালী পত্রিকার অকাল মৃত্যুতে রাজসাহীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। রামপুরবোয়ালিয়া হইতে ২/৩ বৎসর হইল "উৎসাহ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় নূতন বিষয় অতি সুন্দর ভাষায় লিখিত হইতেছে। "উৎসাহ" অতি প্রশংসনীয় পত্রিকা। বোয়ালিয়াতে "হিন্দু-রঞ্জিকা" নামে এক প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এস্থলে বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি রাজা এবং স্কুল বা কলেজে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া নিজ অধ্যবসায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। "সুখভ্রম", "সীতাচরিত", "এখন আসি" ও "স্বভাব নীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম দুইখানি পদ্যে এবং শেষ দুইখানি গদ্যে রচিত। তাহার কবিতা লিখিবার শক্তি যে একেবারে ছিল না তাহা আমরা বলিতে পারি না। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের নিকট শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয়ের জন্মস্থান। ইনি একজন সুলেখক। ইহার প্রণীত গ্রন্থগুলিও প্রশংসনীয়।

রাজসাহীতে চিকিৎসা বিদ্যালয়েরও অভাব ছিল না। বৈদ্য জাতিরা সংস্কৃত ভাষায় এই বিদ্যাশিক্ষা করিত। বৈদ্য বেলঘরিয়া, হাজরা-নাটোর, হরিদা-খলসী ও থাঐপাড়া গ্রামের চিকিৎসা বিদ্যালয়ই প্রসিদ্ধ। আডাম সাহেব বলেন সে সময়ে ২৯৭ জন ধাত্রী ছিল। "তাহারা অনভিজ্ঞ ছিল না।"[১৩]

রাজ বাজত্বের অব্যবহিত পূর্বে রাজসাহীতে উচ্চজাতীয়দের সংস্কৃত ও বাংলা এবং কোন কোন স্থলে পারস্যভাষা শিক্ষা ভিন্ন সাধারণ প্রজাগণের কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। নিম্ন শ্রেণি হিন্দুদের মধ্যে পাটওয়ারী, তহশিলদার বা আমিনের কার্য জন্য কোন কোন ব্যক্তি শিক্ষিত হইত এবং এই শ্রেণির লোকেরাই প্রায় পাঠাশালার কার্য নির্বাহ করিত। উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরূপ শিক্ষার প্রচার একবারে যে ছিল না তাহাও বলা যায় না।

স্বাধীন পাঠানদিগের সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দন, কুল্লূকভট্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মোঘল সম্রাটের অধীনে বাংলার সুবাদারদের সময়ে ঐরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই বঙ্গেশ্বরদের সময়ে মুকুন্দরাম, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম হইলেও, তাহারা রঘুনন্দন, কুল্লূকভট্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারে না। মোঘল রাজত্ব সময়ে প্রজাগণের শিক্ষার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। সে সময়ে সংস্কৃত ভাষার যে উন্নতি দেখা যায়, তাহা হিন্দু জমিদারগণের টোল, চতুষ্পাঠীতে ভূমি ও অর্থদানের ফল। এ সময় যবন রাজার শিক্ষা বিস্তারের যত্ন ছিল না। আবার মোঘল সম্রাট বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে বাস করেন এবং সুবাদারগণই বঙ্গদেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। সুবাদারগণের অধীনে জমিদারগণের ক্ষমতাও প্রচুর। বঙ্গের সুবাদার ও জমিদারগণ নিজ নিজ রাজ্য শাসনে ব্যস্ত। প্রজার শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত নহে। এইরূপ অবস্থায় মুসলমান রাজত্বের শেষ সময় এবং ইংরাজ অধিকারের কেবল প্রারম্ভে রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জমিদারগণের ও মহাজনগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইল, চুরি ডাকাইতি বেশি হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে দস্যু দলের সৃষ্টি হইতে লাগল; আবার নবাগত পুলিশের দারগা, জমাদার, বরকন্দাজগণের অত্যাচারে প্রজাগণ অস্থির হইয়া পড়িল। চোর ডাকাইতের অত্যাচারও বরং ভাল; কিন্তু আবার দারগা, জমাদার ও বরকন্দাজগণকে উৎকোচ দেওয়া নিঃস্ব প্রজার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। সাধারণ অশিক্ষিত প্রজাগণ আরো বেশি অস্থির হইল। জমিদারগণের অত্যাচারে, মহাজনের পীড়নে, পুলিশের শাসনে প্রজাগণ ভীত হইতেছিল কেন? সুবাদারের অশ্বারোহী, জমিদারের সিপাহি, পুলিশের লাল পাগড়ি ও চাপরাশ দেখিয়াই সে সময় প্রজাগণ ঘরে লুকাইতে লাগিল কেন? এ সময় সাধারণ প্রজাগণের এত আতঙ্ক হইয়াছিল কেন? সর্বসাধারণ প্রজাগণের মূর্খতা এবং অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। প্রজাগণকে শিক্ষিত করিলে, তাহারা সমুদয় বুঝিতে পারিবে এবং অন্যায় অত্যাচারের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার সাহসী হইবে। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের রাজত্বের প্রারম্ভেই এই কথার আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজার অভিযোগ সমূহ তৎকালিক ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির কর্ণগোচর হইল। কি উপায়ে সাধারণ প্রজাকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার যুক্তি হইতে লাগিল।

এইরূপ যুক্তি হইতে হইতে কিছুকাল অতীত হইল। এইকাল মধ্যে হেস্টিংসের সময় কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামক প্রসিদ্ধ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার চারি বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মিঃ মে নামক একজন মিশনরি প্রথমে চুঁচুড়ায় বাংলা স্কুল স্থাপিত করিবার সূত্রপাত করেন। বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের এই সূত্রপাত হইল। বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট সময়ে দেশে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত হয়। তদপর বড়লাট বেন্টিঙ্ক বিখ্যাত লর্ড মেকলে সাহেবের সহায়তায় এ দেশীয় প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তারের এরূপ ব্যবস্থা করেন যে, যাহাতে দেশীয় ভাষা অধিক শিক্ষা হয়। এই গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের আমলে দেশীয় লোকদের বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের মহাসভার আদেশ অনুসারে ভারতবাসীদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়। এই টাকা মঞ্জুর হওয়ার পর স্থানে স্থানে সংস্কৃত, পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন জন্য সকলেরই অনুরাগ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই বিষয় শিক্ষা কমিটির গোচর করা হইল। তদপর এ বিষয় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সভায় বাদানুবাদ হইয়া ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই স্থির হইল যে এদেশীয় লোকদের ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং ইতঃপূর্বে ভারতবাসীদের বিদ্যা

শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে। কিন্তু এই নিয়ম হইবার পূর্বে সংস্কৃত, পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যয় গবর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র দিবেন।

এইরূপ প্রণালীতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানীয় লোকদের সন্তানদিগের বিদ্যা শিক্ষারই সুবিধা হইল। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে প্রজাগণকে শিক্ষিত না করিতে পারিলে পূর্বের লিখিত অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা কঠিন। অতএব ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যেক জেলায় কিরূপ জানিবার জন্য এবং প্রথমে কি উপায়ে দেশীয় শিক্ষা সর্বত্র বিস্তার করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, মহাত্মা উইলিয়ম আডাম সাহেবকে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে কমিশনর নিযুক্ত করেন।[১৪] এই প্রথমে জেলায় জেলায় দেশীয় শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হইল এবং রাজসাহী প্রজাপুঞ্জের সৌভাগ্য প্রসন্ন হইবারও সূত্রপাত হইল। মহাত্মা আডাম এই কার্যের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তাহার রিপোর্ট বড়লাট বাহাদুর সমীপে পৌঁছিলে, শিক্ষার সুব্যবস্থা হইবে। মহাত্মা আডাম দেখিলেন যে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক থানায় স্বয়ং যাইয়া দেশীয় শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক জেলার কোন একটি প্রধান থানা বা প্রধান নগরে স্বয়ং যাইয়া তথাকার দেশীয় শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় সংগ্রহ করিয়া আদর্শ স্বরূপ সমস্ত জেলার শিক্ষার অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। তাহার অনুসন্ধান এত পরিপক্ক ও গভীর ছিল যে প্রত্যেক জেলার শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই প্রণালী অনুসারে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে আডাম সাহেব স্বয়ং রাজসাহী আসিয়া নাটোরকে আদর্শ স্বরূপ নির্দেশ করিলেন। নাটোরে প্রথমে রাজসাহী জেলার সদর অফিস ছিল এবং এক্ষণে রাজসাহীর একটি প্রধান মহকুমা। অতএব নাটোরের অবস্থা জানিতে পারিলে রাজসাহী জেলার শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপ জানা যাইবে। এই সময়ে আডাম সাহেব রাজসাহী জেলা পরিদর্শনে আইসেন, সে সময়ে সেখানে কোন সুবন্দোবস্ত ইংরেজি স্কুল ছিল না। "আডাম সাহেব বলেন নাটোরে বাংলা স্কুল ১০টি এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ১৬৭; ছাত্রগণ ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স সময় স্কুলে ভর্তি হয়। শিক্ষকগণ যুবক এবং সরল প্রকৃতির পুরুষ; কিন্তু দরিদ্র এবং অনভিজ্ঞ; তাহারা এই কার্যে সম্মান মনে করেন।"[১৫] নাটোরে পারস্য ও আরবীয় ভাষাও শিক্ষা হইত। "নাটোরে পারস্য স্কুল চারিটি এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ২৩। ছাত্রগণ ৪½ হইতে ১৩ বৎসর বয়স সময় স্কুলে ভর্তি হয়। ১৭ বৎসর বয়সের পর আর স্কুলে থাকে না। বিদ্যা বুদ্ধিতে বাংলা স্কুলের শিক্ষক অপেক্ষা পারস্য স্কুলের শিক্ষক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ধর্মভাবে বাংলা স্কুলের শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ।"[১৬] পারস্য স্কুলের শিক্ষকের মাসিক আয় ৭ টাকা। আরবীয় ভাষা শিক্ষা জন্য যে স্কুল ছিল, সে সমুদয়ে কোরান পড়ান হইত। এ শ্রেণির স্কুলের সংখ্যা ১১ এবং ছাত্র সংখ্যা ৪২। ছাত্রগণ ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স সময় পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হয় এবং ১৮ বৎসর বয়সের পর আর স্কুলে থাকে না। ইহাদের শিক্ষকগণ অনুপযুক্ত। বাংলা স্কুল অপেক্ষা পারস্য স্কুলের শিক্ষায় বৃহৎ এবং উদার ভাব লক্ষিত হয়।"[১৭]

আডাম সাহেবের সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু জমিদারেরা পুত্রের ন্যায় কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। অনেক সময়ে কন্যাকেও জমিদারি কার্য নির্বাহ করিবার জন্য লেখাপড়া করিতে হইত। রাণী সূর্যমণি, তারাঠাকুরঝি প্রভৃতি লেখাপড়া মন্দ শিক্ষা করেন নাই।[১৮]

পুরুষ ও স্ত্রীলোক, বালক ও যুবা, সমুদয় লোকের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া এই মীমাংসা হইল যে তৎকালে রাজসাহী জেলায় গড়ে শতকরা ৭.৭৫ জন বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৯২.২৫ জন বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে না।[১৯] ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে অবস্থা ও কাল বিবেচনা করিয়া সে সময় রাজসাহীতে শিক্ষার

অবস্থা ভাল ছিল না ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। নিম্নশ্রেণি লোকদের মধ্যে যে একবারে শিক্ষা প্রচলিত ছিল না তাহাই বেশি অনুমিত হয়। "বাংলার সমুদয় জেলা মধ্যে আডাম সাহেবের রাজসাহী গড়ে একটি আদর্শ জেলা বলা যাইতে পারে।"[২০] স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে "রাজসাহী একটি একবারে অনুন্নত জেলা নহে। আবার যে একেবারে মূর্খের জেলা তাহাও ভাল যাইতে পারে না। এই জেলায় পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান লোকের বাস ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এই জেলা বড় বড় প্রধান রাজা জমিদারগণের বাসস্থান বলিয়া গৌরব করে। ইহা একটি রেশম আদির প্রধান বাণিজ্য স্থান।"[২১] রাজসাহী কেন বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন হইল। রাজসাহীতে শিক্ষা-বিস্তার না করিলে চুরি ডাকাইতি প্রভৃতির অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা কঠিন; এবং রাজ্যও নিরাপদ নহে। "জ্ঞান কেবল শক্তি নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষার একটি প্রধান উপায় এবং মূর্খতা দুর্বলতার একটি প্রধান উপাদান, যদ্দ্বারা রাজ্য বিপদে পতিত হয়।" এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তার জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন।

আডাম সাহেব গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট দিবার সমসাময়িককালে অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন তারিখে বোয়ালিয়ায় একটি জেলা স্কুল স্থাপিত হইল এবং বাবু সারদাপ্রসাদ বসু মহাশয় তাহার হেডমাস্টার নিযুক্ত হইলেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে এই স্কুলে মোট ১৭১ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১৬৪ জন হিন্দু, ৫ জন খ্রিস্টান এবং ২ জন মুসলমান। এই জেলা স্কুল হইতে কলিকাতার ছোট আদালতের জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু শিবপ্রসাদ সান্যাল, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু মোহিনীমোহন রায় এবং কিশোরীমোহন রায় প্রভৃতি শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ নাম ও যশ বিস্তার করেন। ইহার কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে দরিদ্র বালকদের শিক্ষার জন্য রায়লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর[২২] অবৈতনিক একটি ইংরেজি বাংলা স্কুল স্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া ভূরি ভূরি দরিদ্র বালকদের শিক্ষাপ্রদান করিতেছে। এ একটি অক্ষয় কীর্তি। এরূপ নিঃস্বার্থভাবে কীর্তি স্থাপনই দেশের মঙ্গল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে নাটোর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিজ নাটোরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সেই বিদ্যালয় "দিঘাপতিয়া প্রসন্ননাথ একাডেমীর" সহিত সংযোজিত করেন। আজও সেই বিদ্যালয় জীবিত থাকিয়া 'প্রসন্ননাথ উচ্চশ্রেণি ইংরেজি স্কুল' নামে পরিচিত; এবং এই বিদ্যালয় হইতে শত সহস্র বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ; বি, এ; এম, এ; বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। মফস্বলে রাজা প্রসন্ননাথই প্রথমে উচ্চশিক্ষার এবং রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুরই প্রথমে মধ্যশ্রেণি ইংরেজি শিক্ষার বীজ রোপণ করেন। যে সময়ে রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করেন, সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ স্থানে স্থানে একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া বঙ্গভাষার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। সেই বঙ্গ বিদ্যালয়গুলি 'হার্ডিঞ্জ স্কুল' নামে পরিচিত হইল। যে সময়ে এরূপ জনরব যে শিক্ষা বিস্তার জন্য জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন না, সে সময়ে রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর এবং রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর সেই জনরব অমূলক করিয়া, রাজসাহীতে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত হইয়াছিলেন। এইরূপ কার্য গবর্ণমেণ্টের অবগতিতেও রাজসাহীর ভাগ্যে "হার্ডিঞ্জ স্কুল" প্রাপ্তি ঘটিল না বটে; কিন্তু রাজসাহীতে বড় বড় রাজা জমিদারগণের বাসস্থান বলিয়া শিক্ষা বিস্তারের ব্যাঘাত হইল না। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের "প্রসন্ননাথ একাডেমী" প্রতিষ্ঠার সময় নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সভার সভাপতি হইয়া আহূত রাজা জমিদারগণকে উল্লেখ করিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন, "দেশের মঙ্গলজন্য সকলেই শিক্ষা বিস্তার করা কর্তব্য কর্ম এবং কেবল শিক্ষা দ্বারাই মানবের সুখ সমৃদ্ধি

বৃদ্ধি পাইবে।"[২৩] এই বাক্যে রাজসাহীর রাজা জমিদারগণ উৎসাহিত হইয়া গবর্ণমেন্ট হইতে আর্থিক সাহায্যের উপব নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ প্রজাগণের উপকার জন্য শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডালহাউসি গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার ভারতবর্ষে আগমনের পর হইতেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষা এবং দেশীয় ভাষায় প্রজাপুঞ্জকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি যত্নবান হইলেন। "এইরূপে গবর্ণর জেনেরল এ-দেশীয় লোকের বিদ্যা শিক্ষার্থ নানা উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ১৮৫৪ অব্দের জুলাই মাসে তদানীন্তন অনুশাসনী সভার অধিপতি মহোদয় স্যর চার্লস উডের নিকট হইতে একখানি পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ লিপিখানি যে ভারতবর্ষীয় লোকের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষার সনন্দপত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ। এই পত্রে ইহা উপদিষ্ট আছে যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এবং দেশস্থ সমুদায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, নানাবিধ পরীক্ষার্থ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিবে। ছাত্রদিগের বিদ্যার পুরস্কার দিবার ও কৃতিত্বের তারতম্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বি,এ, এবং এম, এ; বি, এল এবং ডি, এল; এম, বি এবং এম, ডি প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিবেন। উক্ত পত্রিকায় ইহা আরও নির্দিষ্ট আছে যে. সাধারণের শিক্ষা বিধানার্থ সরকার হইতে অর্থ সাহায্য বিতরণ করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইবে। সাহায্য দান প্রণালী দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ইহা দ্বারা অপর সাধারণের মধ্যে অনেক পরিমাণে জ্ঞান জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার সোপান হইয়াছে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে একটি মহৎকার্য সম্পন্ন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে এ দেশীয় লোক ক্রমশ শিক্ষা পাইতেছেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কোন পরাধীন রাজ্যে কখন এত অল্পকালের মধ্যে সেরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় নাই। ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা যে এই অদৃষ্টপূর্ব অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ, তাতে সন্দেহ হইতে পারে না।"[২৪] এইরূপ সাহায্য দান প্রণালী রাজসাহীর শিক্ষা বিস্তারের বেগ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া রাজা জমিদারগণ ও সাধারণ লোক সমূহকে আরও উৎসাহিত করিল। এই প্রণালীতে কেবল যে রাজসাহীর রাজা জমিদার প্রভৃতি উৎসাহিত হইয়াছিল এমত নহে, সমগ্র বঙ্গদেশেই রাজা জমিদার প্রভৃতি উৎসাহিত হইয়া শিক্ষাবিস্তারের জন্য যত্নবান হন। ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সাহায্য দান প্রণালী কার্যে পরিণত হয়। সে সময়ে সমগ্র বাংলা দেশে ১৪৫ বিদ্যালয় এবং তাহাতে ১৩,২২৯ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু সাহায্যদান প্রণালী প্রচলিত হইবার পর ১৮৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৫ হইতে ২,৯০৭ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৩,২২৯ হইতে ১২১১০৮ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাজসাহীতে নিম্নশ্রেণির স্কুল ৬২ এবং তাহাতে ১৯৮৪ জন ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিল। ইতিপূর্বে জমিদারগণের উপর যে গুরুতর দোষ অর্পিত হইয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে এ সময় খণ্ডন হইল। সাহায্য-দান প্রণালী প্রচলিত হইবার পর বাবু মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ডেপুটি কালেক্টর রাজসাহীতে অনেকদিন ছিলেন। তিনি রাজসাহী জেলা স্কুল কমিটির সম্পাদক ছিলেন এবং তাহার সরল ও অমায়িক স্বভাবগুণে জেলার রাজা জমিদারগণ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। রাজসাহীর রাজা ও জমিদারগণের শিক্ষা বিস্তারের পরামর্শদাতা মথুরবাবুই ছিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন রাজা, জমিদার নূতন স্কুল স্থাপনে অগ্রসর হইতেন না। সুতরাং রাজসাহীর অনেক ইংরেজি ও বাংলা স্কুল অদ্যাপি মথুরবাবুর যত্নের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সাহায্যদান প্রণালীতে উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণি প্রজাপুঞ্জকে শিক্ষা প্রদান করিবার যথেষ্ট সুবিধা হয়, কিন্তু এই প্রণালীতে নিম্নশ্রেণি প্রজাপুঞ্জকে শিক্ষাপ্রদানের কোন বিশেষ সুবিধা হইল না।

বাংলার প্রথম লেপ্টনান্ট গবর্ণর স্যর ফ্রেডরিক হ্যালিডের পর স্যর জন পিটর গ্রান্ট ১৮৫৯

খ্রিস্টাব্দে বাংলার ছোটলাট হইলেন। এই গ্রান্ট সাহেবই প্রজাগণকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া পাঠশালা সমূহে সাহায্যদান করেন এবং বাংলায় নিম্নশিক্ষা বিস্তারের পথ প্রদর্শন করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে স্যর সিসিল বিডন সাহেব লেপ্টনান্ট গবর্ণর হন। তিনি মাননীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে নিম্নশিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন। এই প্রণালীতে কলিকাতার নিকটবর্তী প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান বিভাগ প্রভৃতিতেই নিম্নশিক্ষার সুবিধা হইল। এসময়ও রাজসাহীর নিম্নশ্রেণির প্রজাপুঞ্জের ভাগ্য প্রসন্ন হইল না। রাজসাহীর দক্ষিণ ভাগে পদ্মানদীর অপর পারে কলিকাতা, যশোহর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান লইয়া নিম্নশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় পাঠশালা সমূহের ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া বর্ধমান, নদীয়া, যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে গুরুমহাশয় প্রস্তুত করিবার জন্য ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত করেন। সেই শিক্ষিত গুরুমহাশয়েরা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিতে লাগিলেন। সেই ভূদেববাবুর অধীনে কেবল পাঠশালা পরিদর্শন জন্য স্বতন্ত্র ডেপুটি ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হইল। এই প্রণালী অনুসারে পদ্মানদীর উত্তরভাগে রাজসাহী প্রদেশে নিম্নশিক্ষা বিস্তার জন্য ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পাঠশালসমূহের ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ঐ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্টের আদেশমত ভূদেব পাঠশালা প্রণালী শিক্ষার জন্য তাহার বিভাগে যান। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রত্যাগমন করিয়া নিজ বিভাগে কার্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হন। রাজসাহীতেই তাহার সদর আফিস হয়। গবর্ণমেণ্ট আদেশমত রাজসাহী, দিনাজপুর ও রঙ্পুর এই তিন জেলায় "ভূদেব পাঠশালা" স্থাপিত করিতে তিনি আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে রাজসাহীর নিম্নশ্রেণিস্থ প্রজাপুঞ্জের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। কাশীবাবু "ভূদেব পাঠাশালা" প্রণালীতে বালক বালিকা উভয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ভারপ্রাপ্ত হন। বালক পাঠশালার শিক্ষক প্রস্তুত জন্য ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর তারিখে রাজসাহী ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হইল। আবার বালিকা পাঠশালার শিক্ষয়ত্রী প্রস্তুত জন্য গবর্ণমেন্টের এবং নাটোরের ছোট তরফের রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সাহায্যে "ফিমেল নর্মাল স্কুল" নামে একটি ট্রেনিং স্কুল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "ফিমেল নর্মাল স্কুল" দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। আবার গুরুমহাশয় প্রস্তুত জন্য যে ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় তাহা পশ্চাৎ স্কুলের পণ্ডিত প্রস্তুত জন্য পরিবর্তিত হইয়া প্রথম শ্রেণি নর্মাল স্কুল নাম হয়। রাজসাহীতে অনাবশ্যক বিধায় এই বিদ্যালয়টি অবশেষে রঙ্পুরে উঠিয়া যায়। এই প্রকারে কাশীবাবু নিজ ডেপুটিগণসহ গ্রামে গ্রামে যাইয়া রাজসাহীতে অনেক পাঠশালা স্থাপিত করেন এবং সেকালে পাঠশালার অবস্থাও ভাল ছিল। কোন কোন পাঠশালায় ১৫০ জন পর্যন্ত ছাত্র হয় এবং কোন কোন গুরুমহাশয়ের মাসিক আয় ২০/২৫ টাকার কম ছিল না। কাশীবাবু ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে "তাহার বিভাগ সর্বসাধারণের শিক্ষার প্রকৃত ভূমি।"[২৫] ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে এই নিয়ম হয় যে পাঠাশালার স্বতন্ত্র ইন্স্পেক্টর ও ডেপুটি ইন্স্পেক্টর থাকিবে না। এই নিয়মানুসারে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্কুল ও পাঠশালাসমূহের ইনস্পেক্টর হইয়া রাজসাহী বিভাগ তাঁহার অধীন হইল। তখনও রাজসাহীতে পাঠশালার অবস্থা উন্নত। কিন্তু নাটোর ও বোয়ালিয়া সারকেল ব্যতীত রাজসাহীর সমুদয় পাঠশালায় মধ্যশ্রেণি লোকের অল্প সন্তানেরাই অধ্যয়ন করিত; নিম্নশ্রেণি লোকদের সন্তানগণই বেশি। সে সময় পাঠশালা প্রণালীতে পাঠশালা হইতে কোন পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। অতএব পরীক্ষা দেওয়ান আবশ্যক হইলে, পাঠশালা হইতেও মধ্য-বাংলা পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্রগণ প্রস্তুত হইত। সুতরাং এই শ্রেণির পাঠশালা মধ্যবাংলা স্কুলের ন্যায় ; এবং উপযুক্ত শিক্ষকেরও প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইলেই, জমিদার, তালুকদার এবং অবস্থাপন্ন ধনীলোকদের সহানুভূতির আবশ্যক। সে সময় ইহাদেরও গবর্ণমেন্টের পাঠশালার উচ্চতর শিক্ষা দিবার ঝোঁক বেশি ছিল।[২৬] নাটোর ও

বোয়ালিয়া সারকেলের কুজীপুকুর, সোইড, হাল্‌সা, ভবানীপুর, নন্দনগাছি প্রভৃতি উন্নত পাঠশালা হইতে মধ্য-বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক ছাত্র প্রথম শ্রেণি নর্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষাতে কৃতকার্য হয়। ইহারা সকলেই মধ্যশ্রেণি স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্ত হন। ২/১ জন স্কুল সমূহের সব-ইন্‌স্পেক্টরের পদও প্রাপ্ত হন।

গ্রে সাহেবের পরে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে স্যর জর্জ কাম্বেল সাহেব বাংলার লেপ্টনান্ট গবর্ণর হন। তিনি উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু নিম্ন-শিক্ষার অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাহারই সময়ে বাংলায় নিম্ন-শিক্ষার যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি বাংলায় নিম্ন-শিক্ষার একটি নূতন সংশোধিত নিয়ম প্রচলিত করেন এবং গ্রামে গ্রামে নিম্ন-শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক জেলায় যথেষ্ট টাকা মঞ্জুর করেন। পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব ইনস্পেক্টরের নূতন পদেরও সৃষ্টি হইল। "ভূদেব পাঠশালার" মাসিক ৫্ টাকা সাহায্য দিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু "স্যর জর্জ কাম্বেল পাঠশালার" ১।।০ টাকা হইতে ৫্ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দিবার নিয়ম নির্ধারিত হয়। ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে স্কুল ২৫৭ এবং তাহাতে ছাত্র ৬৬৪৬; এবং ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে স্কুল ২৬৪ এবং তাহাতে ছাত্র ৮৭০৪ জন অধ্যয়ন করিত। ২৬৪ স্কুল মধ্যে ২২৫ পাঠশালা। ৬ বৎসরে ৬২টি হইতে রাজসাহীতে ২২৫ পাঠশালা হয়। ঐ সময়ে গুরুমহাশয়দের উপযোগিতারও বিচার রহিল না। এই নূতন নিয়মে রাজসাহীতে পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইল কিন্তু প্রত্যেক পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গেল এবং গুরুমহাশয়দের উপযোগিতারও হ্রাস হইল। এইরূপ অবস্থা কম বেশি সকল জেলারই হইল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্যর রিচার্ড টেম্পল সাহেব বাংলার লেপ্টনান্ট গবর্ণর হন। তাহার সময়েই এই অনুপযুক্ত গুরুমহাশয়দের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় এবং পাঠশালার জন্য উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা ইহার পূর্বেই প্রচলিত হয়। ৫্ টাকার পাঠশালা হইতে উচ্চপ্রাইমারী এবং ৩ টাকার পাঠশাল হইতে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রচলিত হইল। ৫ টাকার পাঠশালাকে "ডি পাঠশালা" অথবা 'ইন্‌টর মিডিএট" স্কুল বলিয়া পরিচিত হয়। এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত যথা—(১) উচ্চপ্রাথমিক, (২) নিম্নপ্রাথমিক। রাজসাহীর মধ্যে নাটোর বিভাগে "ডি পাঠশালা" অথবা "ইন্‌রমিডিএট" স্কুলেরই অবস্থা উন্নত হয়। এ জেলায় "৩ টাকার পাঠশালা" অর্থাৎ নিম্নপ্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার ন্যায় উন্নত ছিল না। এইরূপে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ভার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পিত ছিল। তিন বৎসরে এ জেলায় স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা যেরূপ ছিল তাহা নিম্নে দেখান গেল—

বৎসর	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
১৮৮৪-৮৫	৬০০	১৬৭৭৯
১৮৮৫-৮৬	৭৯৫	১৭৫৪৮
১৮৮৬-৮৭	৬৮২	১৬২৫৯

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যদিচ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সর্বময় কর্তা ছিলেন, তত্রাচ জেলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের পরামর্শ মত জেলার প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় কার্য নির্বাহ হইত। শিক্ষা সম্বন্ধে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরই ম্যাজিস্ট্রেটের দক্ষিণ হস্ত ছিল। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে "স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী" রাজসাহীতে প্রচলিত হইল। এই "স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী" প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে জেলার অনুন্নত স্থান ব্যতীত সমুদয় স্থানের নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা "পুরস্কার প্রথার" অধীন ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্ত হইতে শিক্ষা কার্য জেলার বোর্ড হস্তে অর্পিত হইলে, "পুরস্কার প্রথা" রহিত হইয়া মাসিক "বৃত্তিপ্রথা" প্রচলিত হয়। এই নিয়মে প্রায় ৭০০ পাঠশালা হইতে প্রায় ৩০০

পাঠশালা হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের সময় জেলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর প্রকৃত প্রস্তাবে জেলার শিক্ষাকার্য নির্বাহ করিত কিন্তু "স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালী" প্রচলিত হইবার পর সে ক্ষমতা রহিল না। বোর্ডের আদেশমত জেলার মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষাকার্য নির্বাহিত হইতে লাগিল। জেলার "পুরস্কার প্রথা" রহিত করা এবং "বৃত্তি প্রথা" প্রচলিত করা গবর্ণমেণ্টের নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া, পুনরায় এক বৎসর পরেই "পুরস্কার প্রথা" প্রচলিত হইল এবং উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার "বৃত্তি প্রথাই" রহিল। "পুরস্কার প্রথা" প্রচলিত হওয়ায় আবার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী জেলার স্কুল ৬১২ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৯৭২৪। মোট ৬১২ স্কুলের মধ্যে ৫৬৫টি পাঠশালা। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে এই ৬৫ বৎসরে স্কুলের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা পূর্ব লিখিত বিবরণ পাঠেই জানা যাইবে।

রাজসাহী জেলা অপেক্ষা বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশি এবং দেশীয় শিক্ষা অনেক ভালরূপে হয়; কিন্তু বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা রাজসাহীর অনেক নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালায় ইউরোপীয় প্রণালীর শিক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। এ বিভিন্নতার কারণ এই যে রাজসাহীতে যে সকল গুরুমহাশয় দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশ ইউরোপীয় প্রণালীর স্কুলের ছাত্র এবং দেশীয় মতের শিক্ষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ। পুরাতন গুরুমহাশয় ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে বা ইউরোপীয় প্রণালীর স্কুলের ছাত্রেরা দেশীয় প্রণালী মতে রীতিমত শিক্ষিত হইলে বঙ্গদেশের উপযুক্ত গুরুমহাশয় হইতে পারে। দেশীয় প্রণালীতে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে না পারিলে প্রকৃত কৃষকদের পাঠশালায় সন্তান পাঠাইতে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। কৃষকদের প্রয়োজনমত পাঠশালায় শিক্ষাপ্রদান করিলে প্রাথমিক স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এ পর্যন্ত নিম্নশিক্ষার বিষয় বলিতেছিলাম। পুনরায় উচ্চশিক্ষার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেও বাহাদুর দেশের উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া দিতে চাহিলে মহামান্য গ্রে সাহেব তাহার খুব প্রতিবাদ করেন। তাহার প্রতিবাদেই উচ্চশিক্ষা একবারে উঠিয়া গেল না বটে, কিন্তু সেই হইতেই গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষাতে বেশি উৎসাহ না দিয়া নিম্নশিক্ষাতে বেশি অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এ ঘটনাতে কলিকাতার নিকটবর্তী উন্নত স্থানেরই বিশেষ অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। দেশীয় রাজা, জমিদার, মহাজন, ধনী, ক্ষমতাশালী প্রভৃতিরা নীরব রহিলেন না। তাহার উচ্চ শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত জন্য বেশি অগ্রসর হইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী জেলা স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষীয় শ্রেণি সংযোজিত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণি কলেজে পরিণত করিবার জন্য দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর তাহার জমিদারি মধ্যে বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। লর্ড মেওর পর লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চঅঙ্গের ইংরেজি শিক্ষার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অতএব রাজা হরনাথের মহৎকার্য গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই "রাজসাহী এসোসিয়েসনের" পক্ষ হইতে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের সাহায্যে ও উদ্যোগে ঐ কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থবর্ষীয় শ্রেণি সংযোজিত করিয়া প্রথম শ্রেণি কলেজে পরিণত হয়। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর মফস্বলে উচ্চ শিক্ষা বীজ প্রথমে ছড়ান। কিন্তু তাহার পুত্র রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর সেই বীজ হইতে পুষ্ট ও পরিপক্ব ফল শোভিত অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাদন করিলেন এবং সেই বৃক্ষের সুস্বাদু ফল জেলার সর্বত্র বিতরণ করিলেন। রাজা প্রসন্ননাথকে অনুকরণ করিয়া রাজসাহীর অন্যান্য রাজা বা প্রধান লোকেরা উচ্চ শিক্ষার বীজ জেলার স্থানে স্থানে ছড়াইতে অগ্রসর হইলেন। এই রাজসাহী কলেজে দুবলহাটির রাজা হরনাথ, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ, পুঁঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায়, মহারাণী শরৎসুন্দরী এবং তাহার পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী প্রচুর অর্থদান করেন। এই কলেজের সহিত দুইটি

(হোস্টেল) ছাত্র নিবাস সংযোজিত আছে। একটি দিঘাপত্তিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আর একটি পুঁঠিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মহৎ কার্য জন্য রাজসাহীবাসীরা উল্লিখিত রাজা ও রাণীদের নিকট ঋণী। ইহারাই ধনের সার্থকতা করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়াছেন। জেলায় ক্রমান্বয়ে যে যে উচ্চ শ্রেণির স্কুল মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

১. ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পাঁচ বৎসর পূর্বে এই দিঘাপতিয়া স্কুল স্থাপিত। এ জেলায় এ একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উচ্চ শ্রেণির স্কুল। ইহার খ্যাতি অনেকদিন হইতে এবং অনেক দূরে বিস্তৃত। স্কুল গৃহ এবং তৎসঙ্গে যাবতীয় কাগজপত্র অগ্নিভস্মীভূত হওয়াতে প্রথম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার ফল জানা কঠিন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ৫৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ৮ বৎসর গড়ে প্রতি বৎসর ৭ জন ছাত্র উত্তীর্ণ। এই স্কুল প্রায় প্রতি বৎসর জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

২. পুঁঠিয়ার রাজা পরেশনারায়ণ রায় বাহাদুর ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুঁঠিয়াতে একটি মধ্যশ্রেণি বাংলা স্কুল স্থাপিত করেন। সেই স্কুল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইংরেজি এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ শ্রেণি ইংরেজি স্কুলে পরিণত হইয়া আছে। এই ঊনবিংশতি বৎসর মধ্যে ৫২ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। গড়ে প্রতি বৎসর ৩ জন উত্তীর্ণ।

৩. নাটোরে আদিতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠ মধ্য শ্রেণি বাংলা স্কুল ছিল। নাটোরের মুসলমান জমিদার রশিদ এ স্কুলকে মধ্যশ্রেণি ইংরেজিতে পরিণত করেন। তদপর নাটোর মিউনিসিপালিটির সাহায্যে ও যত্নে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ স্কুল উচ্চ শ্রেণিতে পরিণত হইয়া আছে। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নাটোরের মহারাজা গ্রহণ করিয়াছেন। এটি এক্ষণ নাটোর মহারাজার স্কুল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রথম প্রেরিত হয়। এই চতুর্দ্দশ বৎসরে ৫১ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৪৩ জন ছাত্র ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ৭ বৎসরে উত্তীর্ণ। পূর্ব সাত বৎসরে ৮ জন এবং শেষ সাত বৎসরে ৪৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং অনেকে জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মফস্বল স্কুল মধ্যে এই স্কুল হইতেই মুসলমান ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে স্কুলের অবস্থা উন্নত।

৪. নওগাঁতে মহকুমা স্থাপিত হইবার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে গাঁজা অফিসের প্রধান কর্মচারী সবডেপুটি বাবু কৃষ্ণধন বাগচির যত্নে এবং উদ্যোগে একটি উচ্চশ্রেণি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের যত্নে একটি ইস্টক নির্মিত গৃহ প্রস্তুতের উদ্যোগ হইতেছে। স্থাপিত হইবার ২/৩ বৎসর পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরিত হয়। এই ১২/১৩ বৎসরে ২২ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৫. এক বৎসরের অধিক কাল হইল উকিল ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের যত্নে ও উদ্যোগে বোয়ালিয়াতে "বোয়ালিয়া একাডেমী" নামে একটি উচ্চশ্রেণি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে খাজুরা নিবাসী জমিদার বাবু জীবন্তি নাথ খাঁ এক হাজার টাকা দান করিয়া পিতা ভোলানাথ খাঁর নাম চিরস্মরণীয় করেন। অতএব এই বিদ্যালয় "ভোলানাথ একাডেমী" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই সকল উচ্চশ্রেণি ইংরেজি স্কুল ও রাজসাহী কলেজ স্থাপিত হওয়াতে রাজসাহী জেলার উচ্চ শিক্ষা স্রোত অতিবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবার উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাজসাহীবাসীদের নিকট কলিকাতা ১০ দিনের পথ হইতে কয়েক ঘণ্টার পথ হইল। ইহাতে উচ্চ শিক্ষার স্রোত আরো দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সুযোগে রাজা জমিদারগণের সন্তানেরা রাজসাহীকে উপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় আরো উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইবে বলিয়া

কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ দিঘাপতিয়া রাজবংশ। রাজসাহীতে বড় রাজাদিগের মধ্যে দিঘাপতিয়া বংশের কুমারগণ যেরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত রাজসাহীতে কেন অনেক জেলায় অতি বিরল। এখন রাজসাহীতে বি, এ; এম, এ; বি, এল অনেক। তজ্জন্য আমরা রাজসাহীর গৌরব করি না; কিন্তু রাজ সন্তানেরা যে বি, এ ; এম, এ হইতেছেন বা সুশিক্ষিত হইতেছেন, ইহাই রাজসাহীর গৌরব। ইহা হইতে রাজসাহীতে আর একটি গৌরবের স্থল এই যে,— একটি ছাত্র রাজসাহী কলেজ হইতে প্রবেশিকা ও এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করে এবং বি,এ; এম,এ, অতি সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার" হইয়াছেন। ইহার নাম যদুনাথ সরকার; ইহার জন্মস্থান রাজসাহী। ইনি একটি সম্ভ্রান্ত জমিদার সন্তান। তিনি আজ কলেজের অধ্যাপক। আডাম সাহেবের সময় যে রাজসাহী অশিক্ষিত লোকের বাসস্থান বলিয়া পরিচিত হয়, অথচ রাজসাহীবাসীরা বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিল; বিনা যত্নে এবং কালের দুর্বিপাকে সেই রাজসাহীবাসীদের বুদ্ধি লুক্কাইত ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্নে ও সুশাসন বলে এবং রাজানুগ্রহে, আজ সেই বুদ্ধি প্রচার পাইতেছে। ইংরেজিতে না হউক, সংস্কৃতে রাজসাহীর এককালে হীন অবস্থা ছিল না। যে কুল্লুকভট্টকে মহাত্মা স্যর উইলিয়াম জোন্স সাহেব ইউরোপ ও এশিয়ার টীকাকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তাহার জন্মস্থান রাজসাহী প্রদেশ। সেই দিনের কথা মনে করিলে তখন রাজসাহী প্রদেশের কি উন্নত অবস্থা? তখন রাজসাহী পণ্ডিত সমাজ, তখন রাজসাহী সভ্যতার শিরোমণি, তখন রাজসাহী ধর্মস্থান, তখন রাজসাহী আর্য জাতির গৌরব স্থান। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাধিধারীদের জন্য আমরা গৌরব করিতেছি; ইহারা কুল্লুকভট্টের ন্যায় পণ্ডিতগণের সমকক্ষ হইতে পারেন না। যে আর্য সন্তানের নাম ইউরোপ ও এশিয়ায় বিস্তৃত এবং সম্মানিত, তাহার জন্যই আমরা গৌরব করিতে পারি। সেকাল অনেক দিন গত। ইহা কি কালের বিচিত্র গতি না রাজসাহীর ভাগ্যে দোষ? হিন্দু রাজাদের পর হইতে আমাদের ভাগ্য অপ্রসন্ন হয়। দেশ যবনাক্রান্ত হইতেই আর্য জাতির সভ্যতা, পাণ্ডিত্য, ধর্ম ও জ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। মুসলমান রাজ্যের ধ্বংসের পর হইতে আর্য জাতিরা ধীরে ধীরে সভ্যতা, পাণ্ডিত্য ও ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেছেন। পুনরুদ্ধারের প্রধান কারণই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্ন, সুশাসন, দয়া এবং সাহায্য। এ দুর্দিনে কৃপাবান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রক্ষা না করিলে আর্য জাতির উপায়ান্তর নাই।[২৭] এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সংস্কৃত জন্য রাজসাহী গৌরব করিতেন, তাহারই উন্নতি জন্য দয়াবান গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তথাপি রাজসাহীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজ নিজ সন্তানকে ইউরোপীয় শিক্ষা দিবার জন্য লালায়িত। পুরকালে রাজা জমিদারগণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের টোল চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহার্থ ভূমি বা অর্থ যথেষ্ট দান করিতেন। এক্ষণে সে প্রথা প্রায় রহিত। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া দাসত্বের উপযোগী করিবার জন্য নিজ নিজ সন্তানকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতেই অগ্রসর হইতেছেন। ইহাই রাজসাহীর দুর্ভাগ্য।

যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও শিল্প বিদ্যার স্রোত আজ বঙ্গদেশে প্রবাহিত তাহা পুরাকালে ভারতবর্ষীয় আর্যজাতিরা কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলকেই শিক্ষা দিতেন। সেকালে সাধারণ বিজ্ঞান ও শিক্ষা হিন্দুদিগের প্রতি গৃহে শিল্প চর্চা হইত। হিন্দুর গৃহে গৃহে যুবতী সূচিকা ও চিত্রকর; বৃদ্ধ মাতা চিকিৎসক ছিলেন। সেকালে যুবতীরা সংসারের আবশ্যকীয় সূচের কার্য নির্বাহ করিতেন এবং পটাদিও চিত্র করিতে পারিতেন। বালক বালিকাদিগের সামান্য ব্যাধিতে সেকালের মাতা এখনকার কালের বঙ্গদেশের মাতার ন্যায় কথায় কথায় দৌড়িয়া ডাক্তারের বাটিতে যাইতেন না। সামান্য ব্যাধির ঔষধ তাহাদের মুখে এবং পেটরা পুঁটলিতেই থাকিত। ইহা ব্যতীত আর্য স্ত্রীলোকেরা গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রেরও রীতিমত শিক্ষা করিয়াছেন। লীলাবতী ও খনার কথা মনে করিলে এক্ষণকার পুরুষদের লজ্জা হইবে। যে জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প

বিদ্যার চর্চা নাই, সে জাতীর উন্নতির আশা কোথায় এবং সে জাতির শিক্ষাই বা কোথায়? পুরাকালের কথা মনে করিলে আজ আর্য জাতিরা দেশীয় বিজ্ঞান ও শিল্পে মূর্খ। তথাপি দেশীয় শিক্ষা যাহা আছে, তাহা উৎসাহ বিহীনে লুপ্ত প্রায়। দেশীয় শিল্পের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি।

আজি দেশীয় বিজ্ঞান ও শিল্প অভিধানের শব্দের ন্যায় লোকমুখে উচ্চারিত। আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যারই স্রোত ভারতবর্ষে প্রবল বেগে প্রবাহিত। আজিকালি ইউরোপ মহাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং দয়াবান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিয়া ভারতবাসীদের মহোপকার করিতেছেন। বঙ্গদেশে বিস্তর বি.এ; এম. এ; দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার জন্য লালায়িত হইয়াও দাসত্ব পাইতেছেন না। তথাপি নিজ নামের শেষে শুষ্ক বি.এ, এমএ, উপাধি সংযোজিত করিবার জন্য ধন, প্রাণ, মন সমর্পণ করিতেছেন। বিএ, এমএ, পরীক্ষা দিয়া কৃতবিদ্যা হওয়া নিতান্ত ভাল, কিন্তু জীবনযাত্রা নির্বাহ জন্য, সংসারের সমৃদ্ধি লাভের জন্য এবং জাতীয় উন্নতি জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যায় অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দাসত্ব করাই বিদ্যা শিক্ষার মূল, তন্ত্রমন্ত্র হওয়া উচিত নহে। এই সম্বন্ধে আমাদের, মহাত্মা বড়লাট লর্ড কার্জন যাহা বলিয়াছেন, তাহার সেই সারগর্ভ উপদেশে ভারতবাসীদের বিশেষত বঙ্গবাসীদের চৈতন্য হওয়া উচিত।[২৮]

এই বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যার তরঙ্গ সকল দেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ে সকলেই উৎসাহিত হইতেছে। এমন সময়ে শিক্ষিত দেশ হিতৈষী ভদ্র মণ্ডলীর যত্নে এবং রাজসাহী জেলার বোর্ডের সাহায্যে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ১) রামপুর বোয়ালিয়াতে একটি রেশমী স্কুল স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টি "ডায়মন্ড জুবিলী ইন্ডস্ট্রিয়াল স্কুল" নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই বিদ্যালয়ে জেলা বোর্ডের সাহায্য থাকিলেও কার্য নির্বাহিকা একটি সভা আছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান, বোয়ালিয়া মিউনিসিপালটীর চেয়ারম্যান, রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য ভদ্রলোক এ সভার সভ্য। জজের উকিলবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, এই সভার সম্পাদক। তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাহাকে আমি ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এ মহৎ কার্যের উপযুক্ত পাত্রই অক্ষয়বাবু। স্বয়ং কালেক্টর মিঃ নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ; সি, এস, এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়া জনসাধারণের প্রীতির ভাজন হন। যে স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের অধিকার। তিনি এই স্থানের নিজ স্বত্ব দেশ হিতকর বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছেন। রাজসাহীর অন্যান্য মহাত্মারাও এই বিদ্যালয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যে যে মহাত্মা যত টাকা সাহায্য করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। নাটোর মহারাজা— ৫০০০। রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ি বাহাদুর—১৫০০০। রাণী হেমন্তসুন্দরী দেবী—৬০০০। দুবলহাটির রাণীদ্বয় ২০০০। মনোমোহিনী দেবী—৫০০০। চৌগ্রামের রাজা রমণীকান্ত রায়—৫০০। ভুবনমোহন মৈত্র জজের উকিল—৩০০০। এই প্রচুর সাহায্যে ইহা বেশ প্রমাণ হইবে জেলার রাজা জমিদারগণের এই বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য বিশেষ যত্ন আছে। গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ হইতেও এই বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় হইতে গুটিপোকার বীজ প্রস্তুত করা এবং দেশ বিদেশ পাঠান হইতেছে, সূতা রং করা এবং সূতা প্রস্তুত করিয়া মটকার কাপড় বুনন এই সকল কার্য শিক্ষা হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু সীতানাথ গুহ। ইনি কৃষি বিভাগের শিক্ষিত পুরুষ। দুই বৎসর হইল এই বিদ্যালয় স্থাপিত। এই অল্পকাল মধ্যে ইহার যশ ও নাম এত বিস্তৃত হইয়াছে যে এই বিদ্যালয় হইতে গুটিপোকার বীজ জাপান, ইতালী, ইংলন্ড এবং ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে।[২৯] ইহাই বর্তমান রাজসাহীর গৌরব। অক্ষয়বাবু ঠিক বলিয়াছেন যে

বাংলার জেলাগুলি মধ্যে উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত জন্য রাজসাহী একটি প্রসিদ্ধ জেলা ছিল।[২৯] এই গ্রন্থের অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে মহারাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যে বিস্তর রেশম ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ইউরোপীয় বণিকদের দ্বারা দেশ বিদেশে প্রেরিত হইত। এই রেশমের কার্য নির্বাহার্থ কোন ইউরোপীয় যন্ত্র ছিল না, কেবল হস্ত ও দেশীয় যন্ত্র দ্বারা নির্বাহিত হইত। কিন্তু শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধন মানসে অক্ষয়বাবু ইউরোপীয় ও দেশীয় উত্তম যন্ত্র প্রয়োগে রেশম কার্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই নূতন বিদ্যালয়ে রাজসাহীর পুরাতন গৌরবের পুনরুদ্ধারের সূত্রপাত বলিতে হইবে। মহারাণী ভবানীর সময়ের ন্যায় রাজসাহীতে পুনরায় পট্টবস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইলে, রাজসাহীবাসীদের সুখ সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইবে তাহার আর ভুল নাই। সে দিন কি আমাদের ভাগ্যে হইবে? রাজসাহীর রাজা জমিদারগণ অধ্যবসায় ও যত্ন করিলে এবং আবশ্যকীয় অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হইলে, রাজসাহীর সেই শুভদিন অবশ্যই হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের জানা উচিত যে নিম্নশ্রেণির কৃষকেরা তিন টাকায় পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং মধ্য ও উচ্চশ্রেণিয়েরা বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যার গূঢ়তন্ত্রে পটু হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে।[৩০] রাজা ও জমিদারগণ বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত হইলে নিজ প্রজাগণকে ঐ বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহিত করিয়া তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং টেলীমেকসের মেনটরের ন্যায় তাহাদের উপদেষ্টা হইয়া প্রজা হিতকর কার্যে যশলাভ করিতে পারেন। পুরাকালে মনুর বিধানানুসারে রাজাকে কৃষি বিদ্যা, বাণিজ্য ব্যবসা ও শিল্পবিদ্যার গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইত।[৩১] রাজার জ্ঞানের উপর প্রজার সুখ সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই রাজা জমিদারগণের কর্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া ও তাহাদের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ কোষ পূরণ করা রাজা জমিদারগণের কর্তব্য কর্ম নহে। প্রজাকে সমৃদ্ধিশালী করাই রাজা জমিদারগণের কর্তব্য কর্ম। বিহার অঞ্চলের প্রজাহিতৈষী মহামান্য রাজা রামপাল সিংহ এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামের জমিদার রায় পার্বতীশঙ্কর চৌধুরির ন্যায় রাজসাহীর রাজা জমিদার দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের যত্নবান হইলে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

ডাকঘর— নিম্নলিখিত পোষ্ট অফিসগুলি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত।

১	আড়ানী	১৬	ডাঙাপাড়া	৩১	মালঞ্চী
২	ইসলামগাঁতি	১৭	তাহিরপুর	৩২	মাঁদা
৩	ওয়ালীয়া	১৮	অনোর	৩৩	মহাদেবপুর
৪	কলম	১৯	তালন্দ	৩৪	মাধনগর
৫	কাজল	২০	দিঘাপতিয়া	৩৫	রাজাপুর
৬	কাসিমপুর	২১	দি আত্রাই	৩৬	রাণীনগর
৭	কালীগাঁও	২২	দুর্গাপুর	৩৭	লালপুর
৮	কুসুম্বি	২৩	দুবলহাটি	৩৮	লালুর
৯	খাজুরা	২৪	নওহাটা	৩৯	বড়াইগ্রাম
১০	গোপালপুর	২৫	নাটোর	৪০	বাগমারা
১১	গোদাগাড়ি	২৬	নওগাঁও	৪১	বলিহার
১২	ঘোড়ামারা	২৭	পতিসর	৪২	বালুভরা
১৩	চারঘাট	২৮	পাকুড়িয়া	৪৩	বেলঘরিয়া
১৪	চৌগ্রাম	২৯	পাঁজরভাঙা	৪৪	বোয়ালিয়া
১৫	জোয়াড়ী	৩০	পুঁঠিয়া	৪৫	শরদহ
				৪৬	সিঙ্গড়া

গোপালপুর, মালঞ্চী, নাটোর, মাধনগর, আত্রাই, রাণীনগর, এই ছয়টি রেলওয়ে স্টেশন এবং টেলিগ্রাফ অফিস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। ইহা ব্যতীত বোয়ালিয়া, ঘোড়ামারা, নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁঠিয়া ও নওগাঁও প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেন্ট টেলিগ্রাফ আফিস আছে। নাটোর হইতে বোয়ালিয়া ৩০ মাইল এবং সুলতানপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে নওগাঁও ৩ মাইল দূর।

রাস্তা।—রাজসাহীতে অনেক নদী ও বিল থাকায় বোধহয় হিন্দু রাজাগণ সময়ে বাণিজ্য জলপথে চলিত। সুতরাং হিন্দু রাজার সময়ে রাজপথের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মুসলমানদিগের সময়েও রাজপথ অতি বিরল ছিল। রাজসাহীতে মুসলমানদের সময়ের একটা মাত্র রাজবর্ত্ম দেখা যায়। "একটা রাস্তা বর্ধমান হইতে বীরভুমের মধ্য দিয়া করতোয়া কুলস্থ ঘোড়াঘাট হইয়া ব্রহ্মপুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।"[৩২] মহারাণী ভবানীর "জাঙ্গাল" একটা রাজপথ চৌগ্রামের কিছুদুর হইতে ভবানীপুরের পীঠস্থান দিয়া করতোয়া নদী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। মহারাণী ভবানী পুকুর খনন আদি পুণ্য কার্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন, তখন রাজপথ প্রস্তুত জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন বা অর্থব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময় রাজসাহীর অনেক স্থান জলাকীর্ণ থাকায় জলপথে গমনাগমন ভিন্ন রাস্তায় যাতায়াত প্রায় ছিল না। অতএব সে সময়ে রাস্তার প্রয়োজনও কম ছিল। রাজসাহীর বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহাও প্রতীতি হয় যে, বর্তমান দিনাজপুর ও বগুড়া হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে পদ্মা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তর নদ, নদী, বিল, খাল ছিল এবং এখনও আছে। এজন্যই বোধহয় সে সময়ে রাস্তা অল্প মাত্র ছিল। ক্রমে নদ, নদী, বিল খাল মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়া ভূমি উচ্চ হইতেছে; এবং রাস্তারও প্রয়োজন হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে, এখন রাজসাহীতে অনেক রাজপথ। তন্মধ্যে কতকগুলিতে কি বর্ষা কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই গমনাগমন চলে এবং কতকগুলি বর্ষার সময়ে জলাকীর্ণ থাকে। বোয়ালিয়া হইতে শরদহ, চারঘাট, লালপুর, অরণকোলা দিয়া পাবনা পর্যন্ত একটি রাজপথ। বোয়ালিয়া হইতে পুঁঠিয়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া, সিঙ্গড়া ও বগুড়া পর্যন্ত একটি রাজপথ। বোয়ালিয়া হইতে গোদাগাড়ি একটি রাজপথ। এই গোদাগাড়ি হইতে দিনাজপুর একটি রাস্তা; আবার গোদাগাড়ি হইলে মালদহ আর একটি রাস্তা। বোয়ালিয়া হইতে নওটাহা দিয়া নওগাঁও একটি রাস্তা। এই রাজপথগুলি প্রসিদ্ধ।

১ The Sanskrit language is "of a wonderful structure ; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than lether."–*Sir W. Jones*, Asiatic Researchs, Vol. I. p. 422.

২. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত সাহিত্য রত্নাবলী।

৩. "In the parts of Hindoostan when the Mogul System was fully introduced, the use of the Persian language has thrown public business into the hands of Mussulmans and Gayets"–Elphcnistone's History of India.

৪. "The five Northern languages, those of the Punjab, Conouj, Mithila (or North Behar), Bengal and Guzerat are, as we may infer from Mr. Colebrooke, branches of the Sanskrit altered by the mixture of local and foreign words and new inflexions, much as Italian is from Latin" ;–The Elphenistone's History of India, Book III. Chapter V.

৫. "The Ranee Bhowani is stated to have been the founder of all the endowments referred to, and to the mode that she adopted of giving effect to her wishes was to arrange with the collector of the District for a fixed increase of the annual assessment to which her estates were liable, the increase being equal to the various endowments which she established and which were to be paid in perpetuity through the collector. Her estates, it to represented, thus became burdened with a permanent increase of

annual assessment to Government, which increase continues to be paid from the successive holder of the estates to whom they have descended on by whom they have been purchased. While the endowments have been discontinued to the heir and representatives of those on whom they were originally bestowed "—Adam's Report on Education.

৬. কুল্লূটভট্ট গুয়াখারায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মৌনভট্টের বংশসম্ভূত। এই কুল্লূটভট্ট সম্বন্ধে Sir W. Jones বলিয়াছেন :— "At length appeared Kullaka Bhatta, a Brahmin of Bengal. who after a painful course of study, and the collation of numerous manuscripts produced at work, of which it may, perhaps be said very truly, that it is the shortest yet the most luminous, the least ostentatious yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever composed on any author ancient on modern, European or Asiatic."

৭. "Panini the earliest extent writer on its Grammar, is so ancient as to be mixed up with the fabulous ages. His works and those of his successors have established a system of grammar the most complete that ever was employed in arranging the elements of human speech"– Elphenistone's History of India Book III, Chapter V.

৮. "Ramkanto Sarvabhom, a logician and Siva Chandra Sidhanta, a vedantic, both highly reputed and both apparently profound in the branches of learning to which they have devoted themselves"– Mr Adam's Repart on Education

৯. In the District of Beerbhoom, "One teacher now dependent on occasional presents, formerly had an annual allowance of Rs. 100 from the Rani Bhowani which has been discontinued since her death"– Adam's Report on Education

১০. "All were willing to believe and desisous to be assured that Government intended to do something, as the fruit of the present enquiry, for the promotion of learning,– a duty which is in their minds constantly associated with the obligations attaching to the rulers of the country. The humbleness and simplicity of their characters, their dwellings and their apparel, forcibly contrast with the extent of their acquirements and the refinement of their feelings. I saw men not only unpretending, but plain and simple in their manners, and although seldom, if ever offensively course, yet reminding me of the very humblest classes of English and Scotish peasantry living constantly half naked and realizing in this respect descriptions of savage life, inhabiting huts which if we connect moral consequences with physical causes, might be supposed to have the effect of stunting the growth of their minds, or in which only the most contracted minds might be supposed to have room to dwell– and yet several of these men are adepts in the sublities of the profoundest grammar of what is probably the most philosophical language in existence, but only practically skilled in the niceties of its usage, but also in the principles of its structure ; familiar with all the varieties and applications of their national laws and literature and indulging in the obstruesest and most interesting disquisitions in logical and ethical philosophy. They are in general shrewd discriminating and mild in their demeanar."— Adam's Report on Education.

১১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সাহিত্য রত্নাবলী"-র—১০.

১২. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সাহিত্য রত্নাবলী।"

১৩. Mr. Adam's Report on Education.

১৪ Mr. William Adam's first step was "to know with all atainable accuracy the present state of instruction in the native institutions and native society."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

১৫. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

১৬ "The Persian Schools in Nattore are four in number containing twenty-three scholars,

who enter school at an age varying from twelve to seventeen. The whole time stated to be spent at school varies from four to eight years. The teachers intellectually are of a higher grade than the teachers of Bengali Schools, although that grade is not high compared with what is to be desired and is attainable. Morally, they appear to have as little notice as Bengali teachers of the Salutary influence they might exercise on the disposition and characters of their pupils." — Mr. Adam's Report on Education

১৭. "On the whole, the course of Persian instruction has a more comprehensive character and a more liberal tendency than that persued in the Bengali schools."— Mr. Adam's Report on Education

১৮. The number of principal zemindars in the District is about fifty or sixty of whom more than a half are females and widows Of these, two viz., Ranees Sarjamani and Kamalmoni Dasi are alleged to passess a competent knowledge of Bengali writing and accounts, while some of the rest are more imperfectly instructed and otehrs are wholly ignorant "— Mr. Adam's Report on Education

১৯. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

২০. বর্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত শিতলাই গ্রামে ইহার নিবাস। রাজসাহী জেলায় ইহার অনেক জমিদারি আছে।

২১. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

২২. ভারতবর্ষের ইতিহাস।

২৩. "My own division is peculiarly the land of the mases"— Education Report far 1865-66

২৪ "Here accordingly the pathsalas are attended by a smaller percentage of the middle clsases than in other districts The teachers of these pathsalas therefore are not called upon to teach their pupils the vernacular scholarship course, or any thing beyond the there Rs. There are exceptions here and there, but the above is the rule. Where exceptions have occured, as in the Nattor and Boalea circles, they have been owing to the care taken of the pathsalas by the Deputy-Inspectors in providing them with patrons in the persons of well-to-do Talukdars and Tradesmen secured such patronage, the gurus generally endeavour to teach higher than where such patronage is wanting. Indeed it seems to be a point pretty well established in the history of educational administration, that patronage, whether of Government, or of wealthy and influential individuals has in all countries a tendency to raise the standard of Education in Primary Schools."— General Report on Public Instruction far 1871–72.

২৫. "Our nation has been debased by continuous alien rule and can only look up to a paternal Government such as ours for help and guidance."– The Indian Empire, December 26th 1899.

২৬. It is a good thing to be a scholar; but it is on the whole, a more important thing to be able to succeed in the battle of life, than it is to attach the initials B.A. to one's name."— The Viceroy's reply to the Gwalior" Maharaja's Speech, on the occassion of the opening of the New college and Hospital at Gwalior,— 1st December 1899; Quoted from the "Month" Vol. I.

২৭. ম্যাজিস্ট্রেটের এডমিনিসস্ট্রেসন রিপোর্টে "জানুয়ারী ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে" লিখিত আছে : কিন্তু অক্ষয়বাবু "ডাইরেক্টর অব পবলিক ইনস্ট্রাকসন" নিকট ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে পত্র লিখেন, তাহাতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কার্যারম্ভ লিখিত আছে।

২৮. "The Sericultural School at Rampare Boalea supplied cocoon seed to Japan, Italy, England and to several places in India. A cocoon rear room has been constructed and arrangements are being made for building workshop"— The Indian Empire December 26the 1899.

২৯. Rajshahye has looked upon in the last century as one of the best silk-producing districts of Bengal. The silk industry, in those days represented rearing of silk-warms, reeling, bleaching, dyeing and weaving of silk fibre and printing of silk fabrics,— all carried on as handicrafts under the system of the rule of thumb"— A letter dated the 5the February 1900 froms Babu Akshoy Kumar Maitra B.L., to A Pedler Esq. F.R S, director Public Instruction, Bengal.

৩০. "The masses should be taught the three R's, and the middle and upper classes should be well grounded upon the mysteries of the science and arts to benefit them to act as monitars and guides of the all and sundry". The Indian Empire, December 26th 1899

৩১ "From the people he is to learn the theory of agriculture, commerce and other practical arts"— Elphinstone's History of India, Book 1,

৩২ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত বাংলার ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূসম্পত্তি

রাজসাহীর জেলার ভূসম্পত্তি প্রধানত পাঁচ প্রকার যথা ঃ—

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি।

(২) গবর্ণমেণ্ট খাস মহাল।

(৩) নিষ্কর ভূমি।

(৪) যে সকল ভূসম্পত্তির নির্দিষ্ট কর জমিদারকে দেওয়া হয়।

(৫) কম-বেশি শর্তের ভূসম্পত্তি।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি, (২) গবর্ণমেণ্ট খাসমহাল—১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এইরূপ জমিদারির বা স্টেটের সংখ্যা ১৭১৭ ছিল। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী স্টেট ১৫৪১, অচিরস্থায়ী বন্দোবস্তী স্টেট ২৩ এবং খাসমহাল ২৬, মোট স্টেটের সংখ্যা ১৫৯০। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি খারিজা তালুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বে কোন কোনও পরগণা হইতে কোন কোন জমিদার কোন ডিহি বা গ্রাম খারিজ করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়ায় খারিজা তালুকের সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব না পাওয়ায় লোকসানি মহাল বলিয়া, যে সকল ভূসম্পত্তি নিলাম করিলেও অন্য কেহ ক্রয় না করে, গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজ তহশীল ভুক্ত করিয়া রাখেন। ঐ সকল ভূসম্পত্তির জমিদার নিজ গবর্ণমেণ্ট। নদীর গর্ভ হইতে যে সকল চরের উৎপত্তি হয়, সেই সকল ভূসম্পত্তিই প্রকৃত খাসমহাল। এপ্রকার স্টেট অল্প ও ক্ষুদ্র।

(৩) নিষ্কর ভূমি—১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে নিষ্কর ভূমির সংখ্যা ১৮৩৭। এইরূপ ভূসম্পত্তি দশ প্রকার যথা :— (ক) আয়মা, (খ) মদৎমাস, (গ) দেবোত্তর, (ঘ) ব্রহ্মোত্তর, (ঙ) পীরপাল, (চ) মহাত্রাণ, (ছ) ভোগোত্তর, (জ) চাকরাণভূমি, (ঝ) হেবা, (ঞ) জায়গির। এই নিষ্কর ভূমি ধর্মার্থ এবং ব্যক্তি বিশেষের বা বংশ বিশেষের উপকারার্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব এবং কতকগুলি পরে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি হিন্দু প্রদত্ত এবং কতকগুলি মুসলমান প্রদত্ত। লালপুর ও নাটোর থানার অন্তর্গত মুসলমান প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিই বেশি।

(ক) আয়মা—আয়মা ভূমি নিষ্কর অথবা সামান্য কর গ্রহণে মৌলবি অথবা ধার্মিক মুসলমানকে অথবা কোন ধর্মার্থ অথবা দরিদ্রের উপকার জন্য মোঘল সম্রাটেরা দান করিয়া যান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় হইতেও মুসলমানেরা ঐ মোঘল সম্রাট প্রদত্ত আয়মা ভূমি ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। রাজসাহীতে বাঘার আয়মা ভূমিই বৃহৎ। এই আয়মা ভূমি মোঘল সম্রাট সাহাজাহান প্রদত্ত। বাঘার খোন্দকারের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে।

(গ) দেবোত্তর— এই নিষ্কর ভূমি হিন্দুদের দেবতাদিগের সেবার জন্য প্রদত্ত।

(ঘ) ব্রহ্মোত্তর— এই নিষ্কর ভূমি ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালন জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঙ) পীরপাল— পীরপাল ভূমির প্রায় মুসলমান গ্রামেই আছে। পীরের দরগা, মসজিদ আদি রক্ষা জন্য এই পীরপাল ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে হিন্দু জমিদারেরা দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর ও মহাত্রাণ ভূমি হিন্দুদিগকে দান করেন এবং আর কতকগুলি মোঘল সম্রাট প্রদত্ত। নাটোর রাজবংশের দানশীলা মহারাণী ভবানী দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর আদি ভূমি বিস্তর দান করিয়া যান। রাজসাহী প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের অল্প বিস্তর কিছু ব্রহ্মোত্তর ভূমি নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ অতি বিরল। প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারা ক্ষত্রিয় ও কায়স্থকে যে ভূমি দান করিতেন তাহাকে "মহত্মারণ" বলিত। "মহত্মারণ" শব্দের অপভ্রংশে "মহাত্রাণ" প্রচলিত হয়।

(চ), (ছ) **ভোগোত্তর ও মহাত্রাণ**— এই নিষ্কর ভূমি স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং সম্মানিত ভদ্রলোকদিগের প্রতিপালন জন্য জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত। মহাত্রাণ ভূমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে পারা যায়; কিন্তু ভোগোত্তর ভূমি ব্যক্তিগত এবং যে ব্যক্তিকে দেওয়া হয় সে তাহার জীবন পর্যন্ত ভোগ দখল করিতে পারে।

(জ) **চাকরাণ ভূমি**— পাইক, সরদার, নাপিত, খানসামা প্রভৃতির কার্য জন্য বেতন না দিয়া নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তিকে যে কার্যের জন্য নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়, সে ব্যক্তি সে কার্য না করিলে, অপর ব্যক্তিকে এই ভূমি প্রদানে সেই কার্য করাইয়া লওয়া হয়। ভূমির আদর ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় এই প্রথা ক্রমে রহিত করিয়া জমিদারেরা বেতনভোগী চাকর রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

(৪) **যে সকল ভূসম্পত্তির নির্দিষ্ট রাজস্ব জমিদারকে দেওয়া হয়**— এইরূপ ভূসম্পত্তি ১৭ প্রকার। যথা :— (১) পত্তনি, (২) দরপত্তনি, (৩) দরাদর পত্তনি, (৪) দবদীরাদীর পত্তনি, (৫) ছো-পত্তনি, (৬) সিকিমী তালুক বা জোত, (৭) কায়েমি জোত, (৮) মৌরসী জোত, (৯) মোকররী জোত, (১০) মৎ কদমী জোত, (১১) ইস্তীমুরারী জোত, (১২) পূর্বোক্ত ছয় প্রকার জোতের দরজোত স্বত্ব, (১৩) মৌরসী ইজারী, (১৪) দরমৌসী ইজারা, (১৫) চক জমা, (১৬) দরচক জমা, (১৭) রাইতওয়ারী। এই প্রকার ভূমি মধ্যে পত্তনি তালুক শ্রেষ্ঠ। পত্তনি তালুক জমিদারির মতই, কিন্তু পত্তনির রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে না দিয়া জমিদারকে দিতে হয় এবং রাজস্ব বাকির জন্য নিলাম হইলে পত্তনি স্বত্বের লোপ পাইতে পারে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অতি অল্প পত্তনি তালুক রাজসাহীতে ছিল। ১৮১৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হওয়ার পর হইতে রাজসাহীতে অনেক পত্তনি তালুকের সৃষ্টি হয়। সিকিমী, কায়েমি, মৌরসী প্রভৃতি ভূসম্পত্তির অধিকারীরা এক নির্দিষ্ট জমায় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিয়া থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে এই রূপ ভূসম্পত্তির সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকাল এক জমায় ভোগ দখল শর্তে "রাইতওয়ারী" ভূসম্পত্তির জমা বৃদ্ধি না হইয়া কৃষক শ্রেণির লোকেরা স্বভাবতঃ দখল করিয়া থাকে।

(৫) **কমি বেশি শর্তের ভূসম্পত্তি**— এরূপ ভূসম্পত্তির রাজস্ব চিরকাল এক হারে আদায় হয় না। রাজস্ব কখন বেশি কখন কমি হয়। এরূপ সম্পত্তি নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত :—

(১) **ইজারা**— কায়েমি স্বত্ববান মালেক নিজ স্বত্ব কিছু দিনের জন্য অন্য বক্তিকে কোন নির্দিষ্ট জমায় অধিকার দেয়। সেই কাল অতীত হইলে পূর্ব জমায় বা বেশি জমায় বা কমি জমায় পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারে। ইহাকে মেয়াদী ইজারাই বলিয়া থাকে।

(২) **দর-ইজারা**— ইজারদারের অধীন যে ইজারা তাহাকে দর হইজারা বলে।

(৩) **দরাদর ইজারা**— দর-ইজারদারের অধীন যে ইজারা তাহাকে দরাদর ইজারা বলে।

(৪) **জেম্মাদারী**— কিছু কালের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট নির্ধারিত জমার জেম্মা রাখাকে জেম্মাদারী বলে।

(৫) **দখিলকারী স্বত্ব**— কৃষকেরা বহুকাল দখল ভোগ করাতে জমির স্বত্ব তাহাদিগের প্রতি বর্তে। এই স্বত্বযুক্ত ভূমি রাজসাহীতে অধিক। সাধারণত ইহা হস্তান্তর করা যায় না। কোন কোন

জমিদার হস্তান্তরে বাধা দেয় না এবং কোন কোন জমিদার বাধা দেয়। ইহার অধীন প্রজাকে "কোরফা" প্রজা বলে। "কোরফা" প্রজার স্বত্ব নিতান্ত দুর্বল।

(৬) **মিয়াদী পাট্টা**—নির্দিষ্টকালের জন্য নিজ স্বত্ব পাট্টা করিয়া দেওয়া।

(৭) **জমিদারের ইচ্ছানুরূপ প্রজা**— জমিদার ইচ্ছা করিলে জমি ছাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু দখিলকারী স্বত্বাধিকারকে জমির দখল হইতে জমিদার ইচ্ছানুরূপ উচ্ছেদ করিতে পারে না। কিন্তু জমার কোন তারতম্য নাই।

(৮) **হুজরী জোত**—এইরূপ জোতের খাজানা-তহশীলদার বা গোমস্তাকে না দিয়া একবারে জমিদারের নিকট দাখিল করে।

(৯) **আধি বা বর্গা**— জমিব উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক যাহার যে জমি সে পায় এবং অপরার্ধ যে জমি চাষ ও বুনানী করে সে পায়।

(১০) **খাসখামার বা নিজ জোত**— নীলের কুঠীয়াল সাহেবেরা জমিদারের নিকট মহাল ইজারা লইযা ইজারার সময় এই প্রকার জোত (১) সৃষ্টি করে। লস্করপুর পরগণায় এইরূপ জোতই প্রায় দেখা যায়।

রাজসাহীতে কমি বেশি শর্তের সম্পত্তিই বেশি। যদিচ সময় সময় জরিপ জমাবন্দি করিয়া জমিদার প্রজার নিকট হইতে বৃদ্ধি হারে কর আদায় করিয়া থাকে, তথাপি কমি বেশি শর্তের ভূসম্পত্তির লাভ বেশি এবং কৃষকেরা এইক্ষণে বহুত্তর নজর দিয়া জমিদারের নিকট জোত পত্তন হইতেছে। জমিদারি অপেক্ষা এইরূপ ভূসম্পত্তিতে লাভ বেশি, যেহেতু এক বিঘা জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা জমিদারের রাজস্বের এক বিংশতি অংশেরও কম, অথচ কাহার সহিত বিবাদ বা কলহ করিতে হয় না। কৃষকদিগের পক্ষে এইরূপ ভূসম্পত্তি যেরূপ লাভজনক, ভদ্রলোকদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। আবাব ভদ্রলোকদিগের জমিদারের নিকট অপমান সহ্য করিতে হয়। আজিকালি রাজসাহীতে অনেক অর্থলাভ অপেক্ষা অপমান লঘু জ্ঞান করে। ইহা অশিক্ষিত ভদ্রলোকদের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

"নিজ জোতের প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থ, নিজের আবাদি ভূমি। কিন্তু কৃষকেরা নীলকবদিগের সম্বন্ধে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিত। তাহারা বলিত যে, প্রজার চতুর্দ্দশ পুরুষের ভোগের ভূমি, যদি নীল উৎপন্নের যোগ্য হয়, তবে সেই ভূমি নীলকরদিগের 'নিজ জোত' এবং তাহার অন্য লিখিত দলিল না থাকিলেও, নীল বৃক্ষের মূল ও নীলের চারাই আদালতে গ্রাহ্য অমোঘ দলিল।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় কৃত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজসাহী রাজ্য শাসন ও রাজস্ব

রাজসাহী প্রদেশ মৎস্য দেশের অন্তর্গত। এই মৎস্য দেশের রাজা বিরাট ছিলেন। তাহার রাজধানী বিরাটনগর, উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে স্টেশন পাঁচবিবি হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূর। এই নগরে বাস করিয়া, মহারাজ বিরাট স্বীয় শ্যালক সেনাপতি বলবান কীচকের সাহায্যে মৎস্য দেশান্তর্গত রাজসাহী প্রদেশের কেবল যে কর গ্রহণ করিতেন এমত নহে; রথযূথপতি বলবান ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার রাজ্যে, মৎস্যবাজ বিরাট সেই সেনাপতি কীচকের বাহুবলে বারংবার নানা প্রকার উৎপাত করিতেন। যে সময় বিরাট নগরে পঞ্চপাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাস করেন, সেই সময় কীচক দ্রৌপদীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সেই ললনার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করাতে মহাবীর ভীমসেন সেই ক্রূর-স্বভাব নিষ্ঠুর পাপাত্মাকে বধ করেন। কীচকের নিধন বার্তা শ্রবণে সুশর্মা সসৈন্যে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন। কেবল পাণ্ডবগণের বাহুবলেই মৎস্যদেশাধিপতি মহারাজ বিবাট উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়া গো-ধন রক্ষা করেন এবং নিজ মঙ্গল লাভ করেন। সেই অবধি বিরাটরাজ পাণ্ডবগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বিরাট রাজার সময় হইতে সেই বংশীয় রাজাদিগের সময় পর্যন্ত যে হিন্দু-রাজগণ রাজসাহী প্রদেশের কব গ্রহণ করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করার পর হইতে বঙ্গদেশ মুসলমান রাজার অধিকৃত হয়। এই সময় হইতে মুসলমান সম্রাটেরা রাজা জমিদারগণকে শাসনাধীন রাখিয়া রাজসাহীর কর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে একজন হিন্দু রাজা গণেশ[১] বা কংস বাংলার অধিপতি হন এবং ৯/১০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পুত্র জিতমল মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া জেলালুদ্দিন মহাম্মদ সা নাম ধারণ করেন।[২] রাজা গণেশ বা কংস এবং তাহার পুত্র ও পৌত্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহাদের রাজ্য করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুনরায় বঙ্গদেশ মুসলমানদের অধীন হইল। আকবরের সময়ে রাজা তোড়লমল্ল "ওয়াশীল তুমার জমা" নামক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবে বঙ্গভূমি ১৯ সরকারে ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত হয়। এই সময় হইতে বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের কিয়ৎ পরিমাণে সুবন্দোবস্ত হয়। আবার আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ "বারো ভুঁইয়া" নামক জমিদারেরা অতি পরাক্রমশালী ছিল। এই "বারো ভুঁইয়া" মধ্যে শাঁতুল, তাহিরপুর ও পুঁঠিয়া রাজগণ রাজসাহী অন্তর্গত ছিল। ইহাদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। ইহাদের সৈন্য, গড় আদি ছিল। ইহারা মোঘল সম্রাটকে কর দিতেন।

১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে শোভা সিংহ নামক বর্ধমানের জনৈক জমিদার রহিম খাঁ নামক এক পাঠানের সহিত একত্রিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং হুগলি অধিকার করেন। এই সুযোগে ইংরাজেরা "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক দুর্গ নির্মাণ করিবার ছল পান। শোভা সিংহ শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। রহিম খাঁকে দমন করিবার জন্য আরঙ্গজীবের পৌত্র আজিমওষান, ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার হন। রহিম পরাজিত ও নিহত হইলে বাংলায় শান্তি স্থাপিত হইল। এদিকে ইংরাজেরা ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে আজিমওষানের নিকট হইতে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সূতানুটি ক্রয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবার সূত্রপাত করিলেন। সেই আজিমওষানের শাসন কালে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বা জাফর খাঁ নামক এক ব্যক্তি বাংলার দেওয়ান

ছিলেন। মুরশিদ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুরশিদকুলি খাঁ নাম ধারণ করেন এবং স্বীয় কার্যদক্ষতার গুণে আরঙ্গজীবের প্রিয়পাত্র হন। এই মুরশিদকুলি খাঁ কৌশলেই রাজধানী ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে উঠিয়া আইসে। অবশেষে সম্রাট ফেরকসিয়রের সময় সেই মুরিশদ বাংলার সুবাদার হন।

নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন প্রথমত পুঁঠিয়া রাজসংসারে সামান্য কর্মে নিযুক্ত হন। পরে পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাহাক পুঁঠিয়ার রাজসরকারে উকিল নিযুক্ত করিয়া প্রথমে ঢাকায় তদপরে মুরশিদাবাদে নবাবদরবারে পাঠাইয়া দেন। মুরশিদাবাদে নবাবদরবারে রঘুনন্দন স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ক্রমে "নায়েব কানুনগোর" পদ এবং "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় রঘুনন্দন মুরশিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া তাহার অনুগ্রহে অনেক জমিদারি লাভ করেন। তাহার সমস্ত জমিদারি তাহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে গৃহীত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও অন্যান্যা ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যবিস্তার ছলে রত্নপ্রসবিণী ভারত ভূমিকে অধিকার করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিতেছিলেন। এই সময় আরঙ্গজীবের পৌত্র আজিমওষান বাংলার শাসনকর্তা হইলেও, মুরশিদকুলি খাঁ বাংলার প্রকৃত কর্তা ছিলেন। তখন মুরশিদাবাদে তাহার রাজধানী। তাহারই দৌহিদ্র সৈয়দ রেজা খাঁ বাংলায় দেওয়ানি করিতেন। ইহাদের দুই জনেরই অযথা অত্যাচারে হিন্দু জমিদারগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লজ্জা, অপমান ও কষ্টে জমিদারগণ নিজ নিজ মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজসাহীর জমিদার রাজা উদিত (উদয়) নারায়ণ নিজ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন।

রাজা উদিত (উদয়) নারায়ণ রায় মুরশিদাবাদের বড় নগরের নিকটস্থ বিনোদলালা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উদিতনারায়ণকে কেহ কায়স্থ কেহ ব্রাহ্মণ বংশীয় বলেন। যে সময় মুরশিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব হইয়া মুরশিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় উদিত নারায়ণের প্রতি এক অতি বিস্তীর্ণ জমিদাবি শাসনের ভার ছিল। সমগ্র রাজসাহী চাকলা তাহার দ্বারা শাসিত হইত। তাহার জমিদারি পদ্মা নদীর উভয় পারে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুরশিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, পাবনা জেলার অধিবাসীগণ ও রঙ্পুর ও দিনাজপুর জেলার কতক অধিবাসী তাহাকে রাজস্ব প্রদান করিত। তাহার সমস্ত জমিদারির নাম বাজসাহী। বহু বিস্তৃত জমিদারি বিনা গোলযোগে শাসন করায় এবং সুচারুরূপে শাসন কার্য নির্বাহ করায়, নবাব মুরশিদকুলি খাঁ তাহার প্রতি প্রথমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহার প্রতি নবাব এইরূপ কিছুদিন সন্তুষ্ট ছিলেন। চিরকাল কাহার সমান যায় না। উদিতনারায়ণের ভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাহার সৌভাগ্যের ক্রমেই হ্রাস দৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশেষে বাংলা ১১২০ সাল অর্থাৎ ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহীর জমিদার উদিতনারায়ণ নবাবের কর্মচারীগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নিজ অনুচরবর্গ সমবেত করিয়া বিদ্রোহী হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুলতান-বার পর্বতে প্রস্থান করেন। নাটোর বংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন তাহাকে ধৃত করিয়া বন্দি করিয়া আনিলে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাহার ভ্রাতা রামজীবনকে সমগ্র রাজসাহীর জমিদারি প্রদান করা হয়।[৩]

রামজীবন এই বিস্তৃত জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া ছাইভাঙা বিল বেষ্টিত নাটোরে গ্রামে চৌকি বা পরিখা খনন করিয়া নিজ রাজধানী স্থাপিত করিলেন। সম্ভবত ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে সমগ্র রাজসাহী নাটোর বংশোদ্ভব রাজাদের অধিকৃত হয়। আরঙ্গজীবের সময়ই বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া বঙ্গদেশে অরাজকতা দেখা দিল। এই সময় নবাব আলিবর্দি মোঘল সম্রাটকে কর প্রদানের তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন এবং জমিদারগণও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলিবর্দির পর সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলেন। আবার সিরাজদ্দৌলার

অধঃপতনের পর, জমিদারগণ ইংরেজদের হস্তে পতিত হইলেন। সে সময় রাজসাহীর রাজ্য মহারাণী ভবানীর হস্তে ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলার শাসন ভারগ্রহণ করিলে, রাজসাহী ইংরাজ শাসনের অধীন থাকিয়া নাটোর রাজাদের অধিকৃত ছিল। এই সময় হইতে এবং পরে অনেক বৎসর পর্যন্ত সমগ্র রাজসাহী জমিদারি এক ব্যক্তির হস্তে ছিল এবং সেই ব্যক্তি কেবল ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব দিবার জন্য দায়ী ছিলেন। ১৭৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দেও রাজসাহী বিখ্যাতা মহারাণী ভবানীর হস্তে অর্জিত ছিল। তিনি ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে বার্ষিক সিক্কা ২,২৮৫, ৬৪৯ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। মহারাণী ভবানী ক্রমে রাজস্বের অনেক টাকা বাকি করিলেন।[৪] কিছুদিন গবর্ণমেন্ট সেই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া খাসে কর আদায় করিতে লাগিলেন অথবা রাজস্ব আদায় জন্য ব্যক্তি বিশেষকে চুক্তি করিয়া ছিলেন। এই প্রণালী অবলম্বণে রাজস্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। অবশেষে রাণী তাহার পোষ্য পুত্র রাজা রামকৃষ্ণকে সমুদয় জমিদারি অর্পণ করিলেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তের সময় রাজা রামকৃষ্ণ সমুদয় রাজসাহী রাজ্য সিক্কা ২,৩২৮,১০১ টাকা জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাজার অধীনস্থ তালুকদারেরা স্বাধীনভাব অবলম্বন করিল এবং রাজাকে রাজস্ব না দিয়া গবর্ণমেন্টের খাজানা-খানায় একবারে রাজস্ব দিতে লাগিল। ইহাতে এই ফল হইল যে ১৮০০-১৮০১ খ্রিস্টাব্দে জেলায় সর্বশুদ্ধ ১৬০৩ ভিন্ন ভিন্ন জমিদার হইল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পদ্মানদীর দক্ষিণ ভাগে নিজ রাজসাহী নামক স্থান মুরশিদাবাদ ও অন্যান্য জেলার সামিল হওয়ায় রাজসাহী জেলার রাজস্ব কমিয়া সিক্কা ১,৪৭১,৪৫০ টাকা হয়। ১৮৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী জেলার তৌজিভুক্ত ৪৫৫০ জমিদার এবং তালুকদার সিক্কা ১,১৭৬,৫১৬ টাকা জমায় ১৮১৩ সংখ্যক জমিদারি বা স্টেট দখল করেন। জেলার আয়তন কমিয়া যাওয়ায় ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে তৌজি ভুক্ত জমিদারি বা স্টেট ১৮১৩ স্থানে ১৭২১ হয় এবং রাজস্ব ১,০২৯,০৩১ টাকা স্থির হয়। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে গবর্ণমেন্ট রাজস্ব পথকর সমেত ১২০২১৪২ টাকা ছিল।

সময় সময় জেলার আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াতে রাজস্বেরও কমিবেশি হইয়াছে। যে রাজসাহী প্রদেশ এক ব্যক্তির হস্তে ছিল, সেই রাজসাহীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর তালুকদারের হস্তে অর্জিত হওয়াতে প্রজার কর ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে দরিদ্র প্রজার রক্ত-শোষণ করিয়া তালুকদারদিগেরই পুষ্টিলাভ হইতেছে।

রাজসাহী জেলা পরগণা অনুসারে বিভক্ত হইয়া,পরগণা বা তদন্তর্গত ডিহি, প্রত্যেক জমিদার বা তালুকদারের হস্তে অর্পিত হয়। সেই জমিদার বা তালুকদার জেলার কালেক্টরিতে নিজ নিজ রাজস্ব কিস্তি মত দিতে আরম্ভ করিলেন। জেলার আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ায় পরগণার সংখ্যাও কমিবেশি হইয়া থাকে। ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে রাজসাহী জেলা নিম্ন ৪৮ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ছিল।[৫]

(১) **আমরুল** : আয়তন ৬৪,৪৯৯ একর অথবা ১০০.৭৮ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ৫ ডিহি যথা— (১) ব্রজপুর ও ভাগসুন্দর (জমিদার কাসিমবাজারের রাজা, পত্তনীদার মোহিনীমোহন রায়), (২) রাম-রামা (বর্তমানে নাটোর রাজা ছোটতরফ), (৩) সেবকোল (নাটোর মহারাজা বড়তরফ), (৪) বিশা (ফরাশডাঙা গুদলপাড়া নিবাসী জমিদার), (৫) বাঁকা (সন্তোষের জমিদার)। এই পরগণায় ৪৯ স্টেট।

(২) **বাজুরাস** : আয়তন ৮৮৮৫ একর অথবা ১২.৬৩ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ৫ স্টেট।

(৩) **বাজুরাস-মহবৎপুর** : আয়তন ৫৫২৪ একর অথবা ৮.৬৩ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ১৪ স্টেট।

(৪) **বলিহার** : আয়তন ১৮০১৩ একর অথবা ২৮.১৫ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৮ স্টেট। জমিদার বলিহারের রাজা।

(৫) **বান্দাইঘাড়া** : আয়তন ৯৯৩২ একর অথবা ১৫.৫২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪ টেস্ট। জমিদার মহাদেবপুরের জমিদারগণ ও কাসিমপুরের রায় বাহাদুর জমিদার প্রভৃতি।

(৬) **বনগাঁও জায়গির** : আয়তন ১৪,২৪৭ একর অথবা ২২.২৬ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬ টেস্ট।

(৭) **বনগাঁও খালসা** : আয়তন ৩৩,৯৩২ একর অথবা ৫৩.০২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২২ টেস্ট।

(৮) **বারবকপুর** : আয়তন ৬৩,৭৪৭ একর অথবা ৯৯.৬০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩৯ স্টেট। কোন কোন গ্রামে গাঁজা জন্মে। জমিদার দুবলহাটির রাজা।

(৯) **বড়বড়িয়া** : আয়তন ৫৭১৩ একর অথবা ৮.৯৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬ স্টেট। জমিদার করচমাড়িয়ার সরকার প্রভৃতি।

(১০) **তপে বিয়াস** : আয়তন ৭৬০৫৪ একর অথবা ১১৮.৮৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৭৮ স্টেট।

(১১) **চাঁদলাই** : আয়তন ৫৯,৯১৭ একর অথবা ৯৩.৬২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫৮ স্টেট।

(১২) **তপ্পে চাঁপিলা** : আয়তন ২৪৯,৪৯৯ একর অথবা ৩৮৯.৮৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৯৫ স্টেট।

(১৩) **চৌগাঁও** : আয়তন ২৯,৪৮৭ একর অথবা ৪৬.০৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬৫ স্টেট। জমিদার রমণীকান্ত রায় বি,এ।

(১৪) **চীনাসো** : আয়তন ১৩১৮৫ একর অথবা ২০.৬০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩৭ স্টেট।

(১৫) **ছিণ্ডাবাজু** : আয়তন ১৯,৬৪৩ একর অথবা ৩০.৬৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৮ মৌজা।

(১৬) **দক্ষিণ জোয়াড়** : আয়তন ১৩০৮৭ একর অথবা ২০.৪৫ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১৫ স্টেট।

(১৭) **ধামীন** : আয়তন ২৪১৯৮ একর অথবা ৩৭.৮১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪৩ স্টেট।

(১৮) **দিঘা** : আয়তন ১৭,৫২৬ একর অথবা ২৭.৩৮ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৩ স্টেট।

(১৯) **গঙ্গারামপুর** : আয়তন ৭০৮২ একর অথবা ১১.০৬ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২০ স্টেট।

(২০) **গয়াহাটা** : আয়তন ৬৬১০ একর অথবা ১০.৩৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১১ স্টেট।

(২১) **গোপীনাথপুর** : আয়তন ৫৯২৭ একর অথবা ৯.২৬ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩৬ স্টেট।

(২২) **গোরের হাট বা গরের হাট** : আয়তন ৩৭,২৭৬ একর অথবা ৫৮.২৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪৩ মৌজা।

(২৩) **গোবিন্দপুর** : আয়তন ৪৬,৩৩০ একর অথবা ৭২.৩৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫২ স্টেট।

(২৪) **হাণ্ডিয়াল** : আয়তন ১৩,৪১৬ একর অথবা ২০.৯৬ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫ স্টেট।

(২৫) **হুসুরপুর** : আয়তন ১৫,২২৯ একর অথবা ২৩.৮০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৪ স্টেট।

(২৬) **ইছলামপুর** : আয়তন ১৬২৭ একর অথবা ২.৫৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫ স্টেট।

(২৭) **জাহাঙ্গিরাবাদ** : আয়তন ১৮৪ একর অথবা .২৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১ স্টেট মাত্র।

(২৮) **জিয়াসিন্ধ** : আয়তন ৭৬৬১২ একর অথবা ১১৯.৭০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২০ স্টেট।

(২৯) **কালীগাঁও** : আয়তন ৪১১০৫ একর অথবা ৬৪.২২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৫ স্টেট।

(৩০) **কালীগাঁও কালীসপা** : আয়তন ৫২৩৫৭ একর অথবা ৮১.৮১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৪ স্টেট।

(৩১) **কাসিমপুর** : আয়তন ৪৪৮২ একর অথবা ৭.০০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩ স্টেট।

(৩২) **কাটার মহল** : আয়তন ১৩০৭১৪ একর অথবা ২০৪.২৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১৮০ স্টেট।

(৩৩) **কাজিহাটা** : আয়তন ১৮৭৬২ একর অথবা ২৯.৩২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬ স্টেট।

(৩৪) **খাসতালুক** : আয়তন ৪৪০০ একর অথবা ৬.৮৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২ স্টেট।

(৩৫) **তপ্পে কুসুম্বি** : আয়তন ২৪৪৭৯ একর অথবা ৩৮.২৫ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩৭ স্টেট।

(৩৬) **লস্করপুর** : আয়তন ২৭৯,৯৬৪ একর অথবা ৪৬৫.৪২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৯৯ স্টেট।

(৩৭) **মালঞ্চী** : আয়তন ৬৭৪৪ একর অথবা ১০.৫৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৩ স্টেট।

(৩৮) **মেহমনসাহী** : আয়তন ৭০৩৫ একর অথবা ১০.৯৯ বর্গমাইল।

(৩৯) **মুহাম্মদপুর** : আয়তন ৪১,৪৯১ একর এথবা ৬৪.৯৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫৬ স্টেট।

(৪০) **নিজামপুর** : আয়তন ১২৫ একর অথবা .২০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২ স্টেট।

(৪১) **প্রতাপবাজু** : আয়তন ১৯২৭০ একর অথবা ৩০.১১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২ স্টেট।

(৪২) **রোকনপুর** : আয়তন ৪৮২৪০ একর অথবা ৭৫.৩৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২ স্টেট।

(৪৩) **শীরশাবাদ** : আয়তন ৫৫৬ একর অথবা .৮৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১ স্টেট।

(৪৪) **সোনাবাজু** : আয়তন ১১৫৩৮০ একর অথবা ১৮০.২৮ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৮৯ স্টেট।

(৪৫) **সুজানগর** : আয়তন ১১১৩০ একর অথবা ১৭.৩৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৪ স্টেট।

(৪৬) **তাহিরপুর** : আয়তন ৮২৯৪৪ একর অথবা ১২৯.৬০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪৩ স্টেট।

(৪৭) **তারাগুণিয়া** : আয়তন ৬৪৭ একর অথবা ১.০১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১৮ স্টেট।

(৪৮) **তেগাছি** : আয়তন ৫১৮২৪ একর অথবা ৮০.৯৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৯৬ স্টেট।

---

১. গণেশ ভাতুড়িয়া দিনাজপুরের জমিদার ছিলেন। মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে গণেশ বাংলার রাজা হন।

২. "Among the usurpers was Raja Kans, a Hindu Zeminder His son embraced the Mohomedan religion"— Appendix, on the states formed on the dissolution of the Empire of Delhi- Elphinistone's History of India.

৩. Calcutta Review, 1873.

৪. Hunter's Statistical Account Rajshahi.

৫. Hunter's Statistical Account.

সপ্তম অধ্যায়

রাজসাহীর রাজা ও জমিদার

মহাভারতীয় বিরাট নগরের ভগ্নাবশেষ, সেনাপতি কীচক বধের নর্তনাগার, অজ্ঞাতবাস সময় পাণ্ডবগণ স্থাপিত দেবমন্দির, মহাভারতীয় "সমী" বৃক্ষের স্থান নয়নপথে পতিত হইবামাত্র সহসা এই প্রশ্নের উদয় হয়, "যে মৎস্য দেশান্তর্গত বারেন্দ্রভূমি রাজসাহী প্রদেশ পাণ্ডবগণের বাসে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া অদ্যাপিও কীর্তিত হইতেছে, এবং যে প্রদেশের সীমা এককালে ভাগলপুর হইতে ঢাকা পর্যন্ত এবং রঙ্‌পুর (ঘোড়াঘাট) হইতে বীরভূম ও বীরকিটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সেই বিস্তৃত রাজসাহীর অতীত বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে উদিত হইলে আমাদের হৃদয় এক অভিনব আনন্দে পরিপূরিত হয় কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর— দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করার পর স্বদেশ প্রতিগমনে স্বদেশের অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণে বা কীর্তনে আমরা যেরূপ আনন্দ অনুভব করি, সেইরূপ রাজসাহীর রাজা ও জমিদারগণের অতীত বৃত্তান্ত কীর্তন করিব বলিয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রাচীন রাজসাহী— প্রাতঃস্মরণীয় লক্ষ্মীস্বরূপা মহারাণী ভবাণীর বাসভবন; যোগী রাজা রামকৃষ্ণের যোগ স্থান ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য প্রথানুযায়ী প্রধান সমাজ ভূমি; নানাবিধ শস্য ক্ষেত্র ও "উৎকৃষ্ট রেশম"[১] উৎপন্ন স্থান— সে পূর্বতন রাজসাহীর কীর্তিকলাপ কীর্তন করা স্বদেশহিতৈষিতা প্রবৃত্তিতে মানবকে চালিত করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! দুঃখের বিষয় যে রাজসাহীর জমিদারগণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লুক্কায়িতভাবে আছে অথবা কোন স্থানে অতীত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী অজ্ঞাতভাব ধারণ করিয়াছে। এরূপ স্থলে প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। লুক্কায়িত ধন কতক পরিমাণে প্রকাশিত হইলে রাজসাহীবাসীরা অবশ্যই আনন্দ অনুভব করিবেন।

রাজসাহী রাজা ও উপাধি বিহীন সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের সমাজক্ষেত্র।[২] কাহার রাজা উপাধি আছে, কাহার উপাধি নাই। কিন্তু সম্মানে কি রাজদ্বারে, কি জাতীয় সমাজে অনেকেই উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের পূর্বপুরুষদিগের কীর্তিকলাপ এরূপ ছিল যে রাজসাহীতে তাহাদের নাম যশ সর্বজন পরিচিত ছিল। কালের গতি বিচিত্র। কালেই সকল ধ্বংস হয়। অনেক প্রাচীন বংশ ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইতিবৃত্তিও লোপ হইয়াছে। কেবলমাত্র লোক প্রমুখাৎ বংশের নাম কীর্তিত হইতেছে।

রাজসাহীতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের বংশ এবং সাঁতুলের রাজবংশ আদিও প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্গত এই দুইটি "ভৌমিক"—তাহিরপুর ও সাঁতুল।[৩] এই প্রাচীন বংশই ধ্বংস হইয়াছে।

নাটোরের রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে পুঁঠিয়া রাজবংশের উৎপত্তি ইতিহাসে কীর্তিত হইয়াছে। বারবকপুর পরগণার রাজা বা জমিদারও অনেক পুরাতন ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহিরপুর এবং সাঁতুল রাজবংশের অভ্যুদয়েরও পূর্বে দুবলহাটি রাজবংশের স্থিতি বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু দুবলহাটি রাজ্য একটি ক্ষুদ্র ও অপরিচিত জমিদারি এবং জমিদার নিম্ন জাতীয় শূদ্র বলিয়া তাহার নাম লুক্কায়িত ছিল। নাটোরের রাজবংশ এত প্রসিদ্ধ যে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার খ্যাতি ও নাম অদ্যাপি বর্ণিত হইতেছে। সামান্য অবস্থা হইতে একটি অতি বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া মানব-মণ্ডলী শাসনাধীন হইয়াছিল তাহার নাটোর বংশই জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

রঘুনন্দন এই নাটোর বংশের ভীত্তি স্থাপন করেন। ইহা কথিত হয় যে কোন ব্যক্তি অল্প সময় মধ্যে অতিশয় ঐশ্বর্যবান হইলে লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে এ ব্যক্তির "রঘুনন্দনী বাড়"। নাটোর বংশের রাজত্ব সময় তাহিরপুর, পুঁঠিয়া ও দুবলহাটি রাজবংশ ব্যতীত প্রায় সমুদয় রাজা, জমিদার নাটোর রাজের অধীন থাকিয়া পরে ক্রমে স্বাধীন ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন।

আত্রাই ও করতোয়া নদীর মিলন স্থানের নিকট সাঁতুল রাজার প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নিকটে সাঁতুলের বিল নামে একটি বিস্তৃত জলাশয় বিদ্যমান আছে। সাঁতুলের বিল প্রসিদ্ধ বিলচলনের সহিত সংযোজিত। পূর্বে বিলচলনের পথ ব্যতীত উত্তরবঙ্গে বাণিজ্যতরী গমনাগমনের অন্যপথ ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ জমিদার সাঁতুলের রাজা ছিলেন। রাজা গণেশ বা কংসের সময় সাঁতুল রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তপ্পে ভাদুড়ি (ভাতুড়িয়া) ও তদন্তর্গত ২৪১৯৭ টাকার বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণা তাহার অধিকৃত ছিল। আত্রাই নদীর উভয় পার্শ্বে ভাতুড়িয়া প্রদেশ। উড়িষ্যা সুবে বাংলার অধীন। উড়িষ্যা লইয়া এই সুবে বাংলা ২৪ সরকারে বিভক্ত। এই ২৪ সরকারের, সরকার মাহমুদাবাদের অথবা সরকার বাজুয়ার অধীন সাঁতুল রাজ্য; এই রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব আইন আকবরীতে ১৯০৭২৭ দাম লিখিত আছে।[৪] যে সময় আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওষমান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্তা; সেই সময় সীতানাথ সাঁতুলের রাজা। তখন তাহার বয়স প্রায় ৫০/৬০ বৎসর। সুতরাং বিষয় কার্যের সমস্ত ভার তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বরের প্রতি অর্পিত হয়। রামেশ্বর অতি বলবান এবং তাহার প্রতাপে উত্তর বঙ্গ কম্পিত হইয়াছিল। রামেশ্বর অতি চতুর ছিলেন। রামেশ্বর জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন এবং রাজা সীতানাথও অতিসুধীর ও ধার্মিক এবং কনিষ্ঠের প্রতি তাহার অসাধারণ স্নেহ ও বিশ্বাস। সীতানাথ দুই বিবাহ করেন। কিন্তু তাহার পুত্র ছিল না। কেবল কনিষ্ঠ রামেশ্বরের এক পুত্র। পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। রাণী সর্বাণীই এই রামকৃষ্ণের পত্নী। সীতানাথের শেষাবস্থায় তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর নিতান্ত অবিশ্বাসের কার্য করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠের হৃদয়কে দগ্ধ করেন। সেই শোক ও দুঃখে রাজা সীতানাথ পরলোক গমন করেন। রামেশ্বরের অধর্মই সাঁতুল রাজ্যের ধ্বংসের মূল কারণ; এবং রামেশ্বরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসই রাজা সীতানাথের সর্বনাশের হেতু হইয়াছিল।

সাঁতুল ভৌমিক প্রাচীন বংশ এককালে লোপ পাইয়াছে। এই বংশের শেষ রাণী সর্বাণীর মৃত্যুর পর তাহার ভাতুড়িয়া প্রভৃতি বিস্তৃত রাজ্য নাটোর বংশের রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছিল। "বাংলা ১১১৭ সালে (১৭১০ খ্রিস্টাব্দে) আধুনিক রাজসাহী জেলার অন্যতম প্রধান পরগণা ভাতুড়িয়া ব্রাহ্মণ জমিদার (সান্তোল রাজ) রামকৃষ্ণের পত্নী সর্বাণী দেবীর মৃত্যু হইলে তাহাদের এক মাত্র উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরামের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারি কার্য পরিচালনে অসমর্থ বলিয়া ঐ বিস্তীর্ণ জমিদারির কার্যভার তৎকালীন একমাত্র সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল।"[৫] সাঁতুলের রাণী সর্বাণী করতোয়া নদীতটে যে মহাপীঠের আবিষ্কার করেন তাহা দর্শন করিবার জন্য অনেক যাত্রী যাইত। রাণী সর্বাণী কৃত দেবমন্দির আদির জীর্ণ সংস্কার রাণীভবানী করিয়া দেন। ইহাও কথিত আছে যে সাঁতুলের রাজবংশ "পঞ্চপাতকী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে এই মহাপাপ আশ্রয় করার পর হইতে সাঁতুল রাজবংশ ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

'বারাহী', এখন বারীণই নামে প্রসিদ্ধ। এই বারাহী নদীর পূর্বতীরে, রামরামার গ্রামে তাহিরপুরের বিখ্যাত ভৌমিক বংশের রাজধানী ছিল। বারাহী এখন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামরামার পশ্চিমে বারাহীর অপর পারে তাহেরপুরে বর্তমান রাজবাটি।"[৬] সুসঙ্গ রাজবংশের পূর্বপুরুষ মধ্যে বুদ্ধিমন্ত হাজরা নামে একজন বলবান ও সাহসী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বল, বিক্রম ও কৌশলের পরিচয় পাইয়া দিল্লির সম্রাট তাহাকে বঙ্গদেশের পূর্ব দ্বারের জমাদার নিযুক্ত করেন এবং খাঁ ও সিংহ উপাধি দেন। পূর্ব দ্বার-রক্ষা জন্য তাহাকে সৈন্য সামন্ত রাখিতে

হইত। সেই ব্যয় নির্বাহ জন্য সম্রাট আসাম ও বাংলার নিকটবর্তী স্থান সুসঙ্গ রাজাকে দেন। এই বুদ্ধিমন্ত খাঁর সময় তাহিরপুরে বিজয় লস্কর[৭] নামে একজন বীরপুরুষ বর্তমান ছিলেন। ইনি বঙ্গের পশ্চিমদ্বারের জমাদার। সুসঙ্গরাজ পূর্ব্বদ্বার রক্ষক এবং তাহিরপুর রাজ পশ্চিমদ্বার রক্ষক বলিয়া সুসঙ্গ রাজ্য "উদয়াচল" এবং তাহিরপুর রাজ্য "অস্তাচল" নাম ধারণ করে। এই পশ্চিম দ্বার রক্ষার জন্য বিজয় লস্করকে দিল্লির সম্রাট ২২ পরগণা এবং সিংহ উপাধি প্রদান করেন। ইহা দ্বারা সৈন্যগণ প্রতিপালিত হইত। রাজবাটি রামরামায় ছিল এবং সেই স্থানে সৈন্য সামন্ত সহিত গড় আদি ছিল। এই বিজয় সিংহের পুত্র উদয়নারায়ণ বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে নিরাবিল পটির প্রথম সৃষ্টিকর্তা। যে সময় রূপ গোস্বামী গৌড়ের বাদসাহর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় বাদসাহ সমস্ত রাজ্য উদয়নারায়ণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কেবল তাহিরপুর পরগণা মাত্র প্রদান করিলেন। সরকার বারবকাবাদের অধীন তাহিরপুর। এই তাহিরপুরের ৫০৫৮২৫ দাম বার্ষিক রাজস্ব ছিল।[৮] এই উদয়নারায়ণের পৌত্রই প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ নান্নাসী গ্রামী (নন্দনবাসী)। পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশে রাজা কংসনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইনি নন্দনীবাসী, সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। কুলীনগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া বারেন্দ্র সমাজে পদ গৌরবে কেহই ইহার সমকক্ষ ছিলেন না। কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য এই নিয়ম করেন যে কুলীন কন্যা শ্রোত্রিয়ে প্রদান রহিত হইবে এবং কুলীনদিগের বিবাহ কুশবারি সংযুক্ত প্রতিজ্ঞা না করিয়া কেবল বাগদানে সম্পন্ন হইবে না। আবার তাহার প্রথম পক্ষীয় বণিতার ছয় পুত্রের সহিত একত্রে শয়নে ও ভোজনে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। এই ঘটনা হইতে অনেক কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। কুলীনগণ ঐ ছয় ভ্রাতার ব্যবহারকে "কাচ" (ছল) বলিয়া স্থির করিলেন। এই "কাচ" হইতে "কাপ" শব্দ প্রসিদ্ধ হইল। উদয়নাচার্যের নিয়মে কুলীন বংশ লোপ হইবার আকার দেখিয়া রাজা কংসনারায়ণ বহুব্যয়ে সমস্ত কুলীন ও কাপকে একত্রিত করিয়া, সেই নিয়ম প্রচলিত করেন যে কাপ কুলীনে কন্যা আদানপ্রদান, কি কুশবারি সংযুক্ত বাগদান, প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কুলীনের কুলপাত হইবে না। আবার কাপ দূষিত শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে সেই শ্রোত্রিয় উৎকর্ষ লাভ করিবেন। ইহাও বিধি হইল যে কাপ ও কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নিয়মে কাপ কুলীনে আহার ব্যবহার প্রচলিত হইল এবং তাহার নিজ বংশের কন্যা কাপে প্রদান করিয়া তিনি সকলের নিকট অতি প্রশংসনীয় ও বারেন্দ্র সমাজে অতি প্রসিদ্ধ হন। রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্রকুলের মূলাধার ছিলেন। রাজা কংসনারায়ণের প্রপৌত্র "রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজা রামজীবনের ঔরস পুত্র রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের বিবাহ হয়। কালিকাপ্রসাদের নাম কালু কোঙর বলিয়া ইতিহাসে লিখিত।"[৯] তাহিরপুর পরগণার দশ আনা অংশ রাজা কংসনারায়ণের বংশের পরিচয় স্বরূপ। এই বংশের শেষ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিল। তাহার পুত্রসন্তান ছিল না। তাহার একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা উমাদেবীকে রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। আনন্দীরাম রায়ের সহিত তাহার বিবাহ হয়। আনন্দীরাম রায়ের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা বিনোদরাম রায় ঐ দশ আনা অংশের উত্তরাধিকারী হইলেন। বিনোদরাম রায় অতিশয় বুদ্ধিমান ও চতুর পুরুষ ছিলেন। এই বিনোদরাম রায় বর্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি ভাদুড়িবংশীয় নিরাবিলপটির কুলীন। তাহিরপুর পরগণার অবশিষ্ট ছয় আনা অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে; এই অংশের একটি দত্তক পুত্র ছিলেন। কিছু দিন হইল তিনিও ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।[১০] বিনোদরাম রায়ের বংশধরেরা বর্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আলোচ্য বিষয়। বীরেশ্বর রায় নামক জনৈক বিনোদরাম রায়ের পুত্র। ইহার দুই পুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় ও মহেশ্বর রায়। বীরেশ্বর রায় ব্যয়ে সাবধান ছিলেন না। তিনি অনেক টাকা ঋণ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় বুদ্ধিমান ও ধার্মিক ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

ইহার বুদ্ধি কৌশলে এবং রাজকার্য নৈপুণ্যে ইনি পিতৃ-ঋণ অতি অল্পকাল মধ্যে পরিশোধ করিয়া পিতাকে ঋণ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইনিই পিতার সৎপুত্র। ইহারই যত্নে ও সাহায্যে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একটি "সদাব্রত" রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থাপিত হইয়া দৈনিক আহার, মাসিক দান ও পৌষমাসের সংক্রান্তর দিন, দিবার নিয়ম হইয়াছে। চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়, অতি বিনয়ী, প্রজার প্রিয় এবং রাজকার্যে দক্ষ ছিলেন। ইহার ভ্রাতৃস্নেহ নিতান্ত প্রশংসনীয় ছিল। মহেশ্বর রায় বড় বুদ্ধিমান ছিলেন না; কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতি তাহার অতিশয় ভক্তি ছিল। চন্দ্রশেখরেশ্বর ও মহেশ্বর রায়ের রাজা উপাধি না থাকিলেও প্রজারা রাজা বলিত।[১১] চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়ের একপুত্র শশিশেখরেশ্বর রায় ; এবং মহেশ্বর রায়ের চারি পুত্র, জগদীশ্বর, তারকেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর। তন্মধ্যে তারকেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর এখন জীবিত আছেন। মহেশ্বর রায়ের বেশি সন্তান বলিয়া ভ্রাতৃ স্নেহ নিবন্ধন চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় অর্দ্ধাংশ জমিদারি দেওয়া ব্যতীত আরও প্রায় ৫০০০ টাকার ভূসম্পত্তি কনিষ্ঠের পুত্রগণকে দিয়া যান। তথাপি মহেশ্বর রায়ের পুত্রগণ রাজ্য শাসন রীতিমত করিতে না পারায় ঋণ গ্রস্ত হইলেন এবং জমিদারির অনেকাংশ হস্তান্তরিত হইল। কিন্তু শশিশেখরেশ্বর রায় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। ইনি নিজগুণে গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নাম ও যশ বিস্তার করিয়াছেন। এখন রাজা বাহাদুর বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর পদে নিযুক্ত আছেন এবং রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপন্ন। সাধারণের হিতকর কার্যে ইনি একজন প্রধান উদযোগী পুরুষ। রাজকুমার কলেজ স্থাপনের জন্য একজন প্রধান অধ্যক্ষ; জমিদার পঞ্চায়িত সভার প্রতিষ্ঠাতাই রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। ইনি পিতার ন্যায় নিষ্ঠাবন ব্রাহ্মণ বিনয়ী ও সদালাপী। আমরা আশা করি ইহাব দ্বারা স্বদেশের অনেক উপকার হইবে।

১. Grant's Analysis of Finances of Bengal.

২. "There is a conclave of Rajas and untitled noblemen in Rajshahi. Most of the families represented by them have decayed but they at one time here large Zamindars and performed important functions."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৩. "বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় এই; —(১) চন্দ্রদ্বীপে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়; (২) যশোহরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য; (৩) ভুলুয়াতে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য। ইনি শূরবংশীয় কায়স্থ ছিলেন. (৪) বিক্রমপুরে চাঁদ রায়; কেদার রায়; ইহারা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন। (৫) চাঁদ প্রতাপ পরগণাতে চাঁদগাজি; (৬) ভূষণাতে মুকুন্দরাম রায়; ইহার বিবরণ "আকবর নাম" নামক পারসিগ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। (৭) খিজিরপুরে ইসা খাঁ মসনদআলি ; ইসাখাঁর বংশধরগণ ময়মনসিংহ জেলার অধীন হয়বৎনগর জঙ্গলবাড়িতে বাস করেন। ইহার বিষয় আকবর বাদসাহের সময়ে লিখিত "ছয়বল মতখরীন" নামক পারসি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। (৮) ভাওয়ালে ফজলগাজি ; ইহার নবম পূর্বপুরুষের নাম পালয়ান সাহা। ইনি দিল্লি হইতে আসিয়া ভাওয়ালের রাজা শিশুপালকে পরাজয় করিয়া তথাকার অধীশ্বর হন। (৯) সাতৈলে রাজা রামকৃষ্ণ ; সাতৈল এক্ষণে পাবনা জেলার চাটমোহর স্টেশনের অধীন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের পূর্ব পুরুষ রাজা রঘুনন্দন উক্ত সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। (১০) রাজসাহী জেলার অধীন পুঁঠিয়ার রাজা;— নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের পূর্ব পুরুষ রাজা রঘুনন্দন পূর্বে ইহার অধীনে কোন ক্ষুদ্র কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। (১১) উক্ত জেলায় অধীন তাহিরপুরের রাজা; এই রাজবংশের রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নিরাবিল পটির নিয়ম বন্ধন করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম শিবপ্রসাদ। (১২) দিনাজপুরের রাজা;— এ বংশের রাজা গণেশ রায় অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ।"

"এই সকল ভুঁইয়া বা রাজা মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভকালে কখনও তাহাদিগের বশীভূত কখনও বা স্বাধীনতাচারী হইতেন। যখন বশীভূত হইতেন, তখন তাহারা নবাবকে কিঞ্চিৎ রাজস্ব মাত্র প্রদান করিতেন; কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সমুদায় ক্ষমতাই তাহাদের কর্তৃত্বাধীন থাকিত। তাহাদের সেনা, দুর্গ, বিচারালয় ইত্যাদি রাজত্বের সমস্ত লক্ষণই ছিল। পরে যখন তাহারা মুসলমানদিগের একান্ত বশীভূত

হইলেন, তখনও তাহারা সেই সকল রাজলক্ষণহীন হইয়াছিলেন না। তখন সময়ে সময়ে তাহারা নবাবের পক্ষ হইয়া সৈন্য, গজ, কামান ও নৌকা প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধের সহায়তা করিতেন।"—কায়স্থ বংশাবলী।

৪. Vide "Taksim Jama"— Ayan Akbari. ৪০ দামে এক টাকা।

৫. "উৎসাহ", শ্রাবণ ১৩০৫।

৬. শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত।

৭. বিজয় লস্কর ভট্টাচার্য বংশ সম্ভূত।

৮. Vide "Taksim Jama"— Ayan Akbari.

৯. "উৎসাহ", ভাদ্র ১৩০৪।

১০. শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি প্রণত "মহারাণী শরৎসুন্দরীর চরিত।"

১১. 'There are several Zemindars in Rajshahi who call themselves Rajas. They have certainly not been enobled by the Government; but they possess large landed properties, on stength of which their retainers and Rayats address them as Rajas. Among them may be mentioned Hara Nath Chaudhuri of the Suri caste, commonly called Raja of Dubalhati Maheswar Raja, a high caste Brahmin commonly called Raja of Taherpur; and Ruhini Kanto Rai also a Brahmin, commonly called Raja of Chaugaon"— The Rajas of Rajshahi Calcutta Review.

অষ্টম অধ্যায়

পুঁঠিয়ার রাজবংশ

লস্করপুর পরগণা— উড়িষ্যা সুবে বাংলার অধীন। উড়িষ্যা লইয়া এই সুবে বাংলা ২৪ সরকারের বিভক্ত, তন্মধ্যে বারবকাবাদ সরকারের অন্তর্গত লস্করপুর পরগণা। বারবকাবাদ সরকারকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, গজ ইত্যাদি যুদ্ধ সময়ে দিল্লির সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইত। এই লস্করপুর পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ২৫৫০৯০ দাম ছিল।[১] লস্করপুর পরগণা পদ্মা নদীর উভয় পার্শ্বে স্থিত। এই পরগণার অধিকাংশ গ্রাম বর্তমানে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত এবং অল্প সংখ্যক গ্রাম পদ্মা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে নদিয়া ও মুরশিদাবাদ জেলায় স্থিত। ১৩০৫ সালের সালের শ্রাবণ মাসের "উৎসাহে" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে "কোম্পানির প্রথম আমলে—ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় পর্যন্ত লস্করপুর পৃথক কালেক্টরি ছিল। উল্লিখিত সময় পর্যন্ত নিজামতে রেকর্ডে লস্করপুরের কালেক্টরের নিকট হইতে মুরশিদাবাদ নিজামত এজেন্টের নিকট পত্রাদি দেখা যাইতেছে।" নাটোর বংশের অভ্যুদয়ে রাজসাহী ও লস্করপুর কালেক্টরি এক হইয়া রাজসাহী জেলা নামে পরিচিত হইল। লস্করপুর বর্তমান পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রধান জমিদারি। পুঁঠিয়ার রাজারা "ঠাকুর"[২] নামে পরিচিত। পুঁঠিয়ার রাজবংশ প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে এই ঠাকুর বা রাজারা পুঁঠিয়ায় বাস করেন। পুঁঠিয়া নাটোর ও রামপুরবোয়ালিয়ার প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত। ইহা কথিত আছে যে এই বিস্তৃত লস্করপুর পরগণা মুরশিদাবাদ সরকারের সংস্রবে জনৈক লস্কর খাঁর জায়গির পুঁঠিয়ার ঠাকুরেরা প্রাপ্ত হন। এই পরগণার অন্তর্গত আলাইপুব গ্রামে লস্কর খাঁ বাস করিতেন। এই লস্কর খাঁর জায়গির ও তাহিরপুরের আট আনা অংশ সহ, সর্বশুদ্ধ ২২ পরগণার মহাল লইয়া বর্তমান লস্করপুর পরগণার আয়তন গঠিত হয়।[৩] বর্তমানে পুঁঠিয়া বংশীয়ের হস্তে সমুদয় লস্করপুর নাই; কিয়দংশ নানা কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। বর্তমানে লস্করপুর পরগণায় অনেক জমিদার, অন্মধ্যে পাঁচ আনা ও চারি আনার অংশের জমিদারদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ। লস্করপুর পরগণার অংশ ব্যতীত ইহাদের অন্যান্য জমিদারিও কম নহে।

পুঁঠিয়া রাজবংশের উৎপত্তি— পুঁঠিয়ার রাজাগণ বারেন্দ্র শ্রেণি কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহাদের আদিপুরুষ বাগচি বংশীয় সাধু। সাধু হইতে পঞ্চদশ পুরুষের পর, শশধর পাঠক নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। শশধর পাঠকের একমাত্র পুত্র বৎসাচার্য (বৎসরাচার্য)।[৪] এই বৎসাচার্যই পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গৃহী হইয়া, বিষয় বাসনা শূন্য ছিলেন এবং ঋষির ন্যায় কালযাপন করিতেন। বৎসাচার্যের সাতটি পুত্র, তন্মধ্যে নীলাম্বর,[৫] পীতাম্বর এবং পুষ্করাক্ষ জীবিত ছিল এবং অপর চারিটি পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়।[৬] বৎসাচার্য জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাসীর ন্যায় গৃহে বাস করিতেন।

পুঁঠিয়া রাজবংশের অভ্যুদয় সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে। অতি প্রাচীনকালে পুঁঠিয়া[৭] আশ্রমে বৎসাচার্য (বৎসরাচার্য) নামে ঋষির ন্যায় এক নিষ্ঠান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি যাগ, যজ্ঞ, তপস্যায় তাহার অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। তাহার বিষয় বাসনা একবারে ছিল'না। অধিকাংশ সময়ে তিনি নির্জনে বাস করিতেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবর[৮] বাংলা

জয় করিয়া মোঘল শাসন বিস্তার করেন। তিনি তাহার সমগ্র সাম্রাজ্য পঞ্চদশ প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক এক সুবাদার (সিপাহসালার) নিযুক্ত করেন। সুবাদারদিগের কর্তব্য কর্ম প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল :— (১) সৈনিক বন্দোবস্ত, (২) বিচার ও শান্তিরক্ষণ, (৩) রাজস্ব আদায়। এই পঞ্চদশ সুবা মধ্যে, বারটি হিন্দুস্থানে এবং তিনটি দাক্ষিণাত্যে ছিল। বিজয়পুর ও গলকুণ্ডা অধিকারের, পর, শেষোক্ত তিনটি সুবা-স্থলে ছয়টি সুবা হইল। আকবরের সময় অতীত হইলে সুবা বা প্রদেশের কর্তার উপাধি "সিপাহসালার" স্থলে "সুবাদার" হইল। এবং প্রত্যেক প্রদেশ বা সুবার কার্য পর্যবেক্ষণ জন্য একজন "দেওয়ান" উপাধিধারী কর্মচারী নিযুক্ত হইল।[৯] এই পঞ্চদশ সুবা মধ্যে বাংলা একটি সুবা বা প্রদেশ ছিল। আবার বাংলা আঠার প্রদেশ বা সুবায় আকবর বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই সুবাদারদিগের এই কর্তব্য কর্ম ছিল, যে রাজস্ব আদায় করিয়া বাংলার প্রধান সুবাদার যোগে সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিতে হইত। কিন্তু সুবাদারেরা একত্রিত হইয়া স্বাধীন হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লির সম্রাট সমীপে রাজস্ব প্রদানে বিরত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিলেন। সম্রাট বিদ্রোহ দমন জন্য কতগুলি উপযুক্ত সৈন্য সমেত একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে[৯] বাংলায় প্রেরণ করেন। সেনাপতি বৎসরাচার্যের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলে, তাহাকে বৎসরাচার্য সৈন্য সমেত তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সেনাপতি বৎসরাচার্যকে বিস্তারিত জ্ঞাপন করিলে, তিনি তাহাকে বিদ্রোহ দমনের উপায় বলিয়া ছিলেন।[১০] সেনাপতি কৃতকার্য হইলে পুরস্কার স্বরূপ ঋষিকে কিছু ভূসম্পত্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে লস্করপুরের জায়গিরদার লস্কর খাঁ নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, দিল্লির সম্রাটের অনুমতি লইয়া সেনাপতি, লস্করপুর বৎসরাচার্যকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। ঋষি বৎসরাচার্য জমিদারিকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন; সুতরাং তাহার পুত্র পীতাম্বর জমিদারি গ্রহণ করেন। পীতাম্বর বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি দিল্লির সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া লস্করপুর পরগণার অধীশ্বর হইলেন। সম্রাটের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই পীতাম্বর প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং নীলাম্বরই সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। পুঁঠিয়ার বর্তমান রাজারা সেই নীলাম্বরের বংশধর। পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বৎসরাচার্য এখন দেববৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে্ন। যেহেতুক তাহার কাষ্ঠ-পাদুকা এখনও দেবতার ন্যায় নিত্য পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে।

পুঁঠিয়া রাজ বংশাবলী :— বৎসচার্য হইতে পুঁঠিয়া বংশে যে যে ব্যক্তি রাজ্যভার গ্রহণ করেন বা বংশোদ্ভব তাহাদের নামের তালিকা নিম্নলিখিত হইল ঃ—

১ বৎসাচার্য
২ পীতাম্বর
৩ নীলাম্বর (তস্যপুত্র) আনন্দরাম[১০ক]
৪ রতিকান্ত (ঠাকুর)
৫ রামচন্দ্র[১১]
৬ নরনারায়ণ
৭ দর্পনারায়ণ
৮ জয়নারায়ণ
৯ প্রেমনারায়ণ
১০ চন্দ্রনারায়ণ
১১ প্রতাপনারায়ণ
১২ অনুপনারায়ণ
২৩ লক্ষ্মীনারায়ণ
২৪ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ[১০ক] (স্ত্রী সূর্যমণি পতির মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারিণী)
২৫ আনন্দনারায়ণ
২৬ জগন্নারায়ণ[১০ক]
২৭ কৃষ্ণনারায়ণ
২৮ গৌলোকেন্দ্রনারায়ণ
২৯ ভূপেন্দ্রনারায়ণ
৩০ মহেশনারায়ণ
৩১ গিরীশনারায়ণ
৩২ ঈশ্বরনারায়ণ
৪১ নীমনারায়ণ
৪২ রামনারায়ণ
৪৩ তারকনারায়ণ
৪৪ কেদারনারায়ণ
৪৫ যাদবনারায়ণ
৪৬ শ্রীনারায়ণ রায়
৪৭ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (স্ত্রী মহারাণী শরৎ-সুন্দরী দেবী পতির মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী)
৪৮ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়
৪৯ ভুবেন্দ্রনারায়ণ রায়

১৩ কিশোরীনারায়ণ	৩৩ ঈশাণনারায়ণ	৫০ গোপালেন্দ্র নারায়ণ রায়
১৪ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ	৩৪ রামনারায়ণ	৫১ বৈকুণ্ঠনারায়ণ
১৫ নরেন্দ্রনারায়ণ	৩৫ মথুরেন্দ্রনারায়ণ	৫২ অঙ্গেশনারায়ণ রায়
১৬ মদননারায়ণ	৩৬ রাণী ভুবনময়ী দেবী রাজা জগন্নারায়ণের বিধবা বণিতা—	৫৩ কাশীনারায়ণ রায়
১৭ রূপেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর		৫৪ কুমার জ্যোতিন্দ্রনারায়ণ রায় (স্ত্রী রাণী হেমন্ত-কুমারী দেবী পতির মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী)
১৮ প্রাণনারায়ণ ঠাকুর		
১৯ কেশবনারায়ণ	৩৭ হরেন্দ্রনারায়ণ	
২০ গোকুলনারায়ণ	৩৮ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়	
২১ ভুবনেন্দ্রনারায়ণ	৩৯ পরেশনারায়ণ রায়	
২২ রুদ্রনারায়ণ	৪০ রমেশনারায়ণ	

পুঁঠিয়া বংশের রাজাগণ— বৎসরাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর[১৩] সাংসারিক কার্যে নিতান্ত পটু ছিলেন। তিনি দিল্লির সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া লস্করপুর রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার এবং সর্ব কনিষ্ঠ পুষ্করাক্ষের নিঃসন্তানে মৃত্যুর পর, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর উভয়েই সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং লস্করপুর পরগণার কর বৃদ্ধি করিয়া, রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। নীলাম্বরের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দরাম তাহার পিতা জীবিত থাকিতেই দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে "রাজা" উপাধ প্রাপ্ত হন; কিন্তু নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রতিকান্ত সর্বসাধারণের কোন অপ্রিয় কার্য করায় পিতৃ রাজ্যের অধিকারী হন নাই এবং "ঠাকুর" নামে সর্বজন নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন। রতিকান্ত হইতে পুঁঠিয়ার রাজারা "ঠাকুর" নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।[১৪] রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র[১৫]। রামচন্দ্র কর্তৃক "রাধাগোবিন্দের" সেবা স্থাপিত হয়। রাধাগোবিন্দের নিত্য পূজা ও ভোগের বন্দোবস্ত এখনও অতি সুন্দর। ১/০ আতপ তণ্ডুল এবং তদুপযোগী নানাবিধ উপকরণ দ্বারা প্রতিদিন ভোগ হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ এবং জয়নারায়ণকে জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নরনারায়ণ ঠাকুরের সময় নাটোর রাজবংশের স্থাপন কর্তা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব লস্করপুরের অন্তর্গত সরুইহাটি গ্রামের তহশীলদারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের তিন পুত্র হইতে পুঁঠিয়া রাজবংশের সকলেরই নামে "নারায়ণ" সংযুক্ত হয়। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময় রামচন্দ্রের তিন পুত্র বর্তমান ছিলেন।

দর্পনারায়ণের সময় কামদেবের পুত্র রঘুনন্দনের সৌভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন। দর্পনারায়ণের নিত্য পূজার পুষ্প সংগ্রহ করিবার কার্যে রঘুনন্দন নিযুক্ত ছিলেন। এই সামান্য কার্য হইতে তিনি নবাব সরকারে পুঁঠিয়া রাজার পক্ষে উকিলের কার্যে নিযুক্ত হন। এইরূপ নবাব দরবারে উকিল বা মুকতিয়ার নিযুক্ত করিবার প্রথা জমিদারগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল।[১৬] রঘুনন্দন নাটোর রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় আনন্দনারায়ণ লস্করপুর পরগণার রাজা ছিলেন। আনন্দনারায়ণের সঙ্গে লস্করপুর পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৮৯৫৯২।০ টাকা জমায় সম্পন্ন হয়। আনন্দ নারায়ণের একজন উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনারায়ণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই রাজেন্দ্রনারায়ণ পুঁঠিয়ার চারি আনা অংশের রাজা ছিলেন। যাহাকে সাধারণত চারি আনা অংশ বলে তাহা প্রকৃত।১৩—ক্রান্তির অংশ। এই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে, তেমুখের নিকট তাজপুর গ্রাম নিবাসী হরিনাথ সান্যালের কন্যা সূর্যমণি দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজা পরলোক গমন করিলে, তাহার বিধবা পত্নী সূর্যমণি পতির সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। রাণী সূর্যমণি একজন বুদ্ধিমতী এবং জমিদারি কার্যে সুবিজ্ঞা

বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তিনি মহিলা হইয়া যেরূপ সুচারুরূপে কাজ কার্য নির্বাহ করিয়াছেন, সেরূপ রাজকার্য নির্বাহ করিতে পুঁঠিয়া বংশের অনেক রাজাই সক্ষম হন নাই। পুঁঠিয়াবংশের ভুবনেন্দ্রনারায়ণ একজন ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। লস্করপুর পরগণার অংশ ব্যতীত তিনি অনেক জমিদারি ক্রয় করেন। তদপর বাংলা ১২১৪ সালে ভুবনেন্দ্রনারায়ণের পুত্র জগন্নারায়ণ নিম্নলিখিত জমিদারি খরিদ করিয়া নিজ রাজ্য ভুক্ত করেন :—

(১) ময়মনসিংহ জেলায় পরগণা পুকরিয়া।

(২) রাজসাহী জেলায় পরগণা কালীগাঁও কালীসপা এবং কাজিহাট।

(৩) জেলা নদীয়ায় ভবানন্দ দিয়াড়।

এইরূপে আয় বৃদ্ধি করিয়া জগন্নারায়ণ বারাণসী ধামে দেবমন্দির আদি প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং একটি ঘাট ও অতিথিশালা নির্মাণ করিলেন। ফলগু নদীর তীরে আর একটি অতিথিশালা প্রস্তুত করিয়া দেন। বাংলা ১২১৬ সালে তিনিও "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা ১২২৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার বিধবা পত্নী পুঁঠিয়ায় শিবস্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে বহুতর পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করেন। এই হিন্দু মহিলা দীন দুঃখীকে শীতকালে শীতবস্ত্র দিতেন এবং বর্ষাকালে গো ও মনুষ্যকে যথোচিত আহার দিতেন। এই প্রশংসিতা হিন্দুরমণীর নাম রাণী ভুবনময়ী দেবী।

তদপরে পুঁঠিয়া বংশীয় জনৈক ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অত্যন্ত বাবু ছিলেন এবং ইহার বিষয় বুদ্ধি নিতান্ত কম ছিল। নিজ মূর্খতা এবং কুসংসর্গ দোষে তাহার ধনক্ষয় হয়। নানা কারণে তাহার বিস্তর ঋণ হয়, সেই ঋণ পরিশোধ জন্য তাহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে হয়। শেষকালে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহার এবং তাহার পত্নীর জীবন রক্ষা হয়।

পরেশনারায়ণ রায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশ-সম্ভূত। ইনি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম-সাময়িক রাজা। পরেশনারায়ণ অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকিয়া ইংরেজি শিক্ষা করেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ না হওয়ার পূর্বেই তাহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। এই অল্পকাল মধ্যে নিজ পুঁঠিয়া, রামপুরবোয়ালিয়া এবং তাহার নিজ জমিদারি মধ্যে কাপাসিয়া, জামরা, বাণেশ্বর, আড়ানী প্রভৃতি স্থানে বিস্তর স্কুল স্থাপিত করিয়া প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করেন। পুঁঠিয়ার উচ্চ শ্রেণি ইংরেজি স্কুল তাহারই নাম এখনও ঘোষণা করিতেছে। ইনি সদাচারী নিষ্ঠাবান রাজা ছিলেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজা জগন্নানারায়ণ রায়ের পৌত্র। বাংলা ১২৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলে, তাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয়। সম্পত্তি ওয়ার্ডসের অধীন হওয়ার পর তাহার বিদ্যাশিক্ষা জন্য জেলার কালেক্টর সাহেবের আদেশে তাহাকে রামপুরবোয়ালিয়ায় আনাইয়া রাজসাহী জেলা স্কুলের নিম্নশ্রেণিতে প্রবিষ্ট করান হইল। রাজসাহী জেলা স্কুলে দুই কি এক বৎসরের জন্য তিনি লেখকের সমপাঠী ছিলেন।[১৭] তদপরে সুশিক্ষিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধীনে কলিকাতা "ওয়ার্ডস-ইনস্টিটিউসনে"[১৮] বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাকে প্রেরিত হইল। যদিচ তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি বিষয় চিন্তায় ও নানা কারণে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বেই, তিনি বাংলা ১২৬৭ সালে (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে) স্বহস্তে সমস্ত জমিদারির শাসনের ভার গ্রহণ করেন।[১৯] বাংলা ১২৪৭ সাল হইতে ১২৬৬ সাল পর্যন্ত, যোগেন্দ্রনারায়ণের বাল্যক্রীড়া, বিদ্যাশিক্ষা ও উদ্বাহ কার্য সম্পন্ন হয়। পিতা শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, সেই শিশুর বিদ্যাশিক্ষার অনেক বিঘ্ন ঘটে। শিশুকালে পিতার মৃত্যু হওয়ায় যোগেন্দ্রনারায়ণ এক মাত্র পুত্র বলিয়া মাতার স্নেহের পুত্তলি

হইলেন। পিতার পরলোক গমনের পরেই যদিচ সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্‌ডসের অধীন হইয়াছিল, তথাপি প্রায় ১৪/১৫ বৎসর পর্যন্ত পুঁঠিয়া রাজধানীতে রাখিয়াই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং পাঠের উন্নতি অধিক না হওয়ায়, তাহার বিবাহের পর শিক্ষার জন্য রামপুরবোয়ালিয়াতে তাহাকে আনা হইল। বিদ্যাশিক্ষায় অধিক উন্নতি লাভ না করিলেও যোগেন্দ্রনারায়ণ মাতার নিকট হইতে নেপোলিয়নের ন্যায় দয়া, উদারতা, সাহস, তেজস্বীতা এবং রাজকার্য কৌশল অনেক পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বাংলা ১২৬২ সালে যোগেন্দ্রনারায়ণ ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে পতিত হইলেন। ঐ সালের বৈশাখ মাসে পুঁঠিয়া নিবাসী হরিনাথ সান্যালের[২০] পৌত্রী এবং ভৈরবনাথ সান্যালের কন্যা শরৎসুন্দরীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। সে সময় শরৎসুন্দরীর বয়ঃক্রম কেবল সাড়ে পাঁচ বৎসর মাত্র। এই উদ্বাহ কার্য নির্বাহ হইবার অল্পকাল পরেই, যোগেন্দ্রনারায়ণের মাতা দুর্গাসুন্দরী পরলোকগম করেন। তাহার মাতার মৃত্যুর পর, বালিকা শরৎসুন্দরী পতির গৃহে বাস করিতে থাকেন। রাজগৃহে অন্য কোন অভিভাবিকা না থাকায়, যোগেন্দ্রনারায়ণ, হরসুন্দরী নাম্নী তাহার বিধবা মাতুলানীকে আনিয়া শরৎসুন্দরীর নিকট অভিভাবিকা স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। "ইনি ব্যতীত যোগেন্দ্রনারায়ণের মাতা সহোদরা ভগিনী, শিবসুন্দরী দেবীও অনেক সময় শরৎসুন্দরীর নিকট থাকেন। শরৎসুন্দরী, ইহাদের দুই জনকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।"[২১] এবং ইহাদের নিকট অনেক পরিমাণে দেবীর ন্যায় নিজ চরিত্র গঠন করেন। এই সময় বোর্ড অব রেভিনিউয়ের আদেশ মতো যোগেন্দ্রনারায়ণকে বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা "ওয়ার্‌ডস ইনস্টিটিউসনে" থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্তি জন্য প্রেরিত হইল। কলিকাতার শিক্ষার কাল অতীত হওয়ার পর ১২৬৭ সালে (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে) নিজ সম্পত্তি ভারগ্রহণ করিয়া সাধ্বী, সুশীলা ও পতিভক্তি পরায়ণ পত্নীর সহবাসে রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিল না। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের পূর্বেই তাহার যাবতীয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্‌ডসের তত্ত্বাবধানে হয়। সেই সময় তাহার যাবতীয় ভূসম্পত্তি ইজারা বিলি হইয়াছিল। রাজসাহী ও নদীয়া জেলার সম্পত্তি রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানির সহিত এবং ময়মনসিংহের সম্পত্তি মিঃ কে বার্ডি সাহেবের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কোর্ট অব ওয়ার্‌ডস হইতে নাবালকের স্টেট তত্ত্বাবধান জন্য মেনেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি নির্বিবাদে কেবল দুই ইজারদারদের নিকট হইতে কিস্তি মত রাজস্ব আদায় করিয়া গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিতেন এবং সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিতেন। এই ইজারা বন্দোবস্তই যোগেন্দ্রনারায়ণের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ওয়াটসন কোম্পানি নীলকর। লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত পদ্মা, বড়াল, মুষাখাঁ ও নারদ নদীর অনেক চরে নীল জন্মিতে পারে এবং রাজসাহী মুরশিদাবাদ ও নদিয়ার অনেক স্থানে ওয়াটসন কোম্পানির অনেক নীল কুঠী আছে। এই নীল কুঠীর উন্নতি জন্য ওয়াটসন কোম্পানির যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজসাহী ও নদীয়ার সম্পত্তি ইজারা লওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। বাংলা ১২৫৯ সাল হইতে বাংলা ১২৬৫ সাল পর্যন্ত ওয়াটসন কোম্পানির সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজসাহী ও নদীয়ার সম্পত্তি ইজারা ছিল। ইজারার কাল অতীত হইলেও, "নিজ-জোত"[২২] নামে কতকগুলি ভূমি ওয়াটসন কোম্পানি আপন দখলে রাখিয়া ছিলেন। প্রজারা, নিজ নিজ জোতের ভূমিতে নীল বুনানী করার জন্য কোম্পানির নিকট অগ্রিম দাদন গ্রহণ করিয়া, এগ্রিমেন্ট বা চুক্তিনামা লিখিয়া দিত। এই এগ্রিমেণ্ট "সাটা" নামে খ্যাত। এই "নিজজোত" ও "সাটা" প্রজাদের অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিল। এই সূত্রে প্রজাদের ও ওয়াটসন কোম্পানির বিবাদ আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই "সাটা" দ্বারা প্রজারা প্রপীড়িত হইয়াছিল। তাহার রাজ্যভার গ্রহণের পরে প্রজারা রীতিমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনারায়ণও নিজ প্রজাদের রক্ষা জন্য তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় যোগ দিলেন এবং প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুতরাং নীলকরদের দখল

জন্য তিনি প্রাণ, ধন, সম্পত্তি অর্পণ করিলেন;[২৩] সুতরাং এই প্রতিজ্ঞা পালন জন্য, আহার নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিলেন।[২৪] দিবা রাত্রি মধ্যে ৩ কি ৪ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতেন না। তিনি নিজ ক্ষমতাগুণে অনেক পরিমাণে নীলকরের হস্ত হইতে নিজ দুঃখী প্রজাদের উদ্ধার করেন ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই। কৌশল অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রজার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা ও যত্ন করিলে তিনি কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারিতেন এবং রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতেই প্রজা সমূহের কষ্টের অবসান হইল না। তিনি জীবিত থাকিলে কি হইত বলা যায় না। এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দুশ্চিন্তা শরীরে প্রবেশ করিয়া, যোগেন্দ্রনারায়ণের শরীর পতন হইল। নানা রোগ তাহাকে আক্রমণ করিল। আবার সুরার[২৫] আশ্রয়ে রোগগুলি বৃদ্ধি পাইতেছিল। অত্যন্ত কাতর হইলে, তাহাকে বোয়ালিয়ায় আনা হইল, কিন্তু শরৎসুন্দরী দেবী পুঁঠিয়া রাজধানীতেই থাকিলেন। জেলার সিবিল সার্জন যোগেন্দ্রনারায়ণকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল না হইয়া ক্রমে জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অরুচি ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করিল যে তাহার আর প্রাণে বাঁচিবার আশা রহিল না। "তিনি সকল আশা, সকল ভরসা, সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ লইয়া যৌবনের প্রথম উদ্যমে অতৃপ্ত জীবনে, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯ বৈশাখ তারিখে একুশ বৎসর এগারো মাস বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সে সময়ে বোয়ালিয়ায় কর্মচারী ও সাধারণ ভৃত্য ব্যতীত তাহার মৃত্যুকালে আত্মীয় বলিতে আর কেহই ছিল না।"[২৬]

বোয়ালিয়ায় বিদ্যা শিক্ষার সময় যোগেন্দ্রনারায়ণ সমপাঠীদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার সুশীলতা, উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় লেখক স্বয়ং পাইয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। তাহার সাহস ও নির্ভীকতা নিতান্ত প্রশংসনীয়। কোন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহার প্রতি তিনি যেরূপ সৌজন্য ও নম্রতা দেখাইতেন, তাহাতে সেই ভদ্রলোক যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিতেন। পরের দুঃখ মোচনে তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইতেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কার্যে বীরের ন্যায় ছিলেন। যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেন তাহা পালন জন্য নিজ প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতেন। বিষয় কার্যে তাহার বুদ্ধি অধিক ছিল। "প্রজারা আমার প্রাণাপেক্ষা সহোদর ভ্রাতা।"[২৭]—এই বাক্যের প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক অক্ষরে, তাহার মহৎ চরিত্রের এরূপ প্রমাণ যে, তাহাকে সুরাপান দোষে কলঙ্কিত করা আমাদের উচিত নহে। যাহার গুণের ভাগই বেশি এবং যাহার কেবলমাত্র একটি দোষ, তাহাকে রাজাদের মধ্যে উচ্চ আসন অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু শয়নে ও ভোজনে অপরিমিতাচার দোষ আশ্রয় করিয়া ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য তাহাকে আমরা উচ্চ আসন দিতে কুণ্ঠিত হইলাম। জীবনকে রক্ষা করিয়া মানবের ধর্ম, অর্থ, কাম— সকলই উপার্জন করা উচিত। তিনি দীর্ঘজীবী হইলে, প্রজারা তাহাকে যে পিতা অপেক্ষা বেশি ভক্তি করিত তাহার আর কোন, সন্দেহ নাই। তিনি কেবল ২/৩ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যেই প্রজারা তাহাকে ভয় না করিয়া ভক্তি করিত। ইহা রাজার চরিত্রের একটি মহাগুণ। মোটের উপর বলিতে যোগেন্দ্রনারায়ণ "দাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরোপকারী, বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা"[২৮]; কিন্তু অপরিমিতাচারী। তিনি প্রজা-হিতৈষী ছিলেন। তাহার অভাবে লস্করপুর পরগণার প্রজারা পিতৃহীন হইয়া বহুতর শোক প্রকাশ করিয়াছে।

যোগেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর সময় তাহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা পত্নীর হস্তে যাবতীয় সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া দেন এবং ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে রাণী শরৎসুন্দরীর গুণের পরিচয় পাইয়া তাহাকে বিস্তৃত রাজ্য শাসনের উপযুক্ত পাত্রী জ্ঞান করিয়াছিলেন। রাজসাহীর কালেক্টর মিঃ ওয়েলস সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে বাংলা ১২৭২ সালে প্রায় ১৫ বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে যাবতীয় সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তদপর বাংলা ১২৭৩ সালের

মাঘ মাসে শরৎসুন্দরী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীকে বিস্তর দানাদি করিয়াছিলেন। দত্তকের নাম রাখিলেন, যতীন্দ্রনারায়ণ। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে দত্তকের উপনয়ন এবং বাংলা ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে বিবাহ হয়। দত্তকের পত্নীর নাম হেমন্তকুমারী দেবী। উপনয়ন ও বিবাহ উপলক্ষেও "সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের ও দীন দুঃখীর সাহায্যার্থ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।"[২৯] শরৎসুন্দরীর জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র আর একটি গ্রন্থাকার ধারণ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। "কুলশাস্ত্র দীপিকা" গ্রন্থে এবং "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে মহারাণী শরৎসুন্দরী সম্বন্ধে যে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তাহার গুণরাশির কীর্তন করা হইবে। তাহার গুণ এত বেশি যে সহস্র মুখে বহুকাল কীর্তন করিলেও তারা শেষ হইবার নহে। সুতরাং উদ্ধৃত অংশ ব্যতীত আরো কিছু বলিবার আশা রহিল।

"রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ লোকান্তরিত হইলে তৎপত্নী শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইনিও তৎকালে অল্প বয়স্কা ছিলেন। দেবের প্রতিকূলে বিধির বিপাকে এই পুণ্যশীলা ও প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকে অকালে জীবনের প্রথম ভাগেই নিদারুণ বৈধব্য দশায় নিপতিত হইতে হইল। ইনি স্বীয় মহামূল্যবান জীবনকে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে নিয়ত ধর্ম কার্যে, দেব সেবায় এবং তীর্থ পর্যটনে সময়াতিবাহিত করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ এবং শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করতঃ বারাণসীতে প্রত্যাগমনকালে ইহার জনক তথায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাণী শরৎসুন্দরী বারাণসীতে মহাসমারোহে পিতৃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে পুঁঠিয়াতে প্রত্যাগমন করতঃ রাজত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। অন্যান্য অপরিণামদর্শী ও প্রজাপীড়ক ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় ইহার হৃদয় ও অন্তঃকরণ পাষাণ নির্মিত নহে। ইনি অপত্য স্নেহে প্রজাবৃন্দের দুঃখ মোচন ও সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা জগদ্বিখ্যাত। অনেক স্থানে দরিদ্রবৃন্দের চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে বিপুল অর্থ প্রদান করতঃ লোকের অন্নকষ্ট নিবারণে নিয়তই যত্নবতী। ১৮৭৭ সালে দিল্লির দরবারে ইনি মহারাণী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"মহারাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী সমস্ত বঙ্গ সাম্রাজ্যের রমণীকুলের শিরোভূষণ। ইনি মহারাণী ভবানীর ন্যায় লোকমণ্ডলীর প্রাতঃ স্মরণীয়া। ইনি বরেন্দ্রভূমির গৌরব ও অত্যুজ্জ্বল রত্ন স্বরূপা। ইহার বিশুদ্ধ চরিত্র, পবিত্র দেব ভাব, দানশীলতা ও সহানুভূতি জগজ্জনের অনুকরণীয় আদর্শ। ইনি প্রতিদিন শত শত অনাথা চিরদুঃখিনী বিধবাগণের ভরণপোষণ করেন। রোগ জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু দুঃখিনীগণের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া স্বয়ং তাহাদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। নারী চরিত্র কতদূর উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারে, মানবীয় কুপ্রবৃত্তি নিচয় ধর্ম চর্চার মহীয়সী শক্তিতে কতদূর পর্যন্ত নিস্তেজ হইতে পারে, ইনি তাহার জীবিত দৃষ্টান্ত স্থল। অতুল ঐশ্বর্যে অধিকারিণী হইয়াও, প্রাচীনা ভারত মহিলাগণের গৌরবের স্থল। ইনি সতীত্ব, ধর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ-স্বীকার ও বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের মহাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। কি ইংরেজ, কি বঙ্গবাসী, কি হিন্দুস্থানী, সকলেই এক বাক্যে এক হৃদয়ে ইহার যশোকীর্তন করিতেছেন।"[৩০]

"নূতন বৎসরের প্রথমদিনে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী বিষয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বাঙালির পক্ষে শুভ সংবাদ নহে। অলৌকিক ধর্মাভাব এবং দানশীলতার জন্য বঙ্গদেশে শরৎসুন্দরী প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। হিন্দু সন্তানের চক্ষে তিনি পবিত্রা-আর্য-নারী-কুলের আদর্শস্বরূপ। অন্য ধর্মাবলম্বীগণও এক বাক্যে তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এরূপ বিশ্বজনীন ভক্তি-প্রীতি যাহার পুরস্কার, তাহার জীবনী আলোচনায় পুণ্য আছে।"

"১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে মহারাণী জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পুঁঠিয়াতেই তাহার পিত্রালয়।

পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্যাল মহাশয় পুঁঠিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ; হিন্দু ধর্মোক্ত সকল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান বার মাস তাহার গৃহে হইত; আজিও হইয়া থাকে। মহারাণীর মাতা[৩১] অদ্যাপি জীবিতা আছেন। যে সকল রমণীয় গুণ তাহার চরিত্রের ভূষণ, সচরাচর একাধারে তাহা প্রায় দেখা যায় না। পিতা মাতার সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত কেমন কার্যকর, তাহাদের মহত্ত্ব, তাহাদের ধর্মাভাব, সন্তানে কতদূর বিকশিত হইতে পারে, মহারাণী শরৎসুন্দরী তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।"

"অতি অল্প বয়সে মহারাণীর বিবাহ হয়। তাহার বয়স তখন ছয় বৎসর; স্বামী স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র।[৩২] পশ্চাৎ শুনা যায়, বিবাহের পূর্বে একজন গণক মহারাণীর বৈধব্য গণনা করিয়াছিল। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে তাহার বৈধব্য ঘটে। পিতামহী গণকের গণনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে স্থির করিয়াছিলেন, বেশি বয়সে পৌত্রীর বিবাহ দিবেন। বলা বাহুল্য তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। পরিণত হইলে বুঝি বঙ্গ সমাজ মহারাণী শরৎসুন্দরীর নাম কখন শুনিতে পাইত না। যাহা হউক, কিন্তু তাহা হইলে বুঝি দেবী শরৎসুন্দরী জীবনে সুখী হইতে পারিতেন। পবিত্রময়ী মহারাণী শরৎসুন্দরীর গার্হ্যস্থ জীবন কেবল দুঃখময়। বাল্যে বিধবা, যৌবনে পিতৃহীনা, হায়! জীবনের সকল ভাগই তাহার কেবল দুঃখময়। চির দুঃখিনী সীতার চিত্র মনে করিয়া যে জাতি অনুদিন পবিত্রতার অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, সাধ্বী শরৎসুন্দরীর দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবনের ইতিহাস বাস্তবিক সে জাতির অর্চণীয় সামগ্রী।"

"১২৭২ সালে শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষয় ভার অর্পিত হয়। সেই অবধি কিরূপ প্রশংসা এবং দক্ষতার সহিত তিনি উহা চালাইয়া আসিয়াছেন, এখানে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। গত বৎসর হইতে তাহার কাশীবাসের কথা হইতেছে। সেই অবধি তিনি ইদানীন্তন বিষয় কার্যে অনেকটা হতাদর হইয়াছিলেন।"

"দিল্লির দরবারের সময় শরৎসুন্দরী "মহারাণী" উপাধি লাভ করেন, কিন্তু তিনি খেলাত গ্রহণ করেন নাই। গবর্মমেণ্টকে সেই উপলক্ষে জানাইয়া ছিলেন, তিনি বিধবা, সে সম্মান তাহার গ্রহণীয় নহে। মহারাণীর দান এত বিস্তৃত এবং তাহা সাধারণের এত পরিচিত যে তাহার উল্লেখ মাত্রই এখানে যথেষ্ট। কিন্তু তিনি অতি গোপনে নিজের আমলাদেরও অজ্ঞাতে যে সকল দান করেন, আজিকার এই বাহ্যাড়ম্বরের দিনে তাহার কিছু পরিচয় দিতে হইতেছে। আজি পর্যন্ত প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার কিছু পরে বৈষয়িক কাগজপত্র দেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ করা তাহার একটা দৈনিক নির্দিষ্ট কার্য। সেই সময় পরিচিত দুঃখী স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকাগণ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে; কেহ কাঁদিতেছে, ঘরে খাবার নাই, কাহারও কাপড় নাই, কাহারও ছেলের ব্যারাম চিকিৎসা হয় না। সকলেই দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে মহারাণী চক্ষের জল মুছিতেছেন। সকলেরই অভাব মোচন করিতে হইবে, কাহাকেও বিমুখ কার হইবে না। রাজবাটিতে অবশ্য চিকিৎসকের অভাব নাই, ইঙ্গিত মাত্রেই দুঃখিনীর ছেলেটির চিকিৎসা হইতে পারে। কিন্তু মহারাণী অতি গোপনে তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ দিয়া ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে উপদেশ করেন।"

"কোমল বয়সে স্বামীর যত্নে মহারাণী সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পর নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে সেই শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; তাহার নিজের একটি লাইব্রেরী আছে। এদেশে যে কোন সুশিক্ষিতের পক্ষে সেইরূপ পুস্তক রাশির সংগ্রহ সুখ্যাতির কথা। গত বৎসর পর্যন্ত মহারাণী প্রায় সকল বাংলা সাময়িক পত্র গ্রহণ ও পাঠ করিতেন। অনেক বাংলা গ্রন্থকার তাহার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য লাভ করিয়া থাকেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ[৩২] তাহার সাহায্যাধীন বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ভদ্র সন্তানের প্রতি তাহার স্নেহ এবং যত্ন মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাজসাহী কলেজের সুন্দর গৃহগুলি, রেইল প্রভৃতি তাহাদের দুই

স্ত্রী পুরুষের অক্ষয় কীর্তি। অন্তঃপুরে বসিয়াও ভারতবর্ষের উন্নতির সূচনা মাত্রে তাহার মনে কেমন আনন্দ, কেমন উৎসাহ জন্মে। আত্ম-শাসন প্রণালী উপলক্ষে গত বৎসর পুঁঠিয়ার বিরাট সভা তাহার উদাহরণ। সেই সভার পর্দার অন্তরালে মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বোধহয় অনেকেই জানেন যে আত্মশাসন সম্পর্কে এদেশে সেই প্রথমসভা।"

"মহারাণী শরৎসুন্দরী হিন্দু ধর্মে অনন্ত বিশ্বাসবতী। তাহার জীবন হিন্দু ধর্মময়— হিন্দু শাস্ত্রের সকল অনুশাসন তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বাল-বিধবা সেই আবল্য, যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন। এই কঠোর ধর্ম ভাবের বলে তাহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙিয়া গিয়াছে। সেবার গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া কলিকাতার প্রাণ সংশয়রূপে পীড়িতা হন। সেই অবধিই প্রায় অসুস্থ। কিন্তু অসুখের কথা সহজে কেহ জানিতে পারে না। সর্বদা অনাবৃত হর্ম্যতলে বসিয়া থাকা তাহার নিয়ম। পীড়ার কষ্ট অসহ্য না হইলে আর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। সুতরাং পীড়া গুরুতর হইয়া না দাঁড়াইলে কখন তাহার চিকিৎসা হইতে পায় না। নিরাশ্রয়া বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা সংখ্যায় অনেকগুলি বারমাস তাহারা মহারাণীকে ঘেরিয়া বসেন ও নানা প্রকার গল্প করেন। রাত্রে প্রকাণ্ড চাতালে সকলের মধ্যস্থলে সামান্য শয্যায় শয়ন করেন। পালঙ্ক নাই, ইস্প্রিংয়ের গদী নাই, দুগ্ধ ফেন নিভ শয্যা নাই, মেজের উপর সেই সামান্য শয্যাতেই মহারাণী সন্তুষ্ট।"

"এক্ষণে কিছুদিন মধ্যে মহারাণী বোধ হয় কাশীবাস করিবেন। তিনি যেখানেই থাকুন, সমগ্র ভারতবাসীরও প্রীতি তাহার সহগামিনী হইবে।"[৩৩]

মহারাণী শরৎসুন্দরী কেবল যে দীন দুঃখীকে দান এবং স্বধর্ম কার্যে সমস্ত কাল যাপন করিতেন এমত নহে। তিনি বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্যেও অতি নিপুণ ও দক্ষ ছিলেন। বাংলা ১২৭২ সাল হইতে বাংলা ১২৯০ সাল পর্যন্ত আঠার বৎসর তাহার হস্তে সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। এই কাল মধ্যে তিনি সম্পত্তির অতি সুবন্দোবস্ত করেন এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পতির সম্পত্তির সহিত সংযোজিত করেন। তিনি প্রজাগণকে এরূপ স্নেহ সহকারে পালন করিতেন যে প্রজারা তাহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধিহারে জমা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ১৮ বৎসর মধ্যে তাহার সম্পত্তির আয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। যে ওয়াটসন কোম্পানির সহিত তাহার পতি রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ বিবাদ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়া সেই কোম্পানির সহিত সন্ধি করেন এবং কোন স্থলে আদালতের আশ্রয়ে অতি কৌশলে মীমাংসা করিয়া নির্বিবাদী হন এবং পরম সুখে প্রজা পালনে রত ছিলেন। মহারাণীর অমায়িকতা ও সদ্‌গুণে শত্রুগণও বশীভূত হইত। ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষে মহারাণী প্রজাগণকে মাতার ন্যায় আহার যোগাইয়া ছিলেন এবং অশক্ত অনেক প্রজার বাকি খাজানা মধ্যেও অনেক টাকা মাপ দিয়া সাধারণে শত সহস্র ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছিলেন। রাজা মহারাজা উল্লেখে মহাত্মা বড়লাট লর্ড কার্জন বাহাদুরের কথায় বলিতে গেলে মহারাণী শরৎসুন্দরী নিজের সুখের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন না; কিন্তু প্রজার মঙ্গলের জন্য। তিনি নিজ প্রজার যেমন প্রভু ছিলেন তেমনই দাসও ছিলেন।[৩৪] এই আদর্শ দৃষ্টে বঙ্গদেশের মহারাজা, রাজা, জমিদারগণ প্রজাপালন করিলে প্রজাগণের সুখের ইয়ত্তা থাকে না। এইরূপ আদর্শের মহারাজা, রাজা, জমিদার আজিকালি ভারতে অতি বিরল। আজি কালি প্রায় মহারাজা, রাজা, জমিদারগণ নিজের সুখের জন্য, নিজ কুটুম্ব প্রতিপালন জন্য, ইংরেজি ধরনের নূতন বিলাসিতা জন্য, প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া নিজ নিজ কোষ পূরণ করিয়া আনন্দিত হন। ধর্মভাবের অভাবেই প্রজাগণের দুঃখ হইলে, প্রজাগণ ও জমিদারগণের সুখ দুঃখের ভাগী হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

বাংলা ১২৯০ সালে তাহার দত্তক পুত্র, কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরী মাতৃভক্ত, বৎসল পুত্রের হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কুমার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াও মাতার বিনা আদেশে বা বিনা পরামর্শে কোন কার্য করিতেন না। কিন্তু তাহাকে অতি অল্পকাল রাজত্ব করিতে হইয়াছিল। মহারাণী কাশীধাম গমন করিবার অল্পদিন পরেই মাতৃভক্ত কুমার মাতৃ দর্শনে কাশীধাম গমন করেন। তথায় তাহার পীড়া উপস্থিত হয়। বাংলা ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে ছয় মাস গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া কুমার কাশীলাভ করেন। তদপর বাংলা ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে মহারাণীর পুত্রবধূ হেমন্তকুমারী দেবী এক কন্যা প্রসব করেন। পুত্রের পরলোক গমনের পর মহারাণী তাহার পুত্রবধূর আত্মীয়গণকে সমাদরে নিকটে রাখিতেন। এসময় হইতে পুত্রবধূর সহিত তাহার মনান্তর ঘটাইবার জন্য দুইটি দল সৃষ্টি হইল। মহারাণী তাহা জানিতে পারিয়া কিছু দিন তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে রাজ কার্যের সংস্রব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, যদিচ কুমারের মৃত্যুর পর মহারাণীর হস্তে রাজকার্যের ভার অর্পিত ছিল। বাংলা ১২৯২ সালের পৌষ বা মাঘ মাসে মহারাণী তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইলেন। অযোধ্যা, চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, জ্বালামুখী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করিয়া বৈশাখ মাসে কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় সকল তীর্থ দর্শনে নিজ পদব্রজে ১০/১২ ক্রোশে পথ গমন করিয়া কাতর হইলেও তিনি ধর্ম বলে বলীয়ান হইয়া কোন যানে পরমসুখে যাইবার প্রয়াস পান নাই। আত্মীয় ও কর্মচারীদের কৌশলে পুত্রবধূর সহিত মহারাণীর যে মনান্তর চলিতেছিল তাহা তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াও নির্বাপিত হইতে দেখা গেল না। তখন মহারাণী ১২৯৩ সালে পুঁঠিয়া আগমন করিয়া অনেকের অনিচ্ছায় সম্পত্তি বধূরাণীর বয়ঃপ্রাপ্ত কাল পর্যন্ত "কোট অব ওয়ার্ডসের" তত্ত্বাবধানে লইবার জন্য স্বয়ং রাজসাহীর কালেক্টরের নিকট আবেদন কারেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিধবা রাণী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী বেশে দিন যাপন করিতেন এবং অনিয়মে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়াও তিনি ওষধ সেবন করিতেন না। অর্শ, অম্লপিত্ত, উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি রোগের ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া তিনি একরূপ শয্যাগত হইলেন। এরূপ শরীরেও তাহার নিয়মিত ধর্মকর্মের বাদ ছিল না বা তিনি কষ্ট বোধ করিতেন না। তখন আর তিনি পুঁঠিয়ায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঐরূপ কাতর শরীরে কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন। কাশীধামে যাইবার পরও তাহার আর রোগ সমূহ হইতে আরোগ্য লাভের আশা রহিল না। এই সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব দিন টেলিগ্রাম পাইয়া জানিতে পারিলেন যে সম্পত্তি "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" অধীন হইবে না। এই সংবাদ পাইবার পর ১২৯৩ সালের ২৫ ফাল্গুন তারিখে মহারাণী কাশীলাভ করিয়া পুণ্যধামে গমন করেন। তাহার কাশী প্রাপ্তির পর পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন।

রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পতির সম্পত্তির ভারগ্রহণ করার অব্যবহিত পরে তাহার আত্মীয়-স্বজন স্টেটের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। রাণী অল্প বয়স্কা এবং বিষয়-কৌশলতাও তাহার তাদৃশ ছিল না। এমতাবস্থায় ভূসম্পত্তির শাসনকার্য সুচারুরূপে নির্বাহ না হওয়ারই কথা। মহারাণী শরৎসুন্দরীর দয়া, অমায়িকতা এবং সুশাসনের পর রাজ্যের বিশৃঙ্খলতায় অনেক শত্রুর সৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মাসীর পুত্র জয়নাথ চক্রবর্তীকে শত্রুপক্ষীয়েরা এই বলিয়া উত্তেজিত করেন যে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী এখন মাসীর পুত্র, যেহেতুক শাস্ত্রের বিধানানুসারে যোগেন্দ্রনারায়ণের দত্তক রাখা হয় নাই। শত্রুদেব এইরূপ উত্তেজনায় এবং অনায়াস লব্ধ একটা বৃহৎ রাজ্য লাভের আশায় জয়নাথ রাজসাহীর জজ আদালতে দত্তক পুত্র অসিদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। জয়নাথের মৃত্যুর পর আদালতে দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইল। জয়নাথের উত্তরাধিকারীগণ মোকদ্দমায় পরাজিত হইল বটে কিন্তু এই মোকদ্দমায় অযথা প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। মোকদ্দমার পর হইতেই স্বজন বন্ধুবান্ধবদের

পূর্বের মত কর্তৃত্ব রহিল না এবং রাজ্য শাসনকার্যও অনেক ভাল হইল। বর্তমানে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যের শুভ লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে।

পুঁঠিয়ার রাজ-মহিলা—আর্যজাতির মধ্যে অনেক সাধ্বী পতিব্রতা, পুণ্যবতী, দয়াবতী এবং দানশীলা মহিলা ধনীর অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে ছিল এবং বর্তমানে আছে। কিন্তু এক মহিলাতে সকল গুণ থাকা বিরল। কেহ হয়ত পতিব্রতা কিন্তু দয়াবতী ও দানশীলা নহে, আবার কেহ হয়ত দয়াবতী ও দানশীলা কিন্তু পতিব্রতা নহে। আবার রাজ রমণীর রাজকার্যের পটুতা সকল স্থলেও দৃষ্ট হয় না। পুঁঠিয় রাজবংশ ধর্মের, পুণ্যের সংসার বলিয়া কীর্তিত হয়। এ বংশের মহিলাদের দেবচরিত্র নিতান্ত প্রশংসনীয়। এই পুঁঠিয়া রাজবংশে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী রাণী সূর্যমণী দেবী, রাজা জগন্নারায়-এর পত্নী রাণী ভুবনময়ী দেবী এবং রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের পত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর কীর্তিকলাপ এরূপ বিস্তৃত এবং প্রসিদ্ধ যে নাম ও যশে বংশের গৌরব সমগ্র ভারতে ব্যাপিয়া আছে। এই তিনটি রমণী মধ্যে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী যেরূপ বালবিধবা হন এরূপ অপর কেহই নহে। যদিচ রাণী সূর্যমণী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পতির ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়ার পর সুকৌশলে রাজকার্য নির্বাহ করেন, তথাপি মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর ন্যায় রাণী সূর্যমণী বা রাণী ভুবনময়ী কেহই যশস্বিণী হইতে পারেন নাই। সুতরাং মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর গুণকীর্তণে হিন্দু মহিলার সহিত পতির কিরূপ সংস্রবে থাকিতে হয় এবং হিন্দু মহিলার কি কর্তব্য তাহাই প্রকাশ পাইবে।

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী পুঁঠিয়া নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ভৈরবনাথ সান্যালের কন্যা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই এই কন্যার হৃদয় দয়া ও উদারতায় পরিপূর্ণ ছিল, যদিচ পিতৃগৃহে কোনরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। ইহার প্রায় ছয় বৎসর বয়সের সময় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত বিবাহ এবং তিনি প্রায় ১৩ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তাহার পর প্রায় ২৫ বৎসর তিনি জীবিতা ছিলেন। পতিগৃহে আসিয়া বিধবা হইবার পূর্বে পতির ভালবাসা ও যত্নে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং পতির পরলোক গমনের পর সেই সামান্য শিক্ষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তাহার নির্মল জ্ঞান এবং পবিত্র দেবচরিত্রের এত উৎকর্ষতা লাভ করে যে তাহাকে সামান্য মানবী না বলিয়া দেবী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর্যজাতির বিবাহের প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে পুতিপত্নী উভয়ে ধর্ম বন্ধনে সম্বন্ধ থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত ধর্ম পালন করিবে। কিন্তু হায়! ভারতের কি দুর্দ্দশা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং ঊনবিংশতীর সভ্যতা ও বিলাসিতার দুর্দমনীয় অত্যাচারে, এই ধর্মবন্ধনী ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে। এই ভারতের দুর্ভাগ্য! এমন দুঃসময়ে সেই রমণী শৈশবকাল হইতে যৌবনের অতীতকাল পর্যন্ত এক মনে, এক হৃদয়ে, এক আত্মায় পতির প্রিয় কার্য সাধনে, নারী ধর্ম প্রতিপালনে, স্বধর্ম রক্ষণে, দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে এবং প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালনে, নিজ অনিত্য দেহকে বিসর্জন দিয়াছেন। "স্বামী স্ত্রীলোকদিগের তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু। অতএব নারী সর্বান্তঃকরণে পতি সেবা করিবে।"[৩৫] আর্যজাতির বিবাহ বন্ধন এইরূপ যে স্বামীর অভাবেও সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রী সর্বান্তঃকরণে তাহার সেবা কবিবে এবং পতিব্রতা সাধ্বীভাবে থাকিয়া তাহার প্রিয়কার্য সাধন করিবে; আবার পতির অভাব হইলে ব্রহ্মচারিণী বেশে সেই পতিকে ধ্যান করিয়া মনে মনে তাহারই চরণ পূজা করিবে এবং দেবার্চনা, দয়া ও দান ধর্মদ্বারা চিত্তকে পবিত্র রাখিবে। "যে ভার্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারী ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।"[৩৬] নারী কোন কালে স্বাধীন নহে। বিবাহের পূর্বে নারী পিতার অধীন, বিবাহ হইলে পতির অধীন, এবং পতির অভাবে তিনি সকল জগতের—প্রজার, দীন ও দুঃখীর—দাস ও অধীনা ছিলেন। এই আদর্শের নারীই মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত

এরূপ পতিপ্রাণ; পতিব্রতী, সাধ্বী, দয়াশীলা ও দানশীলা রমণী ভারতে দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজারাণী হইয়া মৃত্তিকা যাহার শয্যা ছিল; হস্ত যাহার বালিশ ছিল। এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুল যাহার জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান ছিল, পতি ও দেবসেবায় যাহার শরীর অর্পিত হইয়াছিল, যাহার অতুল ধনরাশি দীন দুঃখীর সেবায় নিয়োজিত ছিল, যাহার যাবতীয় ধর্ম ও কর্ম, নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে নির্বাহিত হইয়াছিল, তাহাকে আমি কেন, জগতের সকলেই এক বাক্যে বলিবে যে তিনি মানবী নহে; তিনি দেবী। তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি-লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। যতদিন এজগতে চন্দ্রসূর্য বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহার কীর্তিও এ জগতে জীবিত থাকিবে।

১ Vida Talksim Jama— Ayan Akbari.

২. "The Thakurs or as they are commonly called, the Rajas of Putiya constitute the oldest territorial aristocracy of Rajshahe"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৩. "বৎসাচার্যের (বাৎসরাচার্য) সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুষ্করাক্ষ, তাহিরপুরের ভৌমিক রাজাদিগের রাজধানী বামরামা গ্রামেই সর্বদা থাকিতেন। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে চারিদিক হইতে নানা বিভব আসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহিরপুরের রাজাবা দুই সহোদর ছিলেন, এবং ছোট রাজা পুষ্করাক্ষকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না, সেই নিমিত্ত অতি নির্বিঘ্ন হৃদয়ে অসার সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে গমন করেন। যাইবাব সময় তাহার অর্ধঅংশ-সম্পত্তি স্নেহ ভাজন পুষ্করাক্ষকে প্রদান করেন।"– শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত। "হস্তবুদ" দেখিয়া ইহা অনুমিত হয় যে তাহিরপুরের ছোট রাজার নাম "শিবেন্দ্রনারায়ণ।"

৪. কুলজ্ঞ গ্রন্থ।

৫. মহাত্মা কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতা রিবিউতে "The Rajas of Rajshahi" শীর্ষক প্রবন্ধে বৎসরাচার্য্যের আশ্রম পুঁঠিয়ায় নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে "পুঁঠিয়ার প্রায় চারি মাইল পূর্বদিকে চন্দ্রকলা-গ্রামে বৎসাচার্যের (বৎসরাচার্যের) নিবাস ছিল।" কোন নবাব সবকারের বা কোম্পানির আমলের রেকর্ডে জানা যায় না যে চন্দ্রকলা হইতে আসিয়া কোন্ সময় পুঁঠিয়ায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

৬. দিল্লিব বাদসাহ হইতে পীতাম্বর "শহর মণ্ডল" উপাধি প্রাপ্ত হন।

৭. "উক্ত প্রবাদের মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, দর্পনারায়ণ হইতে চারি পুরুষ উর্দ্ধেই এক সময়ে সুযোগে পুঁঠিয়ার ঠাকুর বংশ জমিদারি লাভ করেন। চারি পুরুষ ১২০ বৎসর ধরিলে এ বিপ্লব বাদসাহ আকবরের সময় ঘটে, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে। সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মতো পুঁঠিয়ার রাজারাও তাহাদের জমিদারির জন্য হিন্দু রাজা তোডরমল বা মানসিংহের নিকট ঋণী, ইহা নির্দেশ করা যাইতে পারে।"—উৎসাহ, শ্রাবণ ১৩০৫।

কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে দিল্লিশ্বর ঘিয়াসউদ্দীন তৌগলগের সময় পুঁঠিয়ার রাজ্যলাভ হয়। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে ঘিয়াসউদ্দীন বাংলায় আইসেন। লাহিড়ি মহাশয়ের লিখা মত দর্পনারায়ণ হইতে চারি পুরুষ উর্দ্ধে ১৫২ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বোধ হয়। অতএব আকবরের সময়েই এই বিপ্লব সম্ভব।

৮. The Elphinistons's History of India. Book-IX, Chapter, III.

৯. Probably Raja Todar Mal or Raja Man Sing. ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসের উৎসাহের লেখকের মতে রাজা তোডরমল বা রাজা মানসিংহই সম্ভব। কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে সুবাদার বখর খাঁর বিদ্রোহ দমন জন্য দিল্লিশ্বর (ঘিয়াসউদ্দীন তৌগলগ) স্বয়ং আগমন করেন এবং ঢাকা নগরের অভিমুখে যাত্রা-সময় পুঁঠিয়ার অনতিদূরে চন্দ্রকলা গ্রামে তিনি শিবির সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু মহাত্মা কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এবং উৎসাহ লেখক মহাশয়ের মতে দিল্লির সম্রাট স্বয়ং আগমন করাব উল্লেখ নাই। কিন্তু ঘিয়াসউদ্দীন স্বীকার করিলে এলফিনিস্টনের ভারত ইতিহাসে বাংলার বিদ্রোহ দমন জন্য সম্রাটের স্বয়ং গমনের উল্লেখ আছে। আকবর বাদসাহ স্বীকার করিলে রাজা তোডরমল বা রাজা মানসিংহকে সৈন্য সমেত বাংলায় পাঠানের

কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

১০. শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে "দিল্লিশ্বর লোক মুখে বৎসাচার্যের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া, আচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে দুইটা প্রশ্ন করেন। আচার্য, তদুত্তরে বলেন যে,— বঙ্গদেশ পুনরায় সম্রাটের শাসনাধীন হইবে; অবাধ্য সুবাদারও স্বকর্মেই থাকিবেন। আর এক বৎসরের মধ্যেই সম্রাটের আয়ুষ্কাল শেষ হইবে;—তিনি কোন আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে অপঘাতে মৃত্যুর বশীভূত হইবেন।" এলফিনিস্টনের ইতিহাসে দেখা যায় যে ঘিয়াসউদ্দীন তৌগলগ অপঘাত মৃত্যুর বশীভূত হন, কিন্তু আকবরের রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়।

১০ক. ইহারা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

১১. আরঙ্গজীবের পৌত্র আজিমওসমানের সময় রামচন্দ্র বর্তমান। রামচন্দ্র জলবিহার উপলক্ষে সাতুলে যান। সাতুলের ছোট রাজা রামেশ্বর এই রামচন্দ্রের সহিত নিজ কন্যা লীলাবতীর বলপূর্বক বিবাহ দেন। সাতুলের রাজবংশ পঞ্চপাতকী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং এই বিবাহ হইতে পুঁঠিয়া রাজবংশে পাঁচুড়িয়া দোষ স্পর্শে। এই জন্য কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন "সাধুর ভরাতল পুঁঠিয়াতে গলই জাগে।"

১২. "On the death of Pitambar, his younger brother Nilambar succeeded him in his Estate"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

"বৎসরাচার্যের সাতটি পুত্র;— নীলাম্বর, পীতাম্বর এবং পুষ্করাক্ষ ব্যতীত, আর চারি পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়।"—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত।

লাহিড়ি মহাশয় নীলাম্বরকে বৎসরাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মিত্র মহাশয় পীতাম্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের লিখাই যেন সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

১৩. "His son Ratikanto in consequence of certain unpopular acts, did not inherit the title of Raja, but was known among the people as "Thakur" a title which still distinguishes the family"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

"এই বংশ, রাজোপাধি ও বিস্তৃত সম্পত্তি ভোগ করিলেও, বহু-পুরুষ পর্যন্ত বৎসরাচার্যের সদাচার ও যোগ নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল, সেই জন্য, ইহার পুত্র রতিকান্তকে দেশস্থ লোকে পূজনীয় "ঠাকুর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পরে বঙ্গের সুবাদার কর্তৃকও ঐ উপাধি অনুমোদিত হয়; সেই হইতে পুঁঠিয়ার রাজবংশকে সাধারণে ঠাকুর নামে অভিহিত করিয়া থাকে।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মহাশয় প্রণীত শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত।

মিত্র মহাশয় বলেন সাধারণের অপ্রিয় কার্য জন্য এবং লাহিড়ি মহাশয় বলেন ধর্ম-নিষ্ঠার পরিচয় স্বরূপ রতিকান্তকে "ঠাকুর" উপাধি দেওয়া হয়। ঐ বৈষম্যের মীমাংসা করা কঠিন।

১৪. "It was the custom, as observed, in the fifth Report of the select-committee on the affairs of East India Company, for the land-holders of distinction and other principal inhabitants to maintain in proportion to other rank, an intercourse with the ruling power, and in person or by Vakil or Agent to be in constant attendance at the seat of Government or with the officers in authority over the district where their lands or their concerns were situated. To establish an interest at the Durbar and to procure the protection of some powerful patron, were to them objects of the unceasing solicitude."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

* "ভবানীপুরী অবসাদ প্রাপ্ত কুলীনগণকে নিষ্কৃতি করেন"— গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

১৫. লেখক সমপাঠী ছিল বলিয়া, তাহার চরিত্র ও তাহার সম্পত্তি আদি সম্বন্ধে অনেক জানেন।

১৬. এই "ইনস্টিটিউসনে" থাকিয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁঠিয়াব কুমার পরেশনারায়ণ রায়, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং দিঘাপতিয়ার কুমার প্রমথনাথ রায় বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইহাদের মধ্যে দিঘাপতিয়ার কুমারই সুশিক্ষিত হন।

১৭ "১২৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। সুতরাং ১২৬৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার পূর্ণ আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে আইনে আঠার বৎসর বয়সই বয়ঃপ্রাপ্ত কাল নির্দিষ্ট ছিল। সে স্থলে তাহার ১২৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সম্পত্তি লাভ করিবার কারণ কি? তৎসম্বন্ধে তাহার

সম্পত্তির তৎকালীয় মেনেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার (যিনি এক্ষণে কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টে কতিপয় জমিদারের পক্ষে মোক্তারি করিয়া থাকেন) বলেন যে, যোগেন্দ্রনারায়ণের কোষ্ঠি দৃষ্টে ১২৬৫ বঙ্গাব্দই তাহার প্রাপ্তবয়স্ক কাল নির্ণীত হইয়া, রাজসাহীর কলেক্টর কর্তৃক ঐ সময় পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি ইজারা বিলি হইয়াছিল। পরে যোগেন্দ্রনারায়ণ যে, সময়ে কলিকাতা শিক্ষাগারে প্রবেশ করেন, সে সময়ে ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোর্ড অব রেভিনিউতে (Board of Revenue) রিপোর্ট করেন যে, যোগেন্দ্রনারায়ণের শারীরিক গঠন ও দন্তাদি দৃষ্টে প্রকৃত বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তাহার বিবেচনায় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পূর্ণ বয়স্ককাল অনুভব হয়; ঐ কাল পর্যন্ত শিক্ষাগারে না থাকিলে, তাহার সুশিক্ষাব ব্যাঘাত হইবে। বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে রাজেন্দ্রবাবুর অনুমানই অকাট্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসই বয়ঃপূর্ণের কাল নির্ণীত হয়। রাজেন্দ্র বাবু একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন; এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আজীবন লেখনী চালনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যদি সমুদয় কার্যে এইরূপ অভিজ্ঞতা পরিচালনা করিয়া থাকেন, তবে বঙ্গদেশের বড়ই দুভার্গ্য বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, রাজেন্দ্র বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির চাতুর্যে জ্বালাতন হইয়া প্রস্তাবিত উপায়ে শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আইনে গুরুতর অপরাধের বন্দিকেও নিয়মিতকালের অতিরিক্ত এক ঘণ্টা কাল কারারুদ্ধ রাখিলে গুরুতর অপরাধ হয়। সেই গবর্ণমেণ্টের প্রধানত রাজস্ব কর্মচারী, কোন প্রমাণের বলে কোষ্ঠী অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে এক বৎসর অধিককাল, শিক্ষাগাব রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান বুদ্ধির অতীত।"

"১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পূর্ণ বয়স্কের কাল হইলেও, ভগ্ন বৎসর হিসাব নিকাশের গোলযোগ হয় বলিয়া, কালেক্টর চৈত্র মাস পর্যন্ত যোগেন্দ্রনারায়ণেব হস্তে সম্পত্তি দিযাছিলেন না। এই কালেক্টর বিখ্যাত মিঃ টেলাব; যোগেন্দ্রনাবায়ণের রাজসাহী জেলায় ইজারদার ওয়াটসন কোম্পানির বোয়ালিয়ার কুঠির কর্মধ্যক্ষ মিঃ কুববরণ সাহেবের কণ্যাকে বিবাহ করিয়া নীল বিদ্রোহেব সময় অনেক সুকীর্তি করিয়াছিলেন"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত।

১৮. হরিনাথ সান্যাল নিজ কন্যা সূর্যমণিকে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণেব সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার পর তাজপুর হইতে পুঁঠিয়ায় বাস করেন এবং কন্যার সাহায্যে অনেক জমিদারি ক্রয় করেন।

১৯. শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দবীর জীবন চরিত।

২০. লেখক ইহার দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ইহাতে এই অনুমিত হয় যে যোগেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু স্কুলে মাত্র সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

২১ "নিজ জোতের" ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে।

২২ "তাহার হৃদয়, প্রদীপ্ততেজে—দুর্দম উৎসাহে পরিপূর্ণ। তিনি এই কার্যে আপনার সমস্ত সম্পত্তি—সমস্ত অর্থ, এমন কী, প্রাণ পর্যন্তও দিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। অতএব প্রাণের প্রতি অনুমাত্রও মমতা রহিল না।"—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত।

২৩. "সে সময়ে এই দুশ্চিন্তায় তাহার আহার নিদ্রা দূরের কথা, পবিত্র হৃদয়া প্রণয়িণী শরৎসুন্দরীও তাহার হৃদয় হইতে স্থানচ্যুতা হইলেন।"—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত।

২৪ যোগেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা "ওযার্‌ডস ইনস্টিটিউসনে" থাকা সময় সুরা পান করা অভ্যাস করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু বোয়ালিয়ায় পাঠাবস্থার সময় লেখক সমপাঠী ছিল এবং অনেক সময়ে সহবাসে কালযাপন করিয়াছে; তথাপি সে সময় কোন দিন সুরা পান করা বলিয়া দৃষ্ট হয় নাই।

২৫ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত।

২৬. শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ্র লাহিড়ি মহাশয় প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত।

২৭. কুলশাত্র দীপিকা।

২৮. মহারাণীর মাতার নাম দ্রবময়ী, দ্রবময়ী অতি সুশীলা গুণবতী বলিয়া পুঁঠিয়াতে খ্যাতি লাভ করেন।

২৯. বিবাহেব সময় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের ১৫ বৎসর বয়স ছিল।

৩০. লালপুর মধ্য-শ্রেণি ইংরেজি স্কুল পুঁঠিয়া মধ্য-শ্রেণি বাংলা স্কুল, মধুখালি মধ্য-শ্রেণি বাংলা স্কুল ; ইহা ব্যতীত অনেক স্কুল ও পাঠশালায় মাসিক সাহায্য ছিল।

৩১. "বঙ্গবাসী" ১২৯০ সাল ১৬ বৈশাখ।

৩২. গোয়ালিয়রে বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন :—

"He must be the servant, as well as the master of his people. He must learn that his revenues are not secured to him for his own gratification, but for the good of his subjects."— The Indian Empire, 5th december 1899.

৩৩. "নৈব এতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রুষণং বিনা
ভর্ত্তৈব যোমিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা নারী পতি সেবাং সমাচরেৎ
পত্যুঃ প্রিয় সদা কুর্য্যাং বচসা পরিচর্য্যয়া।।"

মহানির্বাণতন্ত্র।

৩৪. "পতি প্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্।।"

নবম অধ্যায়

নাটোর রাজবংশ

নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি—আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন, তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেনমণি একজন। এই সুষেনাদির পুত্রগণ বরেন্দ্রভূমে একশত গ্রামে বাস করেন। সুষেণ বংশের মতু নামক একব্যক্তি মৈত্র উপাধি প্রাপ্ত হন। মতু ও তাহার সন্তান কুলীন ছিল। ঐ বংশে জীবর মৈত্র[১] নামক ব্যক্তি কুলচ্যুত হন। নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ কামদেব মৈত্র ঐ জীবর মৈত্রের বংশধর। ঐ কামদেব পুঁঠিয়ার রাজবংশের নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে পরগণে লস্করপুরের অন্তর্গত বারইহাটা গ্রামের তহশীলদার ছিল। কামদেবের তিন পুত্র;— রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। তিন ভ্রাতা রাজধানীতে থাকিয়া তৎকালোপযোগী লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন। এই সময় আরঙ্গজেব দিল্লির সম্রাট ছিলেন।

রঘুনন্দনের উন্নতি—এই তিন ভ্রাতার মধ্যে রঘুনন্দন বুদ্ধিমান এবং প্রতিভা গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহা কথিত আছে তিনি পুঁঠিয়া রাজসংসারে দেবপূজার পুষ্প সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। এই জনশ্রুতি আছে যে এক দিবস ক্লান্ত হইয়া রঘুনন্দন পুষ্পোদ্যানে শয়ন করিয়া আছেন। একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে সূর্যের রশ্মি হইতে রক্ষা করিতেছে। এটি রাজচিহ্ন বলিয়া প্রবাদ। রাজা দর্পনারায়ণ রায় এই সংবাদ পাইয়া রঘুনন্দনকে ডাকিলেন। রঘুনন্দন উপস্থিত হইলে রাজা দর্পনারায়ণ বলিলেন, "রঘুনন্দন তোমার রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে; তুমি রাজচক্রবর্তী হইলে আমার বংশধরকে কখন রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে না; এই প্রতিজ্ঞা কর।" রঘুনন্দন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তিনি রাজা হইবেন। সুতরাং তিনি সহজে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "আমার দ্বারা পুঁঠিয়া রাজবংশের কোন অনিষ্ট হইবে না।" এই ঘটনার পর হইতে রঘুনন্দনের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। রাজদরবারে রঘুনন্দনের বুদ্ধি ক্রমে বিকাশ পাইতে লাগিল। রঘুনন্দনকে বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ জানিয়া রাজা দর্পনারায়ণ রায় ঢাকার নবাব দরবারে তাহাকে মোক্তার বা উকিল[২] নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সেই সময় এই প্রথা ছিল যে নবাব দরবারে কোন রাজা বা জমিদারের পক্ষে মোক্তার বা উকিল না থাকিলে তাহার রাজ্য রক্ষা হইত না। পুঁঠিযা রাজার পক্ষে উকিল হওয়াই রঘুনন্দনের উন্নতির সোপান হয়।

রঘুনন্দন মুরশিদাবাদে—এসময় মুরশিদকুলি খাঁ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব। তাহার রাজধানী ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগরে) ছিল। ঢাকায় যাওয়ার পর হইতে মুরশিদকুলি খাঁ রঘুনন্দনের বুদ্ধিমত্তা ও কার্যদক্ষতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দনের পরামর্শেই কুলি খাঁ দেওয়ানি কার্যালয় প্রভৃতি ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে উঠাইয়া আনেন।

রঘুনন্দনের "নায়েব কানুনগো" এবং "রায় রায়াণ" পদ প্রাপ্তি—মুসলমান রাজ্যের আইন কানুন রঘুনন্দন অতি শীঘ্র শিক্ষা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং নবাবের যাবতীয় কর্মচারিদের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। বিশেষত প্রথম কানুনগোর মত, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে রঘুনন্দনের ন্যায় সুযোগ্য কর্মচারী অতি বিরল। রঘুনন্দনের গুণে ও কর্মদক্ষতায়, প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে "নায়েব কানুনগোর" পদে

নিযুক্ত করিলেন। কানুনগো সমগ্র সুবার ভূসম্পত্তির রেজেষ্ট্রার, পরগণা ও মৌজার সীমা, রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য, ভূমি সম্বন্ধীয় প্রথা ও নিয়ম প্রভৃতি কানুনগোব দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে নবাব ও দিল্লির সম্রাট আদেশ দিতেন। বৎসর অন্তরে যাবতীয় রাজস্বের একটি হিসাব কানুনগোকে প্রস্তুত, মহর এবং স্বাক্ষর করিয়া প্রথমে নবাবের এবং পরে দিল্লির সম্রাট সমীপে পাঠাইতে হইত। এই কানুনগোদের দস্তখতী কাগজ ভিন্ন রাজসাহী খালসা দপ্তরে সুবার দেওয়ানের নিকাশ দিবার নিয়ম ছিল না। প্রথম কানুনগো দর্পনারায়ণ এবং দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণকে দস্তখত জন্য অনুরোধ করা হইল কিন্তু কেহই দস্তখত করিল না। দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণ নিকাশী কাগজে দস্তখত না করায় নবাব মুরশিদকুলি খাঁ বিপন্ন হইয়া রঘুনন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রঘুনন্দনও কানুনগোর মহর ও দস্তখত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ১৩০৪ শকের বৈশাখ মাসের "সাহিত্যে" যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "আজিমওষানের সহিত মুরশিদকুলি খাঁর মনোমালিন্যের পর কুলি খাঁ হিসাব লইয়া স্বয়ং বাদসাহ দরবারে গেলে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিবার অবসর পাইবেন এই চিন্তায় আজিমওষানের মুখ শুকাইল। তিনি কানুনগোগণকে শাসন করিয়া দিলেন যেন নিকাশী কাগজে দস্তখত না করেন। কানুনগোদ্বয় উভয় সঙ্কটে পড়েন। এদিকে কানুনগোর সহী না পাইয়া কুলি খাঁর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল; অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রঘুনন্দনের স্মরণাগত হইলেন। রঘুনন্দনের চেষ্টায় একজন মাত্র কানুনগোর দস্তখত যুক্ত হিসাব ও উপঢৌকন লইয়া তিনি সম্রাটের নিকট গমন করেন। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে তখন অর্থের বড়ই অনটন, কুলি খাঁও বহু অর্থ লইয়া উপস্থিত, কাজেই একজন কানুনগোর দস্তখত খবরেই আসিল না।" নির্বিঘ্নে নিকাশী কাগজ বাদসাহর সরকারে দাখিল হইল। এই কার্যের পর হইতে রঘুনন্দনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যুর পর কানুনগো দর্পনারায়ণ দেওয়ানি কার্যের ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর দর্পনারায়ণ পরলোক গমন করিলে, রঘুনন্দন দেওয়ান হন এবং "রায়রায়াণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। "রায়রায়াণ" সুবার প্রধান কর্মচারী এবং দেওয়ানের নিম্নপদ। দেওয়ান সুবার নবারের প্রতিনিধি স্বরূপ। দেওয়ান পদ বহু সম্মানের। নবাব রাজশাসনে দুর্বল ও শিথিল হইলে দেওয়ানই সর্বময় কর্তা। পক্ষান্তরে নবাব কার্য দক্ষ হইলে, দেওয়ান নবাবের অধীন থাকিয়া তাহার আজ্ঞানুসারে নায়েব স্বরূপ রাজ্য শাসন করিতে সক্ষম।[৩] এক্ষণে রঘুনন্দন নবাব কুলি খাঁর "রায়রায়াণ" এবং "দেওয়ান"— সর্বময় কর্তা। রঘুনন্দনের নিকট কুলি খাঁ ঋণী এবং তাহারই যত্নে বাদসাহ দরবারে নিকাশ হইতে অব্যাহতি পান। নবাব কুলি খাঁ রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলে রঘুনন্দন তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। "মুরশিদকুলি খাঁর সুবিখ্যাত রাজস্ব বন্দোবস্তে দেওয়ান রঘুনন্দন তাহার দক্ষিণ হস্ত; প্রতিভা ও কর্ম কুশলতায় তিনি কুলি খাঁর উপযুক্ত সহকারি" ছিলেন।[৪]

রঘুনন্দনের রাজ্যলাভ— ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপনের পর মুরশিদকুলি খাঁ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন এবং রাজস্ব নির্ধারণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই বৃহৎ কার্যে "রায়রায়াণ" রঘুনন্দন তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। সমুদয় দেশ ১৩টি চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বঙ্গের বার্ষিক রাজস্ব ১৪২৮৮১৮৬ টাকা নির্ধারিত হয়। এই রাজস্ব আদায়ের ভার নবাব মুরশিদকুলি খাঁর দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁর প্রতি অর্জিত হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য সৈয়দ রেজা খাঁ জমিদারগণের প্রতি বিশেষ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেন। তাহার দৌরাত্ম্য এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল যে কোন জমিদারের প্রাণ বিয়োগ হইল, কেহ বন্দি হইল এবং কেহ নির্বাসিত হইল। জমিদারগণের উত্তরাধিকারক্রমে জমিদারি দখল রাখিবার প্রথা থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব বাকির জন্য তাহাদের জমিদারি অন্য নূতন জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।[৫] এইরূপে নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টি করা আবশ্যক হইল। ইহাই নাটোর রাজবংশের রাজ্য লাভের মূল সূত্র। নূতন নূতন

জমিদার সৃষ্টির সময়, দেওয়ান রঘুনন্দন নিজ বুদ্ধি কৌশলে নির্ধারিত রাজস্ব নিরুদ্বেগে আদায় করার ভানে আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে নূতন নূতন জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। রামজীবনও বাহুবলে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া নবাব সরকারের রীতিমত দাখিল করিতে লাগিলেন বলিয়া তাহার প্রতি নবাব ও দিল্লির সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই রাজ্য বিস্তারের সুযোগ হইল। নিম্নে সেই সকল জমিদারি প্রাপ্তির বিবরণ লিখিত হইল :—

(১) বাংলা ১১১৩ সালে পরগণা বাণগাছির বিখ্যাত জমিদার গণেশরাম ও ভগবতীচরণ চৌধুরি, রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায় রাজ্যচ্যুত হন। সেই পরগণা বাণগাছি দেওয়ান রঘুনন্দন কৌশল ক্রমে নিজ জ্যেষ্ঠ রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নাটোর বংশের এই প্রথম রাজ্যলাভ।

(২) বাংলা ১১১৭ সালে পরগণা ভাতুড়িয়ার সাতুল রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, তাহার উত্তরাধিকারী তাহার পত্নী রাণী সর্বাণী ছিলেন। রাণী সর্বাণীর নামে দেওয়ান রঘুনন্দন সাঁতুল রাজ্যের কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার হইলেন।

(৩) উদিত (উদয়) নারায়ণ সমগ্র রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে বাংলা ১১২১ সালে দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে উদয় নারায়ণের সমগ্র জমিদারি বন্দোবস্ত হয়;[৬] কিন্তু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,[৭] "বিস্তীর্ণ রাজসাহীর জমিদারি ও রঘুনন্দন রামজীবন এবং কালুকোঙর— এই দুই নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন"।[৮] বাংলা ১১২২ সালে নবাব নলদাহ পরগণা রামজীবনকে প্রদান করেন।

(৪) উদয়নারায়ণের রাজসাহী জমিদারি রামজীবনের হস্তগত হইবার কিছুদিন পরে, যশোহরের জমিদার সীতরাম, ফৌজদার আবুতরাবকে বধ করার অপরাধে ধৃত হইয়া বন্দি হন। কিন্তু সীতারাম কারাগারে মৃত্যু হওয়ায় তাহার জমিদারি পরগণা ভূষণা, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের প্রতি অর্পিত হইল।

(৫) স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে বাংলা ১১৩১ সালে রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়।[৯] তাহার মৃত্যুর পর হাবিলী, মাহমুদপুর, সাহুজীয়ান, তুঞ্জী এবং স্বরূপপুর প্রভৃতির জমিদারগণ কিশোর খাঁ, সমসের খাঁ, এনাএত খাঁ এবং পরগণা পুকরীখার জমিদার ইছফিন্ডের বেগ নরহত্যা অপরাধে বন্দি হন, এবং নবাব তাহাদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া রামজীবনকে অর্পণ করেন।

(৬) ইহার কিছুদিন পর জালালপুরের জমিদার এনাএত উল্লা রাজস্ব বাকি ফেলিয়া নবাব সরকারে সেই বাকি রাজস্ব পরিশোধ করার মানসে রামজীবনের নিকট তাহার জমিদারি বিক্রয় করে। এই রূপে একটি বিস্তৃত রাজ্য রামজীবনের অধিকৃত হইল।

নাটোর রাজবাটি নির্মাণ— লস্করপুর পরগণার অধীন তরফ কানাইখালির অন্তর্গত নাটোরে রাজবাটি নির্মাণ হয়। যে স্থানে রাজবাটি নির্মিত হয় সেই স্থান ছাইভাঙা নামক বিল বলিয়া পরিচিত ছিল। রাজবাটির চারিদিকে চৌকি বা পরিখায় বেষ্টিত। এইরূপ রাজবাটি নির্মাণ করিয়া প্রবল প্রতাপে রামজীবন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে নবাবের অনুগ্রহে দিল্লি হইতে তিনি ২২ খান খেলাত এবং "রাজা বাহাদুর" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নাটোর রাজ্যের সীমা— রামজীবনের সময় রাজসাহী জমিদারি বাংলার মধ্যে আয়তনে সর্বপ্রধান ছিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "ইহার তদানীন্তন পরিমাণ বার হাজার বর্গমাইলেরও অধিক।"[১০] ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে লস্করপুর পরগণা, তাহিরপুর পরগণা ও বারবাকপুর পরগণা ব্যতীত বর্তমান সমগ্র রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া এবং ফরিদপুর. ঢাকা, যশোহর, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, দিনাজপুর, মালদহ এবং

রঙ্পুরের কিয়দংশ রামজীবনের অধিকৃত ছিল। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে "ইহা সাধারণত ৫২ লক্ষের জমিদারি"।[১১] শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে "সর্বসমেত ১৩৯ পরগণার ইহার সদর জমা ১৬৯৬০৮৭ টাকা খালসা সেরেস্তায় লিখিত হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "সাহিত্যে" নিম্নলিখিত পরগণায় রামজীবনের রাজ্য বিভাগ করেন :—

১। রাজসাহী প্রদেশ	,,,	,,,	৬৮	পরগণা
২। ভাতুড়িয়া	,,,	,,,	৩০	,,
৩। ভূষণা	,,,	,,,	২৯	,,
৪। বাজে মহাল	,,,	,,,	১২	,,
			১৩৯	,,

মোট ১৩৯ পরগণার রাজস্ব ১৭৪১৯৮৭ টাকা ছিল। ইহা অনুমান করা যায় যে এই বিস্তৃত রাজ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক মুনাফা ছিল। এইরূপ বিস্তৃত বৃহৎ রাজ্যের স্থাপন কর্তা প্রতিভা সম্পন্ন রঘুনন্দন; তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রামজীবন এবং তাহার দেওয়ান দয়ারাম রায়ের সুশাসনে ঐ রাজ্যের গৌরব, নাম ও যশঃ বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

রঘুনন্দনের সময় জমিদারি—এসময় জমিদারি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত যথা :—(১) জঙ্গলবুড়ি, (২) ইস্তীকালী, (৩) আহকামী।

(১) জঙ্গলবুড়ি—পতিত অনাবাদী ভূমি। জমিদার পরিশ্রম দ্বারা জমি হাসিল করিয়া নিষ্কর বা সামান্য করে বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

(২) ইস্তীকালী—ফশলী উত্তর জমি। নিযুক্ত জমিদার রাজস্ব বাকি ফেলে বা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বা উত্তরাধিকারী বিহীন বা রাজ বিদ্রোহী হইলে অন্য জমিদার সম্রাট নিকট ঐ ভূসম্পত্তি সনন্দ করিয়া লয়।

(৩) আহকামী—জমিদারের বিনা দোষে এবং নবাবের কর্মচারীদের চাতুরি ও কৌশলে নবাবের বা সম্রাটের আদেশে যে জমিদারি হইতে জমিদার রাজ্যচ্যুত হয় তাহা নবাবের কর্মচারী নিজ নামে বা আত্মীয়ের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

রঘুনন্দন যে সকল জমিদারি তাহার ভ্রাতা বা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লয় তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত জমিদারি।

রামজীবনের সামাজিক পদ গৌরব—সামান্য অবস্থা হইতে রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এবং বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি হইয়াও রামজীবন সামাজিক পদ গৌরবকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বৈষয়িক পদ গৌরব অপেক্ষা সামাজিক পদ গৌরবও কম নহে। সুতরাং রামজীবন সামাজিক পদ গৌরব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন।

কুল্লুকভট্টের সময় কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ি বংশে তর্কশাস্ত্রে বিশারদ বৃহস্পতি আচার্যের ঔরসে উদয়নাচার্য নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরেন্দ্র ভূমিতে একটি নূতন সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার দুই স্ত্রী। তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ছয় পুত্র এবং মধু মৈত্রের দুই পুত্রের সহিত তিনি মিলিত হইয়া এক নূতন দল গঠিত করিলেন। কিন্তু বিচারে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়া এক নূতন দল "কাপ"[১২] নামে প্রসিদ্ধ হইল। কাপের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদানে কুলীনের কুলচ্যুত হইতে লাগিল। এমন কি কাপের সঙ্গে আহারে, শয়নে ও উপবেশনেও কুলীনের কুল নষ্ট হইতে লাগিল। সুতরাং কাপের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া তাহিরপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রীয় রাজা কংসনারায়ণ মধ্যস্থ হইলেন এবং কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়া দিলেন। এই নূতন নিয়মে শ্রোত্রীয় বরে কন্যা দান করিলে

কাপ শোত্রীয় হইবে এবং শ্রোত্রীয় হওয়ার পর কুলীন বরে কন্যা দান করিলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইবে। ইহাও নিয়ম হইল যে কুশবারি সংযুক্ত না হইলে কাপের স্পর্শে কুলীনের কুলপাত হইবে না। এ নিয়মে কুলীন ও কাপ উভয়েরই সুবিধা হইল। ইহা পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে নাটোর বংশের আদি পুরুষ কামদেব জীবর মৈত্রের বংশধর এবং সেই জীবর মৈত্র কুলচ্যুত হইয়া কাপ দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কংসনারায়ণের সাময়িক প্রচলিত নিয়মানুসারে জীবর মৈত্রের বংশধর কাপ হইয়াও পরে শ্রোত্রীয় বরে কন্যা দানে শ্রোত্রীয় হন। এইক্ষণ রামজীবন ও রঘুনন্দন সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা কংসনারায়ণ কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। সুতরাং বারেন্দ্র সমাজে পদগৌরব তাহার সামনে কেহই ছিল না। তাহাব বংশধরগণেরও সেই পদগৌরব ছিল। রামজীবন ও রঘুনন্দনের সময় রাজা কংসনারায়ণের প্রপৌত্র বাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাহিরপুরে রাজত্ব করিতেন। সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ বা "কালুকোঙরের" বিবাহ জন্য রঘুনন্দন ও রামজীবন প্রস্তাব করিলেন। ভবিষ্যতে "কালুকোঙর" রাজসাহীর মহারাজা হইবেন, তখন কন্যাদানে লক্ষ্মীনারায়ণ সম্মতি প্রদান করিলেন। অতি সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহে নাটোর বংশের সামাজিক পদগৌরব বৃদ্ধি হইল।

রামজীবন ও দয়ারাম নাটোরে, রঘুনন্দন মুরশিদাবাদে— রামজীবন নাটোরের রাজবাটিতে বাস করিতেন এবং রাজকার্য সম্পন্ন জন্য দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ অসাধারণ বুদ্ধিমান দয়ারাম রায় তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে "রঘুনন্দন নাটোর রাজ্য সৃষ্টি করেন এবং দয়ারাম রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন। রঘুনন্দন নাটোর রাজ্যের ক্লাইব এবং দয়ারাম হেস্টিংস ছিলেন।"[১৩] আমরা বলি রামজীবন ধনরক্ষক বা কুবের। যদিচ বঘুনন্দন মুরশিদাবাদে থাকিযা মুরশিদকুলি খাঁর প্রসাদাৎ নাটোর রাজ্যের ভীত্তি স্থাপন করেন, তথাপি রামজীবন ও দয়ারামের বুদ্ধি কৌশলের সাহায্যে তাহা রক্ষা করিয়া উন্নতি সাধন করেন। নাটোর রাজ্যের মূল রঘুনন্দন তাহার আর ভুল নাই। রামজীবনের বাস-স্থান নাটোর এবং রঘুনন্দনের বাসস্থান গঙ্গাতীরে বড়নগর বা বীরনগর ছিল।

রামজীবন ও রঘুনন্দন—রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই ভ্রাতা। রামজীবন জ্যেষ্ঠ ও রঘুনন্দন মধ্যম। রামজীবন ও রঘুনন্দনের ভ্রাতৃপ্রেম অকৃত্রিম। রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার প্রতি ভক্তি আদর্শনীয়। রামজীবনের রঘুনন্দনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রশংসনীয়। রঘুনন্দন আইনজ্ঞ এবং রাজস্ব সচিব ছিলেন। রামজীবন জমিদারি কার্যে দক্ষ ছিলেন। রঘুনন্দনের বুদ্ধি কৌশল ও প্রতিভা অসাধারণ এবং রামজীবনের সাহস ও কার্যকুশলতা অসীম। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে "রামজীবনের বীরত্ব, সাহস, ধর্মশীলতা এবং রঘুনন্দনের বুদ্ধি, কৌশল, প্রতিভা এবং ভ্রাতৃপ্রেম একত্রিত হওয়াই নাটোর রাজবংশের বিস্তীর্ণ রাজ্যলাভের মূল কারণ।" দয়ারামের পরামর্শে রামজীবন বিস্তীর্ণ রাজ্যের তিনটি প্রধান রাজধানী, (১) নাটোর, (২) বড়নগর, (৩) সেরপুর স্থাপন করিয়া জমিদারি কার্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। রামজীবনের সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ ছিল।[১৪]

রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম—ইহারা তিন ভ্রাতা এবং তিনজনই একান্নভুক্ত। বাংলা ১১৩১ সালে (১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে) রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়। সেই সময় রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ (কালুকোঙর) পরলোক গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে রঘুনন্দনের একমাত্র শিশু পুত্রেরও মৃত্যু হয়। রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারী রহিল না এবং রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদেরও মৃত্যু হইল। কেবল বিষ্ণুরামের দেবীপ্রসাদ নামে এক পুত্র রহিল। কেহ দত্তক পুত্র রাখিবার জন্য রামজীবনকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং কেহ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকেই রাজ্যদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অবশেষে দত্তক পুত্র রাখিলেন।

এই দত্তক পুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা রামকান্ত নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পরগণা চৌগ্রাম ও বর্তমান রঙ্পুর জেলার অন্তর্গত পরগণা ইস্‌লমাবাদ পুরস্কার স্বরূপ রামজীবন রসিককে দিলেন। রসিকের পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে রাজবাটি নির্মাণ কারেন। ইহারই প্রপৌত্র রাজা রমণীকান্ত রায় বিএ, শান্ত, ধীর, মিতব্যয়ী ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। এই দত্তক পুত্র রাখার পর হইতে দেবীপ্রসাদ রাজ্য প্রার্থনা করেন। দত্তক পুত্রকে রাজ্যের ।।০ আনা অংশ দিতে রামজীবন স্বীকার কবেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সমগ্র রাজ্য দত্তক পুত্র রামকান্তের প্রতি অর্পিত হইল।

স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামজীবন পবলোক গমন করেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় রাজা রামজীবনের মৃত্যুর তারিখ ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্দেশ করেন। সে সময় রামকান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক। রাজা রামজীবনের মৃত্যু সময়, তাহাব রাজ্যের ভার তাহার প্রিয় বন্ধু ও উপদেষ্টা দয়ারামের হস্তে সমর্পিত হইল। রামকান্তের অপ্রাপ্ত বয়ক্রমকালে অর্থাৎ ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দয়ারাম এরূপ সুকৌশলে রাজ্য রক্ষা করেন যে দেবীপ্রসাদ নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন দিয়াও কোন ফল পাইল না। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দিঘাপতিয়ার রাজবাটি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু তিনি রামকান্তের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত রহিলেন।

দয়ারাম রায়— নাটোর রাজ্যের সহিত দয়ারামের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে তাহাকে নাটোর রাজবংশের ইতিহাস হইতে পৃথক করা নিতান্ত কঠিন। নাটোর রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গেলে দয়ারামের প্রতিভা ও বুদ্ধি কৌশলের বিষয় না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে যেখানে উল্লেখ না করিলে নয় সেই স্থানেই কেবল তাহার নাম উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু দিঘাপতিয়া রাজবংশের ইতিবৃত্ত লিখিবার সময় দয়ারামের ইতিহাস বিস্তৃত রূপে লিখিত হইবে।

রাজা রামকান্তের রাজ্যভার গ্রহণ— ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে হইতে রামকান্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে "পিতার রাজ্য অধিকার সময় রামকান্তের বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর ছিল। তিনি একটি ধার্মিক মনুষ্য ছিলেন। দেবতাদের পূজা ও ধর্মকার্যে তিনি দিনপাত করিতেন। কিন্তু সাংসারিক কার্য নির্বাহ করিতে তিনি জানিতেন না।"[১৫]

রামকান্তের সময় রাজ্যলাভ— রাজা রামজীবনের মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদ রাজ্য প্রাপ্তি জন্য নবাব দরবারে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময় সুজা খাঁ মুরশিদাবাদে নবাব। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নবাব জমিদারি স্বরূপপুর এবং পাতিলাদহ রামকান্তকে অর্পণ করেন।[১৬] ইহাও দয়ারামের কৌশল। এখন দেবীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে দয়ারামের কৌশলে নবাব সুজাখাঁর নিকট কোন ফল হইবে না। সেই সময় পাতিলাদহ পরগণায় ৭০০০্ টাকার বেশি আদায় হইত না, কিন্তু ঐ জমিদারি মহামান্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের হস্তে আসিলে, উহার আদায় বার্ষিক তিন লক্ষ টাকারও বেশি হয়।

রামকান্তের সময় রাজ্য বিভাগ— নিম্নলিখিত পরগণায় নাটোর রাজ্য বিভক্ত হয় :—

রাজসাহী প্রদেশ	...	...	৭৮	পরগণা
ভাতুড়িয়া	...	...	২৩	,,
ভূষণা	...	...	২১	,,
বাজেমহাল	...	...	৪২	,,
			১৬৪	পরগণা

এই ১৬৪ পরগণার মোট বার্ষিক রাজস্ব ১৮৫৩৩২৫ টাকা ছিল। রাজা রামজীবনের সময়

অপেক্ষা ২৫ পরগণা এবং ১১১৩৮ টাকা রাজস্ব বেশি। তথাচ রামকান্তের বিষয় বুদ্ধি ছিল না বলিয়া, তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন।

রামকান্তের বিবাহ— বর্তমানে বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতানী গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরির ঔরসে জয়দুর্গার গর্ভে এক পরমাসুন্দরী ও সুলক্ষণসম্পন্না কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সেই কন্যার নাম ভবানী। তাহার সহিত রাজা রামকান্তের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় ছাতানী গ্রামে রাজা রামজীবন উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যখন বালিকার বয়স ১৫ বৎসর তখন পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়।[১৭]

রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানী— রামকান্তের বিষয় বুদ্ধি ছিল না। তিনি লোক চিনিতে পারিতেন না। কে শত্রু আর কে মিত্র তাহার তাহা জানিবার ক্ষমতা ছিল না। রাণী ভবানী অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাহার বিষয় বুদ্ধি যেমন, তেমনই ধর্মভাবও অদ্ভুত। এরূপ গুণ সম্পন্না স্ত্রীর নিয়ত সহবাসে তাহার গুণ জানিতে না পারায় রামকান্ত সামান্য বুদ্ধি রহিত বলিয়া পরিচিত। তাহার স্ত্রীর গুণের ও বুদ্ধির পরিচয় পাইলে তাহার রাজ্যের বিশৃঙ্খলা কখনই হইত না। যে রমণী ভারতে দেবী বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, তাহার পরামর্শে রামকান্ত রাজকার্য নির্বাহ করিলে তাহাকে কিছু কালের জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া কষ্ট পাইতে হইত না এবং বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামের সহিতও বিবাদ ঘটিত না।

দয়ারামের সহিত রামকান্তের বিবাদ— সুজাখাঁর পর সরফরাজ মুরশিদাবাদে নবাব হইলেন। সরফরাজ নবাব হইয়া জগৎশেঠের পুত্রবধূকে অপমান করিলেন। জগৎশেঠ জমিদারের আশ্রয় স্থল। জগৎশেঠ জমিদারগণকে উত্তেজিত করিলেন। সমুদয় জমিদার নবাব সরফরাজ খাঁর বিপক্ষ হইল। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করিয়া ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দি খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। এই সময় রাজা রামকান্ত নবাব সরকারে অনেক রাজস্ব বাকি ফেলিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রামকান্তকে বলিলেন রাজকার্য নিতান্ত অসতর্কতভাবে নির্বাহ হইতেছে এবং দেখাইয়া দিলেন যে সর্বাগ্রে নবাব সরকারে ঠিক সময় ও কিস্তিমত বাজস্ব দাখিল করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার অন্যথায় রাজ্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। রামকান্ত দয়ারামের নিঃস্বার্থহিত বাক্যের মর্যাদা রক্ষা করা দূরে থাকুক, বরং তাহার বাক্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথমত তিনি তাহার উপদেশগ্রহণ করিলেন না। এবং দ্বিতীয়ত যে দয়ারামকে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাকে অপমান ও তাচ্ছিল্য করিলেন। দয়ারাম রাজা রামজীবনের পরম বন্ধু ও বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন। চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রামকান্ত পিতার বিশ্বাসী সুযোগ্য বৃদ্ধ মন্ত্রীকে শত্রুরূপে পরিগৃহীত করিলেন। অবশেষে দয়ারামকে মন্ত্রীর পদ হইতে চ্যুত করিলেন। পতির এরূপ কার্য গর্হিত ও রাজ্যের অনিষ্টকর জানিয়াও, রাণীভবানী পতির কার্যের প্রতিবাদ করা অধর্ম জ্ঞানে বিরত ছিলেন। এইরূপ অসম্ভবনীয় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া এবং যুবরাজকে শিক্ষা দিবার জন্য, দয়ারাম মুরশিদাবাদে নবাব আলিবর্দি খাঁর সমীপে উপস্থিত হইয়া রামকান্তর রাজকার্যের শিথিলতা ও রাজস্ব বাকির বিষয়ে বিস্তারিত তাহাকে জ্ঞাত করাইলেন। দয়ারামের প্রতি নবাবের বিশেষ বিশ্বাস ছিল সুতরাং দয়ারামের কথা বিশ্বাস করিয়া নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে রাজ্য অর্পণ করিলেন। এই সময় দেবীপ্রসাদও সুজা খাঁর নিকট কোন ফল না পাইয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রামকান্ত দয়ারামের সহিত বিবাদ করাতে দেবীপ্রসাদের সুবিধা হইল। দেবীপ্রসাদ রাজ্য অধিকার করিলে, রামকান্ত রাণী ভাবনীসহ নাটোর রাজবাটি ত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রামকান্তের পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তি— রামকান্ত ও রাণী ভবানী শেঠভবনে সমাগত হইলে, জগৎশেঠ প্রাণপণে তাহাদের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন। এদিকে রামকান্ত ও

রাণীভবানীর অর্থের অভাবে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইল। এইরূপে কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। একদিন দালানের ছাদের উপর রামকান্ত ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন এবং চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পালকিতে চড়িয়া দয়ারাম নবাব বাড়ি হইতে নিজ বাস স্থানে যাইতেছেন। দয়ারামকে দেখিয়া রামকান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দয়ারাম দাদা আর কতদিন কষ্ট ভোগ করিব।" এই কথায় দয়ারামের দয়ার উদ্রেক হইল; বিশেষত রাণী ভবানীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায় সেই দিন হইতে দয়ারাম রায় রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যত্নবান হইলেন। পুনরায় রাজ্য রামকান্তকে দিবার জন্য নবাব সরকারে দয়ারাম কৌশল জাল বিস্তার করিলেন; তাহার কৌশলেই রামকান্তের পুনরায় রাজ্য লাভ হইল। আবার জগৎশেঠও আলিবর্দিকে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত করাইতে ত্রুটি করিলেন না। নবাব আলিবর্দি খাঁ সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পুনরায় রামকান্তকে রাজসাহী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। দয়ারামও পুনরায় মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন।

বর্গীর হাঙ্গামা— মহারাষ্ট্রীয়দের বাংলা আক্রমণকে "বর্গীর হাঙ্গামা" বলে। রামকান্ত ও রাণী ভবানী যখন রাজসাহী রাজ্যের পুনরায় অধিকার লাভ করিলেন, সেই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণের সূত্রপাত হইল। বাংলা দেশ এরূপ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ যে "সোনার বাংলা" বলিয়া পরিচিত। সুতরাং শিবাজীর অনুচরেরা পঙ্গপালের ন্যায় বাংলার দিকে ধাবিত হইল। এই সময় মহারাষ্ট্রীয়দের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য দয়ারাম সৈন্য সামন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য যত্নবান হইলেন।

রাজা রামকান্তের সন্তান সন্ততি—রাণী ভবানীর গর্ভে রামকান্তের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয় অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কেবল রাজকুমারী তারাকে রাখিয়া এবং দত্তক পুত্রের অনুমতি দিয়া বাংলা ১১৫৩ সালে (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে) রামকান্ত পরলোক গমন করেন। রাণী ভবানী রাজসাহী রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন।

মহারাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যে অধিকার—রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর, রাণী ভবানী রাজসাহী রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রাজসাহীর অন্তর্গত খাজুরা গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ির সহিত কন্যা তারার বিবাহ হয়। রাণী ভবানী জামাতার হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিবেন বলিয়া নবাব দরবারে রঘুনাথের নাম জারি করাইয়াছিলেন। রাজ্যের ভারও জামাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল: কিন্তু বাংলা ১১৫৮ সালে জামাতার মৃত্যু হওয়ায়, রাণী ভবানী স্বয়ং রাজ্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রাণী ভবানীর রাজ্যচ্যুতি— ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নন্দকুমারের চক্রান্তে রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুত হন এবং নবাব নাটোর রাজ্যের ভার দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদের প্রতি অর্পণ করেন। কয়েক মাস মাত্র গৌরীপ্রসাদ নাটোর রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তদপর পুনরায় রাজ্য মহারাণী ভবানীর প্রতি অর্পিত হইল।

রাণী ভবানীর গুণ—রাণী ভবানী একটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী হিন্দু রমণী। ইহার জমিদারি কার্যকুশলতা এবং বিবেচনাশক্তি এত প্রশংসনীয় ছিল যে, হলওয়েল সাহেব বলেন "এই হিন্দু রমণীর যশঃ প্রভা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।" তিনি যাহা বলিবেন তাহা করিবেন এবং তাহার মস্তিষ্ক এত পরিষ্কার ছিল যে সমুদয় ভারতবাসী তাহার যশঃ গান করিতেন এবং ইংরাজদের মধ্যেও তিনি "পূজনীয়া দেবী বলিয়া" কীর্তিত হইয়াছেন। রাণী ভবানী বহুদিন স্বর্গলাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার নাম লুপ্ত হয় নাই। এখনও ভারতের শত শত নরনারী প্রাতঃকালে ভক্তিভরে রাণী ভবানীর পুণ্য-শ্লোক নাম স্মরণ করিয়া দিন সফল হইল বলিয়া আনন্দ অনুভব করে। মহারাণী ভবানীর নানাবিধ গুণ[১৮] সম্বন্ধে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। রাণী ভবানীর জমিদারি কার্য-কুশলতা যেমন প্রশংসনীয় তেমনই তাহার দানশীলতা, পুণ্যকীর্তি ও যশঃও ভারত-বিস্তৃত।

মহারাণী ভবানীর সময় "বর্গীর হাঙ্গামা"— "বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শালবন অতিক্রম করিয়া, উড়িষ্যার গিরিনদী পার হইয়া, নানা পথে সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী পঙ্গপালের মত বাংলা দেশের বুকের উপর ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বাদসাহ আরঙ্গজীব একদিন যাহাদিগকে 'পার্বত্য মূষিক' বলিয়া উপহাস করিতেন, তোযামোদ পরায়ণ পারিষদগণ যাহাদিগকে পিপীলিকাবৎ নাসাগ্রে টিপিয়া মারিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেন, সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ কঙ্কন প্রদেশের গিরিগহ্বরে অধিক দিন লুকাইয়া রহিল না; মোঘলের অধঃপতন কাল নিকট বুঝিয়া বাহুবলে হিন্দু রাজত্ব সংস্থাপন করিবার আশায়, তাহারা দলে দলে অসি হস্তে দেশ বিদেশ ছুটিয়া বাহির হইল। দিল্লির বাদসাহ তাহাদের হাতে ক্রীড়া কন্দুক হইয়া উঠিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে রাজকবের চুতর্থাংশ "চৌথ" আদায়ের 'ফরমান' পাইয়া বাহুবলে ন্যায্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য বাংলা-দেশেও পদার্পণ করেন;— বাংলার ইতিহাসে ইহার নাম 'বর্গীর হাঙ্গামা'।"[১৯]

যে সময় আলিবর্দি খাঁ বাংলা, বিহার উড়িষ্যার নবাব, সেই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ অশ্বারোহী লইয়া দলে দলে লুট করিতে করিতে একবারে কাটোয়া পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। কাটোয়ায় একটি অতি সামান্য দুর্গ ছিল। সেই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়গণ অনায়াসে জয় করিয়া মুরশিদাবাদের অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। কাটোয়া মুরশিদাবাদ প্রবেশের দ্বার স্বরূপ; সেই দ্বার মহারাষ্ট্রীয়গণ অতিক্রম করিলে, নবাব আলিবর্দি খাঁ নিজ রাজধানী মুরশিদাবাদ রক্ষা জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে মহারাষ্ট্রীয়গণের শক্তি ও গতিরোধ করিতে আলিবর্দি খাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তাহাদের সেই অত্যাচার হইতে সেই হিন্দু রমণী রাণী ভবানী প্রজাগণকে অধিকাংশ সময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনে রাজসাহী রাজ্যের একাংশ নষ্টও হইয়া যায়, কিন্তু রাণী ভবানীর শাসন কৌশলে পদ্মানদীর উত্তর তীরস্থ রাজসাহী প্রদেশ অনেক অংশে রক্ষা পাইয়াছিল। এই হিন্দু রমণীর বীরত্ব, ইহাই তাহার সুশাসনের পরিচয়। নবাব আলিবর্দি খাঁ মহারাষ্ট্রীয়গণের ভয়ে মহারাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যে পদ্মানদীর উত্তর তীরে গোদাগাড়ি গ্রামে নিজ বাস ভবন নির্মাণ করেন। হিন্দু রমণী পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন "বিগত শতাব্দীর শেযার্ধভাগে তাহার (রাণী ভবানীর) রাজ্যশাসন চিরস্মরণীয় ছিল।"[২০] "বর্গীয় হাঙ্গামা" বঙ্গদেশের নরনারীদের এত ভয়াবহ ছিল যে এখনও শিশু সন্তানকে নিদ্রা করান সময় বর্গীর ভয় দেখান হয়।

মহারাণী ভবানীর রাজ্যশাসন ও রাজকর— রাজসাহী প্রদেশে রাজকুমারীকে "ঠাকুর ঝি" নামে সম্বোধিত হইয়া থাকে। এই প্রথা অনুসারে মহারাণী ভবানীর কন্যা তারাদেবী "ঠাকুর ঝি" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। সেই তারা ঠাকুর ঝি এবং বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামের সাহায্যে রাণী ভবানী রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। তারা ঠাকুরাণী বিবিধ বিদ্যা অনুশীলন করেন এবং নিরন্তর মাতৃ সন্নিধানে থাকিয়া মাতার অনেক গুণ অনুকরণ করেন। তাহার কার্য-কুশলতা-বুদ্ধিও কম ছিল না। দয়ারামও অসাধারণ বুদ্ধিমান মন্ত্রী। এই দুই ব্যক্তির পরামর্শে রাজকার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইবে তাহার আর সন্দেহ কি। রাণী ভবানীর রাজ্য সম্বন্ধে হলওয়েল সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রচুর প্রমাণ যে দয়ারামের বুদ্ধি কৌশলে এবং রাণী ভবানীর অসাধারণ গুণে রাজ্যের উন্নত অবস্থা ছিল।[২১] আবার ১৩০৪ সনের কার্তিক মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন---"স্বাধীনভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, বাঙালি কত সহজে, কত অল্প ব্যয়ে, কিরূপ কৌশলে রাজ্যশাসন করিয়া প্রজা-পুঞ্জের সুখ সৌভাগ্য বর্ধন করিতে সক্ষম, রাণী ভবানীর জীবন কাহিনীই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।" রাণী ভবানীর সময় তিন শ্রেণির রাজকর প্রচলিত ছিল :— (১) দখলী ভূমির জন্য প্রকৃত জমা, (২) অপরাধ জন্য আর্থিক দণ্ড, (৩) আবওয়াব[২২]। সে সময় দখলী ভূমির জমা যৎসামান্য ছিল।

কিন্তু আবওয়ারের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশি ছিল। সুতরাং আবওয়াবই অধিক পরিমাণে আদায় হইত। কিন্তু অপরাধ জন্য প্রজার আর্থিক দণ্ড অতি সামান্য ছিল। কেবল প্রজার শাসন জন্য এবং এক প্রজার প্রতি অপর প্রজা অন্যায় অত্যাচার করিতে না পারে এই জন্য, অপরাধী প্রজার সামান্য আর্থিক দণ্ড করা হইত। যাহারা কৃষিজীবী তাহারা যৎসামান্য রাজকর দিত কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ী তাহারাই অধিক পরিমাণে রাজকর দিত। সেকালে বাস্তু ভূমির রাজকর বড়ই যৎসামান্য ছিল; এবং উত্তরদ্বারী গৃহের জন্য কাহারই রাজকর দিতে হইত না। কোন্ বিষয়ের আবওয়াব ধার্য হইত তাহা নিম্নে লেখা গেল :—

বাণিজ্যের লভ্যাংশের উপর।

অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক মাঙ্গলিক কার্যের উপর।

এই প্রকারেই রাণী ভবানীর প্রচুর অর্থ আদায় হইত। এই অর্থ দ্বারা রাণী ভবানী দেবসেবা, পুষ্করিণী খনন, দান প্রভৃতি পুণ্য কার্য নির্বাহ করিতেন। তাহার রাজ্যে প্রজাগণ এরূপ সুখে কালযাপন করিত যে তাহার রাজ্য "রামরাজ্য" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

রাজকার্য নির্বাহ সময় রাণী ভবানী ও তাহার কন্যা তারা ঠাকুরঝি একত্রিত হইয়া দয়ারামের সহিত কৌতুকাবহ কলহ করিতেন। তারা ঠাকুরঝি দয়ারামকে জ্যেঠা বলিয়া ডাকিতেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এবং রাণী ভবানীরও দয়ারামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। একদা তারা ঠাকুরঝি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মোত্তর পত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রাজা রামজীবন ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করেন, তাহাদের অধিকাংশ সনন্দ দয়ারামের দস্তখতী। তারা ঠাকুরঝি ঐ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ক্রোক দিলেন। দয়ারাম একজন চাকর, তাহার দস্তখতে নিষ্কর ভূমির দানপত্র কোন মতে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাণী ভবানী সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন," "মহারাণী! আপনকার বিবাহের লগ্নপত্রে আমি স্বাক্ষর করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে রাজা রামজীবন স্বাক্ষর করেন নাই। সুতরাং আপনকার বিবাহও গ্রাহ্য যোগ্য নহে।" এই কথায় মহারাণী ভবানী ও তারাঠাকুরঝি হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ! দয়ারামের কি বুদ্ধি কৌশল।" তখনই মহারাণী ভবানী সমুদয় নিষ্কর ভূমি ক্রোক হইতে মুক্ত করিয়া খালাস্ দিলেন এবং দয়ারামের স্বাক্ষরিত সনন্দ গ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে দয়ারামের পরামর্শে রাণী বহুতর নিষ্কর ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন।

মহারাণী ভবানীর কীর্তি— বিষয় কার্য নির্বাহ জন্য মহারাণী ভবানীর পুণ্য কার্যের বাধা জন্মে নাই। সাংসারিক কার্য নির্বাহ সময়ও তাহার পুণ্যকীর্তি স্থাপনের চিন্তা প্রবল ছিল।

মোঘল সম্রাট আরঙ্গজীব ধর্মান্ধ ছিলেন। তাহার কঠোর শাসনে বারাণসী ধামের সীমা চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দেব মন্দিরগুলি প্রায়ই চূর্ণ হইয়াছিল। মহারাণী ভবানীর কল্যাণে আবার কাশীর সীমা চিহ্ন নির্দিষ্ট হইল এবং কাশীতে সর্বশুদ্ধ ৩৮০ ধর্মশালা, অতিথিশালা এবং ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি স্থাপিত হইল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে সুরনাথের মন্দির পর্যন্ত তিনি এক সুবিস্তৃত রাজপথ নির্মাণ করেন। এই কেবল তাহার অক্ষয় কীর্তি নহে। "আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক কালিদাস শাণ্ডিল্য বিরচিত 'উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত' নামক পুস্তকে লিখিত আছে—'মহারাণী ভবানীদেবী কাশীধামে গমন করিয়া দেখিলেন যে, কাশীধামে প্রকৃত ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব। তাই তিনি কান্যকুব্জ হইতে সার্ধ তিন শত সুব্রাহ্মণ আনাইয়া কাশীতে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের প্রত্যেকের বাসের জন্য ৫০/৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে পৃথক পৃথক বাড়ি প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যজ্ঞোপলক্ষে যে কয়টা ভোজ দিয়াছিলেন, তাহার 'গাথা' অদ্যাপি ঐ প্রদেশে প্রচলিত আছে।"[২৩] বারাণসী, মুরশিদাবাদ, নাটোর প্রভৃত স্থানে তাহার নির্মিত দেবমন্দির বিস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শ্যামরায়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ডিহি ফুলবাড়ি দেবোত্তর

দেন। দেবসেবার জন্য দেবোত্তর এবং ব্রাহ্মণের ভরণ-পোষণ জন্য ব্রহ্মোত্তর, রাণী ভবানী বিস্তর দান্ করেন। এক কাশী ধামেই মহারাণী ভবানী প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকার বেশি দেবোত্তর সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার স্বামী কে তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। অসংখ্য পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি বহু স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর নিকটবর্তী ভবানীপুরে যে তীর্থস্থান আছে, সেই পর্যন্ত একটি পথ রাণী ভবানী নির্মাণ করেন। সেই পথ রাণী ভবানীর "জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে "কেহ গৌরব লালসায় উত্তেজিত হইয়া, কেহ লোক প্রশংসার বা রাজদত্ত উপাধি লাভাশয় অনেক পুণ্য কীর্তির অনুষ্ঠানাচরণ করিয়া থাকে। রাণী ভবানীর দান সে শ্রেণির নহে।" রাণী ভবানীর দান মানুষ দেখান ছিল না; তিনি পরের দুঃখে কাতর হইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সকরুণ হৃদয়ে, স্থিরচিত্তে এবং মুক্ত-হস্তে দুঃখীর দুঃখ মোচন জন্য দান করিতেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কথায় বলিতে গেলে, "প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী একটি ধার্মিকা রমণী, মুক্ত হস্ত, এবং পরোপকারে দ্রুতগামিণী"।[২৪] রাণী ভবানী স্বদেশের হিতকামনায় এবং পরের উপকার জন্য নিজ জীবন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এক মুষ্টি আতব তণ্ডুলের উপর নির্ভর করত নিজ জীবন ক্ষেপণ করিতেন। তাহার পুণ্যকীর্তি নিষ্কাম। নিষ্কাম দান বা পুণ্য কার্য তাহার জীবনের একটিমাত্র ব্রত ছিল। রাণী ভবানীর দান কি প্রণালীর তাহা ১৩০৪ শকের মাঘ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন :—"নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌবাচ্চাতে আটমণ ছোলা ভিজান যাইত, তাহা অনাহুত যে সকল লোক আগত হইত, তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য ২৫ মণ তণ্ডুল বিতরণ হইত।" এই উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যায় রাণী ভবানী কিরূপ উদারমনা এবং তাহার নিরাশ্রয়ের প্রতি দয়া। তাহার দানে ভেদাভেদ নাই; পাত্রাপাত্র বিচার নাই; স্থান ও সময় বিবেচনা নাই। আমরা হিন্দু এবং রাণী ভবানীও হিন্দু। আমরা অনায়াসে তাহার প্রশংসা শত মুখে বর্ণনা করিতে পারি। কিন্তু ইউরোপ দেশীয় লোক যাহার রীতিনীতি ও ধর্ম বিভিন্ন, তিনি রাণী ভবানীর কিরূপ গুণ কীর্তন করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত অংশে জানা যাইবে :— রাণী ভবানী পুণ্যশীলা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া সবিশেষ পরিচিতা। তিনি সর্বদাই দেবসেবা ও দেব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন; একমাত্র কাশীধামেই তিনি শত দেব মন্দির, অতিথিশালা ও ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আজ পর্যন্ত তাহার অনেকগুলি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, অনেকগুলি আর দেখিতে পাওয়া যায় না; হয় তো বিস্তীর্ণ রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর বংশধরগণ অর্থাভাবে সেগুলির রক্ষা করিতে পারেন নাই;[২৫] রাণী ভবানী এই সকল সেবাপূজার জন্য অর্থ ও ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি নাটোরে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামরায়ের সেবা এখনও মুরশিদাবাদ প্রদেশে সর্বজন পরিচিত। ইহার জন্য রাণী ভাবনী যে ভূমিদান কবেন, তন্মধ্যে চুয়াগাছা ও কালীগঞ্জের মধ্যবর্তী ডিহি ফুলবাড়িয়া সর্বপ্রধান।"[২৬] রাণী ভবানীর পুণ্য কীর্তি অবলোকনে এবং তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া ইহা স্থির করা যাইতে পারে যে তাহার কার্য দেবময়। রাণী ভবানীর সময় ইংরেজি শিক্ষার প্রচার ছিল না। সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল। দেশীয় পাঠশালায় সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা হইত এবং চতুষ্পাঠীতে রীতিমত সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি পড়ান হইত। রাজসাহী প্রদেশের অনেক স্থানে ভাল ভাল চতুষ্পাঠী ছিল। দয়ারামের যুক্তি অনুসারেই রাজসাহী রাজ্যের বিস্তর চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ ভূমি ও কোন কোন চতুষ্পাঠীতে মাসিক বা বার্ষিক অর্থ দান করিতেন।[২৭] মহারাণী ভবানীর দান কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "বঙ্গে এরূপ প্রবচন প্রচলিত আছে যে, যিনি রাণী ভবানীর ব্রহ্মোত্তর ভোগী নন তিনি ব্রাহ্মণ নামেরই অযোগ্য।"[২৮] এ প্রবচন বরেন্দ্র ভূমিরই যোগ্য।

ভবানী মহারাণী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী— রাণী ভবানী শয্যা হইতে প্রত্যুষে উঠিয়া নিজে পুষ্প চয়ন করিতেন। যখন গঙ্গাতীরে বড়নগরের নিজ বাটিতে বাস করিতেন, তখন প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন। মধ্যাহ্নকালে দেবতাদের পূজা ও সেবা করিতেন। অবকাশ মত পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন। এ সকল কার্য করাতেও তাহার রাজকার্য পরিদর্শনের ব্যাঘাত হইত না। রাজকার্য নির্বাহ জন্য তাহার একটি সময় নির্দিষ্ট ছিল। তিনি একবার মাত্র হবিষ্যান্ন আহার করিতেন— হবি নামে মাত্র। "তাহার হবিষ্যান্নের জন্য উড়ি ধান্য ভিন্ন কৃষিজাত ধান্য ব্যবহৃত হইত না"। তাহার নিজের সুখের জন্য তিনি কিছুই ব্যয় করিতেন না। কেবল লোক হিতসাধন জন্য তিনি সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। হিন্দু বিধবা রমণীর এইরূপে দিন যাপন করাই প্রশংসনীয়।

পবিত্রা বিধবা হিন্দু রমণী দেবী না মানবী?— মহারাণী ভবানী, মহারাণী শরৎসুন্দরী ও অহল্যাবাই, এই তিনটি হিন্দু বিধবা রমণী ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহারা নিজে ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় দিন যাপন করিয়া লোক হিতসাধনে, দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, প্রজাপালনে এবং গো, ব্রাহ্মণ, দেব সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। নাটোর রাজবংশীয় মহারাণী ভবানী ও পুঁঠিয়া রাজবংশীয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর বিস্তর বলিয়াছি। মহারাণী শরৎসুন্দরী ১৩ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়া ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। আবার মহারাণী ভবানী এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিয়া ও পতির সঙ্গে কিছুদিন কালযাপন করার পর বিধবা হইয়া ব্রহ্মচারিণী বেশে দিনযাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের শয্যা কুশাসন, ইহাদের হস্ত উপাধানের কার্য করিত। মশকের দংশনকে ভয় করিতেন না। দিনান্তে আহার হবিষ্যান্ন, হবি কেবল নাম মাত্র। এইরূপে দিন যাপন করিয়া কেবল পরের দুঃখ মোচনের জন্য তাহারা ব্যগ্র ছিলেন। ইহাদের নির্মল চরিত্রের অনুকরণ সকল হিন্দুরমণীরই প্রার্থণীয়। অহল্যাবাই মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু রমণী। ইহার পুণ্যকীর্তি ও কম নহে। ইহার মহৎকীর্তি কলিকাতা হইতে বারাণসী ধাম পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত রাজপথ অদ্যাপিও বর্তমান আছে। কাশীধামেও তাহার কীর্তি অসংখ্য। এই তিন হিন্দু রমণীর কাহিনী পাঠে এক আশ্চর্য বিষয় উদঘাটিত হয়। ইহারা তিনজনই বিস্তৃত রাজ্য শাসনে যেমন পটু এবং কর্তব্যপরায়ণা; পারত্রিক যাবতীয় কার্য সম্পন্নে তেমনই পটু এবং কর্তব্যপরায়ণা। আবার ইহাও দেখিতে হইবে ইহাদের পুণ্য কীর্তিতে নিষ্কাম ভাব অবলম্বন করে। রাণী ভবানী নিজ পুত্রনিধনে শোক এবং কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রাজ-কার্য নির্বাহে একদিনের জন্যও অমনোযোগ করেন নাই। সেইরূপ অহল্যাবাইও পুত্রের দুর্বৃত্ততায় এবং তাহার নিধনে কাতর হইয়াও রাজকার্য নির্বাহে শৈথিল্য করেন নাই। রাণী শরৎসুন্দরীও ১৩ বৎসর বয়সে পতির অভাবে ম্রিয়মানা হইয়াও সুচারুরূপে রাজকার্য নির্বাহ করিয়াছেন। এই তিন হিন্দু রমণীর আশ্চর্য গুণ এই যে, কর্তব্য জ্ঞান ইহাদের যেরূপ দৃঢ় ছিল, অনেক পুরুষের সেরূপ কর্তব্য-জ্ঞান দেখা যায় না। এই তিন রমণীই ভারতবর্ষের হিন্দু রমণীদের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। ধন্য ভারত ভূমি! তুমি এরূপ রমণীর জন্মদাত্রী। ভারতবর্ষের মানবকুল সতত এই তিন হিন্দু রমণীর পবিত্র কীর্তিকলাপ কীর্তন করিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে যে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।।

প্রত্যহ ব্রহ্মমুহূর্ত সময়ে নিদ্রা ভঙ্গের পর এই পঞ্চ কন্যার পবিত্র নাম স্মরণ করিবার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং ইহাদের নাম স্মরণ করিলে মহাপাতক নাশ হয়, কিন্তু ইহাও বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী, অহল্যাবাই— এই তিন রমণীর নাম স্মরণেও পাপক্ষয় হইবে। ইহারা তিন রমণী দেবী—মানবী নহেন—তাহা

আর ভুল নাই। রাণী শরৎসুন্দরী বাল্যে বিধবা হইয়া কিরূপ সাধ্বী পবিত্রা রমণী ছিলেন তাহাতে কেবল রাজসাহীর নহে, সমগ্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। পতির মৃত্যুর পরেও যে, সাধ্বী পতিপরায়ণা হিন্দু রমণীর সেই পতির সহিত ধর্ম সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না[২৯]—পতির চরণ যুগল ধ্যানে, পতির পবিত্র হৃদয়ের প্রেম চিন্তনে, পতির মুখশ্রী নিজ হৃদয়ে অবলোকনে, পরলোকেও পতিদর্শন লালসায়, এবং ইহলোক বিচ্ছেদেও পতির প্রিয় কার্য সতত সাধনে, আহার নিদ্রা সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ— সেই হিন্দু রমণীই দেবী, সেই হিন্দু রমণীই ব্রহ্মচারিণী, সেই হিন্দু রমণীই আর্য-কুলের ভূষণ, সেই হিন্দু রমণীরই জীবন ধন্য, দান, তীর্থ ও ধর্ম সার্থক। এখন ভারতে সে ভাবের হ্রাস দেখা যায়। একালে বিবাহ যে একটি ধর্ম সম্বন্ধ এবং যে সম্বন্ধ এ সংসারে কোন কারণে সাধ্বীর জীবন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবার নহে, তাহার শিথিলভাব রাজার অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুঠীর পর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে। তথাপি ভারত ভূমি পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা এখনও সতীকুলের পবিত্র নিবাস-ভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। ভারত আজও নারীজাতির সতীত্বের জন্য ধরণীময় কীর্তিত। কিন্তু বিদেশীয় আদর্শে অল্পস্থলেই সেই গৌরব ধ্বংসের সূত্রপাত করিতে দেখা যাইতেছে। যতদিন হিন্দুর ধর্মভাব ভারতে জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে, ততদিন সেই গৌরব, আর্যজাতির সেই শ্রেষ্ঠত্ব অস্তমিত হইবার নহে।

তারা-ঠাকুরঝি ও নবাব সিরাজদ্দৌলা— মহারাণী ভবানীর বংশে নবাব সিরাজের কর্তৃক একটি কলঙ্কের আখ্যায়িকা শুনা যায়। তারা-ঠাকুরঝির বিদ্যা-বুদ্ধির কথা, অপরূপ-লাবণ্যের কথা এবং প্রতিভার কথা বঙ্গদেশের সকল স্থানেই প্রচারিত হইয়াছিল। তারার রূপ-লাবণ্যের কথা নবাব সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, নবাব তারাকে হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মহারাণী ভবানী সেই কথা জানিতে পারিয়া বড়ই বিপদ মনে করিলেন। নবাব দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। তাহার হস্ত হইতে তারা রক্ষা করা কঠিন মনে করিয়া, রাণী ভবানী "তারাকে লইয়া বারাণসী ধামে পলায়ন করিলেন।"[৩০] ইহাই স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন। এ বিষয়ে মত ভেদ দেখা যায়; কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন "রাণী ভবানী কলঙ্কগ্রস্ত হইবার ভয়ে তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর রটনা করিয়া দিয়া নাটোর হইতে পলায়ন করিয়া ছিলেন, ইহাই বিশ্বাস যোগ্য।" মিত্র ও মৈত্রেয় মহাশয়ের কথায় অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমরা মিত্র মহাশয়ের কথাকে বিশ্বাস যোগ্য মনে করি।

জমিদার (জমিনদার) — জমিনদার শব্দ পারস্য ভাষায় প্রচলিত। পারস্য ভাষায় "জমিন ও দার" এই দুই শব্দ দ্বারা জমিনদার শব্দ গঠিত হয়। "জমিন" শব্দে ভূমি এবং "দার" শব্দে রক্ষক বুঝায়। সাধারণ কথায় জমিনদারকে ভূমির রক্ষক বুঝায় ; কিন্তু ভূমির অধিকারী বুঝায় না[৩১]। ক্রমে জমিনদার শব্দ পরিবর্তন হইয়া বাংলাভাষায় জমিদার শব্দ প্রচলিত হয়। ক্রমে জমিদার ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। আরঙ্গজীব বাদসাহের সময় পর্যন্ত জমিদার ঐ প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বুঝাইত, যাহারা জমিন রক্ষক হইয়া মুসলমান রাজাদের সময় প্রজার নিকট রাজস্ব আদায় করিত এবং রাজস্বের রাজ্যাংশ মুসলমান রাজাকে দিয়া যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিত। ইহারাই মুসলমান রাজত্ব সময় হইতে জমিদার নাম প্রসিদ্ধ হইয়া স্বাধীন ভাব অবলম্বনে ক্রমে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইল।[৩২] কুতবের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বখতিয়ার বঙ্গদেশ অধিকার করার পর ঘিয়াসউদ্দীনের সময় হইতে সেনবংশীয় রাজাদের অধীনে যে সকল ভূম্যধিকারী ছিল, তাহারাই পরে জমিদার নাম ধারণ করিল। পাঠান সম্রাটদের সময় বঙ্গদেশের জমিদারগণ সুবাদারের অধীন থাকিয়া রাজস্ব সুবাদার সমীপে দাখিল করিত। সে সময় জমিদারগণের ক্ষমতা বেশি ছিল না— সুবাদারই বাংলার হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন। পাঠানদের পর মোঘল সুবাদারগণ বাংলায় প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন। পাঠানদিগের অপেক্ষা মোঘল সুবাদারগণের রাজ্যশাসন প্রণালী অনেক ভাল ছিল। "মোঘলদের আমলে হিন্দুদিগের ক্ষমতা

অনেক বাড়িয়া ছিল।" সুতরাং "মোঘল সুবাদারদের আমলে হিন্দু জমিদারদিগেরও ক্ষমতা খুব ছিল। তাহাদের মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পুঁঠিয়া, তাহিরপুরের এবং দিনাজপুরের বর্তমান প্রসিদ্ধ রাজাদিগের পূর্বপুরুষগণ এবং নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই খুব বিখ্যাত ছিলেন। ইহারা যদিও সুবাদারকে কর দিতেন, কিন্তু অনেকটা স্বাধীন রাজার মতই জমিদারি করিতেন। ইহাদের মধ্যে বারভূঁইয়া জমিদারেরাই অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। এই জমিদারদের সৈন্য, গড়, বিচারালয় সবই ছিল।"[৩৩] আবার "আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে বাংলার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা সম্রাটের সাহায্যার্থ ২৩.৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ পদাতিক, ১১৭০ গজ, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা যোগাইয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।"[৩৪] আমাদের মহারাণী ভবানী এই জমিদার শ্রেণির মধ্যে গণ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন "রাণী ভবানী যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে জমিদারেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী মোঘল রাজ রাজেশ্বরকেও জমিদারবর্গের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইয়াছিল।"[৩৫] নবাব মুরশিদকুলি খাঁর শাসন সময় জমিদারগণ স্ব স্ব রাজ্যে দেওয়ানি ফৌজদারি বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া অপরাধীগণকে নিজ নিজ রাজবাটিতে কারারুদ্ধ করিতেন এবং নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিতেন। তাহারা কিস্তিমত নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতেন, এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে কথঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে জমিদারি কার্য নির্বাহ করিতেন। তথাপি নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে কিস্তি মত "রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে, সকলকেই সবিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। কেহ কারাগারে নিক্ষেপ হইতেন, কাহারও জমিদারি অন্যের হস্তে সমর্পিত হইত, কাহারও বা বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইত।"[৩৬] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "বৈকুণ্ঠের" ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে :—"মুরশিদকুলি খাঁর শাসন সময়ে মুরশিদাবাদে একটি গর্তের মধ্যে যাবতীয় পূতিগন্ধময় পদার্থ সঞ্চিত রাখিয়া রাজস্ব দানে অশক্ত জমিদারদিগকে তাহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া নির্যাতন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সেকালে মুসলমানেরা ব্যঙ্গচ্ছলে 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। মুসলমান ইতিহাসে একথার উল্লেখ নাই, কিন্তু সমসাময়িক ইংরাজেরা ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।"[৩৭] জমিদারগণের সাহায্যেই আলিবর্দি খাঁ মুরশিদাবাদের নবাব হন। সুতরাং তাহার শাসন সময়ে বাংলার জমিদারগণের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি তাহাদের পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। জমিদারগণ যাহা বলিতেন তাহার বিরুদ্ধে নবাব কোন মতে কিছু করিতে পারিতেন না। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার ইহা ভাল বোধ না হওয়ায় জমিদারগণের ক্ষমতা ক্রমে খর্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জমিদারগণ ভয় পাইলেন। ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন এবং মিরজাফরকে নবাব করিবেন বলিয়া দল পাকাইতে লাগিলেন। জগৎশেঠ ভবনই জমিদারগণের যুক্তি পরামর্শের স্থান ছিল। প্রায় বড় বড় সকল জমিদারগণই এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমাদের মহারাণী ভবানী এই দলের বিপক্ষও ছিলেন না এবং সপক্ষও ছিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি কালের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কালচক্রে এবং ইংরেজদের বাহুবলে যাহা হইবে তাহাতেই তিনি বাধ্য ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বৃহস্পতিবারে ইংরাজেরা সিরাজদ্দৌলাকে পলাশি যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। সিরাজ পলায়ন করেন এবং অবশেষে ধৃত হইয়া নিহত হন। পলাশি যুদ্ধের পর হইতে জমিদারগণের স্বাধীন রাজশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে বার্ষিক ২৬০০০০০ টাকা রাজকর লইয়া দিল্লির সম্রাট সাহআলম ইংরাজদিগকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার 'দেওয়ানি' সনন্দ প্রদান করেন। এই সনন্দ বলে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণকে নিমন্ত্রণ

করিয়া "শুভ পুণ্যাহ" করিলেন। এই হইতে "কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।" এই দিল্লি সাম্রাজ্যের অধঃপতন, মুরশিদাবাদ নবাবের ধ্বংস এবং ইংরেজ রাজ্যের সূত্রপাত। তদপর ক্লাইব স্বদেশ চলিয়া গেলে মিস্টার বেরেলেস্ট এবং মিস্টার কার্টিয়ার নামে দুই ব্যক্তি পর পর বাংলার গবর্ণর হন। তাহাদের সময় রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। এমন বিপদের সময়েও মহারাণী ভবানী নিজ প্রতিভা গুণে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অতি সুচারুরূপে প্রজাদের রক্ষা করিতেছিলেন এবং তাহার শাসন কৌশলে চোর ডাকাইতের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিতেছিলেন। মুসলমান রাজ্যের পতনে ইংরেজ রাজ্যের আরম্ভ হওয়ায় মহারাণী ভবানী সন্তোষচিত্তে রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন।[৩৮] ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গবর্ণর হইয়া কলিকাতা পৌঁছেন। "শুভপুণ্যাহ" হওয়ার পর হইতে নবাবের সঙ্গে একযোগে বাংলার শাসনকার্য সম্পন্ন হইত। কিন্তু কোম্পানির আদেশ মত এবং দিল্লির সম্রাটের সনন্দ বলে হেস্টিংস জমিদারগণের নিকট হইতে খাজানা আদায়ের ভার নিজ হস্তে লইলেন এবং তজ্জন্য প্রত্যেক জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন। জমিদারগণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাহার মন্ত্রী সভার পাঁচজন সভ্যকে স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারগণের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইল। ঐ প্রণালীতে হেস্টিংস মহারাণী ভবানীর সঙ্গে কেবল রাজস্বের বন্দোবস্ত করিলেন, এমত নহে; প্রত্যেক জেলায় এক একটি ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত স্থাপন করিলেন। কালেক্টরের হস্তে দেওয়ানি বিচারের ভার এবং মুসলমান কাজির হস্তে ফৌজদারি বিচারের ভার অর্পিত হইল। এই বন্দোবস্তে জমিদারগণের রাজস্ব বৃদ্ধি হইল এবং তাহাদের পূর্বে যে ক্ষমতা ছিল তাহা খর্ব হইবার সূত্রপাত হইল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় পর্যন্ত নাটোর রাজা দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের কার্য সম্পন্ন করিতেন।[৩৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় পর্যন্ত অন্যান্য জমিদারগণেরও নাটোরের রাজার মতই প্রায় ক্ষমতা ছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদারগণ নিজ নিজ রাজ্য ভোগ দখল করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা রাউস সাহেব স্বীকার করিয়াছেন।[৪০] উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদারি পাইবার প্রণালী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সময়ও প্রচলিত হইল, কিন্তু জমিদারগণের অন্যান্য ক্ষমতার হ্রাস হইল। ইংলন্ডে পার্লেমেণ্ট নামে একটি মন্ত্রীসভা আছে, সেই সভার ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের নিয়মানুসারে বাংলার গবর্ণর হেস্টিংস ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম "গবর্ণর জেনেরেল" হইলেন। ইহার সময় (জমিদারির নূতন বন্দোবস্ত সময়) হইতে ইহার ইংলন্ডে প্রত্যাগমন করা পর্যন্ত, (১৭৭২-১৭৮৫) ইনি অনেক জমিদারগণের প্রতি অত্যাচার করেন। মহারাণী ভবানী এবং তাহেরপুর, লস্করপুর ও বারবকপুর পরগণার জমিদারগণের সহিত হেস্টিংস পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করেন, এই পাঁচশালা বন্দোবস্তই রাণী ভবানীর অধঃপতনের মূলকারণ। ওয়ারনে হেস্টিংস বলিয়াছেন,—"রাজসাহী জমিদারি বাংলার দ্বিতীয় রাজ্য; ইহার বার্ষিক রাজস্ব ২৫ লক্ষ; বহুসংখ্যক জমিদারকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বর্তমান রাজসাহী জমিদার, তাহার সমগ্র জমিদারি মধ্যে একখানা গ্রামও উত্তরাধিকারক্রমে অধিকার করেন নাই।"[৪১] কিন্তু হেস্টিংস স্বয়ং এই নিয়ম রক্ষা না করিয়া রাণী ভবানীর নিকট হইতে রঙ্পুরের অন্তর্গত বাহিরবন্দ পরগণা কাড়িয়া লইয়া বানিয়ান কান্তবাবুকে দেন। সেই হইতে এখনও বাহিরবন্দ কাসিমবাজার রাজবংশের অধিকারে। হেষ্টিংসের পরে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। জমিদারগণের সহিত তিনি প্রথমে দশ বৎসরের জন্য যে "দশশালা" বন্দোবস্ত করেন, তাহাই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে জমিদারগণের নিকট হইতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আর বৃদ্ধিহারে রাজস্ব লইতে পারিবেন না এবং জমিদারগণও প্রজাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজানা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আবওয়ার লইতে পারিবেন না। তাহাদের বিচারাদি করিবার ক্ষমতা রহিত হয় এবং কিস্তিমত

নির্দিষ্ট দিনে খাজানা ইংরেজ সরকারে দাখিল করিতে না পারিলে জমিদারি নিলাম হইয়া যাইবে। স্বজেলার কালেক্টরগণের হস্তে খাজানা আদায়ের ভার অর্পিত হইল। প্রতি জেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার জন্য জজ নিযুক্ত হইল। জজদিগের অধীন বাঙালি মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়া এবং স্থানে স্থানে থানা স্থাপিত করিয়া এক এক থানায় এক এক পুলিশ দারোগা নিয়োজিত করা হইল। তদপর গবর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্কের সময়ে কালেক্টরদের হাতে ফৌজদারি বিচারের ভার অর্পিত করিয়া বাঙালিদের ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। আবার লর্ড এলেনববার সময়ে বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পদ সৃষ্টি করিয়া নিম্ন ফৌজদারি বিচার একবারে তাহাদের হস্তে অর্পিত হইল। এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে আইন সঙ্গত জমিদারগণের বিচারাদি করিবার কোন ক্ষমতা রহিল না, কেবল প্রজার নিকট খাজানা আদায় করিয়া ইংরেজ সরকারে রাজস্ব দিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজার অভ্যাস বশতঃ এবং প্রজারা অশিক্ষিত বলিয়া, জমিদারগণ ব্যপদেশে বিচারাদি কার্য নির্বাহ করিয়া কিঞ্চিৎ দণ্ডও আদায় করিতেছিলেন। এপ্রথা রাজসাহী প্রদেশে যে প্রচলিত ছিল না তাহা বলিতে পারা যায় না। সামান্য ব্যয়ে এবং বিনাপরিশ্রমে, বিচারকার্য জমিদারের নিকট সম্পন্ন হয় বলিয়া, প্রজার বহুকালের পূর্ব অভ্যাস একবারে ত্যাগ হওয়া কঠিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাটোর রাজ্যের কি প্রকার অবস্থা ঘটে তাহাও এস্থলে বলা প্রয়োজন।

নাটোর রাজ্য যে দুইদিন পবে ধ্বংস হইত, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহার ধ্বংস আরো নিকটবর্তী হইল।[৪২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার সমুদয় জমিদারগণের অসম্ভব বৃদ্ধিহারে রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়। বিশেষত নাটোর জমিদারির রাজস্ব অন্যান্য জমিদারগণ অপেক্ষা অত্যন্ত বেশি হইয়াছিল।[৪৩] অনেক স্থলে আদায়ী জমা অপেক্ষা রাজকর বেশি হইয়াছিল।[৪৪] এইরূপ বৃদ্ধিহারে রাজকব নির্ধারণে "কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ" সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অসন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তাহারা এই বলেন যে "পরিমিত জমা নির্ধারণ করিয়া, কিস্তি কিস্তি বীতিমত আদায় হয়, তাহাতে প্রজা ও জমিদারগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু বৃদ্ধিহারে জমা নির্ধারণ করিয়া নিয়মিত আদায় না হইলে, প্রজা ও জমিদারগণের বিরক্তির ও কষ্টের কারণ ভিন্ন কিছুই নহে। প্রজার ও জমিদারের সুখই কোম্পানির সুখ ও সমৃদ্ধি।"[৪৫] মুসলমান রাজত্ব সময়ে জমিদারগণের জমিদারিতে যে লাভ ছিল তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কমিয়া গেল। জমিদারগণের রাজস্ব পূরণ করিতে বা আয় বৃদ্ধি করিতে কিছুদিন কষ্টভোগ করিতে হইয়ছিল; কিন্তু ভূমির উৎকর্ষতা ও আদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জমিদারগণের আয়ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভাল মন্দ দুই ঘটিল। ক্রমে প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া জমিদারগণের আয় বৃদ্ধি হইতেছে অথচ জমিদারগণকে নির্ধারিত জমার বেশি দিতে হইতেছে না। মোটের উপর বলিতে গেলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারগণ ভূমির উৎকর্ষতা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থাকে অনেক উন্নত করিতে পারিয়াছেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে এক দল নূতন শ্রমজীবী ব্যবসায়ী লোকের উৎপত্তি হইল। ইহারা ভূমির আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া, ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের অধীনে সদরমেট, বানিয়ান, কোম্পানি কাগজের দালালি কার্য প্রভৃতি নির্বাহ করিয়া যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে অনেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাময়িক অসুবিধা নিবারণ করিয়া পরে তাহারা বড় বড় ভূম্যধিকারী হইয়া পড়িলেন। এ সকল সুবিধা নাটোর রাজবংশের কিছুই হইতে পারে নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাটোর রাজকে যত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল এত কোন রাজাকেই করে নাই। জমিদারির আয় অপেক্ষা রাজকর বেশি হওয়ায়, নাটোর রাজা সম্পূর্ণ রাজস্ব দাখিল করিতে অক্ষম হন এবং জমিদারিও রাজকর জন্য ক্রমে নিলাম হইয়া যায়। এইরূপে নাটোর রাজের অধঃপতন ছোট ছোট বিত্তর জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

রাণী ভবানীর সময় সামাজিক নিয়ম সংস্কারের প্রস্তাব— রাণী ভবানীর কন্যা তারা ঠাকুরঝি

অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার বৈধব্য যন্ত্রণায় রাণী ভবানী সর্বদা দুঃখিত থাকিতেন। ঢাকার রাজবল্লভও ঐরূপ স্বীয় কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণায় প্রপীড়িত ছিলেন। রাণী ভবানী ও রাজবল্লভ তাহাদের বিধবা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পণ্ডিতমণ্ডলীতে উত্থাপন করিলেন। সে সময় বিক্রমপুর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের শিরোমণি ছিলেন। নদীয়ার পণ্ডিতগণ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন। বিক্রমপুর ও নদীয়ার পণ্ডিতগণের বিচারে বিধবা বিবাহ ব্যবস্থাসূচক বলিয়া স্বীকৃত হয় ; কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে কার্যে পরিণত হইল না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বঙ্গদেশে প্রচলিত জন্য আন্দোলন করেন তাহা একশত বর্ষ পূর্বে রাণী ভবানী একজন হিন্দু রমণী প্রস্তাব করেন। রাণী ভবানী স্কুলে পড়েন নাই এবং আধুনিক মতেও শিক্ষিতা ছিলেন না। এইরূপ হিন্দু রমণীর বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে তাহার দূরদর্শীতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মতেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার আগ্রহ প্রকাশ পায়।

বিধবা রমণীদের প্রতি রাণী ভবানীর ব্যবহার— বিধবা অনাথা দরিদ্রারমণীর যে কষ্ট ও দুঃখ তাহা রাণী ভবানী বিলক্ষণ বুঝিতেন। বিধবা রমণীদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নিবারণ জন্য তাহাদের অনেককে মাসিক বৃত্তি দিতেন এবং অনেক হতভাগিণী বিধবা রমণীর ভরণপোষণের জন্য গঙ্গাতীরে আশ্রয় স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

বিধবা রমণীদের প্রতি এইরূপ সাহায্য করা পূর্বে প্রয়োজন কম ছিল। দেশে এত প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত যে তদ্দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিয়া তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। একার্যের প্রতিবন্ধকেই তাহাদের পরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন—"দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পস উৎপন্ন হইত; বিধবাগণ তাহা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইত। এদেশের তন্তুবায়গণ ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, কার্পাসের কথা এখন অভিধানে অধ্যয়ন করিতে হইতেছে ; সুতরাং পল্লী রমণীগণের পক্ষে শ্রমলব্ধ অর্থোপার্জনের সর্ব প্রধান পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।"[৪৬] মুসলমান ও নীচ জাতীয় অনাথা হিন্দু রমণীরা এক্ষণে অপরের শস্যক্ষেত্রে ত্যক্ত ধান্য কুড়াইয়া এবং গোময় পিষ্ঠক বিক্রয় করিয়াও জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের হতভাগিণী দরিদ্রা বিধবা রমণীর জীবিকা নির্বাহের উপায়ের দ্বার পায় একবারে রুদ্ধ। তাহাদের অধিকাংশই আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া থাকেন।

রাণীভবানীর সময় শিল্প ও বাণিজ্য—রাজসাহী রাজ্য কার্পাস ও পট্টবস্ত্র জন্য বিখ্যাত ছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া বিক্রয় জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিতেন। রাণী ভবানীর শাসন সময়ে ধান্য চাউল খুব সস্তা দরে বিক্রয় হইত। কোনও কোন সময় টাকায় ৫৬ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত, খুব দর চড়া হইলেও টাকায় ২/৩ মণ করিয়া পাওয়া যাইত। এ জন্য তাহার প্রজাগণ সুখী ছিল। তাহার শাসন সময়ের প্রথম অবস্থায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে, আবার তাহারই শাসন সময়ের শেষ দশায়, দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের তিরোধানের সূত্রপাত হয়। মীরকাসিমকে যুদ্ধে ইংরেজেরা পরাস্ত করার পর হইতে দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ব্যবসা বাণিজ্যের লাভ নিতান্ত কম হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধা শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। অনেক লোক শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে লাগিল। বিলাতি কাপড় সস্তা দরে বিক্রয় হওয়াতে দেশীয় তন্তুবায়েদের অন্ন একবারে আরো গেল। সুতরাং দেশীয় কার্পাস বস্ত্র আর দেখা যায় না। একমাত্র পট্টবস্ত্র (মটকা বস্ত্র) রাজসাহী প্রদেশের দক্ষিণ ও উত্তরভাগে অতি অল্প পরিমাণে এখনও প্রস্তুত হইতেছে।

রাণীভবানীর সময় "মন্বন্তর"—দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে "দেওয়ানি" সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া

ইংরেজ বণিক সমিতি দেশের রাজা হইলেন। নবাবের আর সে ক্ষমতা রহিল না। সুতরাং জমিদারগণের ক্ষমতা হ্রাসেরও সূত্রপাত হইল। এক রাজার পতনে এবং নূতন রাজার নূতন আমলে, রাজশাসন শিথিল হইবারই কথা। সুতরাং অরাজকতা আরম্ভ হইল এবং দেশের লোক দুর্দ্দশায় পতিত হইল। নিরাশ্রয় দরিদ্র লোকদিগের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। লোকেরা আর স্বচ্ছন্দ চিত্তে ও নিরুদ্বেগে কি কৃষি, কি শিল্প, কি ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিল না। কেহ প্রধান প্রধান ব্যবসার আড়ং হইতে দূর দেশে পলায়ন করেন এবং কেহ বা পল্লী গ্রামে যাইয়া কৃষি আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় "দেশের রাজ্যশাসন বিশেষত প্রজারক্ষণ কার্য প্রায় লুপ্ত হইতে লাগিল"।[৪৭] ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "মন্বন্তর" সম্বন্ধে বিশেষ রূপ লিখিয়াছেন ঃ—"বাঙালির অন্নগত প্রাণ। সাতাত্তরের মন্বন্তরে সেই অন্ন দুর্লভ হইয়া উঠিল। লোক দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। প্রধান জমিদার বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। পথে ঘাটে নদী তীরে শবদেহ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষ শেষে স্থির হইল যে, "মন্বন্তরে" বাংলার সর্বনাশ হইয়াছে—হলকর্ষণক্ষম কৃষক জীবিত নাই, বীজধান্য ও গো-বৎসের অভাব হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র তৃণ কন্টকে পূর্ণ হইয়াছে"। এরূপ দুর্দিনে দয়াশীলা রাণী ভবানী প্রজার রক্ষা জন্য রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। রাজকোষে আর অর্থ রহিল না। চারিদিকে হাহাকার। রাণী ভবানী প্রজার দুঃখে ম্রিয়মানা। তিনি শূন্য হস্তে প্রজার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া এবং রক্ষা করিতে না পারিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রজার দুঃখ নিবারণ জন্য রোদন করিতে লাগিলেন।

রাণী ভবানীর গঙ্গাবাস—রাজসাহী রাজ্যে "মন্বন্তর" উপস্থিত; ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যবহারে দুঃখিত; শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি; প্রজার দুঃখ; রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি; নিজ ক্ষমতার খর্বতা;— এই সমুদয় কারণে রাণী ভবানী দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাবাসের সঙ্কল্প করিলেন। যে দিন রাণী ভবানী রাজসাহীর রাজ্যভার পরিত্যাগ করেন সেই দিন হইতে রাজসাহীর গৌরব নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল।

মহারাজা রামকৃষ্ণ—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আটগ্রামের রায় বংশ সম্ভূত রামকৃষ্ণ।[৪৮] মহারাণী ভবানীর মৃত্যুর পর, মহারাজা রামকৃষ্ণ সর্বতোভাবে তাহার মাতৃরাজ্য অধিকার করিলেন। তাহার পিতার ন্যায় তিনিও নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক ছিলেন এবং দেবার্চনায় তাহার সময় অতিবাহিত করিতেন। তাহার বিষয় বুদ্ধি এবং জমিদারি কার্য নির্বাহের ক্ষমতা একবারে ছিল না, বা তিনি জমিদারি ও ঐশ্বর্য ভোগে বীতরাগ ছিলেন। যখন দেবার্চনা ও তপস্যা তাহার জীবনের ব্রত ছিল, তখন তাহার সংসারে বীতরাগই সম্ভব। যে কারণেই হউক মহারাজা রামকৃষ্ণের সময় হইতে নাটোর রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ আরম্ভ হইল। বলিহারের রাজা কৃষেন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেরূপ তাহার "সুখভ্রমে" লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"—'মহারাজা রামকৃষ্ণ' নিবিষ্ট অন্তরে—
অন্বেষিলা নিত্যসুখ, যবে যোগবলে,
ভ্রুক্ষেপ কি ছিল তাঁর, বিষয়ের প্রতি!
অতি অল্পকালে, প্রায়, সমস্ত সম্পদ,—
পরহস্তগত হ'ল অনেকেই জানে।
—কিন্তু, একদিন (ও) তিনি, ক্ষোভ না প্রকাশি—
প্রশান্ত মানসে চিন্তি, ইষ্টদেব পদ,
ইহলোক পরিত্যাগ করেন হরিষে।"

যাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বর-প্রেম উচ্ছলিত হয়, তাহার নিকট অতুল ঐশ্বর্য, ধন জন সম্পত্তি তৃণবৎ জ্ঞান হয়। রামকৃষ্ণ তাহার বিশাল রাজ্যকে অনিত্য সুখের কারণ জ্ঞানে উপেক্ষা

করেন।[৪৯]

মহারাজা রামকৃষ্ণের আমলা ও চাকরদের অন্যায় ব্যবহার—তাহার অমাত্য, আমলা এবং ভৃত্যগণ চারিদিকে লুঠ আরম্ভ করেন। যে ব্যক্তি যে দিকে পায় অর্থ লইয়া নিজে ধনী হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল বংশের কালীশঙ্কর রায় সর্বপ্রধান। মহারাজা, কালীশঙ্করকে বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ এবং পরম বন্ধু জ্ঞান করিতেন। কিন্তু কালীশঙ্কর মিত্রের কার্য না করিয়া শত্রুর কার্যই করিয়াছেন। তিনি নাটোর রাজ্য ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ।

মহারাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যনাশ— মহারাজা একটি গানের জন্য পরগণা কাদিহাটি নড়াইল বংশীয় কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করিলেন এবং ভূষণার অবশিষ্টাংশ তাহাকে ইজারা দিলেন। ভূষণার আয় বৃদ্ধি হইবার আশয়ে কালীশঙ্করকেই ইজারা দেওয়া হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইজারা লইয়া কালীশঙ্কর ৩২৪০০০ টাকা রাজস্ব হইতে ৩৪৮০০ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় বর্ষে রাজস্ব বৃদ্ধি করায় কালীশঙ্করের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইল। কালীশঙ্করের সহিত বিবাদে অনেক প্রজা প্রাণ হারাইল। অবশেষে কালীশঙ্কর নরহত্যার অপরাধে চারি মাস কারাগারে বাস করিলেন। ইজারা আর রহিল না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা, তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিশ্বনাথের নামে ভূষণা হেবা করিয়া দিলেন। এই রূপে কিছুদিন চলিয়া গেলে, জমিদারির কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতেছে না বলিয়া ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভূষণার জন্য একজন কমিশনর নিযুক্ত হইল। তিনি কালীশঙ্করের নির্ধারিত কর বিস্তর কমাইয়া দিলেন। ভূষণার মোট রাজস্ব ৩২৭৮০০ টাকা এবং সদর জমা ২৪৮১১৮ টাকা স্থির হইল। বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ভূষণা জমিদারি অর্পণ করা হইল ; কিন্তু লাভজনক জমিদারি নহে বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন না। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে যশোহরের কালেক্টরির অফিসে নিম্নলিখিত লাটে ভূষণা বিক্রয় হইল :—[৫০]

পরগণা	রাজস্ব	বিক্রয়ের তারিখ	যে ব্যক্তি ক্রয় করে
হাবেলী	৩৬৬১৩	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯	রমানাথ রায়
মুকিমপুর	২৫৩৪৭	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯	রমানাথ রায়
নসীবশাহী	১৬৯৩৭	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়
সাতোড়	৩৯৯৬৮	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯	শিবপ্রসাদ রায়
নলদী	৬৬৭৬০	২৩ মার্চ ১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভূষণা পরগণা যশোহব জেলার সামিল হয় বলিয়া যশোহরের কালেক্টরির আফিসে নিলাম হয়। মহারাজা রামকৃষ্ণের অন্যান্য বৃহৎ জমিদারি ভূষণার মত বিক্রয় হইয়া গেল। রাজার অনেক জমিদারি ইজারাদার কালীশঙ্কর ক্রয় করিলেন। ময়মনসিংহের চৌধুরি জমিদারেরা পুখরিয়া পরগণা; গোবরডাঙার কেনারাম মুখোপাধ্যায় ডিহি আড়পাড়া এবং গোপীমোহন ঠাকুর ডিহি কালেশপুর এবং স্বরূপপুর ক্রয় করিলেন। এইরূপে রাজসাহী রাজ্যের ধ্বংস হইয়া অল্প মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যনাশের কারণ—মহারাজার জমিদারি কার্যের অপটুতা ও শিথিলতাই যে রাজ্যনাশের কেবল একমাত্র কারণ তাহা নহে। রাজানাশের অন্যতম কারণ রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি। অতিরিক্ত কোম্পানির কর বৃদ্ধি হওয়ায় মহারাজা কিস্তিমত কোম্পানির সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলেন না এবং দেশীয় শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাঘাতে প্রজার অবস্থা দিন দিন খারাপ হওয়ায় প্রজার নিকটও কর রীতিমত আদায় করিতে পারিলেন না। ডাইরেক্টরগণ বলিয়াছেন যে—"সম্ভবপর জমা কিস্তিমত আদায় করিয়া প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সুখ সন্তোষ বর্ধন করাই কর্তব্য কিন্তু অসম্ভব জমার কিয়দংশ বলপূর্বক আদায় করিয়া প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণকে ত্যক্ত বিরক্ত করা এবং কঠিন ব্যবহার করা নিতান্ত অযুক্তি।"[৫১] এই উদ্ধৃত অংশে ইহা কতকটা

প্রমাণ হয় যে সদর জমা অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্যনাশের একটি কারণ। কিন্তু রাজার জমিদারি কার্যের শিথিলতাই রাজ্যনাশের প্রধান কারণ। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে "মহাত্মা ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব যশোহরের রিপোর্টে যে সকল জমিদারি বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়াছেন সে বন্দোবস্ত বিশেষতঃ নাটোর রাজ্যের বন্দোবস্ত অতিরিক্ত হইয়াছে।"[৫২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোন কোন স্থলে পুরাতন জমিদারগণের উপকারও হইয়াছে। আবার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নূতন একশ্রেণি জমিদারগণের সৃষ্টি হইল— যাহারা বণিক, দালাল, মহাজন, ভূসম্পত্তি লাভের লালসায় সঞ্চিত ধন প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক। পুরাতন জমিদারের জমিদারি কোম্পানির রাজস্ব না দিতে পারায় নিলাম হয় এবং ঐ বণিক, দালাল প্রভৃতি তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ঐ সকল নিলামী ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া নূতন জমিদার হইল। ইহারা জমিদারিতে যেরূপ আয় বৃদ্ধি করিয়া লাভজনক করিল, পুরাতন জমিদারেরা প্রায়ই সে রূপ আয় বৃদ্ধি করিতে পারিল না। ক্রমেই পুরাতন জমিদারগণ— ধ্বংস হইবার আকার হইল। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাটোর রাজ্যের ধ্বংস শীঘ্র হয়।"[৫৩] মহাত্মা হেঙ্কেল সাহেব ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের কালেক্টর, জজ এবং মাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তাহার সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যে পরিণত হয়। তাহার বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তিনি নিজে সন্তোষ লাভ করেন নাই। নাটোর রাজ্যের অধঃপতনে তাহার দোষ ছিল না। মহারাজা রামকৃষ্ণ সুচারুরূপে রাজকার্য নির্বাহ করিতে পারগ হইলেও তাহার পক্ষে কিছুকালের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্ধারিত সদর জমা গবর্নমেন্টকে রীতিমতো দেওয়া কঠিন হইত। তাহার সংসারে সঞ্চিত অর্থ থাকিলে এবং সেই অর্থ দ্বারা কমতি জমা কিছুদিন পূরণ করিতে পারিলে, তাহার রাজ্যনাশ হইত না, বরং পরে ঐ জমিদারি লাভজনক হইত। তাহার ভাগ্যক্রমেই নাটোর রাজ্যের ধ্বংসাপবাদ সহ্য করিতে হইল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের কারাবাস— মহারাজা ক্রমে রাজস্ব বাকি ফেলিলেন। কোম্পানির রাজস্বের অনেক টাকা মহারাজার নিকট পাওয়ানা হইল। নিজ রাজসাহী জন্য সিক্কা ১৭০৩৩৫ টাকা এবং বাজে মহাল জন্য সিক্কা ৯৮৫০৭ ৸৵ ১৪ গণ্ডা মোট সিক্কা ২৬৮৮৪২ ৸৵ ১৪ গণ্ডা রাজস্ব মহারাজার নিকট কোম্পানির পাওয়ানা। এত টাকা আদায়ের কোন উপায় না দেখিয়া ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ তারিখে রাজসাহী বিভাগের কমিশনর মহাত্মা জে, এইচ, হারিংটন সাহেব মহারাজাকে অতি সম্মানের সহিত নজরবন্দি স্বরূপ উপযুক্ত কারাবাসে রাখিলেন। কেবল সিপাহি মাত্র পাহারা থাকিল, কিন্তু তাহার আমলাগণ বা তাহার চাকর আদি যখন ইচ্ছা তখনই রাজার নিকট যাইতে পারিতেন। নাটোর রাজ্যের কার্য নির্বাহ জন্য রাজার কারাবাসের সময় পর্যন্ত রামজীমল নামক জনৈক "সরবরাহকার" নিযুক্ত হইলেন। বোর্ড কমিশনরের কার্য অনুমোদন করিলেন।[৫৪] কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ বড়লাট মহারাজাকে আরো সময় দিলেন এবং কমিশনর সাহেবকে আদেশ করিলেন যে মহারাজা কোম্পানির কিস্তির বাকি রাজস্ব দিবার "অঙ্গীকার পত্র" রেজেস্টরি করিয়া দিলে তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিতে পারেন। ১৮ মার্চ "অঙ্গীকার পত্র" রেজেস্টরি হইলে মহারাজা কারাবাস হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু "অঙ্গীকার পত্রের" শর্তানুসারে কার্য করিতে না পারায় মহারাজার অবশিষ্ট রাজ্যের কিয়দংশ বাকি রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইল। এই সময় পরগণা পাতিলাদহ, পরগণা আমবাড়ি, কিসমৎ কোতওয়ালী, চৌঘরিয়া মাণিক ডিহি প্রভৃতি জমিদারি নিলাম হইল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের সময়ে দেশের অবস্থা—ইংরেজ বঙ্গদেশ অধিকার করায় এবং কোম্পানির আপন নবাব সৃষ্টি হওয়ায়, মহারাজার দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের ক্ষমতা কমিয়া গেল। ইংরেজ শাসন প্রণালীও রীতিমত প্রচলিত হয় নাই। এ সময় রাজ্যের সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। চারিদিকে চুরি ডাকাইতি এত প্রবল হইয়া উঠিল যে প্রজার ধন

প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইল। ডাকাইতগণ মধ্যে পণ্ডিতা, কার্তিকা, ফতু এবং জিতু প্রধান। এই দস্যুদল মধ্যে ব্রাহ্মণ ভদ্রও ছিল। চলনবিল এই দস্যুদলের আবাস স্থান ছিল। এই চলনবিলের স্থানে স্থানে দস্যুদলের ঘাঁটি ছিল। চলনবিলই দস্যুদলের দস্যুবৃত্তির প্রধান স্থান ছিল। ইহাদের অত্যাচারে প্রজাগণ অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িল। পুলিশ ও জমিদারের নায়েব ও গোমস্তাদের নিকট লোকে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল। চোর ডাকাইতেরা অর্থ দ্বারা পুলিশ ও জমিদারের নায়েব ও গোমস্তাকে বশীভূত করিল। এইরূপে চোর ডাকাইতের দল ক্রমে পুষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তি চুরির দ্রব্যাদি গোপনে নিজ বাটিতে রাখিলেন এবং তাহারা "থানীদার" বলিয়া পরিচিত হইল। এই প্রকারে সলপ ও রাজসাহী প্রদেশের অন্যান্য গ্রামের অনেক ব্যক্তি চোর ডাকাইতের অর্থ দ্বারা বহুতর ধন সঞ্চয় করিল।[৫৫] রাজসাহী প্রদেশের বর্তমান কোন কোন ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের ধন সম্পত্তির মূল অনুসন্ধান করিলে ইহা অনুমিত হইবে যে, দস্যুবৃত্তিই তাহাদের সম্পত্তির কারণ। মাজিস্ট্রেট সাহেব নূতন স্থানের রীতি নীতি জানেন না। সুতরাং তাহাকে তাহার সেরেস্তাদারের উপর সমুদয় বিষয় নির্ভর করিতে হইল। সেকালে সেরেস্তাদারই প্রকৃত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া উঠিলেন। যখন সেরেস্তাদার জেলার সর্বময়কর্তা, তখন চোর ডাকাইতের শাসনের আশা রহিল না। কলিকাতার সারকিট কাছারির তৃতীয় জজ স্ট্রেচি সাহেব উল্লেখ করেন যে, সেরেস্তাদার এবং রহিমউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন এবং তাহাদের প্রজা বলিয়া, চোর ও ডাকাইতকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করেন।[৫৬] যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক হইল। দেশ রক্ষার উপায় রহিল না। সে সময় পুলিশের দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ এবং কাছারির আমলা দেশ রক্ষক। কিন্তু তাহারা উৎকোচ গ্রহণ করায়, চোর ডাকাইতের দৌরাত্ম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইল।[৫৭] এসকল কথা গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মচারীদের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। এক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য এক সাহেব নির্বাহ করিতেন। তাহার কার্য এত বেশি যে তিনি একা সুচারুরূপে সকলদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন না। সুতরাং আমলাদের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় হয় না এবং পুলিশের কার্য উচিত রূপ পর্যবেক্ষণ করিবার সময় হয় না। প্রজাগণও পুলিশের অত্যাচার সহ্য অপেক্ষা চোর ডাকাইতের অত্যাচারই সহ্য করা সঙ্গত মনে করিল। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন যে—"মফস্বল কাছারির প্রধান বিচারকই আমলা, যেহেতুক নূতন বিচারককে আমলাবা আপন ইচ্ছামত চালায়"।[৫৮] আমলাদের ও পুলিশের কর্তব্য কর্মের ত্রুটিতে দেশে চুরি ডাকাইতির দমন না হওয়ায়, রাজ্য শাসনের জন্য এবং প্রজাগণকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নানা দিক হইতে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট চাহিতে লাগিলেন যে কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজাগণকে চোর ডাকাইতের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যায়। চোর ডাকাইতের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা "সারকিট কোর্টের" জজ মিঃ স্ট্রেচি সাহেব গবর্ণমেন্ট সমীপে এই প্রস্তাব করিলেন যে চোর ডাকাইতের সর্দারগণকে কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিলে, তাহাদের অনুচর ডাকাইতদের প্রভেদ না করিয়া একবারে সমুদয়কে দণ্ড করা সঙ্গত নহে; কিন্তু কেবল চোর ডাকাইতকে দণ্ড প্রয়োগ করা অপেক্ষা চোর ডাকাইতি দমন জন্য উপায়ালম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ। আবার কেবল লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, স্থান পাত্র বিবেচনা করিয়া ফৌজদারি বিচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারি আদালতের বিচারক নিযুক্ত করাই সঙ্গত। এই প্রস্তাব অনুমোদনে প্রজাগণকে চোর ডাকাইতের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট ক্রমে কৃতকার্য হইতে লাগিলেন। শেষে কোম্পানির সুশাসন বলে চোর ডাকাইতের দমন হইল এবং প্রজাগণও সুস্থির হইল।

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" গঠনের সময় হইতে রাজ্য শাসন প্রণালী—ইংলন্ডেশ্বরী মহারাণী

এলিজাবেথ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব মহাদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য লন্ডন নগরের এক দল বণিককে সনন্দ দেন। এই সনন্দ অনুসারে "লন্ডন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" নামে এক বণিক সমিতি সংস্থাপিত হয়। আবার ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে "ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" নামে এক ইংরাজ বণিক সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু মহারাণী এনের রাজত্বকালে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে এই দুই দল বণিক একত্রিত হইয়া "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" নাম ধারণ করে। এইরূপে দুই দল বণিক একত্রিত হইবার পূর্বে, ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের বণিক সমিতি ভারতবর্ষান্তর্গত সুরাট নগরে কুঠি নির্মাণ জন্য দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহাই "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির" ভারতে স্বাধীন রাজত্ব বিস্তারের সূত্রপাত। এই কোম্পানি স্বাধীন ভাবে রাজত্ব বিস্তার করিবার পূর্বে বণিক সমিতি মোঘল সম্রাটের অধীন থাকিয়া, তাহাকে কর দিতেন, তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতেন এবং কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যই চালাইতেন। কুঠিগুলি মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও, ইংলন্ডেশ্বরের আদেশ মতো বণিক সমিতি নিজ আইন প্রচলিত করেন এবং নিজ কর্মচারীদের ও কোম্পানির দখলি ভূমির অধিবাসীদের কোম্পানির আইন অনুসারে বাধ্য করিতেন। ইহাতে মোঘল সম্রাটের কোন আপত্তি ছিল না। তত্রাচ সে সময়ে কোম্পানির শাসনপ্রণালী ব্যবস্থাহীনই ছিল। মহারাণী এলিজাবেথ প্রদত্ত সনন্দ সময় হইতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের সময় পর্যন্ত, কোম্পানির শাসনপ্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পলাশি যুদ্ধের পর হইতে মোঘল সম্রাট সাহ আলম নিকট হইতে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার "দেওয়ানি" প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ এই আট বৎসরে "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির" আইন কানুনের অনেক পরিবর্তন হয়। কুঠি সমুদয়ের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ জন্য, কোম্পানির স্বত্ব রক্ষা জন্য এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি নিবারণ জন্য, কোম্পানি সংশোধিত নিজ আইন ও নিয়ম প্রচলিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন আইন বা ব্যবস্থা ইংলন্ডের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হইবার যো ছিল না। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডেশ্বর প্রথম জর্জের সময় বাংলা, মান্দ্রাজ ও বোম্বে এই তিন প্রেসিডেন্সীতে "মেওর কোর্ট" নামে বিচারালয় স্থাপিত হইল। এই কোর্টে সর্বপ্রকার দেওয়ানি বিচার হইত এবং উইল আদিও প্রবেট হইত। এই কোর্টের আদেশের অন্যথায় প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর গবর্ণরের নিকট আপিল এবং গবর্ণরের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিলাতে রাজার সমীপে হইত। এই "মেওর কোর্ট" ইংলন্ডস্থিত "কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের" অধীন ছিল। ভারতের বিচারালয়ের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টরেরা আইন, নিয়ম ইত্যাদি করিয়া দিতেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপ আইন ও ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল এবং ইহা মোঘল সম্রাটের অনুমোদিত ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে লর্ড ক্লাইব মোঘল সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানির পক্ষে বাংলা বিহার উড়িষ্যার "দেওয়ানি" সনন্দ গ্রহণ করেন। এই সনন্দ অনুসারে "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" এই তিন প্রদেশের রাজস্ব আদায় করিবেন এবং দেওয়ানি ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচার করিবেন। কিন্তু ফৌজদারি বিচার নবাবের হস্তে রহিল। এই ফৌজদারি বিচারের ব্যয় ভার কোম্পানিকেই বহন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর স্বরূপ মোঘল সম্রাটকে দিতে হইবে। ৬ বৎসর যাবৎ ঐ ফৌজদারি বিচার নবাবের হস্তে এবং দেওয়ানি বিচার "দেওয়ানের" হস্তে অর্পিত ছিল। ইহাতে এই ফল হয় যে কিছুদিন রাজ্যে প্রকৃত বিচার ছিল না— অরাজকতাই হইয়াছিল। অরাজকতা দুই প্রকার— (১) রাজার অভাবে, (২) রাজার বা রাজকর্মচারীর অবিচারে। রাজার বা রাজ কর্মচারীর অবিচারে যে অরাজকতা হয়, তদ্দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের যে কেবল ক্ষতি হয় এমত নহে; অরাজকদেশে মনুষ্যের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম ক্রিয়াকলাপ দস্যুর ন্যায় হইয়া দেশের শ্রীনষ্ট হয়। মফস্বলে ফৌজদারি বিচার মুসলমান আইন অনুসারে মুসলমান কর্মচারী দ্বারা নির্বাহিত হইত। কিন্তু শহরে নবাব, তাহার নায়েব, ফৌজদার, কোতওয়াল প্রভৃতি

দ্বারা ফৌজদারি বিচার নির্বাহ করিতেন। কলিকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে এবং তন্নিকটবর্তী স্থানের বিচার কার্য সাহেবের তত্ত্বাবধানে ছিল; কিন্তু বাংলা বিহার উড়িষ্যার অবশিষ্ট স্থানে কার্য নির্বাহ জন্য দুই জন দেশীয় দেওয়ান ছিল— একজন মুরশিদাবাদে এবং একজন পাটনায় থাকিত। এই দুই জনের কার্য পর্যবেক্ষণ জন্য দুই স্থানে দুই সাহেব "রেসিডেন্ট" ছিলেন। "এই সময়েও জমিদারগণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার করিতেন; কেবল প্রাণদণ্ডের উপযোগী মোকদ্দমা নবাব নাজিমের নিকট রিপোর্ট করিতে হইত।"[৫৮] অতএব নাটোর রাজার ঐরূপ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের ক্ষমতা ছিল। এ সময় "পিনাল কোড", "ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড" প্রভৃতি দণ্ডবিধির আইন কিছু ছিল না। নাটোর রাজার কারাগার ছিল, সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ডের যোগ্য হইলে, কোন অপরাধী আর্থিক দণ্ডের দণ্ডিত হইত এবং কোন অপরাধী কারাগারে নিহিত হইত। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচলিত করেন :—

(১) নায়েব দেওয়ানের পদ উঠাইয়া জেলায় জেলায় এক একজন সাহেব জেলার কর্তা হইল।

(২) একটি সারকিট কমিটি স্থাপিত হইল ; গবর্ণর এবং ৪ জন মেম্বর দ্বারা এই কমিটি গঠিত।

(৩) মফস্বলে দেওয়ানি আদালত স্থাপিত হইল; এই দেওয়ানি আদালত জেলার কালেক্টর সাহেবের অধীন। এই কালেক্টর সাহেবই জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিবেন।

(৪) সদর দেওয়ানি আদালত স্থাপিত হইল। মফস্বল আদালতের ৫০০ টাকার অতিরিক্ত দাবীর মোকদ্দমার এই আপিল আদালত।

(৫) এক এক জেলায় এক একটি ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হইল। প্রত্যেক জেলায় একজন কাজি, কালেক্টর সাহেবের অধীন থাকিয়া, ফৌজদারি কার্য নির্বাহ করিবেন। একজন মুফতি এবং দুইজন মৌলবি কাজিকে সাহায্য করিবে।

(৬) মুরশিদাবাদে "সদর নিজামত আদালত" স্থাপিত হইল। ইহার অধ্যক্ষ একজন দারোগা থাকিবে। ঐ দারোগাকে একজন মুফতি এবং দুই জন মৌলবি সাহায্য করিবে। এ আদালতে জেলার ফৌজদারি আদালতের বিচারের পুনর্বিচার হইবে। নবাব নাজিমের তত্ত্বাবধানে এই 'সদর নিজামৎ আদালত" স্থাপিত হয়।

এইরূপেও রাজ্যশাসন সুচারু রূপে নির্বাহিত হইতেছিল না। কোম্পানির অধীন কর্মচারীরা প্রজার প্রতি অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য করিয়া অথবা প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে গমন করিতে ছিলেন। ইহারা সর্বসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সকল ভারতের অত্যাচারের গল্প ইংলন্ডের পার্লেমেন্ট নামক মহাসভা শুনিতে পাইলেন। ভারতে কোম্পানির নূতন লব্ধ রাজ্য উত্তমরূপে শাসন হইতেছে না এবং কর্মচারীর দোষে কোম্পানির অনেক দুর্নাম হইতেছে, এসকল কথাও পার্লেমেণ্ট জানিতে পারিলেন। প্রজার দুঃখ নিবারণ করিতে না পারিলে, রাজ্য রক্ষা হওয়া কঠিন। কোম্পানির কর্মচারীরা বা তাহাদের আত্মীয়েরা প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া স্বার্থ-সাধন করিতে না পারে, ইহার জন্য পার্লামেন্ট কৃতসংকল্প হইলেন।[৬০] ভারতের প্রজার দুঃখ নিবারণ এবং রাজ্যে সুশাসন সংস্থাপন জন্য ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে "রেগুলেটিং এক্ট" (Regulating Act) নামে বিলাতে একটি আইন প্রচলিত হইল। এই বিধান অনুসারে বাংলার গবর্ণর ভারতবর্ষের "গবর্ণর জেনারেল" হইলেন এবং চারিজন মন্ত্রী তাহাকে সাহায্য করিবেন। ইহাই ভারতের "সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট" হইল। ইংলন্ডস্থিত "কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের" অধীনে এই "সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট" হইল। এই 'সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট' আইন করিবেন এবং জরিমানা আদি অর্থ দণ্ডেবন্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু এই আইন ও ব্যবস্থা 'সুপ্রিম কোর্টের' অনুমোদিত না হইলে

তদনুসারে কার্য হইবে না।[৬১] একজন প্রধান জজ এবং অপর তিনজন সহকারি জজ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আইসেন। ইহারাই চারিজনে কলিকাতায় 'সুপ্রিম কোর্টের' বিচার কার্য সম্পন্ন করিতেন। এই ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের বিধানে একটি দোষ লক্ষিত হইল। 'সুপ্রিম কাউন্সিল' এবং 'সুপ্রিম কোর্ট— দুইটিবই স্বতন্ত্র ক্ষমতা, আবার প্রত্যেকের ক্ষমতা বিশদরূপে নির্দিষ্ট করা ছিল না। ইহাতে দুটিতেই দ্বেষ ও ঈর্ষা উপস্থিত হইল। সুপ্রিম কোর্টের জজেরা সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রতি ক্রমে শত্রুতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিচারে অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল। এই রূপে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, আট বৎসর, সুপ্রিম কোর্টের অত্যাচার, অবিচার, দৌরাত্ম্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই আট বৎসর 'ভয়াবহ রাজত্ব' বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিল।[৬২] রাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড এবং ঢাকার ফৌজদারি আদালতের দেওয়ানের অপমান এবং গ্রেপ্তার প্রভৃতি অত্যাচার সুপ্রিম কোর্টের অবিচারের জাজ্বল্যমান প্রমাণ এবং সুপ্রিম কোর্টের সহিত সুপ্রিম কাউন্সিলের বিবাদের ফল। এমতাবস্থায় দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের ধন, প্রাণ, সম্মান রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। ১৭৮১ সালের আইনে 'গবর্ণর জেনেরল' স্বাধীন হইলেন এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন কার্যে সুপ্রিম কোর্টের আর কোন ক্ষমতা রহিল না। গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রী সভায় যে সকল আইন পাশ হইবে তাহার এক খণ্ড নকল ইংলন্ডের সম্রাটের স্টেট সেক্রেটরী সমীপে এবং আর এক খণ্ড প্রতিলিপি ইংলন্ডস্থিত 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ' সমীপে পাঠাইতে হইবে। দুই বৎসর মধ্যে ঐ আইন রদ না হইলে, আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কার্যে পরিণত হইবে। এই বিধানে "সুপ্রিম কোর্ট" কর্তৃক কারাগারে নিহিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ খালাস পাইল এবং দেশে শান্তি স্থাপন হইল। এই সময় হইতেই রাজ্যে সুশাসন বিস্তৃত হইল এবং সুবিচারের সূত্রপাত হইল। কিন্তু ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের গোলযোগে, নূতন সমাজ গঠন প্রভৃতি কার্যে কোম্পানিকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। অতএব ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ হইতে কোম্পানির রাজকার্যের সুশৃঙ্খলা হইল।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাটোরে রাজসাহী জেলার সদর কাছারি ছিল। উপরের প্রণালী অনুসারে নাটোরে রাজ্যশাসন কার্য নির্বাহিত হইত। হেস্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্ব সময়ে, রাজ্য-শাসন প্রণালী অনেক পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারগণের সহিত প্রসিদ্ধ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" সম্পাদিত করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ সাল পর্যন্তও নাটোর রাজার কমবেশি, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা ছিল। ইহার পর হইতেই নাটোর রাজাদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা একবারে রহিত হইল এবং রাজার কারাগার উঠিয়া গিয়া কোম্পানির কারাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কোম্পানি একজন সাহেবকে জজ, কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিলেন। একজনের হস্তে জেলার যাবতীয় কার্যের ভাল অর্জিত হওয়ায় কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? একজনে যাহা নির্বাহ করিতে পারে তদপেক্ষা অনেক বেশি কার্য উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে থাকিয়া কাজির কার্য পর্যবেক্ষণ, ক্ষুদ্র অপরাধীদের সরাসরি বিচার করিয়া কারাগারে প্রেরণ বা অর্থদণ্ড করিতেন। কিন্তু নরহত্যা, ডাকাইতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের কলিকাতা "সারকিট কোর্টে" অর্পণ করিতেন। তিনি কালেক্টরের পদে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য তাহাই নির্বাহ করিতেন। তিনি জজের পদে দেওয়ানি বিচারের কার্য নির্বাহ করিতেন এবং তাহার অধীন বাঙালি মুন্সেফের বিচারের উপর অধিকাংশ সময় নির্ভর করিতেন। এক ব্যক্তিকে নানাবিধ বহুতর কার্য করিতে হয়; আবার তিনি দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতিতে অনভিজ্ঞ। এমতস্থলে দেশ প্রকৃতরূপ শাসন না হইয়া অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নাটোরও ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নাটোর হইতে জেলা,

পদ্মা নদীর তীরে রামপুর বোয়ালিয়ায় উঠিয়া গেল। ক্রমে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টরের কার্য নির্বাহ্ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং জজের অধীনে সবজজ, মুন্সেফ; ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টরের অধীনে বাঙালি ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হওয়ায় শাসন কার্য ক্রমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নাটোর রাজগণ ক্রমে যে হীন অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রহিলেন। আবার জেলার অপর জমিদারগণেরও কেবল প্রজার নিকট নির্ধারিত রাজস্ব আদায় ভিন্ন ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা রহিল না।

মহারাজা রামকৃষ্ণের তপস্যা—রামকৃষ্ণ রাজসাহী রাজ্যের রাজা হইয়াও তান্ত্রিক মতের ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাহার সংসারে আসক্তি ছিল না। তিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সাংসারিক দুঃখেও আনন্দময় ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে তান্ত্রিকমতে শ্মশানে জপ তপ করিতেন। ভোলা তাহার উত্তর সাধক ছিল। করতোয়া নদীর অনতি দূরে ভবানীপুর নামক গ্রাম ৫১ পীঠ বা তীর্থস্থানের একটি স্থান। ভবানীপুর সেরপুর হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণ। সাধক প্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ এই স্থানে তপস্যা করিতেন। এখন পর্যন্ত তাহার যজ্ঞকুণ্ড, তপস্যাসন ও পঞ্চমুণ্ডি ভবানীপুরে বিদ্যমান আছে। দিঘাপতিয়ার নিকট বাগসরও তাহার তপস্যা স্থান ছিল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী— মহারাজা রামকৃষ্ণ দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বনাথ এবং কনিষ্ঠের নাম শিবনাথ।

বিশ্বনাথ ও শিবনাথ—মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজ্য বঙ্গদেশের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ বিস্তৃত রাজ্য ছিল। মহারাজা রামকৃষ্ণের সময়ে সেই বৃহৎ রাজ্যের সমস্তই ধ্বংস হইয়া অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে। দেবোত্তর ভূমি সমস্তই ছিল। বিশ্বনাথ পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী হইলেন এবং শিবনাথ দেবোত্তর ভূমি অধিকার করিয়া সেবাইত রাজা হইলেন। এসময় হইতে বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে নাটোর রাজবংশ পরিচিত হইল। বিশ্বনাথ বড় তরফের এবং শিবনাথ ছোট তরফের রাজা হইলেন।

বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথের তিন স্ত্রী—(১) রাণী কৃষ্ণমণি, (২) রাণী গোবিন্দমণি, (৩) রাণী জয়মণি। বিশ্বনাথের জীবনের প্রধান ঘটনা তাহার শাক্ত ধর্ম হইতে বৈষ্ণব ধর্মে পরিবর্তন। তিনি এবং তাহার পূর্বপুরুষেরা শক্তির উপাসনা করিতেন, কিন্তু নিজে বৈষ্ণব ধর্মে অবলম্বন করিলেন। রাণী কৃষ্ণমণি ও রাণী গোবিন্দমণি তাহাদের পতির অনুকরণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিলেন। কিন্তু রাণী জয়মণি শাক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া মুরশিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বিশ্বনাথ অপুত্রক পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে দত্তক গ্রহণের "অনুমতি পত্র" দিয়া গেলেন। অনুমতি পত্রানুসারে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে রাণী কৃষ্ণমণি গোবিন্দচন্দ্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। আবার রাণী জয়মণিও এক দত্তক পুত্র রাখিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র—১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র পিতৃ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু তাহাকে বেশিদিন রাজ্যভোগ করিতে বিধাতা দিলেন না। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলেন। তিনি আসন্নকালে তাহার স্ত্রী রাণী শিবেশ্বরীকে দত্তক পুত্র রাখিবার "অনুমতিপত্র" এবং তাহার মাতা রাণী কৃষ্ণমণিকে রাজকার্য নির্বাহ জন্য "কর্তৃত্ব পত্র" রেজষ্টরী করিয়াছিলেন।

রাণী কৃষ্ণমণি—রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার মাতা রাণী কৃষ্ণমণি নাটোর রাজ্যের ভারগ্রহণ করিলেন। রাণী কৃষ্ণমণি অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাহার রাজকার্য নির্বাহের উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল। যে সকল জমিদারি ধ্বংস হইয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহাদের মোকদ্দমা জয়ী হইয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেন। তাহার বুদ্ধি কৌশলে নাটোর রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্টোদ্ধার হয়।

রাজা গোবিন্দনাথ—রাণী শিবশ্বেরী অনুমতি পত্রানুসারে গোবিন্দনাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ

করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গোবিন্দনাথ পিতৃ রাজ্য অধিকার করিলেন। মাতা ও পুত্রের মনান্তর হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। রাণী শিবেশ্বরী দত্তক পুত্রের অসিদ্ধির মোকদ্দমা রাজসাহীর জজ আদালতে উপস্থিত করিলেন। রাজসাহীর জজ মহাত্মা লুইস জ্যাক্সন দত্তক পুত্র অসিদ্ধ করিলেন। মহামান্য হাইকোর্টে জেলার জজের আদেশ রহিত করিয়া দত্তক পুত্র সিদ্ধ করিলেন। প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের আদেশ স্থির রাখেন। ইংলন্ড হইতে এই শুভ সংবাদ তারযোগে আসিবার পূর্বেই রাণী কৃষ্ণমণি ও রাজা গোবিন্দনাথের মৃত্যু হয়। ইহারা কেহই পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। ইহা সুখের বিষয় যে রাজা গোবিন্দনাথের মৃত্যুর সময় তাহার মাতার সহিত সদ্ভাবের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। আদিতে এই সদ্ভাব থাকিলে মাতার সহিত পুত্রের বিবাদ হইয়া অশান্তির কারণ কখনই দেখা যাইত না।

রাজা গোবিন্দনাথ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। তিনি পরের দুঃখ মোচনে মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাহাকে সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। রাণী কৃষ্ণমণির ন্যায় তিনিও জমিদারি কার্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হন। মাতার সহিত যে মনান্তর সেই অশান্তিই বোধ হয় তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ—রাজা গোবিন্দনাথের কোন পুত্র ছিল না। অনুমতি পত্রানুসারে তাহার পত্নী মহারাজা জগদিন্দ্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি রাজসাহী কলেজে শিক্ষিত হইয়া কৃতবিদ্য হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। তাহার পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা গুণে তিনি বাংলা কাউন্সিলের মেম্বর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বর্তমান মহারাজা নাটোর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রিটিশ রাজ সম্মান গ্রহণ করিতেছেন এবং বিজ্ঞ মন্ত্রিগণের সাহায্যে সুচারুরূপে রাজকার্য নির্বাহ করিতেছেন।

রাজা শিবনাথ— শিবনাথ মহারাজা রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র এবং বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ছোট তরফের প্রথম রাজা। ইহার নয়টি বিবাহ, কিন্তু পুত্র সন্তান হয় নাই। কেবল তাহার একমাত্র কন্যা ছিল। শিবনাথের হস্তে সমগ্র দেবোত্তর ভূমি অর্পিত হয়। ইহারই দত্তক পুত্র রাজা আনন্দনাথ।

রাজা আনন্দনাথ—আনন্দনাথ পিতৃ দেবোত্তর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অতি সুচারুরূপে স্বীয় রাজকার্য নির্বাহ করিতেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান কিন্তু সরলভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিতেন না বলিয়া পরিচিত। তিনি ১০,০০০ টাকায় রামপুর বোয়ালিয়াতে পুস্তকালয় জন্য একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন এবং বহু অর্থ দ্বারা নানাবিধ পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। এই পুস্তকালয় "আনন্দনাথ লাইব্রেরী" নামে পরিচিত। এই মহৎ কার্যের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা বাহাদুর" এবং তদপর "সি, এস্ আই" উপাধি প্রাপ্ত হন। এ পর্যন্ত রাজসাহীতে কোন রাজা এই শেষোক্ত প্রণালীর উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। এই চারিটি পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ইংরেজি পারস্য, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। রাজা চন্দ্রনাথ ইংরেজিতে একজন সুলেখক ছিলেন। তাহার পিতা বর্তমানে অল্প দিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্যগুণে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হন এবং "ফরেন আফিসে" মহামান্য বড়লাট সাহেব বাহাদুরের অধীনে "আটাচীর" পদ প্রাপ্ত হন। দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রণালীর শিষ্টাচার ব্যবহারে রাজা চন্দ্রনাথ একজন সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতা কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে রাজা চন্দ্রনাথ শোক-সাগরে নিমগ্ন হন। এই তিন ভ্রাতাই গত। তাহাদের তিন বিধবা পত্নী একত্রে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যোগেন্দ্রনাথ বর্তমান থাকিয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেছেন। ইনি বুদ্ধিমান ও তেজস্বী। কিন্তু একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাহার জীবনের আশা ও তেজস্বীতা

বিলুপ্ত প্রায়। তাহার একমাত্র পৌত্র বর্তমান, এখন সেই পৌত্রই রাজার জীবনের সম্পূর্ণ আশা। পৌত্রের মুখ-চন্দ্রিমা দর্শনে রাজার পুত্র শোকের কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইবারই সম্ভব।

নাটোর রাজবংশের সমালোচনা— প্রায় দুই শত বৎসর হইল নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই কাল মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজ্যের উন্নত অবস্থা এবং তাহার সময়ই অবনতি ও পতনের সূত্রপাত হয়। কোম্পানির রাজস্ব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি এবং দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের হ্রাস রাজ্যের অবনতির প্রধান কারণ। যে সময় রাজ্যের অবনতি ও পতনের সূত্রপাত হয়, সেই সময় যদি রাজা রামজীবনের ন্যায় একজন সুদক্ষ প্রতাপশালী রাজা এবং দয়ারাম রায়ের ন্যায় একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যের ভার অর্পিত হইত; তাহা হইলে রাজ্যের পতন এত শীঘ্র হইবার সম্ভব ছিল না। নাটোর রাজবংশের একটি এই বিশেষত্ব দৃষ্টি হয় যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশি প্রতিভাসম্পন্না ছিলেন। এই বংশে মহারাণী ভবানী এবং রাণী কৃষ্ণমণি যেরূপ বুদ্ধি কৌশলে রাজকার্য নির্বাহ করিয়া আপন আপন নাম বিস্তার করিয়াছেন, সেরূপ রাজা রামজীবন ব্যতীত আর কোন পুরুষ রাজা যশস্বী হইতে পারেন নাই। রাণী কৃষ্ণমণি ও রাণী শিবেশ্বরীর বুদ্ধি কৌশল নিতান্ত সাধারণ ছিল না। নষ্ট রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার এবং জমিদারির আয় বৃদ্ধি করাই, তাহাদের বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য দক্ষতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহারাণী ভবানী ব্রাহ্মণদিগকে এত ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছেন; এত পুষ্করিণী খনন করিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন এবং এত দেবীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে নাটোর বংশ লোপ পাইলেও রাণী ভবানীর নাম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। অক্ষয়কীর্তিই মহারাণী ভবানীকে আজও জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

১. জীবর মৈত্রের সমাজ অঙ্গারো।
২. এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় পুঁঠিয়া রাজবংশের ইতিহাসে উকিল রাখিবার প্রথা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।
৩. "His Excellency evinced his gratification and gratitude by appointing Roghu Nandan as Rai Rayan and Dewan. The Rai Rayan is the principal officer of the Province next to the Dewan and the Dewan represented the Nawab in all matters of detail regarding the Government, These posts opened to him a vista of greatness and enabled him to reap a rich harvest of rupees. The Dewanship was especially a post of great importance and honour. It clothed its incumbent with the powers of the Nawabs. In the case of weak minded Nawabs the Dewan was the defacto Nawab. and in the case of strong minded Nawabs, he was the Naib or Sub-Viceroy and enjoyed and exercised an authority second to that of his master."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review, 1873.
৪. "উৎসাহ", শ্রাবণ শক ১৩০৫.
৫. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.
৬. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.
৭. "উৎসাহ", শ্রাবণ, শক ১৩০৫।
৮. এই রাজসাহী রাজ্য কি প্রকারে রামজীবনের হস্তগত হয় তাহা এই গ্রন্থের "রাজস্ব" নামক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।
৯. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.
১০. "উৎসাহ", শ্রাবণ, শক ১৩০৬।
১১. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.
১২. এই গ্রন্থে "কাপেব" উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তারিতরূপে পূর্বে লিখিত হইয়াছে।
১৩. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

১৪. রামজীবনের সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ১৬৪৫ শকে (১১৩০ বাংলা) "পদাঙ্ক দূত" প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে রামজীবন বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শর্মার জন্মস্থান সম্ভবতঃ রাজসাহী প্রদেশ। "পদাঙ্ক দূতের" পদাবলীর ভাব স্থানে স্থানে এত সুন্দব যে, যেমন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ শর্মাও শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রপীড়িত হইয়া নিজ মনোভাব প্রণীত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৫. When Ramkanta succeeded to the Raj, he was 8 years old He was a pious man and devoted his time to the performance of the Puja and religious duties, but he had no capacity for business."-- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

১৬. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

১৭. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

১৮. The Maharani Bhabani was endowed with a large capacity for business. She tharoughly understood Zamindari affairs, and the tact and judgment with which she managed the Raj were most admirable . "She was gifted with genius— with the talent of governing and managing men and her regime was the culminating period of the influence and wealth of the Nator family."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review. 1879

১৯. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রণীত সিরাজদ্দৌলা। ২৬ পৃষ্ঠা।

২০. "—Her administration of the Raj during the last half of the last century was memorable"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

২১. "At Nattore about ten day's travels North-East of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu Princes of Bengal. Raja Ramkanto of the race of Brahmins who deceased in the year 1748 was succeeded by his wife, princess named Bhabani Rani, whose Dewan or Minister was Dayaram of the teely caste or tribe, they passess a tract of country about 35 day's travel and under a settled Goverrment; their stipulated annual rent to the crown was seventy Laks of Sicca Rupees, the real revenues about one krore and half."— Holwell.

(বাংলায় অনুবাদ)

"কলিকাতার উত্তর-পূর্ব দশ দিবসের পথ নাটোর। সেই নাটোরে বঙ্গদেশের প্রাচীন বংশীয় একটি অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালিনী হিন্দুরাণী বাস করেন, ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ নাটোরের ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা রামকান্ত পরলোক গমন করেন। রাজার মৃত্যুর পর তাহার পত্নী রাণী ভবানী পতির ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। তিলি জাতীয় দয়ারাম নামক একব্যক্তি রাণীর দেওয়ান বা মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় নাটোর রাজ্য প্রদক্ষিণ কবিতে ৩৫ দিবস লাগিত এবং রাজ্যটি সুশাসনের অধীন ছিল। উহার বার্ষিক নির্ধারিত রাজস্ব ৭০ লক্ষ সিক্কা টাকা কিন্তু উহার প্রকৃত আদায় দেড় কোটি টাকা ছিল।"—হলওয়েল।

২২. নবাব জাফরখাঁর পর হইতে আবওয়াব লওয়া প্রচলিত হয়। কিন্তু নবাব আলিবর্দি ও কাসিম খাঁর সময় আবওয়াব বেশি পরিমাণে আদায় করা হইত।

২৩. "বঙ্গবাসী"— ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

২৪. "The Maharani Bahbani was pious, liberal and actively benevolent."— The Rajas of Rajshahi. Calcutta Review.

২৫. স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন কাশীতে দেব মন্দির প্রভৃতি মহারাণী ভবানী নিজ মন্ত্রদাতা গুরুর নামে প্রতিষ্ঠিত করেন, গুরু বংশের অভাবে মন্দির প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে।—

"—The religious establishments at Beneras standing as they do in the name of the Guru or spiritual guide of the family are gone to wreck and ruin, because the said Guru and his descendents are extinct."—The Rajas of Rajshahi ; Calcutta Review.

২৬. Translated by Babu Akshya Kumar Maitra from Westland's Jessore published in "Sahitya"

২৭. সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানীর দান এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

২৮. "বঙ্গবাসী"—৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

২৯. "And not more than about a quarter of a century ago, even the death of the husband did not dissolve a tie formed in his life time, far which the utmost regidity was the injunction carried out which prohibited widows to remmany."— "The Statesman", September 30, 1891

৩০. She therefore took her daughter Tara with her and fled from the Rajbari to Beneras."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৩১. "The Persian word Zamindar means haver holder or keeper of the land, but by no means necessarily implies ownership"—

—The Elphinistone's History of India—foot note, Book II, Chapter II.

৩২. It is said by Mr. Sterling (Asiatic Researches, Vol. XV. A. 239) that until Aurang Zeb's time, the term Zemindar was confined to such chiefs as enjoyed some degree of independence"— The Elphinistone's History of India, Book II, Chapter II.

৩৩. প্রিয়নাথ মল্লিক প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

৩৪. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

৩৫. "The first class of Bengal Zemindars represented the old Hindus and Mohammedan Rajas of the country, previous to the Mogul conquest by the Emperor Akbar in 1576, or persons who claimed that staus. The second class were Rajas or great land-holders, most of whom were dated from the 17th and 18th centuries and some of whom where like the first defacto class, rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land tax to the representative of the Emperor. These two classes had a social position faintly resembling the Fuedatory chifts of the British Indian Empire, but that position was enjoyed by them on the basis of custom, not of treaties."— The Bengal M. S. records. Vol. I. 31

৩৬. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা।"

৩৭. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা।"

৩৮. "The Maharani had the gratification of witnessing the extinction of the Mohammedan Government and the substitution for it of the English Governmen."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৩৯. At the time of the permanent settlement the chief of the Natore Raj exercised civil and criminal powers and was also unmolested in the collection of revenue. On him rested the power of farming the lands, collecting the rents from the villages and keeping the accounts. He was independent of the interference of the Government in the details of fiscal and criminal administration."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪০. "—That the state in which we received the rich princes of Bengal Behar and Orissa, was a general state of hereditary property."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪১. Mr. Warren Hastings in his "Memories relative to the State of India" mentions that "the Zamindari of Rajshahi, the second in rank in Bengal and yielding an annual revenue of about twenty five laks of Rupees has risen to its peresent magnitude during the course of the last eighty years by accumulating the property of a great number if dispossessed Zamindars although the ancestors of the present possessor had not by inheritance a right to the property of a single village within the whole Zamindari."- - The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

"Mrs. Hastings himself did not spare the Raj, as he wrested from Rani Bhabani the large estate of Bahirband in Rangpur and vested the same in his Banian Kanto Babu,"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪২. "The permanent settlement precipitated the ruin of the Natore Raj."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪৩. "Based upon the Lawazima papers of the Zamindari Sarishta and the records of the

Kanungos as well as previous periodical settlements, it assumed a rental in excess of the reality. It formed an exaggerated estimate of Zemindaris and assured them at a rate far beyond their power."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪৪. "The assessment of several large estates and notably of the Nattore Raj, was excessive, as shown by the settlement given by Mr. West-Land in his report on Jessore"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪৫. "—a moderate Jama or assessment, regularly and punctually collected unites the consideration of our interest with the happiness of the natives and security of the land holders, more rationally than any imperfect collection of an exaggerated Jama to be enforced with severity and vexation."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

৪৬. "সাহিত্য", ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৪ শক।

৪৭. The Government of the country, as far as regarded the protection of the people, was dissolved"–Mill's History of Brithsh India. Vol III.

৪৮. হরিদেব রায় কামদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিরামের বংশ সম্ভূত। এই হরিদেব রায়ের তৃতীয় পুত্র রামকৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়। রামকৃষ্ণকে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হইলে, রাণী ভবানী আমরুল পরগণার অন্তর্গত আটগ্রাম পুরস্কার স্বরূপ নিজরাজ্য হইতে মৌরসী জোত সত্বে খারিজ করিয়া দেন। এক্ষণে আটগ্রাম রায়বংশীয়ের একটি বিশেষ লাভের সম্পত্তি।

৪৯. জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত বীরকুৎসা গ্রামনিবাসী মজুমদারগণ সিংদিয়াড় গ্রামী। মহারাজা রামকৃষ্ণ ঐ মজুমদার বংশের কন্যা বিবাহ করাতে তাহারা মান্য শ্রোত্রিয় হইয়াছেন।
রামকৃষ্ণের শাসনে ও যত্নে নিরাবিল ও ভূষণাপঠী কুলীন মধ্যে দত্তকগ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয়।

৫০ The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫১ The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫২. The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫৩. "We approve your having put the Raja in confinement conformably to the Regulations and of your having vested the management of his estate in Ramjimal, to whom you will afford any necessary assistance to secure the realization of the sums now remaining outstanding."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫৪. "Several families in Sulap and other villages in Rajshahi accumulated wealth by Thangidari."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫৫. "It appears that the Sarishtadar and one Rohim Uddin monopolised magisterial power and sheltered several Sardar dacoits, who were their ryats."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫৬. "We see corruption pervading every grade of the Police establishment ; the Darogas, the Jamadars, the Muharirs, the Barkandazes, and Chaukidars. We see the Magistrate was overwhelmed with work. The consequence was, the people preferred quite submission to extortion and robbery as a lesser evil than the operation of the police"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫৭. Refferring to this evil, Babu Dwarka Nath Thakur in his evidence before the Police Committee says, "the first and principal Judges of the Mufassal Courts are the Amlas, who lead the inexperienced Judges as they pleased."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৫৮. "In the provinces the Zemindars exercised civil and criminal Jurisdiction over their several districts. A report was made to the Nazim in capital cases only."— Cowell's Tagore Law Lucture, 1872, quoted from the student's guide to Law Examinations, by Babu Bejoy Kesab Miter B. L.

৫৯. "A variety of circumstances tended to draw the attention of the English public to the confused state of the Indian affairs. The unpopularity of the retired servants of the com-

pany, their wealth and ostentation attracted attention and led people to believe that their wealth was due to crimes and oppression Tales of cruelty and oppression roused English Statesmen to bring the authority of Parliament into action to control the excesses of their countrymen abroad, and to secure some measure of protection and good Government to the territories they had acquired. A committee of Secrecy was formed in the House of Commons, in 1772 , to carry out the general demand for investigation. The English Government determined to interfere directly with the authority of the company, and to assume the exercise of the sovereign powers conceded by the Mogul Emperor. In 1773, the committee reported that the subjects derived little protection or security from the Courts of Justice established in Bengal., and great appression prevailed. Accordingly in the same year, an Act of Parliament, known as the Regulating Act, was passed for the better management of the company's affairs in India as well as in Europe."— Cowell's Law Lecture II, 1872

৬০. সুপ্রিম কোর্টের আইন প্রস্তুতের সহিত সংস্রব না থাকিলে বিবাদেব সম্ভাবনা ছিল না।

৬১. "The history of the first eight years of the supreme court is marked with violence, oppression and misrule. The period was indeed a Reign of Terror The court carried all its measures with a high hand, in defiance of the Executive Government, and thereby entailed the most disastrous consequences upon the country."— Cowell's Lecture Section, II, 1872, quoted from the student's guide to Law Examination, by Babu Bejoy Kesab Mitra B. L.

দশম অধ্যায়

দিঘাপতিয়া রাজবংশ

দিঘাপতিয়া রাজবংশের উৎপত্তি—দয়ারাম দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ইহার নিবাস কলমে ছিল বলিয়া কথিত হয়; এবং পিতার নাম কি জানিবার উপায় নাই। নবাব সরকারের এবং কোম্পানির সময়ে কাগজ-পত্রে কেবল এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি তিলি জাতীয় ছিলেন। ইহা কথিত আছে যে, রাজা রামজীবন জলবিহার উপলক্ষে চলন বিলে যান। সেই সময় তিনি কলমে নৌকা লাগাইলে, দুইটি বালক রাজার নৌকার নিকট উপস্থিত হয়। এই দুই বালক মধ্যে এক বালক আমাদের দয়ারাম। দয়ারামের বাল্যকালেই বুদ্ধি ও প্রতিভার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। বালককে সুলক্ষণ সম্পন্ন জানিয়া, রাজা সঙ্গে করিয়া নাটোর রাজধানীতে আনেন। সেই হইতে দয়ারামের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। দয়ারাম রায় অসাধারণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু তাহার বুদ্ধির সীমা ছিল না। যেমন পণ্ডিতেরা পুস্তক পাঠ করিয়া নানা শাস্ত্রের মর্ম অবগত হইতে পারিতেন, তেমনই দয়ারাম মনুষ্যের মুখ দেখিয়াই তাহাকে অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহার আভ্যন্তরিক সমুদয় বিষয় জানিতে পারিতেন। ফল কথা, তিনি মনুষ্যকে বিশেষরূপ চিনিতে পারিতেন। তাহার বিষয় কার্যের বুদ্ধি অসাধারণ। তাহার মন উন্নত এবং মস্তিষ্ক নিতান্ত পরিষ্কার ছিল। তিনি নাটোর বংশে আদি রাজা রামজীবনের একজন ক্ষুদ্র কর্মচারীর পদে প্রথমে নিযুক্ত হন ; অবশেষে তিনি নাটোর রাজের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই রাজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিভাগুণে ও বুদ্ধি কৌশলে দয়ারাম দিঘাপতিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

দয়ারাম রায়ের "রায়রায়াণ" উপাধি— যশোহরের অধীন মামুদপুরের জমিদার, সীতারাম মজুমদার বিদ্রোহী হইলে, নবাবের অনুমত্যানুসারে রাজা রামজীবন, দয়ারাম রায়কে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন। সীতারামের সহিত যুদ্ধ হইল, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সীতরাম বন্দি হইল; এবং দয়ারাম তাহাকে বন্দি করিয়া নাটোর রাজধানীতে আনিলেন। অল্পদিন পরে নাটোর রাজ কারাগারে সীতারামের মৃত্যু হইল। এই কার্য কৌশলে এবং বীরত্বে নবাব দয়ারামের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে "রায়রায়াণ" উপাধিতে সম্মানিত করিলেন; এবং রামজীবন পুরস্কার স্বরূপ এবং ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি ভাল জমিদারি তাহাকে দিলেন। এই দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রথম রাজ্যলাভ।

দয়ারামের সহিত রাজা রামকান্তের মনান্তর— নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

দয়ারাম রায়, রাজা রামজীবন, রাজা রামকান্ত ও মহারাণী ভবানী— রাজা রামজীবন প্রথমে দয়ারামকে সামান্য কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়া, পরে প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা রামজীবন দয়ারামকে তাহার বুদ্ধি-কৌশলে ও প্রতিভাগুণে এত বিশ্বাস করিতেন এবং এত ভালবাসিতেন যে দয়ারাম তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিল। তাহার প্রতি এরূপ বিশ্বাস ও সম্মান যে রামকান্তের সহিত রাণী ভবানীর বিবাহের "সম্বন্ধ পত্রে" দয়ারাম স্বাক্ষর করেন এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ভূমি দানপত্রেও তাহারই স্বাক্ষর ছিল। মহারাণী ভবানীও দয়ারামকে সেইরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামের পরামর্শ বিনা রাণী ভবানী কোন কার্য

করিতেন না। দয়ারামের জীবিতকাল পর্যন্ত নাটোর রাজবংশের অবনতি ও পতনের সূত্রপাত দৃষ্টি হয় নাই।

দয়ারাম রায়ের রাজ্যলাভ— নবাব ও রাজা রামজীবনের অনুগ্রহে নিম্নলিখিত জমিদারি দয়ারাম অধিকার করেন ঃ—

(১) পরগণা ভাতুড়িয়া, তরফ নন্দকুজা।

(২) তরফ ডুমরাই, এই তরফ ডুমরাইয়ের অন্তর্গত নওলিখা। নওখিলার কিয়দংশ জেলা বগুড়া এবং জেলা মৈমনসিংহেস্থিত।

(৩) জেলা যশোহরের অন্তর্গত তরফ মাউল কালনা।

(৪) পাবনা জেলার অন্তর্গত তরফ সিলিমপুর।

তরফ ডুমরাই অত্যন্ত লাভের জমিদারি। যে সময় এবট্ সাহেবকে ইজারা দেওয়া হয়, সে সময় তরফ ডুমরাইয়ের ৩৫০০০ টাকা আদায় ছিল। সাহেবের কৌশলে ক্রমে জমা বৃদ্ধি হয়। রাজা প্রসন্ননাথ রায়বাহাদুরের সময় হইতেই ক্রমে জমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। দাওকোবা নদীর চরের জন্যও অনেক জমা বেশি হয়। এক্ষণে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আদায়। দিঘাপতিয়া রাজ্য মধ্যে এরূপ লাভের জমিদারি আর নাই।

দয়ারাম রায়ের পুণ্যকীর্তি— দয়ারামের সময় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদের বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি অনেক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন এবং সেই সকল চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য মাসিক ও বার্ষিক সাহায্যদান করিতেন। ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ জন্য তিনি অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন এবং প্রজাপুঞ্জের জলকষ্ট নিবারণ জন্য নিজ জমিদারি মধ্যে অনেক স্থানে পুষ্করিণী খনন করেন। জেলা যশোহরের অন্তর্গত মামুদপুরে কৃষ্ণচন্দ্র দেবের, জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বিনোদে গোপালদেবের এবং নিজ দিঘাপতিয়া রাজবাটিতে কৃষ্ণজীর নিত্যসেবার ও পূজার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া প্রচুর দেবোত্তর ভূমি দয়ারাম দান করিয়া যান।

দয়ারামের সন্তান সন্ততি ও বংশধরগণ— এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া দয়ারাম রায় পরলোক গমন করেন। তাহার পুত্র জগন্নাথ রায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার ১৬ জন সন্তান ছিল, কিন্তু ক্রমে ১৫ জন গত হওয়ার পর, কেবল এক পুত্র প্রাণনাথ রায় বর্তমান ছিলেন। তিনি পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত বাবু ছিলেন এবং দানকর্মে নিতান্ত মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহা কথিত আছে যে, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ অতি ধুমধামের সহিত নির্বাহ করেন। তাহার পুত্র সন্তান না থাকায়, প্রসন্ননাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। প্রসন্ননাথ পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দিঘাপতিয়া রাজবংশের যশ ও নাম বিস্তৃত করেন।

প্রসন্ননাথ রায়— প্রসন্ননাথ রায়ের অপ্রাপ্তবয়সের সময়, তাহার পিতা প্রাণনাথ রায় পরলোক গমন করেন। অপ্রাপ্ত বয়সের সময় তাহার রাজ্য "কোর্ট অব ওয়ার্ডের" অধীন হয়। প্রসন্ননাথ রামপুর বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল থাকিয়া ইংরেজি ভাষার ব্যুৎপত্তি জন্মাইতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার রাজকার্য নির্বাহ করিবার জ্ঞান পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাহার বিদ্যাশিক্ষার অভাব তাহার প্রতিভা, বুদ্ধি ও কার্য-কৌশল পূর্ণ করিয়া তাহাকে যশস্বী করিয়াছিল। তিনি, তাহার পিতৃপুরুষ প্রতিভাশালী দয়ারামের ন্যায়, লোককে চিনিতে পারিতেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছুদিন কতকগুলি মন্দ পারিষদের সংসর্গে এবং পরামর্শে তাহাকে কুপথগামী করিবার উদ্যত করে; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহার চৈতন্য হয় এবং কুসংসর্গ একবারে পরিত্যাগ করেন। তখন তাহার মন সৎকার্যে ধাবিত হয়।[১]

নাটোরে মহকুমা স্থাপন— এই সময় প্রত্যেক জেলায় মহকুমা স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট যেরূপ জেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন, সেইরূপ মহকুমার কার্যের ভার একজন সাহেব বা বাঙালির প্রতি অর্পিত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট বিভাগীয় কমিশনর

সাহেবের অধীন এবং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন হইলেন। রাজসাহী জেলায় নাটোর মহকুমা স্থাপন করা স্থির হইলে, জ্যাকসন নামে একজন সাহেব মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি অল্পদিন নাটোরে থাকিয়া স্থানান্তর চলিয়া যান। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে একজন সদ্বংশজাত হিন্দু সন্তান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া নাটোর মহকুমার ভার পরে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি মহকুমার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইলেন। নাটোরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবার জন্য মহকুমার অন্তর্গত জমিদার কুঠিয়াল সাহেবদের নিকট তিনি যথেষ্ট সাহায্য পান। এই সকল সৎকার্যে প্রসন্ননাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষ সাহায্য করেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ— লর্ড এলেনবরা, লর্ড বেন্টিঙ্কের দৃষ্টান্তানুসারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন এবং বড় বড় লোকদের ছেলেদিগকে এই পদ দিবার ব্যবস্থা করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারি হইয়া দণ্ডবিধান ও পুলিশের তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি কার্যে ব্রতী হইলেন। এই নিয়মানুসারে সদ্বংশজাত এবং হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্য হইতেও এই পদের জন্য লোক মনোনীত হইতে লাগিল। ক্রমে সেরেস্তাদার, পেস্কার, দারোগা ও মুহুরিদের মধ্য হইতেও ঐ পদের জন্য লোক মনোনীত হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রদের মধ্য হইতে ডেপুটি ও সব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্য লোক মনোনীত করা হয়। এই প্রণালীতে সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিই ঐ পদে নিযুক্ত হইতেছে। জমিদার ও সম্ভ্রান্ত সদ্বংশজাত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাহাদের পরীক্ষা করিয়া ঐ পদের জন্য লোক মনোনীত করিবার প্রণালীই উত্তম বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের দ্বারাই নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব।

প্রসন্ননাথ রায়ের পুণ্যকীর্তি— দিঘাপতিয়া হইতে রামপুর বোয়ালিয়া পর্যন্ত যে একটি প্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহা পূর্বে নাটোর পর্যন্ত ছিল। কিছু দিন পরে দিঘাপতিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বগুড়া যাইবার রাস্তার সঙ্গে সংযোগ করা হয়। ঐ রাজপথ মেরামত জন্য ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্ননাথ এককালীন ৩৫,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একটি বিদ্যালয় নাটোরে স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্ননাথের সাহায্যে দিঘাপতিয়া স্থিত "প্রসন্ননাথ একাডেমীর" সহিত মিলিত হইল। এই কার্য জন্য প্রসন্ননাথকে নাটোর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ প্রশংসা করেন।[২] এই উচ্চ শ্রেণি ইংরেজি স্কুল হইতে অনেকে অদ্যাবধি কৃতবিদ্যা হইতেছেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নাটোরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। দিঘাপতিয়া উচ্চশ্রেণি ইংরেজি স্কুল এবং নাটোর ও রামপুর বোয়ালিয়া চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহ জন্য প্রসন্ননাথ কমিশনর সাহেবের যোগে গবর্ণমেন্টকে এক বৎসরের সুদ সমেত একলক্ষ টাকার গবর্ণমেন্ট প্রমিসারী নোট (অর্থাৎ ১০৪৫৬৭ টাকা ২ পাই) দান করেন। ঐ দান গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্ট ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই তারিখে কমিশনরসাহেবকে পত্র লিখেন এবং প্রসন্ননাথকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্কুল ও চিকিৎসালয়ের কার্য নির্বাহ জন্য গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি সংস্থাপিত করেন। কমিশনর, জজ, কলেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সিবিল সারজন কমিটির "একস অফিসিও" মেম্বর থাকিবেন। নাটোর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্থানীয় অন্যান্য ভদ্রলোককে গবর্ণমেন্ট মেম্বর পদে নিযুক্ত করিয়া "সব কমিটি" গঠিত করেন। নিজ দিঘাপতিয়া রাজবাটির নিকটে প্রসন্ননাথ স্বীয় নাম খ্যাত "প্রসন্নকালী" স্থাপিত করিয়া মধ্যাহ্নে অন্নভোগ এবং রাত্রিতে লুচি পক্কান্ন ভোগের বন্দোবস্ত করেন। মধ্যাহ্নকালে প্রত্যহ একমণ চাউলের ভোগ এবং তদুপযোগী উপকরণ আছে এবং রাত্রিতে প্রায় ১০/১৫ জন ব্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে আহার করিতে পারেন এরূপ লুচি পক্কান্নের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে শিবস্থাপন করেন এবং প্রজাগণের জল কষ্ট

নিবারণ জন্য নিজ জমিদারি মধ্যে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দীন দুঃখীকে তিনি যথেষ্ট দান করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় দিঘাপতিয়া হইতে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার সময় টাকা, আধুলি, সিকি, দুই আনি, পয়সা এবং চাউল স্থানে স্থানে দীন দুঃখীকে অকাতরে দান করিতেন।

প্রসন্ননাথের রাজ সম্মান— প্রসন্ননাথের অতুল দান ও সৎকার্যের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। এ উপাধির সনন্দের তাবিখ ২০ এপ্রিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২০মে তারিখে উপাধি প্রদত্তের সংবাদ রাজা প্রসন্ননাথের নিকট প্রেরণ করেন। স্বয়ং বড়লাট লর্ড ডালহাউসি গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে প্রকাশ্য দরবারে রাজা প্রসন্ননাথকে খেলাতসহ "রাজা বাহাদুর" উপাধির সনন্দ প্রদান করেন। ঐ দরবারে পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত রাজা ও সুবা উপস্থিত ছিলেন।

রাজা প্রসন্ননাথের ম্যাজিস্ট্রেটের পদ—১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর অবৈতনিক আসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তাহার অধীন পুলিশের একজন জমাদার এবং ২০ জন বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি নিজে রাজধানীতে নির্ধারিত সময়ে এই ফৌজদারি কার্য নির্বাহ করিতেন।

রাজা প্রসন্ননাথের চরিত্র— রাজা প্রসন্ননাথের চরিত্র সম্বন্ধে কেহ কেহ কোন বিষয়ে দোষারোপ করে। কিন্তু তাহার গুণের ভাগ এত বেশি যে তাহার লঘুদোষ থাকিলেও তাহা কাহারই স্মরণ করা বা উল্লেখ করা উচিত নহে। আমরা বলি যে তিনি একজন মহচ্চেতা, উদারমনা ও বিদ্যোৎসাহী প্রধান জমিদার ছিলেন। দান ও সৎকার্য সম্বন্ধে তিনি একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। দিঘাপতিয়ার ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিয়া, মফস্বলে উচ্চ শিক্ষার বীজ তিনিই প্রথমে রোপণ করেন। তিনি স্বভাবতঃ সাহসিক ও উদার ছিলেন। তাহার হৃদয় সর্বদা আনন্দময়। তিনি রাজা হইয়াও, তাহার সকলের সহিত মিশিবার চেষ্টা প্রবল ছিল। তাহার আতিথ্য ও সৌজন্যগুণে গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী, কুঠিয়াল সাহেব এবং জমিদারগণ তাহার বাধ্য ছিলেন এবং তাহারা তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি মৃগয়াসক্ত ছিলেন এবং অনেক সময়ে এই মৃগয়া জন্য বড় বড় সাহেব এবং জমিদারগণকেও আহ্বান করিয়া নিজ দিঘাপতিয়া রাজধানীতে আনিয়া "সিংহদালান" নামক উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত অট্টালিকায় তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং তাহাদের আতিথ্য করিতেন। তাহার পরে একত্রিত হইয়া নিজব্যয়ে তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিতেন। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের পূর্বে রাজবাটি তত সুন্দর ছিল না। তিনি প্রসন্নকালীর বাটি, সিংহ দালান, দোলমঞ্চ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া রাজবাটি প্রকৃতই সুন্দর করেন। মন্দকে সুন্দরগঠনে আনিবার তাহার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা ছিল।

রাজা প্রসন্ননাথের উত্তরাধিকারী—১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রসন্ননাথ রায় পরলোক গমন করেন। তাহার সন্তান-সন্ততি ছিল না। প্রমথনাথ রায়কে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা প্রসন্ননাথের মৃত্যুর পর তাহার উইল অনুসারে তাহার ভূসম্পত্তি "কোর্ট অব ওয়ার্ডের" অধীন হয় এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সুশিক্ষার জন্য প্রমথনাথকে কলিকাতা "ওয়ার্ডস ইন্‌স্টিটিউসনে" পাঠান হয়। তাহার সদ্‌গুণ ভূষিতা মাতাও তাহার সহিত কলিকাতা যান ও স্বতন্ত্র গৃহে বাস করেন। মাতৃভক্ত কুমার প্রতি রবিবারে মাতার চরণ-দর্শন জন্য তাহার বাসভবনে আসিয়া সমস্ত দিবাভাগ মাতৃসন্নিধানে কালযাপন করিতেন এবং সন্ধ্যাকালে স্বস্থানে গমন করিতেন। যেমন নেপোলিয়ান মাতার সদুপদেশে নিজ চরিত্র গঠিত করেন, সেইরূপ কুমার প্রথমনাথও মাতার উপদেশে দিন দিন স্বীয় চরিত্র সুগঠিত করিলেন এবং পবিত্র করিয়া উঠিলেন। চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যালাভ করিতেন। কলিকাতা "ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন" হইতে কুমার প্রমথনাথই প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কুমার প্রমথনাথের পিতৃ রাজ্য অধিকার— কুমার প্রমথনাথের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন জন্য প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত না হইতেই তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমাবস্থায় রাজকার্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি রাজকার্যে যেরূপ পটু হন এবং প্রজারঞ্জনে যশঃলাভ করেন, সেরূপ রাজসাহীর অনেক জমিদারই সক্ষম হন নাই।

কুমার প্রমথনাথের রাজ্য ভার গ্রহণ করিবার পর বিদ্যাধ্যয়ন এবং দৈনিক কার্য-নির্বাহের নিয়ম— প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে কুমার দুই কি তিন মাইল পথ ভ্রমণ করিতেন। তদপর রাজবাটি প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন। পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্যন্ত রাজমন্ত্রীদের সহ রাজকার্য নির্বাহ করিতেন এবং প্রজাগণের আবেদন শুনিয়া যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিতেন। স্নান আহারাদি করিয়া নির্জন গৃহে প্রবেশ করিতেন। তাহার দিবা নিদ্রার অভ্যাস একবারে ছিল না। আহারান্তে প্রথমে সংবাদপত্রাদি পাঠ এবং তদপর রীতিমত এবং ধারাবাহিক ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান আদি সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেন। ইতিহাসই তাহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। দিবা দুই প্রহর হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা, কোন দিন ৫ ঘটিকা পর্যন্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। পাঠান্তে রাজকার্যের কাগজ পত্রাদি স্বাক্ষর করিতেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আবার প্রাতঃকালের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত সদালাপে কালযাপন করিতেন এবং আবশ্যক হইলে কখন মন্ত্রীদেরসহ রাজকার্যের পরামর্শ করিতেন। রাত্রি এক প্রহর সময় আহারাদি করিয়া অন্তঃপুরে শয়নাগারে গমন করিতেন। রাজকুমারদের এরূপ অধ্যয়নে অনুরাগ প্রায় দেখা যায় না। কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন না করিয়াও তিনি ইংরেজি ভাষায় এত প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নিয়ত অধ্যয়নে তাহার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং নানা দেশের এত সংবাদ জানিতেন যে তাহার সহিত একজন পণ্ডিত আলাপ করিতে বসিলে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিতেন। তাহার এই জ্ঞান জন্য সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

কুমার প্রমথনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত—১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বিভাগীয় কমিশনর গবর্ণমেণ্ট সমীপে রিপোর্ট করেন যে নিম্ন বাংলার জমিদারগণ মধ্যে কুমার প্রমথনাথ একজন বুদ্ধিমান এবং সৎস্বভাব সম্পন্ন জমিদার; তিনি নিজ জমিদারির কার্য অতি উৎকৃষ্টরূপে নির্বাহ করিতেছেন এবং তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করে। রাজাদের মধ্যে কুমার প্রমথনাথের ন্যায় বিনয়ী অতি অল্প লোকই ছিল। এই সকল নানাগুণে ভূষিত ছিলেন বলিয়া কমিশনর গবর্ণমেণ্ট সমীপে কুমারকে "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সদাশয় বড়লাটও "রাজা বাহাদুর" উপাধি-সনন্দ মঞ্জুর করেন। রামপুর বোয়ালিয়াতে কমিশনর সাহেব গবর্ণমেণ্টর প্রতিনিধি স্বরূপ রাজা প্রমথনাথকে "রাজা বাহাদুরের" সনন্দ প্রদান করেন।

রাজা প্রমথনাথের রাজ্যলাভ— রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর পিতৃ-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই রাজ্যের কেবল উন্নতি সাধন করেন এমত নহে; তাহার বুদ্ধি কৌশল এবং যত্নে তিনি অনেক নূতন জমিদারি লাভ করেন। তাহার সময় নিম্নলিখিত জমিদারি তিনি রাজ্যভুক্ত করেন :—

(১) জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত ডিহি শিবপুর, জেলা সাইল, তরফ বেশালপুর, রামপুরবোয়ালিয়া, বৈদ্য বেলঘরিয়া প্রভৃতি।

(২) জেলা হুগলি ও হাবড়ার অন্তর্গত শেওড়াফুলি স্টেট।

(৩) জেলা যশোহরের অন্তর্গত মাহমুদপুর, তেলিহাটি মধ্যে নড়াইল জমিদারির কিয়দংশ এবং নসরৎসাহীর কিয়দংশ।

(৪) জেলা নদিয়ার অন্তর্গত ডিহি রামচন্দ্রপুর।

এইরূপে এবং সুশাসনগুণে পূর্বাপেক্ষা দিঘাপতিয়া জমিদারির আয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। এইক্ষণে রাজসাহী মধ্যে সকল জমিদার অপেক্ষা দিঘাপতিয়া রাজার রাজ্য বেশি এবং রাজসাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, নদিয়া, হুগলি, হাবড়া প্রভৃতি বহু জেলায় বিস্তৃত। এরূপ বিস্তৃত এবং লাভজনক রাজ্য রাজসাহী জেলার আর কোন রাজা জমিদারের নাই।

রাজা প্রমথনাথের পুণ্য-কীর্তি— রাজা প্রমথনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াই রামপুর বোয়ালিয়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্মাণ জন্য ১০,০০০ টাকা দান করেন।[৩] এই চিকিৎসালয় তাহার পিতৃকীর্তি। এই দান দ্বারা পিতার কীর্তির তিনি গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দিঘাপতিয়া হইতে রামপুরবোয়ালিয়া পর্যন্ত যে রাজপথ আছে তাহার সংস্কার জন্য তিনি তাহার পিতার ন্যায় যাবতীয় ব্যয় দিয়ে গবর্ণমেণ্টের এবং সর্বসাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন হন। রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ১৮০৲ টাকা প্রয়োজন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই টাকার অনুরূপ তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট দান করেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে তিনি তিনটি বৃত্তির সৃষ্টির করেন। বাংলার ছোটলাট এই দান জন্য রাজা প্রমথনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রজাপুঞ্জের উপকার জন্য স্থানে স্থানে স্কুল পাঠশালা এবং কোন কোন স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। রাজসাহী জেলা-স্কুল, দুবলহাটির রাজা হরনাথ দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে পরিণত করিয়া এফ, এ, পরীক্ষার উপযোগী দুইটি শ্রেণি সংযোজিত করিবার সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করেন। "রাজসাহী এসোসিয়েসন" নামে রাজনীতি বিষয় পরিচালনার জন্য একটি সভা বোয়ালিয়াতে স্থাপিত আছে। এই সভার পক্ষ হইতে রাজা প্রমথনাথ ঐ কলেজে আর দুইটি শ্রেণি সংযোজিত করিয়া বি, এ, পরীক্ষার পাঠার্থী প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব করেন। ইহার ব্যয় অনেক। এই প্রচুর ব্যয়ভার রাজা প্রমথনাথ একাই অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুবলহাটি রাজার কীর্তিকে খর্ব করিয়া নিজ কীর্তির প্রাধান্য স্থাপন করা রাজা প্রমথনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং "এসোসিয়েসন" হইতে রাজসাহীর জমিদারগণের নিকট টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু অতি অল্প টাকাই সংগ্রহ হইল। রাজা প্রমথনাথ 'রাজসাহী এসোসিয়েশন' যোগে দেড় লক্ষ টাকা নিঃস্বার্থভাবে এককালীন দান করিয়া সর্বজন নিকট প্রশংসার পাত্র হন। অনেক রাজা জমিদার নামের জন্য বা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সম্মান চিহ্ন জন্য দান করিয়া থাকেন। রাজা প্রমথনাথের দান এ শ্রেণির দান নহে। তাহার কোন দানই নামের জন্য ছিল না। দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য যে দান আবশ্যক, তাহার দানও সেই প্রকারের ছিল। যে ব্যক্তির ভিক্ষাই ব্যবসা এবং যে ব্যক্তি অভাব জন্য ভিক্ষা করেন না, তাহাকে তিনি কখনই দান দিতেন না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রণালীতে দান করিতেন, রাজা প্রমথনাথও সেই প্রণালীতে দান করিতেন। তিনি যে কেবল বহুতর স্কুল পাঠশালায় মাসিক ও বার্ষিক সাহায্য দিতেন এমত নহে; তাহার অর্থে অনেক বিধবা দরিদ্রা হিন্দু-রমণী দিন যাপন করিতেন। তিনি অনেক হিন্দু বিধবা রমণীকে মাসিক বৃত্তি দিয়া ভরণপোষণ করিতেন। তাহার উদারতা ও দানের অনেক কাহিনী আছে। এ স্থলে একটি কাহিনী বলিলে তাহার দানের প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। একদা বৈকালে ভ্রমণ উদ্দেশে রাজবাটি হইতে তিনি বহির্গত হইলেন। তাহার সঙ্গে তাহার মাতুল ও ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এবং লেখকও সেই সঙ্গে ছিল; অশ্বশালার নিকট আসিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে একটি রমণী তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। রাজা মাতুলকে বলিলেন যে অনুসন্ধান করুন "এ কাহার রমণী এবং কি কারণে এখানে শয়ন করিয়া আছে; বোধহয় এ স্থানের কোন লোকের রমণী নহে"। মাতুল জিজ্ঞাসা

করায় রমণী উত্তর করিল। "আমি মুসলমান রমণী, আমাব বাড়ি রঙ্পুর প্রদেশে, আমি পাণ্ডুয়া তীর্থে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিবার সময় পথি মধ্যে আমার ভেদবমি হয়, আমি অজ্ঞান অবস্থায় থাকায়, আমাকে মৃত জ্ঞানে আমার সঙ্গীরা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি একাকিনী ভিক্ষা করিয়া আহার করি এবং ক্রমে চলিয়া আসিতেছি। আমাকে কেহ বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিলে, আমি সন্তুষ্ট হইতাম; আমি চলিতে পারি না।" রাজা এই সকল কথা শুনিয়া ডাক্তারকে আদেশ করিলেন যে "ডাক্তারবাবু দেখুন, রমণীর কোন ব্যাধি আছে কিনা?" ডাক্তারবাবু দেখিয়া রাজাকে বলিলেন, "এ রমণীর এক্ষণে কোন ব্যাধি নাই, অত্যন্ত দুর্বলা, কেবল শুশ্রূষা ও পুষ্টিকর আহার পাইলে, রমণী সবলা হইবে।" রাজার আদেশমত রমণীর আহারের ও শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত হইল এবং পরিধেয় জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া ভাল নূতন বস্ত্র দেওয়া হইল। শরীর সুস্থ হইলে কিছুদিন পর রাজা বেহারা ও ডুলি করিয়া সঙ্গে অনেক লোক দিয়া রমণীকে নিজ বাটিতে পৌঁছাইয়া দিলেন। সে সময় উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং বহু ব্যয় করিয়াও রাজা ঐ অনাথা মুসলমান রমণীর মহোপকার করিলেন। তাহার দানে জাতিভেদ ছিল না। এই প্রকার পুণ্যকীর্তিই প্রকৃত সৎকার্য এবং রাজার মহত্ত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এইরূপ কাহিনী রাজা প্রমথনাথের জীবনে অনেক আছে। তাহার আমলা ও অন্যান্য চাকরগণের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, পুত্র কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ প্রভৃতি কার্যে ও তীর্থাদি পর্যটন জন্য, তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। যাহারা যেরূপ কার্য তদনুরূপ দান করিতেন। তিনি ১০ টাকা হইতে ৫/৬ হাজার টাকা পর্যন্ত নিজ কর্মচারীদের দান করিয়াছেন। তিনি নিজ চাকরদের মধ্যে কাহাকে বন্ধুর ন্যায়, কাহাকে পিতার ন্যায়, কাহাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া এরূপ অভাবের সময় তাহাদের অকাতরে সাহায্য করিতেন।

রাজা প্রমথনাথ ও প্রজাগণ—যেমন পিতা পুত্রে সম্বন্ধ, তেমনই জমিদার প্রজা সম্বন্ধ। যেমন পিতা পুত্রকে পালন করিবে, তেমনই জমিদার প্রজাকে পালন করিবে। পুত্রের নিকট পিতার যেরূপ স্বার্থ, প্রজার নিকট জমিদারের সেইরূপ স্বার্থ। রাজা প্রমথনাথের প্রজার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ ছিল। প্রজাকে পালন করা এবং বিপদ হইতে রক্ষা করা তাহার মুখ্য কর্ম ছিল। প্রজার কর বৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য কিন্তু প্রজাকে পীড়ন করিয়া কর বৃদ্ধি করেন নাই। তিনি সকল বিষয়ে প্রজাকে সুখে রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলে তাহাকে দমন করিতে পিতা যেমন যত্ন ও চেষ্টা করেন; তেমনই রাজা প্রমথনাথ দুরন্ত প্রজাকে শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাকে কখনই নষ্ট করিতেন না। দুরন্ত প্রজা বশীভূত হইলে, তাহাকে পুত্রজ্ঞানে ক্ষমা করিতেন। তাহার ক্ষমা ও ধৈর্যগুণ যথেষ্ট ছিল। পিতার নিকট পুত্র আবদার করিলে পিতা যেমন সন্তোষসহ তাহা সম্পন্ন করেন, তিনিও সেইরূপ প্রজাকে সুখী করিতেন। পিতা পুত্রের সহিত যেমন আলাপ করেন, তিনিও তেমনই প্রজার সহিত আলাপ করিতেন এবং তাহার দুঃখের কথা মনোযোগপূর্বক শুনিতেন। প্রজারা রাজাকে ভয় না করিয়া ভক্তি করিত। তাহার রাজত্ব সময়ে প্রজা সুখে ছিল। কোন কর্মচারী প্রজার প্রতি অযথা অত্যাচার করিলে, তাহা রাজার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাহার প্রতিবিধান হইত। প্রজার সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে কোন বিষয় কেবল মন্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না। তিনি প্রজাপালন সম্বন্ধে একটি আদর্শ জমিদার ছিলেন; তাহা গবর্ণমেণ্ট অনেকস্থলে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কি নিজের প্রজা, কি অপর জমিদারের প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন।

রাজা প্রমথনাথের বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত—রাজা প্রমথনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাওয়ার পর তাহার উপযোগিতা এবং রাজ্যের সুশাসন জন্য তিনি বাংলার ছোটলাট বাহাদুরের প্রশংসাভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তাহাকে বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত করা হইল। তিনিও অতি সুচারুরূপে ব্রিটিশ রাজ প্রদত্ত সম্মানের কার্য সুসম্পন্ন করিতে

লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরে তাহার রাজকার্যের অসুবিধা হওয়াতে তিনি ঐ পদ নিজেই ত্যাগ করেন। তিনি যে কেবল রাজসরকার হইতে সম্মানিত হইয়াছিলেন এমত নহে, দেশীয় জমিদারেরাও তাহাকে সম্মান করেন। "রাজসাহী এসোসিয়েসনের" প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি পদে তিনি নিযুক্ত থাকিয়া সকলের প্রীতিকর ও স্বদেশ-হিতকর কার্য নির্বাহ্ করেন।

রাজা প্রমথনাথের শারীরিক অসুস্থতা ও মৃত্যু— প্রায় ১৩/১৪ বৎসর রাজত্বের পর, তাহার শরীর অপটু হয়। অজীর্ণ জনিত অসুস্থতাই তাহার প্রবল কারণ। কিন্তু এই ব্যাধিতে কিছুদিনের জন্য তাহার শরীরের লাবণ্য ও কান্তি নষ্ট হয়। সুচিকিৎসাবলে এই অজীর্ণ রোগ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা জ্বররোগে কাতর হন। নিজ রাজসরকারে যে আসিস্টাণ্ট সার্জন ছিলেন, তিনিই প্রথমে চিকিৎসা করেন। ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হওয়ায় দুইজন বিখ্যাত সাহেব সিবিল সার্জন চিকিৎসা করেন। তাহাদের চিকিৎসায় কোন সুফল না হওয়ায়, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে কেবল রাজপরিবারবর্গ অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন এমত নহে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সমগ্র রাজসাহীবাসী তাহার অকাল মৃত্যুর জন্য ক্রন্দন করিয়াছে।

রাজা প্রমথনাথের চরিত্র— রাজা প্রমথনাথ অতি বুদ্ধিমান ও সরলাত্মা এবং অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সহজে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেন না, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাতে সহস্র ক্ষতি হইলেও সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বিমুখ হইতেন না। তিনি বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। তাহার রাজা বলিয়া মনে কোন অহঙ্কার ছিল না। তাহার অধীনস্থ কর্মচারী পীড়ায় কাতর হইলে ঔষধ ও পথ্যাদির উপযোগী দ্রব্য দিতেন এবং অনেক সময়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন কোন স্থলে স্বয়ং তাহাকে দেখিতেও যাইতেন। প্রতিবেশী জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের বাটিতে যাইতে বা তাহাদের সহিত সৌহৃদ্যভাব রক্ষা করিতে, তাহার মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তাহার কোন কর্মচারী বা ভৃত্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহাকে কটু বা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাহাকে কর্মচ্যুত করিয়া বা আর্থিক দণ্ড করিয়া বা উপদেশচ্ছলে সামান্য ভর্ৎসনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন। তিনি নিতান্ত লজ্জাশীল পুরুষ ছিলেন। তিনি নিতান্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তাহার পরিচ্ছদে রাজার ন্যায় কোন ধূমধাম ছিল না। কিন্তু তিনি নিতান্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাহার শরীরে দয়া ও উদারতা যথেষ্ট ছিল, তাহা তাহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠে বিশেষরূপ জানা যাইবে। তিনি পণ্ডিত এবং জমিদারি কার্যে এবং আয় অনুসারে ব্যয় করিতেন। প্রজার সহিত তাহার সম্বন্ধ নিতান্ত প্রশংসনীয়। তিনি সুধীর ও সুবিবেচক ছিলেন; ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি কখন নিরানন্দ থাকিতেন না; সর্বদা আনন্দময়। অবয়ব কিছুকাল নিরীক্ষণ করিয়া, দয়ারামের ন্যায় তিনিও লোককে চিনিতে পারিতেন। সরল লোক না হইলে তাহার সহিত অতি সাবধানে আলাপ করিতেন। স্বজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের তাহার বিশেষ যত্ন ছিল। তাহার স্বজাতীয় মধ্যে যে এতক্ষণে সুশিক্ষিত অনেক ব্যক্তি দেখা যায়, তাহা তাহারই যত্নের ও অর্থের ফল। তাহাদের শিক্ষা জন্য সময় সময় তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। মোটের উপর বলিতে গেলে তিনি একজন পণ্ডিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দয়াবান, বুদ্ধিমান সরল প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। তাহার পবিত্র চরিত্র মনে করিয়া আমরা এখনও রোদন করিয়া থাকি। তিনি ১৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া জমিদারি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইলে তাহার রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত হইত, তাহা পাঠক অনুমান করিবেন।

রাজা প্রমথনাথের সন্তান সন্ততি— চারি পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া রাজা প্রমথনাথ পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর সময় চারি পুত্রই অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাহার উইল অনুসারে

তাহার যাবতীয় সম্পত্তি "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" অধীন হয় এবং রাজসাহীর অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সরকার মহাশয় মেনেজরের পদে নিযুক্ত হন।[৪] বোর্ডের আদেশমত এবং উইলের শর্তানুসারে চারি কুমারের শিক্ষার জন্য অতি সুবন্দোবস্ত হয়। প্রথমে রাজসাহী কলেজে ও তদপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সকলই সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত হইয়াছেন। এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজজামাতাও সুশিক্ষিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রাজজামাতা রাজসাহী জজ আদালতের উকিল শ্রেণিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। রাজসাহীতে বড় রাজবংশে দিঘাপতিয়ার রাজকুমারেরা ও রাজজামাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী এক গৃহে বাস প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু দিঘাপতিয়া রাজবংশে এই দুই দেবীই বিরাজমানা। ইহা দয়ারামের পুণ্যকীর্তির ফল না রাজা প্রমথনাথের পবিত্র নির্মল চরিত্রের লক্ষণ? চারি কুমার— প্রমদানাথ রায়, বসন্তকুমার রায়, শরৎকুমার রায় ও হেমেন্দ্রনাথ রায়— দীর্ঘজীবী হইয়া যশঃ ও নাম বিস্তার করিলে দয়ারাম রায়ের বংশের আরো গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

রাজা প্রমথনাথের উত্তরাধিকারী—রাজা প্রমথনাথকৃত উইল অনুসারে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার প্রমদানাথ রায় পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র পাঠ সমাপ্ত না হওয়ার পূর্বেই তাহার পিতার ন্যায় তাহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়। কুমার প্রমদানাথ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জানুয়ারী তারিখে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার চারি বৎসব পরেই "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই অল্পকাল মধ্যে ভূমিকম্প রাজবাটির ও প্রসন্নকালীর বাটির সুন্দর অট্টালিকা ভূতলশায়ী করায় রাজবাটির শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহা কম ক্ষতি নহে। রাজা বাহাদুর পুনরায় রাজবাটি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তথাপি তিনি পুণ্য কার্যে বিরত নহেন। কিছুদিন হইল তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিস্তর দীন দুঃখীকে প্রচুর আহার, পয়সা এবং বস্ত্র দান করিয়া, জনসমাজে তিনি যশস্বী হইয়াছেন। রাজসাহী কলেজে এম. এ, পরীক্ষার্থীদিগের জন্য একটা ১০ টাকার মাসিক বৃত্তি স্থাপিত করিয়া উচ্চ শিক্ষার বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।[৫] এই ছয় বৎসর মাত্র তাহাব রাজত্ব। এই অল্প সময় মধ্যে এবং রাজবাটি নির্মাণের প্রচুর ব্যয় নিবন্ধনেও, তিনি যেরূপ পুণ্যকীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তাহার পিতৃপুরুষের যশঃ ও নাম বিস্তার করিলে লোক সমাজে প্রশংসার পাত্র হইবেন।

১. "After leaving School he fell into a bad set of Europeans who tried to tempt him to several indulgences and fleece him, but he soon shook off their influences and learned to think and judge for himself. He at last stumbled into the right path and found for himself a field far active usefulness."— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

২. "Impressed with these sentiments, I hail the establishment of the "Prasannea Nath Academy" as a harbinger of better days for Rajshahi"— The Rsjas of Rajshahi, Calcutta Review.

৩. ঐ গৃহ জীর্ণ সংস্কাব জন্য রাজা প্রমথনাথের পুত্র রাজা প্রমদানাথ ১০,০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই দান দ্বারা পিতা পিতামহের কীর্তির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

৪. রাজকুমার রাজা প্রমথনাথের প্রিয়বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। রাজকুমার অতি সুশিক্ষিত এবং জমিদারি কার্যে সুদক্ষ। ইহার পিতার নাম বামকুমার এবং পিতামহের নাম নিমাই। এই নিমাই হইতেই বংশ উন্নতি লাভ করে। নিমাই ও রামকুমার বিস্তর জমিদারি লাভ করেন।

৫. "Raja Promoda Nath Roy Bahadur, of Dighapatya has founded a scholarship of Rs. 10, to be forwarded to a greaduate of the college reading for the M.A. Degree Examination."— Administration Report of the Rajshahi Division for 1898-99.

একাদশ অধ্যায়

দুবলহাটি রাজবংশ

উপক্রমণিকা—দুবলহাটির আদিরাজ্য বারবকপুর। এই বারবকপুরের কোন একটি অত্যুচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বর্ষা সমাগমে যদি একবার চতুর্দিকে নয়ন-নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটি বিস্তৃত জলরাশি চারিদিকে ব্যাপিয়া বহিয়াছে। সেই জলরাশি মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, এক একটি দ্বীপ এবং নিজ দুবলহাটিও সেই রূপ দ্বীপ বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। এই দুবলহাটি রাজ্যে মৎস্যের নামে শৌলকোপা, খালিশামারি, পবা-মারি, টেঙ্গরা-গাড়ি প্রভৃতি মৌজা আছে। আবার জলকর গুন্দীর অন্তর্গত প্রায় ৫০/৬০ বিল এখনও এই রাজ্যে বর্তমান আছে। এই দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইবামাত্র হৃদয়ে সহসা এই উদয় হয় যে দুবলহাটি একটি প্রাচীন স্থান এবং এককালে সেই জলরাশি মৎস্যাদি জলজন্তুর আবাস স্থান ছিল। সেই দৃশ্য, মৎস্য নামের মৌজা, এবং বিলসমূহ স্পষ্টই বলিয়া দেয় যে জলরাশি এককালে কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম ঋতুতে চারি দিকে ব্যাপিয়া থাকিত, তাহা এক্ষণে শস্যক্ষেত্ররূপে পরিণত, এবং আদিতে বিনা করে রাজ্যভোগ তদপরে "বাইশ কাহন কবজী মৎস্য কর স্বরূপ" মোঘল সম্রাট সমীপে প্রেরিত হইত, তাহাও মিথ্যা ঘটনা বলা যায় না। এইক্ষণ সেই জলরাশি শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এবং লক্ষাধিক মুদ্রার জমিদারি। ইহাই কালের বিচিত্র গতি।

রাজসাহী মধ্যে দুবলহাটি একটি প্রাচীন রাজবংশ। সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঁঠিয়া ও নাটোর রাজবংশ অভ্যুদয়ের অনেক পূর্বে দুবলহাটি বংশের স্থিতি অনুমিত হয়। আদিশূরের (অর্থাৎ রাজসাহী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজ নাম ধারণ করার) পর হইতে তাহিরপুর ও সাঁতুল রাজবংশের উৎপত্তি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। সুতরাং সেনবংশীয় আদিশূর বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পূর্বে পাল বংশীয় রাজাদের সময় বা তৎপূর্বে দুবলহাটি বংশের স্থিতি তাহাই অনুমিত হয়। জগৎরাম রায় দুবলহাটি রাজবংশের আদি পুরুষ। জগৎরাম হইতে রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর পর্যন্ত ৫৩ জন পুরুষ দুবলহাটি রাজ্য অধিকার করেন। সম্বৎ ১৯৪৮ (১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে) রাজা হরনাথের মৃত্যু হয়। গড়ে প্রত্যেকের ৩৩ বৎসর রাজত্ব কাল বলিয়া ধরিলেও ৫৩ পুরুষে ১৭৪৯ বৎসর হয়। সুতরাং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ প্রচারের ২০০ বৎসরের পর যে দুবলহাটি বংশের অভ্যুদয় হয় তাহা অনুমান কার যাইতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে মুসলমানদের আক্রমণ পর্যন্ত বাংলা দেশে পাঁচটি বংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করে।[১] এই পাঁচটি রাজবংশের কোন একটা রাজবংশের সময় দুবলহাটি বংশের অভ্যুদয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা কথিত আছে যে উত্তরে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে দেবপালদেব নামক এক রাজা রাজত্ব করেন।[২] বাংলার ইতিহাসে ইহার নাম এরূপ বিখ্যাত যে দেবপালদেব অঙ্গ, বঙ্গ, অর্থাৎ বেহার, বাংলা, উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের নিকট কর আদায় করেন এবং "মহারাজাধিরাজ রাজ-চক্রবর্তী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারই বংশধরেরা পালবংশীয় রাজা নামে বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। এই পালবংশীয় রাজাদের রাজধানী গৌড়ে তদপরে নবদ্বীপে ছিল এবং পুরাতন রাজসাহী প্রদেশে তাহাদের অনেক কীর্তিও আছে। আদিশূরের পূর্বে অর্থাৎ রাজসাহী প্রদেশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও

কায়স্থগণের উপনিবেশের পূর্বে, রাজসাহী বন, জঙ্গল, বিল, নদ, নদীতে পরিপূর্ণ ছিল। লোকের বসতি সংখ্যাই কম ছিল, যে সকল লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে আদিম নিবাসী অসভ্য জাতিই অধিক। এ সময় দুবলহাটি রাজ্য যে জঙ্গলময় গ্রাম চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ এবং অসভ্যজাতির বাস ছিল, তাহা দুবলহাটি রাজ্যের বর্তমান অবস্থা দেখিলেও কতক পরিমাণে প্রতীতি হয়। এখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দুবলহাটি বংশের অভ্যুদয় রাজসাহী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ নাম ধারণের পূর্বে এবং সম্ভবতঃ পাল বংশীয় রাজার সময়। এই বংশের অভ্যুদয়কালে জগৎরাম জঙ্গলময় ও জলময় দেশে একজন অপরিচিত ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূম্যধিকারী ছিল, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ প্রাচীন বংশের ইতিবৃত্ত রক্ষিত হয় নাই; এবং যাহা কিছু রক্ষিত হইয়াছিল তাহাও রাজা হরনাথের মাতার সঙ্গে বিবাদে লোপ হয়। সুতরাং দুবলহাটি বংশের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপ ও অসম্পূর্ণ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

দুবলহাটি রাজবংশের উৎপত্তি—এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে। পদ্মা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামে জগৎরাম রায় নামে শুঁড়ি জাতীয় একজন ধনী বণিকের বাস ছিল। তিনি দেশ বিদেশ বাণিজ্য জন্য বহুবিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদিসহ অনেক নৌকা বোঝাই করিয়া কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত সওদাগরের ন্যায় জলপথে গমনাগমন করিতেন। একদা বাণিজ্য দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ বহু নৌকাসহ বাটি হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। একটি ক্ষুদ্র নদী বর্তমান দুবলহাটি গ্রাম দিয়া প্রবাহিত হইত। সে নদীর চিহ্ন এখনও আছে। হাতাশের বিলের সহিত এই নদীর যোগ আছে। এই বিল দিয়া জগৎরাম তাহার নৌকা-আদিসহ যাইতে যাইতে এক রজনীতে বর্তমান দুবলহাটির দুই মাইল ঠিক উত্তরে এ নদীর তীরে কশবা গ্রামে বাণিজ্য তরীগুলি বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই প্রবাদ যে রজনীতে নিদ্রায় অভিভূত হইলে, দেবী "রাজরাজেশ্বরী" জগৎরামের নিকট আবির্ভূতা হইলেন। জগৎরাম স্বপ্নে দেবীকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। দেবী বলেন, "জগৎরাম! আমি অনেক দিন হইল এই স্থানে ভূমিতলে বাস করিতেছি, আমাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া তুমি সেবা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।" এখনও এই "রাজরাজেশ্বরী" দেবীর সেবা রীতিমত দুবলহাটি রাজবাটিতে হইতেছে। স্বপ্নাদেশের পর জগৎরামের নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া জগৎরাম দেখিলেন, যে স্থানে তাহার বাণিজ্য তরীগুলি আছে তাহার চতুর্দিকের গ্রামগুলি জঙ্গলময় এবং জলরাশি মধ্যে এক একটা গ্রাম যেন জলে ভাসিতেছে; কেবল স্থানে স্থানে ২/১ ঘর ইতর লোকের বাস। পরে জগৎরাম জানিতে পারিলেন যে এ গ্রামবাসীরা স্বাধীন, কাহাকে কোন কর দেয় না। ভাগ্যপ্রসন্ন হইলে লোকের সকল বিষয়ই সুবিধা হয় এবং বুদ্ধি-কৌশলও ভাগ্যপ্রসন্নের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া দেয়। জগৎরামের অর্থবল যথেষ্ট এবং সঙ্গেও অনেক নৌকা, অনেক দ্রব্য ও অনেক টাকাও ছিল। আবার গ্রামগুলির স্বামীও কেহই দেখা যাইতেছে না। তখন দেবীর স্বপ্নাদিষ্ট কথার "তোমার মঙ্গল হইবে" উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, জগৎরাম ক্রমে গ্রামগুলি দখল করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কার্যে কোন বাধা না পাইয়া তিনি উৎসাহের সহিত বন, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং নূতন প্রজাকে অগ্রিম টাকা দিয়া বসতি করাইতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তাহার বাণিজ্য করা অপেক্ষা এই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করাই বেশি লাভ হইবে। তখন তিনি বাণিজ্য একবারে ত্যাগ করিয়া ক্রমে নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে প্রায় ১০/১২ ক্রোশ মধ্যের গ্রামগুলিতে তাহার অধিকার স্থাপন করিলেন, এবং কর আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে আধিপত্য স্থাপিত হইলে জগৎরাম কসবা গ্রামে নিজ বাসভবন স্থির করিয়া, সেই "রাজরাজেশ্বরী" দেবীকে নির্দিষ্ট স্থান হইতে উত্থিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যেরূপ শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া সিংহল প্রভৃতি দেশে গিয়া ব্যবসা করেন এবং ভারতবর্ষের

পশ্চিম অঞ্চলে গিয়া জঙ্গল কাটিয়া ভগবতীর অনুগ্রহে গুঞ্জর দেশ অর্থাৎ গুজরাট রাজ্য স্থাপন করেন, সেইরূপ জগৎরাম বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্যবসা করেন এবং শেষে বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলে গিয়া জঙ্গল কাটিয়া দেবী "রাজরাজেশ্বরীর" অনুগ্রহে দুবলহাটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই জগৎরামই দুবলহাটি রাজবংশের আদি পুরুষ।

জগৎরামের বংশধরগণ— জগৎরাম হইতে ৪৪ পুরুষ পর্যন্ত এই বংশধরগণের মধ্যে কাহার কাহার নাম জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ৪৫ পুরুষ হইতে জগৎরামের বংশে যে যে ব্যক্তি রাজত্ব করেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

পুরুষ	ভূম্যধিকারীর নাম	পুরুষ	ভূম্যধিকারীর নাম
১	জগৎরাম	৫০	শিবনাথ রায়চৌধুরী
৪৫	তুলসীরাম রায়চৌধুরী	৫১	কৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী
৪৬	মুক্তারাম রায়চৌধুরী	৫২	আনন্দনাথ রায়চৌধুরী
৪৭	কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরী	৫৩	রাজা হরনাথ চৌধুরি রায় বাহাদুর
,,	রঘুরাম রায়চৌধুরী (দুই ভ্রাতা)	৫৪	কুমার ঘনদানাথ রায়চৌধুরী
		,,	কুমার ক্রীঙ্কারীনাথ রায়চৌধুরী (দুই ভ্রাতা)
৪৮	রঘুনাথ রায়চৌধুরী		
৪৯	পরমেশ্বর রায়চৌধুরী		

কাহার সময় হইতে এবং কিরূপ ঘটনায় নামের পর "রায়চৌধুরী" উপাধি সংযোজিত হয় তাহার বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু তুলসীরাম হইতে "রায়চৌধুরী" প্রত্যেক নামের পর সংযোজিত হইয়াছে। কেবল হরনাথ রায়চৌধুরী ভিন্ন দুবলহাটি বংশে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হইতে কোন ব্যক্তি "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু রাজসাহীর প্রথানুসারে বড় বড় জমিদারকে তাহার রাইয়তেরা "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করে। সেই প্রথানুসারে রাইযতেরা দুবলহাটি জমিদারকে পূর্ব হইতে রাজা বলিত।[৩]

জগৎরাম হইতে কৃষ্ণরাম পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ— এই দীর্ঘকাল মধ্যে ৪৬ পুরুষ দুবলহাটি রাজ্যে রাজত্ব করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালবংশের লোপ হইলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেনবংশীয় রাজগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। পালবংশীয় কি সেনবংশীয় রাজাদের সময় দুবলহাটির ভূম্যধিকারী যে কর দিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাই বেশি সম্ভব যে ক্ষুদ্র জঙ্গলময় এবং জলময় রাজ্য বলিয়া দুবলহাটি রাজ্য পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং জগৎরামের বংশধরেরা দীর্ঘকাল দুবলহাটি রাজ্য নিষ্কর ভোগ করিতেন। সেনবংশীয় রাজাদের সময় মুসলমানেরা বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই সময় বা তাহার অব্যবহিত পরে মুসলমানেরা জানিতে পারিলেন যে দুবলহাটি রাজ্যের ভূম্যধিকারী নিষ্করে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। তখন মুসলমান সম্রাট দুবলহাটি রাজ্যের ভূম্যধিকারীর নিকট রাজস্ব চাহিলেন। ভূমধ্যাধিকারী মুসলমান সম্রাটের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, "আমি যে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী তাহার প্রজার কর এত কম যে রাজার রাজস্ব দিলে আমার কিছুই থাকিবে না, আমার কেবল পরিশ্রম মাত্র হইবে; রাজ্যের অধিকাংশ স্থান প্রায় সমুদয় বৎসর জলমগ্ন থাকে এবং যে স্থানে জল নাই সে স্থানের অনেক ভাগ জঙ্গলময় ও প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় না।" এই কথায় মুসলমান সম্রাট বিশ্বাস করিয়া ভূম্যধিকারীকে বলিলেন, তুমি নিষ্করে রাজ্য ভোগ কর, কেবল রাজকর স্বরূপ প্রতি বৎসর ২২ কাহন কবজী মৎস্য সম্রাট সমীপে দিতে হইবে এবং বংশের চিহ্ন স্বরূপ 'তুরী ও ডঙ্কা" ব্যবহার করিতে পারিবে। সেই অবধি দুবলহাটি বংশীয়েয়া "তুরী ও ডঙ্কা" ব্যবহার করিয়া থাকে। বারবকপুর পরগণা দুবলহাটির রাজ্য। এই পরগণায় এখনও যেরূপ ৫০/৬০ বিল এবং হিন্দু জালুয়া ও "ধাওয়া" নামে এক প্রকার মুসলমান জাতীয় প্রায় ৫০০/৬০০ ঘর

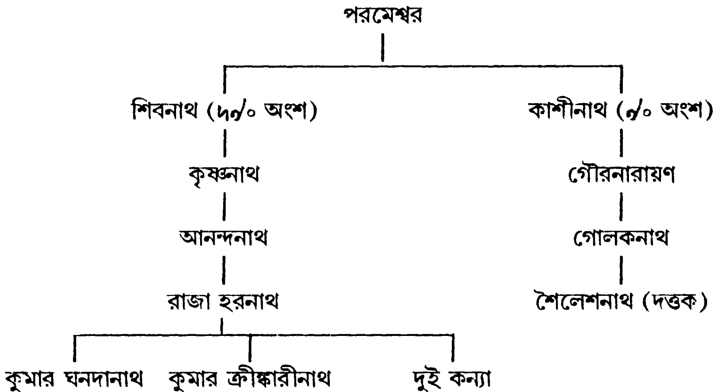
মৎস্যজীবীর বাস দেখা যায় এবং এখনও সেরূপ কবজী মৎস্য বিলে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা নিতান্ত অমূলক নহে যে কেবল "২২ কাহন কবজী মৎস্য কর স্বরূপ" প্রদত্ত হইত। এই রূপে জগৎরামের বংশধরেরা কিছুদিন রাজ্যভোগ করেন। মোঘল সম্রাট আকবরের সময় রাজা তোডরমল সমগ্র বঙ্গদেশ জরিপ করিয়া রাজার রাজস্ব নির্ধারিত করেন। সেই সময় দুবলহাটি রাজ্যের রাজস্ব অতি অল্পমাত্র ছিল। "তকসীম জমায়" ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে বাংলার সুবাদারের অধীন সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত এক বারবকপুর মহাল দৃষ্ট হয়। ইহার বার্ষিক জমা ৮৪.৯৫২ দাম ছিল।[৪] আবার ঐ সুবার অধীন সরকার জেনাতাবাদের (গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী) অন্তর্গত মালদহের আশপাশ বারবকপুর প্রভৃতি ১১ খান মহালের নাম দেখা যায়; ইহাদের কোন রাজস্ব ছিল না।[৫] "হস্তবুদে" ইহা দেখা যায় সরকার পীঞ্জীরা চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বারবকপুরের ১১৩৫ বঙ্গাব্দের আসল জমা ৬০৭ সিক্কা টাকা এবং ১১৬৮ বঙ্গাব্দের "হস্তবুদে" জমা ৭২২ সিক্কা টাকা ছিল।[৬] সরকার জেনাতাবাদের অন্তর্গত বারবকপুরের কোন নির্দিষ্ট জমা আইন আকবরীতে লিখা যায় না এবং "হস্তবুদে" যাহার জমা ৭২২ সিক্কা টাকা মাত্র ছিল, তাহাই দুবলহাটি রাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। "হস্তবুদে" যেমন রাজসাহী প্রদেশ, লস্করপুর, তাহিরপুর, সাঁতুলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ আছে, তেমনই বারবকপুরেরও স্বতন্ত্র নাম দেখা যায়। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বারবকপুর উদিতনারায়ণের বা রাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। ইহা প্রথম হইতেই একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরীর সময় কসবা হইতে দুবলহাটি রাজবাটি নির্মাণ হয়। কৃষ্ণরাম ও রঘুরাম দুই ভ্রাতা। কৃষ্ণরাম জ্যেষ্ঠ ও রঘুরাম কনিষ্ঠ। কিছুদিন একত্র বাস করার পর দুই ভ্রাতার মনান্তর ঘটিল। মনান্তর হওয়ার পর ভূসম্পত্তি দুই অংশ হইল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম ।।/০ আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ রঘুরাম ।৶০ আনা অংশ পাইলেন। কৃষ্ণরাম জমিদারির ।।/০ আনা অংশ লইয়া বলিহারের নিকট মৈনম গ্রামে এবং কনিষ্ঠ রঘুরাম ।৶০ আনা অংশ লইয়া দুবলহাটিতে বাস ভবন নির্দেশ করেন। কসবাতে আর বাস করিলে বংশ থাকিবে না এই কুসংস্কারবশত দুই ভ্রাতাই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস ভবন নির্দেশ করিতে বাধ্য হন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম অপুত্রক পরলোক গমন করিলে তাহার বিধবা স্ত্রী এক একজন পরে ক্রমান্বয়ে চারিটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একে একে সকল পুত্রই পরলোক গমন করিল। এইরূপ দুর্ঘটনায় কৃষ্ণরামের বিধবা স্ত্রীর সংসারে বিরাগ জন্মিল। এই বিধবা রাণীর সহিত রঘুরামেরও মনান্তর ছিল। সুতরাং সেই বিধবা রাণী তাহার ।।/০ আনা অংশ বলিহারের ও দামনাশের জমিদারদের নিকট বিক্রয় করেন।[৭] দুবলহাটি রাজ্যের কেবল ।৶০ আনা অংশ রঘুরামের হস্তে রহিল। দুবলহাটির বর্তমান কুমারেরা ঐ রঘুরামের বংশধর।

রঘুনাথ চৌধুরি— রঘুনাথ, রঘুরামের পুত্র। রঘুনাথের স্ত্রীর নাম বিদ্যাধরী চৌধুরাণী। ইহার রাজত্ব সময়ে কোন প্রধান ঘটনা দেখা যায় না। ইনি মৃত্যুকালে, ইহার পত্নীর ভরণপোষণ জন্য দুবলহাটি রাজ্যের ৶০ আনা অংশ দান বিক্রয়ের ক্ষমতা সহিত হেবা করিয়া দেন। এই হেবানামা সূত্রে বিদ্যাধরী দুবলহাটি রাজ্যের ৶০ আনা অংশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট ৸৶০ আনা রঘুনাথের পুত্র পরমেশ্বরের দখলে রহিল।

শৈলগাছি বংশোৎপত্তি— পরমেশ্বর রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শিবনাথ কনিষ্ঠ কাশীনাথ। পরমেশ্বর পরলোক গমন করিলে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনাথ পিতৃরাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ মাসিক মাসহারা গ্রহণে স্বতন্ত্র বাস করিতে লাগিলেন। শিবনাথের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইলেন। এই সময় পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ দুবলহাটি রাজ্যের অংশ পাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। রঘুনাথের পত্নী বিদ্যাধরী অপত্য স্নেহবশতঃ তাহার পতির

দুবলহাটি রাজ্যের দান করা ৵০ আনা অংশ পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথকে হেবানামা-সূত্রে দান করিয়া পরলোক গমন করেন। এই কাশীনাথ হইতে শৈলগাছি বংশের উৎপত্তি হইল। এই শৈলগাছি যমুনা নদীর তীরে এবং কাসিমপুর হইতে দুই মাইল দূর। কাশীনাথের বংশধরেরা দুবলহাটির ৵০ আনির জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশীনাথের পুত্র গৌরনারায়ণ এবং গৌরনারায়ণের পুত্র গোলকনাথ। এই গোলকনাথ স্বধর্ম পরায়ণ এবং অতিথি সেবায় অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। "যস্য ন জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রং নচ স্থিতিঃ অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সেহতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া অতিথির নাম, গোত্র বা কোন পরিচয় লইতেন না। ভিক্ষা ব্যবসায়ীই হউক বা পুস্তক বিক্রেতাই হউক, যে ব্যক্তি ভোজনার্থী হইয়া তাহার গৃহে আসিত, তিনি তাহাকেই অতিথি করিতেন। সময়, জাতি বা অবস্থার ভেদাভেদ তাহার নিকট ছিল না। তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করিলে তাহার পত্নী এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর হইতে যে শৈলগাছি বংশের উৎপত্তি, তাহার বংশাবলী নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—



চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— রাজা হরনাথ চৌধুরি রায় বাহাদুরের পিতামহ কৃষ্ণনাথ চৌধুরির সময় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ বার্ষিক ১৪৪৯৫ ৷৷/০ আনা রাজস্বে কৃষ্ণনাথের নিকট কবলিয়ত গ্রহণ করেন। এই জমিদারি রাজসাহী কালেক্টরি তৌজির নম্বর ১৬২ পরগণে বারবকপুর। কাসিম আলীর রাজত্ব সময়ে বাংলা ১১৬৮ সালে (১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ) বারবকপুরেব হস্তবুদ জমা ৭২২ সিক্কা টাকা ছিল।

কৃষ্ণনাথের বংশধর— কৃষ্ণনাথের পুত্র আনন্দনাথ। আনন্দনাথের কোন পুত্র সন্তান জন্মে না। তাহার পত্নী রূপমুঞ্জরীকে দত্তক পুত্র রাখিবার অনুমতি দিয়া, আনন্দনাথ পরলোক গমন করেন। পতির মৃত্যুর পর তাহার পত্নী রূপমুঞ্জরী দুবলহাটি রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া হরনাথকে দত্তক পুত্র স্বরূপ রাখিলেন। এই দত্তক পুত্রের সহিত, মাতার মনান্তর উপস্থিত হইল। মাতা দত্তক পুত্র অসিদ্ধ জন্য রাজসাহীর জজ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। নিম্ন আদালতে দত্তক সিদ্ধ হইলে, মাতা কলিকাতা হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন। এই আপিল করার পর, রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া প্রাণসংশয়ে কাতর হন। এমন সময় পুত্রের প্রতি স্নেহের উদয় হয় এবং তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পুত্র হরনাথ মাতার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহাকে দুবলহাটি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি করেন। সম্বৎ ১৯১০ (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে) হরনাথ রায়চৌধুরী দুবলহাটি রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার মাতা রূপমুঞ্জরী পরলোক গমন করেন।

রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণীর সময় রাজ্য লাভ— জগৎরামের সময় হইতে রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণীর সময় পর্যন্ত জগৎরামের বংশধরগণ মধ্যে কেহই নূতন জমিদারি, লাভের যত্ন বা চেষ্টা করেন নাই। রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণীর বিষয় বুদ্ধি বিলক্ষণ ছিল। তাহার সময় যে সকল জমিদারি দুবলহাটি রাজ্যভুক্ত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জেলার নাম	কালেক্টরির তৌজির নম্বর	মহালের নাম
রাজসাহী	১৮২৯	চক কালিদাস ও রঘুনাথপুর
ঐ	৭৩৮ হাল নম্বব ২১৯৭	মহাল দেওয়ানপুব

দুবলহাটি রাজ্যের প্রজা বিদ্রোহ— পূর্বে দুবলহাটি রাজ্যের জরিপ জমাবন্দি রীতিমত হয় নাই। সুতরাং প্রজার রাজস্ব বেশি ছিল না। হরনাথ রায়চৌধুরী দুবলহাটি রাজ্য জরিপ করান। জমাবন্দির সময় কতকগুলি দুষ্ট প্রজা একত্রিত হইয়া বৃদ্ধি হারে জমা দিবে না বলিয়া ক্রমে দল পাকাইতে লাগিল। শেষে প্রায় সমস্ত প্রজাই বাংলা ১২৯১ সালে (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে) বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রাজাকে কর দিতে প্রজারা বিরত হইল। বাংলা ১২৯৬ সালে (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে) সেটেলমেণ্ট আদালতের সাহায্যে প্রজার কর বৃদ্ধি হইল এবং প্রজাগণও সুশাসিত হইল। এই বন্দোবস্তে প্রায় বিশ হাজার টাকা দুবলহাটি রাজ্যের কর বৃদ্ধি হইল। দুবলহাটি রাজ্যে অনেক জমিন বহুকাল হইতে পতিত ছিল এবং জলময় ছিল। ক্রমে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। আবার বারবকপুরে প্রায় ১৮০০ বিঘা জমিতে গাঁজা জন্মে। গাঁজার চাষে প্রজার বিলক্ষণ লাভ। এমনতাবস্থায় প্রজার কর বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজার অসুবিধা হওয়াই সম্ভব নহে।

হরনাথ রায়চৌধুরীর সময় জমিদারি লাভ— হরনাথ রায়চৌধুরীর সময় যে যে জমিদারি লাভ হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জেলার নাম	কালেক্টরির তৌজির নম্বর	মহালের নাম
রাজসাহী	৯৮০ ; ১৬৬	কিঃ ভাকৈল বনামে আবাদপুর
,,	৯৭৯	জফরাবাদ
,,	৯৮৫/৮৬/৮৭	হানঘোষপাড়া
,,	১৭৫৪	খাসবন্দোবস্তী মহাল বুজরক আতিথা
,,	১৮৭৬	মহাল যমুনী
,,	১৭৩৬	ফুলীহার
,,	২২৭	পরগণে তেগাছিব তালুক গোড়সর
,,	২৪০	পরগণে তেগাছির তালুক কর্ণভাগ
,,	৯৮১	পরগণে বারবকপুর তালুক ভবানীগাছি উলাসপুর
,,	২২৩১	পরগণে ফতেজঙ্গপুরের লাট নন্দাহার
,,	২২২০	পরগণে ফতেজঙ্গপুরেব লাট নাবায়ণপুর
,,	১০৪৭	পরগণে তাহিরপুর কিঃ রসুলপুর
,,	১৭২৬	পরগণে বারবকপুর বঃ আতিথা মৃজাপুর
বগুড়া	১৪২ হালনম্বর ১৪৭	পরগণে খাট্টার মোতালক ডিহি পুশুরিয়া
,,	২৭ বি	পরগণে খাট্টা নিষ্কর কিঃ লস্করপুর গাঙ্গজোয়ার বঃ রহিমপুর
দিনাজপুর	২৩৮	মহাল পরগণে সুলতানপুর
,,	৫৯৭	পরগণে সুলতানপুরের তালুক আমড়া
,,	১২৭	মহাল পরগণে গিলাহবাড়ি নাটপুখুরি
,,	৪৭	মহাল পরগণে খলসীর নাট লোকা

ফরিদপুর	২৩৪৯	মহাল পরগণে মকিমপুরের মোতালক তালুক চৈতন্যকৃষ্ণ রায় মৌজে ঘোনাপাড়া
শ্রীহট্ট	৪৭০৩১/১ হাল নম্বর ৭	পরগণে ভানুগাছের তালুক রায় গৌরহরি সিংহ তালুকদারী রাধাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কীয় মৌজে কুমড়াকাপন
	৪৭০৩১/১	পরগণে ভানুগাছের তালুক রায় গৌরহরি সিংহ ও তালুকদারী রাধাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কীয় মৌজে গোপালনগর, মৌজে পাণিশালা সমেত তদন্তর্গত প্রকাশ্য নাম জাদেহাট বাজার কমলগঞ্জ ও চাঁদনী কট এবং মৌজে বড়গাছ

হরনাথের মাতার পূর্বে কেবল পরগণে বারবকপুরের ৸৶৹ আনা অংশ জমিদারি ছিল। তাহার মাতা রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণীর সময় অল্প জমিদারিই লাভ হয়। কিন্তু হরনাথের সময় বিস্তর জমিদারি লাভ হয়। পূর্বে কেবল রাজসাহী জেলায় বারবকপুর পরগণার ৸৶৹ আনা দুবলহাটি রাজ্য মাত্র; কিন্তু হরনাথের সময়ে দুবলহাটি রাজ্য রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, ফরিদপুর এবং শ্রীহট্ট, এই পাঁচ জেলায় বিস্তৃত। জগৎরামের সময়ে দুবলহাটি রাজ্যের যে আয়তন ছিল, তদপেক্ষা এক্ষণ দুবলহাটি রাজ্যের আয়তন চারিগুণের বেশি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হরনাথ কোন কলেজে বা স্কুলে শিক্ষিত হন নাই, কিন্তু তাহার বিষয় বুদ্ধি এত প্রবল ছিল যে দুবলহাটি রাজবংশের কোন রাজা তাহার মতো বিষয় বুদ্ধির পরিচয় দেখাইতে পারেন নাই। আবার নিজ বুদ্ধিগুণে তাহার সুযোগ্য মন্ত্রী বাবু শশিভূষণ রায়ের এবং বুদ্ধিমতী জ্যেষ্ঠা পত্নীর উপদেশকে শিরোধার্য করিতেন। হরনাথের রাজ্য বিস্তারই তাহার বিষয় বুদ্ধির এবং মন্ত্রী ও পত্নীর উপদেশের সম্মান জাজ্বল্য প্রমাণ। তিনি যে কেবল রাজ্য বিস্তার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এমত নহে। তিনি যেরূপ আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থের সার্থকতা সম্পাদনে নিজ বংশের গৌরবও বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজসাহী বাসীদের "সাত সমুদ্র তেরনদী" পার হইয়া এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতা যাইতে হইত সে শিক্ষা আজ ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই প্রাপ্ত হইতেছেন। সে সময় কলিকাতা বহু দিবসের পথ ছিল। তখন রাজসাহীতে রেল প্রবেশ করে নাই। সে সময় দরিদ্র পক্ষে কলিকাতা গমনাগমন অসাধ্য ব্যাপার ছিল। এমন দুঃসময়ে রাজসাহীতে হরনাথই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার সূত্রপাত করেন। ইনিই রাজসাহী জেলা স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণি কলেজে পরিণত করেন। এই মহৎ কার্য জন্য ইনি বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেন্টকে বাংলা ১২৭৯ সালের ৯ মাঘ তারিখে (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি) দান করেন। যদি বিশগুণ ধরা যায়, তথাপি ঐ সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ টাকা হয়। ইহা সামান্য দান নহে। ইহা ব্যতীত তাহার যথেষ্ট পুণ্যকীর্তি আছে, তাহার উল্লেখ যথা স্থানে করা যাইবে।

দুবলহাটি অতিথিশালা— যে অভ্যাগত, ভিক্ষার নিমিত্ত বা ভোজনার্থী হইয়া গৃহস্থের গৃহে আগমন করে, তাহাকেই অতিথি বলে। এই অভ্যাগত ব্যক্তিদের আবাস স্থানকেই অতিথিশালা বলে। গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ তাহার নাম, গোত্র বা কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে না। গৃহস্থ কেবল তাহার সেবায় নিযুক্ত হইবে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হয়, তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় এবং গৃহস্থ ঘোর পাপে নিমগ্ন হয়। গৃহস্থদিগের গৃহে গৃহে গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালিত হইতেছে কি না, দেখিবার জন্য ধর্ম অতিথিরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, অতিথি গৃহস্থের গৃহ দেখিয়া তাহাতে উপস্থিত হয়। যদি সেখানে তাহার আতিথ্য না হয়, তবে সে গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ কি? অতিথিকে অতি মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া যথা বিধানে তাহার সৎকার করিবে। ইহার অন্যথায় গৃহস্থ ঘোর নরকে পতিত হয়। অতিথি ব্রাহ্মণ হউন বা অন্য জাতিই হউন, ধনীই

হউন, কি দরিদ্রই হউন, তাহার যথাবিধি পূজা করা উচিত। যে ব্যক্তি অতিথির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে, নরকের প্রাণিগণও তাহার মুখ দেখিতে ঘৃণা বোধ করে। হিন্দু গৃহস্থের অতিথি সেবাই প্রধান ধর্ম। পুরাকালে কি রাজার প্রাসাদে কি দরিদ্রের কুটীরে সর্বত্র যথাবিধানে অতিথির সৎকার হইত। এক্ষণে ইহার বৈলক্ষণ্য অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ এক্ষণ কোন কোন হিন্দু জমিদার অতিথি সেবাকে বৃথাকার্য মনে করেন। তাহারা ইহাকে পুণ্য-কীর্তি বা কর্তব্যকর্ম একবারে জ্ঞানই করেন না। আজকাল জমিদারগণ কলেজ, স্কুল, ডাক্তারখানা, রাস্তা প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত করিয়া সংবাদপত্রে গুণানুবাদ ও প্রশংসা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। আবার এই পুণ্য কার্যের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মহারাজা, রাজা বা রায় বাহাদুর উপাধি পাইলে আর কোন কথাই নাই। কলেজ, স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত করাও বিশেষ পুণ্যকীর্তি ; কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থের নিত্য ধর্ম ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। আবার ইহাও সকলের জানা উচিত, সকাম দান দানই নহে, নিষ্কাম দানই দান। হিন্দু শাস্ত্রে কেন, সকল জাতীয়ের শাস্ত্রেই লিখিত আছে, যে অতি গোপনে দান করিবে। আবার কোন কোন হিন্দু গৃহস্থ বলিয়া থাকে যে, অতিথি সেবায় বংশ লোপ পায়। অতএব অতিথি সেবা অকর্তব্য। যাহাদের এই সংস্কার তাহাদের আমরা এই বলি যে যদি অভ্যাগত অতিথিকে সেবা করিলে. বংশ না থাকে. তবে সে বংশ থাকিয়াই বা ফল কি? হিন্দু গৃহস্থের প্রধান কার্য অতিথি সেবা, এই কার্য যথা বিধানে নির্বাহিত করিয়া যে অর্থ থাকিবে সেই অর্থ দ্বারা মানবের অন্য পুণ্যকীর্তি স্থাপন করাই যুক্তিসিদ্ধ। দুবলহাটি রাজবংশের পুণ্যকীর্তি এই প্রণালীর। এই বংশীয়দিগের প্রধান ধর্মই অতিথি সেবা।[৮] হরনাথ যদিচ কলেজ, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি পুণ্যকীর্তিতেও যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছেন, তথাপি পূর্বপুরুষদের প্রধান কীর্তি অতিথি সেবার ব্যয় কোন প্রকারে হ্রাস করেন নাই; বরং অতিথি সেবার উৎকর্ষ সাধন করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দুবলহাটি অতিথিশালায় কোন অতিথি মাসাধিক বাস করিলেও তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ হয় না বা তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ হয় না। এই কীর্তি স্থির থাকিলে বা আরো উন্নতি লাভ করিলে, বংশের যশঃ, নাম ও গৌরব ক্রমে বৃদ্ধি হইবে তাহার আর ভুল নাই। "এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই কথার মর্যাদা রক্ষা করা রাজসাহীবাসীর নিতান্ত কর্তব্য। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রাজসাহীতে এখনও অতিথি সেবা প্রণালীর প্রধান্য দেখা যায়। একান্নবর্তিতা ও প্রচুর শস্য উৎপন্নতা অতিথি সেবার অনুরাগ স্থির রাখে বা বৃদ্ধি করে। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাসের ইচ্ছা সংক্রমিত হইলে, আতিথ্য ধর্মের হ্রাস হইয়া যাইবে। জগতের সকল দেশীয় লোক অপেক্ষা ভারতবাসীরা আতিথ্য ধর্মে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ গৌরব রাজসাহীবাসীদেরও রক্ষা করা কি কর্তব্য নহে?

হরনাথের পুণ্য-কীর্তি— হরনাথ দুবলহাটি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সৎকার্যে যে যে দান করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

পুণ্যকীর্তি	যত টাকা দান
১। রাজসাহী জেলা-স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণি কলেজে পরিণত (বার্ষিক ৫০০০৲ লাভের সম্পত্তি বিশগুণ মূল্য)	১,০০,০০০৲
২। একটি রাজপথ দুবলহাটি রাজবাটি হইতে নওগাঁও পর্যন্ত ৫ মাইল (কেবল বিলের মধ্যে)	২০,০০০৲
৩। নওগাঁও মহকুমার কাছারি আদি প্রস্তুত জন্য গবর্ণমেণ্টকে দান ৩৬ বিঘা জমি, প্রত্যেক বিঘা ৫৲ টাকা, বিশ বৎসরের কর ধরিয়া নিষ্কর ভূমি	৩,৬০০৲
৪। পুস্তক, সংবাদপত্রাদি মুদ্রিত করিবার জন্য বোয়ালিয়া ধর্মসভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান আনুমানিক মূল্য	২,০০০৲
৫। জিওলজিকাল বাগানে (কলিকাতা)	১,০০০৲

৬। দারজিলিং লাল্সি জুবিলী সেনিটেরিয়াম	১,০০০৲
৭। কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোস্টেল	১,০০০৲
৮। স্যর এসলী ইডেন সাহেবের জীবনচরিত মুদ্রিত করিবার সাহায্যার্থ নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে দান ...	৩০০৲
৯। কলিকাতা সিটি কলেজের গৃহ নির্মাণ জন্য সাহায্য ...	৪০০৲
১০। রাজসাহী কলেজের সংশ্লিষ্ট হিন্দুবোর্ডিং গৃহনির্মাণের সাহায্য	১,০০০৲
	১৩০৩০০৲

হরনাথের এই মোটামুটি দানের তালিকা দিলাম। ইহা ব্যতীত দুঃখী দীন-দরিদ্র অভ্যাগতকে নিত্য দানও যথেষ্ট ছিল। তাহার নিত্য অর্থ দান অপেক্ষা নিত্য অন্নদানই বেশি প্রশংসনীয়। অন্ন ও জল দান অপেক্ষা জগতে অন্য কোন দানে মানবকে সন্তুষ্ট করা যায় না। যে ব্যক্তি ক্ষুধায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, এবং যে ব্যক্তি পিপাসায় কাতর, তাহাকে অন্ন ও জল না দিয়া অর্থ দিলে, সে কখনই সন্তুষ্ট হইবে না এবং অর্থে তাহার জীবনরক্ষাও হইবে না। হরনাথ জানিতেন অন্ন ও জল মহাদান। অন্নদান যে মানবের প্রধান কর্তব্য কর্ম, সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত দীন দুঃখীকে অন্ন ও জল দিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। অন্নদানে তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা ছিল না।

প্রজাপুঞ্জের বালকদের ও নিজ অমাত্যবর্গের বালকদের শিক্ষার জন্য ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি অবৈতনিক মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল[৯] নিজ বাটিতে স্থাপন করেন; তাহা আজিও সুপ্রণালীতে পরিচালিত হওয়ায় প্রতি বৎসর বহুতর বালক মধ্যশ্রেণি ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

হরনাথের রাজ-সম্মান—হরনাথের পুণ্য-কীর্তি জনসমাজে প্রকাশিত হইল এবং ব্রিটিশ রাজ দরবারেরও অগোচর রহিল না। তিনি রাজভক্তি প্রদর্শনেও ত্রুটি করেন নাই। হরনাথের ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া দয়াবান প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত করেন। ইহার পূর্বে দুবলহাটি রাজবংশের আর কোন রাজা ব্রিটিশ রাজ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। রাজা হরনাথ চৌধুরি রায় বাহাদুর হইতেই দুবলহাটি বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়।

রাজা হরনাথের শেষ জীবন— রাজা হরনাথ শেষাবস্থায় শারীরিক তত ভাল থাকিতেন না। ক্রমে শরীর অপটু হইলে, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একখানি উইল করেন। এই উইল রেজেস্টারি হইবার পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া, তিনি স্বর্গারোহন করেন। দুই পুত্র— কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী এবং কুমার ক্রীঙ্কারীনাথ চৌধুরী অপ্রাপ্ত বয়ঃক্রম ; সুতরাং তাহাদের বিধবা মাতারাণী শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণী ও উমাসুন্দরী চৌধুরাণীর কর্তৃত্বাধীন রহিলেন।

রাজা হরনাথের উত্তরাধিকারী— রাজার কৃত উইল অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ঘনদানাথ রায়চৌধুরী দুবলহাটী রাজ্যের ।।/০ এবং কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ক্রীঙ্কারীনাথ রায়চৌধুরী ।৶০ আনা অংশ পাইবেন। কুমারগণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দুবলহাটি রাজকার্য তাহাদের মাতার কর্তৃত্বাধীনে নির্বাহ হইবে। সুতরাং দুবলহাটি রাজ্য কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন হয় নাই। সুবিজ্ঞ ম্যানেজরবাবু শশিভূষণ রায় মহাশয়ের পরামর্শে রাণীরা একত্রিত হইয়া সুচারুরূপে রাজকার্য নির্বাহ করিতেছেন। রাণীরা কুমারগণের[১০] শিক্ষার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে দিঘাপতিয়া কুমারগণের ন্যায় সুশিক্ষিত হইবার সম্ভব। পতির সৎকার্যের অনুকরণ করিয়া রাণীরাও পুণ্যকার্যে বিরত নহেন। পতির স্বর্গারোহনের পর রাণীরা নওগাঁ "প্রাইস দাতব্য চিকিৎসালয়ের" গৃহ নির্মাণ এবং মহকুমার কাছারির নিকট পাকা ঘাটসহ একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেছেন।

তাহাদের পূর্বপুরুষের দেবার্চ্চনা, অতিথি সেবা ও নিত্য দান আদি কর্ম পূর্বের ন্যায় নির্বাহ হইতেছে। দুই রাণী যেরূপ সদ্ভাবে সকল কার্য-নির্বাহ করিতেছেন, তাহাতে রাজশ্রী ক্রমে বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই সদ্ভাব স্থির থাকিলেই রাজ্যের কুশল।

দুবলহাটি রাজবংশের সমালোচনা— রাজসাহীতে দুবলহাটি রাজবংশের ন্যায় প্রাচীন রাজবংশ আর একটি দেখা যায় না। যে বংশ অদ্যাবধি বর্তমান থাকিয়া ৫৪ পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন, সে বংশের যশঃ গৌরব কীর্তন করা অতীব আনন্দের বিষয়। এরূপ প্রাচীন বংশ ব্রাহ্মণ বা উচ্চ কুলোদ্ভব হইলে ইহার যশঃ ও নাম বহুদূর বিস্তৃত হইত তাহার আর ভুল নাই। যে বংশের স্থিতি ১৭০০/১৮০০ বৎসর অনুমান করা যায়, সে বংশের পুণ্যফল ব্যতিরেকে এত দীর্ঘকালে স্থায়িত্ব সম্ভব নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে অনেক জাতি বা অনেক বংশের রাজ্য লাভের প্রধান কারণই বাণিজ্য। "বাণিজ্যের লক্ষ্মী" এই বাক্যের সার্থকতা দুবলহাটি রাজবংশ বিশেষরূপ সম্পাদন করিয়াছেন। সদুপায়ে শ্রম-লব্ধ রাজ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল সম্ভব। দুবলহাটির রাজ্য এই শ্রেণির রাজ্য। অসদুপায়ে যে রাজ্য লাভ হয়, তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল সম্ভব নহে। ধর্মের সহিত অর্থোপার্জনে বংশের উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। যেমন একটি দীপ-শিখা অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া সহসা নির্বাণ হইয়া যায়, তেমনই অধর্মের উপার্জিত অর্থে যে বংশ অল্প সময় মধ্যে উন্নতি লাভ করে, সে সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অর্থোপার্জনের সময় যে ব্যক্তি ধর্মের প্রতি লক্ষ করে না, সে বালির উপর অট্টালিকা নির্মাণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করে।

চৌগ্রাম রাজবংশ

রাজসাহীর জমিদার— রাজসাহীতে কতকগুলি এরূপ বড় বড় জমিদার আছেন যে তাহারা রাজা বলিয়া পরিচিত। গবর্ণমেণ্ট রাজা উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করেন নাই ; কিন্তু তাহাদের প্রচুর জমিদারি আছে, এই জন্য তাহাদের প্রজারা জমিদারকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করে। চৌগ্রামের জমিদার এই শ্রেণির রাজা।[১১] চৌগ্রাম বিলের মধ্যে এবং সিংড়া থানা হইতে প্রায় ৪/৫ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে। একটি রাজপথ রামপুর বোয়ালিয়া হইতে নাটোর, দিঘাপতিয়া দিয়া বগুড়াভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে; সেই রাস্তার পার্শ্বেই চৌগ্রাম।

চৌগ্রাম রাজবংশের উৎপত্তি— গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভ্যুদয় সময় গৌড়ের বাদসাহদিগের অধীনে কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী বংশজাত সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ[১২] নামে তিন ভাই উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। দিল্লির বাদসাহের নিকট সুবুদ্ধি ও কেশব আপন আপন বল বিক্রমের পরিচয় দেওয়াতে খাঁ উপাধি এবং জগদানন্দ রায়[১৩] উপাধি প্রাপ্ত হন। এই তিন ভ্রাতা রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয় এবং উদয়নাচার্যের অধস্তন সন্তান ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে ইহারা শ্রেষ্ঠ কুলীন। জগদানন্দ রায়ের পাঁচু রায় ও ভুবন রায় নামে দুই বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাঁচু রায়ের পুত্র রসিক রায় মহারাজা রামজীবনের সময়ে বর্তমান ছিলেন। রসিকের দুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রকে মহারাজা রামজীবন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। এই দত্তক পুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা এবং রাজসাহীর ইতিহাসে মহারাজা রামকান্ত নামে পরিচিত ছিলেন।

পুরস্কার— রসিক রায়ে কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণে মহারাজা রামজীবন রাজসাহীর অন্তর্গত পরগণা চৌগ্রাম এবং রঙ্পুরের অন্তর্গত পরগণা ইসলামবাদ পুরস্কার স্বরূপ রসিককে প্রদান করেন।

রসিক রায়ের বংশ— রসিক রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায় চৌগ্রামে রাজবাটি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র রুদ্রকান্ত রায়। রুদ্রকান্ত রায়ের দত্তক পুত্র

রোহিনীকান্ত রায়। রোহিনীকান্তের পুত্র সন্তান না থাকায় পাটুল নিবাসী নিরাবিলপটির কুলীন কৃপানাথ মৈত্রের এক পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্র অতি সুলক্ষণ সম্পন্ন। ইনি রমণীকান্ত রায় নামে পরিচিত। ইনি সুধীর ও সুশিক্ষিত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ। ইহারই দ্বারা সরস্বতী ও লক্ষ্মী এক গৃহে বিরাজিত। খাজুরার ভোলানাথ খাঁর সহিত রসিক রায়ের জ্ঞাতিত্ব।

রমণীকান্ত রায় বি, এ—রোহিনীকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর, তাহার জমিদারি কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন হয়। রমণীকান্ত রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং শিক্ষা সমাধা করিলে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। তিনি পিতৃ জমিদারির ভার গ্রহণ করিয়া একটি মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করেন এবং জমিদারির যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করেন। ইহার কার্য কুশলতা এবং জনসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার নিতান্ত প্রশংসনীয়। ইনি মিতব্যয়ী ও ধর্মনিষ্ঠ।

কাসিমপুরের চৌধুরি বংশ

বর্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত উঁপেলসর গ্রামে গঙ্গানন্দ সান্যালের বাস। ইনি ধরাধর বংশ সম্ভূত। ইনি নিরাবিল পটির কুলীন ছিলেন। কাপের কন্যা গ্রহণে চূড়ামণি কাপ হইলেন। যেমন কাসিমপুরের চৌধুরিরা কাপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনই লালুরের ও হরিপুরের চৌধুরিরাও কাপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবাল বা আপাল সরস্বতী হইতে লালুর চৌধুরি বংশের ও রামদেব হইতে হরিপুরের চৌধুরি বংশের উন্নতি হয়। রামদেব চৌধুরি সাতুলের রাণী সর্বাণীর দেওয়ান ছিলেন। গঙ্গানন্দ সান্যাল হইতে কাসিমপুরের চৌধুরি বংশের উন্নতি হয়। ইহার চারি পুত্র— শিবরাম, সীতারাম, রামনারায়ণ, দেবী দাস। ইহাদের বংশধরেরা বর্তমান কাসিমপুরের চৌধুরি জমিদার। ইহা কথিত আছে যে কাসিম খাঁ নামে একজন মোঘল জায়গিরদার কাসিমপুরে বাস করিতেন। কাসিমের বংশ লোপ হইলে বা অন্য কোন কারণে জনৈক বাংলার সুবাদার[১৪] কাসিম খাঁর জায়গির শিবরামকে প্রদান করিয়া "চৌধুরি" উপাধি দেন। এই চৌধুরি বাংলার "চৌদ্দ চৌধুরির" এক চৌধুরি বলিয়া কথিত হয়। কাসিমের জায়গির প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি। এই বৃহৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিবরাম কাসিমপুরে বাস করিতে থাকেন। পরগণে কাসিমপুর ব্যতীত শিবরামের আরো অনেক জমিদারি ছিল। শিবরামের প্রথম বনিতার দুই পুত্র, জয়কৃষ্ণবল্লভ ও বিষ্ণুবল্লভ কাসিমপুরে থাকেন এবং দ্বিতীয় বনিতার পুত্র শ্যামমোহন কাসিমপুর ত্যাগ করিয়া হাজরাহাটি বাসভবন নির্দেশ করেন। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র ব্রজবল্লভ। ইহার সময়ে রামজীবনের রাজ্যলাভ। নাটোরের অধিপতি মহারাজা রামজীবন কাসিমপুরে আইসেন এবং ব্রজবল্লভের গৃহে আহার করিয়া ভোজন লৌকিকতা স্বরূপ পরগণে কালীগাঙ গ্রহণ করেন। ইহার পর কেবল কাসিমপুর পরগণা ব্রজবল্লভের দখলে রাখিয়া রাজা রামজীবন অবশিষ্ট সমুদয় জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এসময় হইতে কেবল কাসিমপুর পরগণা চৌধুরিবংশের অধিকৃত রহিল। আবার বিষ্ণুবল্লভের বংশধর বৃন্দাবনবল্লভ কাসিমপুর ত্যাগ করিলেন এবং জোয়ারী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্তমানে গঙ্গানন্দ সান্যালের বংশ বহুবিস্তৃত। এই বিস্তৃত বংশে আজিকালি অনেক অংশীদার ; তন্মধ্যে রুদ্রকান্ত চৌধুরির বংশই প্রসিদ্ধ। রুদ্রকান্তের পুত্র হরকান্ত অনেক তীর্থ পর্যটন করেন এবং "মহাভারত" পুরাণ পাঠে অনেক ব্যয় করেন। ইনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহার সহিত লেখকের পিতার গাঢ় প্রণয় ছিল। এই হরকান্তের পুত্র সারদাকান্ত সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। রঘুনাথ চৌধুরির প্রপৌত্র কিশোরীনাথ চৌধুরি একজন সুধীর এবং বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। এস্থলে কাসিমপুর চৌধুরি বংশাবলী সন্নিবেশিত করা হইল।

এই কাসিমপুরের চৌধুরি বংশে বিস্তর কুলীনের কুলচ্যুত হইয়াছে। অতএব চৌধুরি বংশ

কাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঝিকড়া নিবাসী গদাধর লাহিড়ি কুলীন ছিলেন। ইহার সহিত রঘুনাথ চৌধুরির ভগিনীর বিবাহ হয়। এই কন্যাগ্রহণে গদাধর লাহিড়ির কাপ হইলেন। বর্তমান রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ি বাহাদুর গদাধর লাহিড়ির বংশসম্ভূত।

কাসিমপুরের "রায়বাহাদুরের" বংশ

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনেন তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ একজন। এই ভট্টনারায়ণের অধস্তন সন্তানের নাম জয়সাগর। জয়সাগরের চারি পুত্র, তন্মধ্যে একজনের নাম পীতাম্বর। যে মৌনভট্ট হইতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের উৎপত্তি হয়, সেই মৌনভট্ট পীতাম্বরের সহোদর। পীতাম্বর ভূষণা পঠীর কুলীন। পীতাম্বরের সাধু, রুদ্র, লোকনাথ নামে পুত্রত্রয় বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন।[১৫] সাধু ও রুদ্র বাগচি গাঞি নামে পরিচিত এবং লোকনাথ লাহিড়ি গ্রামে বসতি করিয়া লাহিড়ি গাঞি নামে বিখ্যাত হন। লোকনাথের পৌত্র বল্লভাচার্য কুলে শ্রেষ্ঠ। এই বল্লভাচার্য উদয়নাচার্য ভাদুড়ির লীলাবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। বল্লভের তিন পুত্র অর্ক, কেশব এবং দনু। ইহারা সাধারণত আকাই, কেশাই ও দনুজাই—নামে প্রসিদ্ধ। কেশাইয়ের সমাজ নকড়িয়া। নকড়িয়ার কেশাই লাহিড়ির বংশধরগণই লাহিড়িকুলে শ্রেষ্ঠ। কেশাইয়ের পুত্র শ্রীনারায়ণ খেকাই নামে পরিচিত ছিলেন। খেকাইয়ের অধস্তন সন্তান বাচাই। এই বাচাইয়ের পুত্র কৃষ্ণদাস লাহিড়ি। ইহার বংশ বহু বিস্তৃত। গদাধর লাহিড়ি কৃষ্ণদাস লাহিড়ির অধস্তন সন্তান। ইহার আদি নিবাস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঙের উত্তর-পশ্চিম ঝিকরা গ্রামে ছিল। গদাধরও শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। গদাধর প্রাণ সংশয়ে কাতর হইয়া গঙ্গাযাত্রা করেন। গঙ্গায় যাইবার সময় নৌকাপথে কাসিমপুর হইয়া যাইতে ছিলেন। কাসিমপুরের শিবরাম চৌধুরির বৃদ্ধ প্রপৌত্র রঘুনাথ চৌধুরির বয়োধিকা অবিবাহিতা এক কন্যা ছিল। রঘুনাথ কুলীনে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া, এত বয়সেও কন্যার বিবাহ দিয়া ছিলেন না। শ্রেষ্ঠ কুলীন গদাধর লাহিড়িকে পথি মধ্যে পাইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, রঘুনাথ কুলক্রিয়া করেন। গদাধরও আসন্নকালে কেবল ধনলোভে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরেই গদাধরের মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি মরিতে যাইতেছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়াও যে কথা, কোন একটা জড়পদার্থের সহিত বিবাহ দেওয়াও সেই কথা। সেকালে সমাজগৌরব জন্য লোক এত লালায়িত ছিল যে কন্যাকে যাবজ্জীবন দুঃখে পাতিত করিয়াও কুল রক্ষার নিমিত্ত তাহারা বিশেষ যত্নবান হইতেন।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামকিশোর লাহিড়ি কাসিমপুরে আইসেন। রুদ্রকান্ত চৌধুরি তাহার ভগিনীর বিবাহ গদাধর লাহিড়ির পুত্র রামকিশোর লাহিড়ির সহিত দিয়া ঐ কাসিমপুরে নদীতীরে বাসোপযোগী ভূমি ব্রহ্মোত্তর দেন এবং নিজ জমিদারি মধ্যে গ্রাম গ্রাম কম নিরিখে জোত দেন। ইহা ব্যতীত কতক ব্রহ্মোত্তর ভূমিও তাহাকে প্রদান করিয়া, রুদ্রকান্ত রামকিশোরকে কাসিমপুরে স্থাপিত করেন, জোত, ব্রহ্মোত্তর এবং নদী তীরে বাসোপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইয়া রামকিশোর লাহিড়ি কাসিমপুরে বাসভবন নির্দেশ করিলেন। ঐ বাটিতেই রামকিশোরের বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিয়া নিজ নাম ও যশঃ বিস্তার করিতেছেন।

রামকিশোর লাহিড়ির তিন পুত্র, কালীকান্ত, কাশীকান্ত ও কালীশঙ্কর। কালীকান্তের পুত্র ছিল না। কাশীকান্তের দুই পুত্র কমলাকান্ত ও রজনীকান্ত। কালীশঙ্করের এক পুত্র গিরীশচন্দ্র। তিন ভ্রাতা কালীকান্ত, কাশীকান্ত ও কালীশঙ্কর একান্নভুক্ত থাকিয়া কাসিমপুরে বাস করিতেন। যে সময় নাটোরে রাজসাহী জেলার সদর আফিস ছিল, সেই সময় কালীকান্তের অভ্যুদয়। নাটোর ছোট তরফ রাজধানী, কাসিমপুরের চৌধুরি, মুক্তাগাছার জমিদার, ডিহি ছাতনীর জমিদার

প্রভৃতির মোক্তারি গ্রহণে, কালীকান্ত নাটোরে স্থায়ী ছিলেন। যে সময় নাটোর হইতে জেলার সদর আফিস রামপুর বোয়ালিয়াতে উঠিয়া যায়, সেই সময় কালীকান্তও নাটোর হইতে যাইয়া রামপুরবোয়ালিয়ায় স্থায়ী হন এবং একটা সুন্দর ও বিস্তৃত বাসভবন নির্মাণ করেন। মোক্তারী পদই কালীকান্তের উন্নতির মূল কারণ। সেকালে বড় বড় মোক্তার সদর নায়েব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেকালে একজন মোক্তার বা সদর নায়েবের যেরূপ আয়, ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল, এখন অনেক উকিলের সেরূপ আয় ও আধিপত্য নাই। বিশেষত সে সময় জমিদারির মূল্য অতি সুলভ ছিল এবং ভাল ভাল জমিদারি লাভেরও সহজ উপায় ছিল। অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা মোক্তারদের সে সময় জমিদারি ক্রয় করিবার অনেক সুবিধা ও সুযোগ ছিল। তথাপি জমিদারি লাভ জন্য কালীকান্ত কৌশল জাল বিস্তার করেন এবং কোন কোন স্থলে অধর্মাচরণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। মোক্তারি করিয়া কালীকান্ত অনেক অর্থ সঞ্চয়ও করিয়াছিলেন। সেই প্রচুর অর্থ ও কৌশল দ্বারা, কালীকান্ত বিস্তর ভাল ভাল জমিদারি ক্রয় করেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু তাহার প্রকৃতি সরল ছিল না। প্রতিভা গুণে তিনি প্রায় ৮০ হাজার টাকা লাভের ভূসম্পত্তি করেন। কিন্তু তাহার পুত্র নাই। এ বিস্তৃত জমিদারি ভোগ করে কে? পুত্র কামনায় তিনি দুই বিবাহ করিয়াও পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না। তাহার প্রথম বনিতার নাম কাশীশ্বরী এবং কনিষ্ঠার নাম মৃন্ময়ী[১৬]। কালীকান্তের কনিষ্ঠা বনিতা মৃন্ময়ী সর্বময়ী কর্ত্রী। ইনি বুদ্ধিমতী এবং ইহার আইন কানুনও কতক পরিমাণে জানা ছিল। মৃন্ময়ীর অমতে কালীকান্তের কোন কার্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

কালক্রমে কাশীকান্ত, তাহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলাকান্ত স্বর্গলোকে গমন করেন। কেবল তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রজনীকান্ত এবং কালীশঙ্করের একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র জীবিত রহিল। কালীকান্তের পুত্র না থাকায় তিনি রজনীকান্তকে সারদাকান্ত নামকরণে দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। এই দত্তক পুত্র গ্রহণের পর হইতে কালীকান্ত ও মৃন্ময়ী দেব্যা গিরীশকে অশ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালীকান্তের প্রথম বনিতা গিরীশকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। গিরীশ জানিতে পারিলেন যে তাহার জ্যেষ্ঠতাত সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন। তখন গিরীশ জ্যেষ্ঠতাতের নিকট সম্পত্তির অংশ চাহিলেন। লেখকের পিতা রঘুরাম চৌধুরি কালীকান্তের বন্ধু ছিলেন। তিনি কালীকান্তকে গিরীশের পক্ষ হইয়া অনেক অনুরোধ করিলেন যে গিরীশকে যাবতীয় ভূসম্পত্তির কিয়দংশ দেওয়া হউক। কালীকান্ত বন্ধুর অনুরোধও রক্ষা করিলেন না। কালীকান্ত মৃন্ময়ীর পরামর্শে বিস্তৃত জমিদারি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া গিরীশকে কিছুই দিলেন না। গিরীশ অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কখন শ্বশুরালয়ে, কখন কোন বন্ধুর আশ্রয়ে থাকিয়া গিরীশ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবের পরমার্শে জ্যেষ্ঠতাত কালীকান্তের নামে সম্পত্তির অংশ পাইবার আশয়ে গিরীশ আদালতের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহাও ঘটিল না। শেষে অর্থ ঋণ করিয়াও কোন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কোনপ্রকার সাহায্যে আদালত অবলম্বনে মাতার নামে বার্ষিক ৯০০্ টাকা মাসহারা মঞ্জুর হয়। এই সামান্য আয়ে মাতা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ সহ গিরীশ বহু কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।

ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। যাহার ধন নাই, যাহার শরীর রক্ষক নাই, যাহার বন্ধুবান্ধব নাই, তাহার ধনই ভগবান, তাহার রক্ষকই ভগবান, তাহার বন্ধুই ভগবান। রক্ষকহীন প্রাণী ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই।[১৭] পাঁচ জন একান্নভুক্ত থাকে; কেহ ক্ষমবান কেহ অক্ষম হয়। কেহ বেশি অর্থ উপার্জন করে, কেহ কম অর্থ উপার্জন করে। তথাপি একান্নবর্তিতা স্বার্থপরতাশূন্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্ধারিত করিয়াছেন। শাস্ত্র লঙ্ঘনেও মানবকে পাপ স্পর্শ করে। গিরীশ ধন হীন, নিরাশ্রয় ও রক্ষক হীন বলিয়া ভগবানের প্রিয় হইলেন এবং ভগবান স্বয়ং গিরীশকে বিপদ হইতে

উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। আবার কালীকান্তকে পাপ আশ্রয় করাতে তিনি ভগবানের দয়ার পাত্র রহিলেন না। এই আভ্যন্তরিক কার্য মানববুদ্ধির অগম্য। এই কার্যের গূঢ়ভাব মানব জানিতে পারিলে কখনই অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম মানবকে রক্ষা করে এবং অধর্মই মানবকে নষ্ট করে। ধর্মের স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় এবং অধর্ম বায়ু সংযোগে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু শীঘ্র নির্বাণ হইয়া যায়। সংসারে এই ভাব মানব সদাসর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে, তথাপি অন্ধের ন্যায় অধর্ম কার্যেই রত হয়। স্বার্থপরতায়, "আমি" "আমার" অভিমানে, ধন ও যশঃ লিপ্সায়, দ্বেষ ও হিংসায়, কালীকান্ত রাগান্ধ হইয়া গিরীশকে উপেক্ষা করেন। পাপীর বিধানকর্তাই ভগবান।

কালীকান্ত নিজ কর্ম ফলে জীবিত কাল পর্যন্ত প্রচুর সম্পত্তি অর্জন করিয়া, তাহার দত্তক পুত্র সারদাকান্তকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। যে অর্থ অর্জন করে, তাহার অদৃষ্টে অর্থ ভোগ প্রায় ঘটে না। কালীকান্ত সম্পত্তি অর্জন করিয়া যান বটে; কিন্তু সেই ধন বিশেষরূপে ভোগ বা সৎকার্যে ব্যয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। কালীকান্তের প্রথম পক্ষীয় বনিতা কাশীশ্বরী মাসোহারা গ্রহণে কাশীধামে বাস জন্য গমন করেন এবং তাহার দ্বিতীয় পক্ষীয় বনিতা মৃন্ময়ী ইহ সংসার ত্যাগ করেন। কালীকান্তের মৃত্যুর পর সারদাকান্ত তাহার পিতৃসম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু সারদাকান্ত সম্পত্তি বেশিদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর সময় তাহার পত্নীকে দত্তক পুত্র রাখিবার অনুমতি পত্র দিয়া তিনি পত্নীর হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ করেন। বিধবা পত্নীও পতির মৃত্যুর এক বৎসর মধ্যে পরলোক গমন করেন। সুতরাং সারদার বিধবা পত্নী দত্তক পুত্র রাখিতে পারেন নাই। সে সময়ে কালীকান্তের প্রথমপক্ষীয় বনিতা কাশীশ্বরী কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তখন এই বিধবা রমণী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। এ সময়ে এ রমণীর বয়স অনেক এবং সংসারেও বীতরাগ; আবার গিরীশকে পূর্ব হইতেই স্নেহ করিতেন। গিরীশেরও ভাগ্যপ্রসন্ন। সারদাকান্তের পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র গিরীশ কাশীধামে যাইয়া বৃদ্ধা রমণীকে বার্ষিক ৯০০ টাকা মাসহারা এবং তাহার আবশ্যকীয় যাবতীয় ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং তাহাকে বশীভূত করিলেন। সুতরাং গিরীশই কালীকান্তের প্রচুর স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

সারদার পত্নীর মৃত্যুর সময় হইতে গিরীশের রাজ্যভার গ্রহণকাল পর্যন্ত, জমিদারির কেহ কর্তা ছিল না। এমন সময় আমলাগণ সর্বময় কর্তা। যে যেখানে পারিল লুট আরম্ভ করিল। এই প্রকারে বহুমূল্য অস্থাবর সম্পত্তি প্রায়ই হস্তান্তরিত হইয়া যায়। সামান্য অস্থাবর সম্পত্তিই গিরীশের হস্তগত হয়। সুতরাং জমিদারির ভার গ্রহণ করিয়াই নানা ব্যয় জন্য গিরীশের অর্থের প্রয়োজন হইল। এই কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, গিরীশ ঋণ জালে জড়িত হন। কিন্তু গিরীশ স্কুল কালেজে রীতিমত শিক্ষিত না হইলেও, তাহার বিষয় বুদ্ধি প্রবল ছিল। নিজ বুদ্ধিবলে ও কৌশলে অল্পদিন মধ্যে ঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। গিরীশের দুর্দিনের কথা মনে ছিল এবং দুঃসময়ে সামান্য উপকার পাওয়াই যে দুর্লভ তাহা গিরীশ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যখন গিরীশের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া, তিনি সুদিনে পতিত হইলেন, তখন তাহার পরোপকার বৃত্তি নিতান্ত প্রবল হইল। গিরীশ নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও শরীর বা অর্থ দিয়া পরের উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার জীবনে তিনি অনেকের দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে উপকার করিয়াছেন। তাহার শরীরে পরোপকার বৃত্তিই যে কেবল প্রবল ছিল এমত নহে; তাহার নিঃস্বার্থতাও অনেক সময় প্রশংসনীয় ছিল। তাহার শরীরে অনেক গুণ ছিল। তিনি বিনয়ী, তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বার্থশূন্য এবং পরহিতে রত ছিলেন। তিনি প্রজাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কর আদায় করিতেন না। তিনি কাসিমপুরে নিজ ব্যয়ে একটি মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করিয়া

শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করেন এবং বিদেশীয় ছাত্রবৃন্দের আহার পরিচ্ছদ, পুস্তক, কাগজ কলমের মূল্য এবং দরিদ্র বালকদের স্কুলের বেতন নিজ সরকার হইতে দিতেন। এই বিদ্যালয়টি একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠ মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল ছিল। ইহা ব্যতীত বর্ষায় প্রপীড়িত দীন-দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থ বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে বিস্তর অর্থ দান করেন। এই সকল গুণে ভূষিত হইয়া গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি মহামান্য ছোট লাট স্যর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল সাহেব বাহাদুরের সময় "রায় বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত হন। তিনি যে কেবল ব্রিটিশ রাজ-সরকারে সম্মান লাভ করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন এমত নহে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেও তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। তিনি পাঁচটি কন্যাকে নিরাবিল, রোহিলা, ভূষণা প্রভৃতি কুলীন পাত্রে দান করিয়া সমাজেও তাহার পদমর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আবার কন্যাগুলির ভরণপোষণ জন্য উপযুক্ত জমিদারি দান করিয়াও সমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠ কুলীনে কন্যাদানে গিরীশ "স্পর্শমণি" পদ পাইয়া বারেন্দ্র সমাজে বিখ্যাত হন।

রায় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুর এক পুত্র রাখিয়া এবং পাঁচ কন্যার শ্রেষ্ঠ কুলীনে বিবাহ দিয়া পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ি পিতৃ জমিদারির ভারগ্রহণ করিলেন। পিতাকে অনুসরণ করিয়া তিনিও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে "রায়বাহাদুর" উপাধিতে সম্প্রতি সম্মানিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি পিতার নাম ও যশঃ গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তিনিও জনসাধারণের প্রশংসনীয় হইবেন।

বিশী বংশ

বিশী বংশের উৎপত্তি— নারায়ণভট্ট, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম, এই পঞ্চ মহাপুরুষের অধস্তন সন্তানেরা বরেন্দ্র ভূমে একশত গ্রামে বাসভবন নির্দেশ করেন। নারায়ণভট্ট শাণ্ডিল্য গোত্রিয়। আদি গাঞি ওঝা নারায়ণভট্টের পুত্র। ওঝা, উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র। উপাধ্যায় উপাধি বল্লাল সেন প্রদত্ত। নারায়ণ ভট্টের অধস্তন পুত্র তপোমণি। এই তপোমণির পুত্র সিন্ধুসাগর। সিন্ধুসাগরের পুত্র বিন্দুসাগর। আবার বিন্দুসাগরের দুই পুত্র, জয়সাগর ও মণিসাগর। জয়সাগর বরেন্দ্র ভূমে থাকিলেন এবং মণিসাগব বীরভূমে বাসভবন নির্দেশ করিলেন। জয়সাগরের চারিটি পুত্র— আদিমাধব, মৌনভট্ট, স্বর্ণরেখ ও পীতাম্বর। আদিমাধবের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর দুই পুত্র, বৎসাচার্য ও বল্লভাচার্য। বৎসাচার্যের অজ, প্রজ, মনু ও মার্তণ্ড নামে চারি পুত্র। প্রজের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কালিসা ওঝা কনিষ্ঠ। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে লিখিত আছে যে "এই কালিসা ওঝা হইতে বিশী গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে।" কিন্তু ঐ বিশী বংশীয় যাদববাবু বলেন যে, এই নারায়ণ ভট্ট ওঝার অধস্থ সন্তান জয়সাগরের বংশে পিপড়া ওঝা বিশী[১৮] জন্মগ্রহণ করেন। যাদববাবুর কথার উপর নির্ভর করিয়া পিপড়া ওঝা হইতে বিশী বংশের উৎপত্তি স্বীকার করা গেল। ব্রাহ্মণেরা জন্ম, সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা শ্রোত্রিয় শব্দে অভিহিত হইতেন। যাহারা কন্যা আদান প্রদানে অসাবধান তাহারাই কষ্টশ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের ৮৪ গাঞি কষ্টশ্রোত্রিয়[১৯], তন্মধ্যে শিহার, খর্জ্জুরী, বিশী প্রভৃতি আট গাঞি সাধ্য এবং অবশিষ্ট কষ্ট আখ্যা প্রাপ্ত হন। বিশী গাঞি যে প্রসিদ্ধ তাহা নিম্ন বচনে প্রমাণ হইবে ঃ—

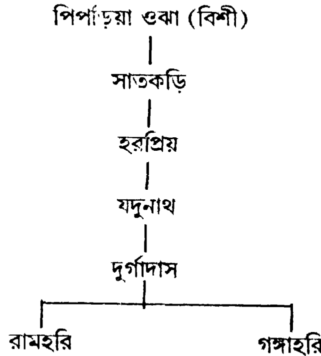
"বিশিষ্ট বিজ্ঞ বিদ্যাংস বৌদ্ধা বেদজ্ঞ ব্যাখ্যাতঃ।
সদ্বংশ সাধকাশ্চাষ্টৌবৈতেষু বিশী গাঞিন।।"

যাদব বিশীর নিকট হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পিপড়া ওঝা, ব্রহ্মচারী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন ; আবার বিশী গাঞি সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব বল্লাল সেন সাধকপ্রবর পিপড়া ওঝার নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া পিপড়া ওঝাকে বিশী গাঞি প্রদান করেন। তিনি ইহাও বলেন যে পিপড়া

ওঝা মোঘল সম্রাট আকবরের সভাপণ্ডিত ও হিন্দুদায়ভাগের বিচারক ছিলেন। যে ব্যক্তি বল্লাল সেনের সময় বর্তমান, সেই ব্যক্তি আকবর বাদসাহের সময়ও বর্তমান থাকা সম্ভব হয় না। ইতিহাসে ইহা জানা যাইবে যে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ; লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র মাধব সেন ও কেশব সেন। এই লক্ষ্মণ সেনের সময় ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা মুসলমান সম্রাটের অধিকৃত হয়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব পিপড়া ওঝার ৩/৪ শত বৎসর জীবিত থাকা অসম্ভব। এমতাবস্থায় পিপড়া ওঝাকে বল্লাল সেনের সময় বর্তমান থাকা অস্বীকার করিতে হয়। পিপড়া ওঝার কোন উর্ধতন পুরুষ বল্লাল সেনের যে দীক্ষাগুরু ছিলেন তাহারই বেশি সম্ভব। ইহা প্রতীতি হইবে যে কালিকা ওঝা বল্লাল সেনকে দীক্ষা দিয়া বিশী গাত্রি প্রাপ্ত হন এবং পিপড়া ওঝা আকবর বাদসাহের সভাপণ্ডিত হইয়া ভূসম্পত্তি লাভ করেন। যাদববাবুর মতে পিপড়া ওঝা আকবর বাদসাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বিশী বংশের জমিদারি লাভ— পিপড়িয়া ওঝা বিশী মোঘল সম্রাট আকবরের সভাপণ্ডিত এবং হিন্দু দায়ভাগের বিচারক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, বেদ, ষড়দর্শন, জ্যোতিষ ও তন্ত্রে ওঝা একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহার ধর্ম শাস্ত্রে এত অধিকার যে ইনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমে আগরায় ছিলেন। হরিবাটি গ্রাম দান করিয়া আকবর ওঝাকে পারইডিঙিতে স্থাপিত করেন। তদপর অতিথি সেবার্থে হুলীখালি গ্রাম, জিয়াসিন্ধ, মাঁদা, সিন্দূর-কুসুম্বি, কালীগাঁও ও তেগাছি প্রভৃতি পরগণা এবং অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ওঝাকে আকবর বাদসাহ দেন। এই বৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভের পর, পিপড়া ওঝা পারইডিঙিতে ইস্টক নির্মিত গৃহ ও দেবালয় নির্মাণ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্থাপিত করেন। জলাশয় খনন করিয়াও জলকষ্ট নিবারণ করেন। ইহার পর তিনি পরলোক গমন করেন। আগরা হইতে যে নীল প্রস্তর আকবর, ওঝাকে দেন তাহা আজিও হরিবাটির দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপিত আছে।

পিপড়িয়া ওঝার অধস্তন সন্তান— পিপড়িয়া ওঝা বিশী হইতে ষষ্ঠ পুরুষ পর্যন্ত বিশী বংশাবলী নিম্নে দেওয়া গেল :—



যে সময় রামহরি ও গঙ্গাহরি পারইডিঙিতে বাস করেন, সেই সময় বড়ল নদীর নিকট চাঁপলিয়ায় একটি ফৌজদাবি আদালত ছিল। দিল্লির সম্রাটের অনুগ্রহে গঙ্গাহরি সেই ফৌজদারি আদালতের প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হয়। বড়ল নদীর তীরে জোয়াড়ী এবং চাঁপিলা জোয়াড়ীর অতি নিকট। চাঁপিলা থাকা সময় গঙ্গাহরি জোয়াড়ীর মজুমদার বংশীয় একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। গঙ্গাহরির শ্বশুরের পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং শ্বশুরের যাবতীয় সম্পত্তি গঙ্গাহরি প্রাপ্ত হন। কিন্তু গঙ্গাহরির মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী সন্তানগণসহ পারইডিঙির বাটিতে যান। রামহরি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাহরির সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন। সুতরাং গঙ্গাহরির

বিধবা পত্নী সন্তানগণসহ জোয়াড়ী ফিরিয়া আসিয়া পিতৃ সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া রহিলেন। এদিকে পারইডিঙিতে রামহরি পৈতৃক সম্পত্তির ষোল আনার অধিকারী হইয়া বসিলেন। অল্পদিন মধ্যেই রামহরি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিলেন। এমন সময়ে নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। যে সময়ে রঘুনন্দন মুরশিদাবাদে আধিপত্য বিস্তার করেন। এবং বিস্তৃত রাজ্য লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে রঘুনন্দন রামহরির যাবতীয় সম্পত্তির প্রতি লোভ করেন। ইহা কথিত আছে যে রামহরি বিশীর নিকট হইতে রঘুনন্দন যাবতীয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া পারইডিঙি, হুগলিখালি ও হরিবাটি এই তিন গ্রাম তাহাকে ছাড়িয়া দেন। এদিকে গঙ্গাহরির বিধবা পত্নী সন্তানসহ জোয়াড়ী গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

জোয়াড়ীর বিশী বংশ—গঙ্গহরি বিশীর অধস্তন সন্তানগণ লইয়াই জোয়াড়ীর বিশী বংশ। গঙ্গাহরির পুত্র রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ। আবার উদয়নারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ। এই দর্পনারায়ণের দুই পুত্র, হরিপ্রসাদ ও বলরাম। গঙ্গাহরি হইতে দর্পনারায়ণ পর্যন্ত বিশী বংশের অবস্থা ভাল ছিল না। হরিপ্রসাদ ও বলরাম হইতেই বিশী বংশ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু দর্পনারায়ণের সময় হইতেই জমিদারি বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। একদা বড়ল নদী দিয়া সাঁতুলের কোন রাণী[২০] বহুতর নৌকা ও লোকজনসহ জোয়াড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ঝড় বৃষ্টি নিবন্ধন নৌকা আদি জোয়াড়ীর ঘাটে লাগাইয়া রাণী বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে দিবস দ্বাদশীর পারণ। দর্পনারায়ণও ঘাটে উপস্থিত। রাণী ব্রাহ্মণ দেখিয়া দ্বাদশীর পারণ জন্য ফল-মূলাদির প্রয়াস করিলেন। দর্পনারায়ণ বিশেষ যত্ন করিয়া রাণীকে নিজ বাটিতে লইয়া গেলেন এবং দ্বাদশীর পারণ ও তদপর হবিষ্যান্নাদিসহ আহার অতিভক্তির সহিত সম্পন্ন করাইলেন। রাণী, দর্পনারায়ণের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কিছু জমিদারি দিতে চাহিলেন। দর্পনারায়ণের আকাঙক্ষা সামান্য ছিল। জোয়াড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, সেই বিল এবং বাড়ির নিকটবর্তী যে কয়েকঘর শূদ্রের বসতি আছে, তাহা দর্পনারায়ণের অধিকারের ছিল না। দর্পনারায়ণ তাহাই যাজ্রা করিলেন। রাণীও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই দিয়া যান। শূদ্র কয়েক ঘর যে স্থানে বাস করিতেছিল তাহা দর্পনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে গৃহীত হইল। সেই হইতে সে স্থানের নাম চক-ভবানী বলিয়া এখনও চলিয়া আসিতেছে। সেই চক-ভবানীর শূদ্রেরা এখনও বিশী বংশের খানসামা, গোমস্তা প্রভৃতির কার্য-নির্বাহ করিয়া থাকে।

দর্পনারায়ণের সন্তান সন্ততি— দর্পনারায়ণের তিন পুত্র ভবানী, হরিপ্রসাদ ও বলরাম। পিতা বর্তমানেই ভবানী গত। পিতার মৃত্যুর পর হরিপ্রসাদ ও বলরাম পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারী হইলেন। নাটোর রাজবংশের জমিদারি নাশের সময় হরিপ্রসাদ ও বলরাম দুই ভ্রাতা পরগণে সোনাবাজু ৩২০০০ টাকা মুল্যে নিলামে ক্রয় করেন। সোনাবাজু পরগণা এখন পাবনা জেলার অন্তর্গত। ইহা একটি বৃহৎ ও বিস্তৃত জমিদারি। আজকাল ইহার মূল্য ৩২ লক্ষ বলিলেও বলা যায়। হরিপ্রসাদ ও বলরাম সুলভমূল্যে এই জমিদারি ক্রয় করেন। নিলাম স্থির থাকিবে কিনা সন্দেহস্থলে, ঐ জমিদাবির ।০ আনা অংশ দুই ভ্রাতা রাখিয়া অবশিষ্ট ৸০ আনা অংশ তাঁতিবন্দ, হরিপুর ও দুলাইয়ের জমিদারগণ নিকট বিক্রয় করেন। এই দর্পনায়ারণ হইতে বিশী বংশের বিস্তার হইতে লাগিল। হরিপ্রসাদ বড় তরফ এবং বলরাম ছোট তরফ হইয়া দুই পৃথক শাখা বিশী বংশে গঠিত হইল।

বড় তরফ—দর্পনারায়ণ বিশীর তিন পুত্র. ভবানী, হরিপ্রসাদ ও বলরাম। ভবানী অল্প বয়সে অপুত্রক পরলোক গমন করেন। সুতরাং হরিপ্রসাদ হইতে বড় তরফ এবং বলরাম হইতে ছোট তরফ গঠিত হইল। হরিপ্রসাদের চারি পুত্র— শিবনাথ, হারু, রামধন এবং বুধরাম। সর্ব কনিষ্ঠ বুধরাম নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ শিবনাথের বংশ বহু বিস্তৃত হয়। হরিপ্রসাদের বংশাবলী সন্নিবেশিত হইল। হরিপ্রসাদের অধস্তন সন্তানেরা বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধন, সম্পত্তি,

মান, মর্যাদা নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে বৃদ্ধি করেন। এই বংশে বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চারও প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা ব্যতীত বিশী বংশে সমাজের পদমর্যাদা নিতান্ত কম নহে। নিরাবিল ও ভূষণা পঠীর কুলীন বংশে এবং রাজা ও বড় বড় সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে কন্যা দানে দর্পনারায়ণের অধস্তন সন্তানদের সমাজের পদ গৌরব আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বড় তরফের কেহ মুনসেফ, কেহ রাজার দেওয়ান, এইরূপ সম্ভ্রান্ত চাকুরিও করিয়াছেন। এই বংশে অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

হরিপ্রসাদ সংস্কৃতে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার ধর্ম শাস্ত্রে ও জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনাথও পিতার ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতি এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ইহার বিষয় বুদ্ধি পিতা অপেক্ষা বেশি ছিল। ইহার সময় অনেক জমিদারি লাভ হয়। শিবনাথের এক কন্যা মহামায়া দেবীর সহিত নওগাঁও নিবাসী শ্রেষ্ঠ কুলীন প্যারীমোহন সান্যালের পিতার এবং অপর কন্যার সহিত ইটালী নিবাসী কুলীন গিরীশচন্দ্র মৈত্রের বিবাহ হয়[২১]। শিবনাথ মহামায়াকে ছোট গোবিন্দপুর কোঙরদহ প্রভৃতি বার্ষিক এক হাজার টাকা লাভের জমিদারি এবং অপর কন্যাকে বার্ষিক তিনশত টাকার লাভের জমিদারি দেন। শিবনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুনাথ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া চাকুরির চেষ্টা করেন। তিনি ওয়াটসন কোম্পানির শাতকুঠির মেনেজর ছিলেন এবং নাটোর রাজ সরকারে কিছুদিন দেওয়ানি পদে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপ চাকুরি করিয়া তিনি ধনসঞ্চয় করেন এবং সঞ্চিত ধন দ্বারা ভূসম্পত্তিও ক্রয় করেন। ইনি নিজ গ্রামের উন্নতি জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। ইহার ব্যয়ে ও যত্নে গ্রামের অনেক রাস্তা প্রস্তুত হয়। শিবনাথের দ্বিতীয় পুত্র কালীপ্রসাদ। ইহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ইহার কন্যা গৌরমণি দেবীকে কাসিমপুর নিবাসী শ্রেষ্ঠ কাপ ও জমিদার আনন্দনাথ চৌধুরি বিবাহ করিয়া বার্ষিক ছয়শত টাকার সম্পত্তি পান। শিবনাথের কনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র কাশীনাথের কন্যা সুধাময়ী দেবীকে খাজুরা নিবাসী নিরাবিল পঠীর কুলীন এবং জমিদার ভোলানাথ খাঁ বিবাহ করিয়া বামন গ্রাম প্রভৃতি বার্ষিক এক হাজার টাকা লাভের ভূসম্পত্তি পান।

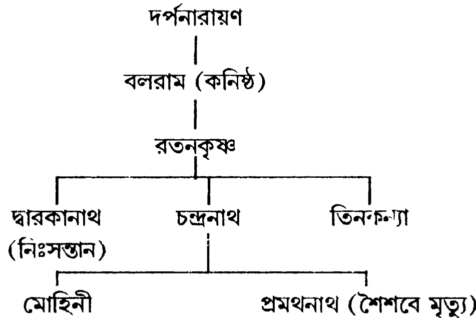
শম্ভুনাথের তিন পুত্র, জয়নাথ, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। সর্ব কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। মহেশচন্দ্রের কন্যা কুমুদমণির বলিহার কুলীন রাজবংশে বিবাহ হয়। শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ইহার রচনাশক্তি ছিল। ইনি বাংলা ভাষায় দেবী-যুদ্ধ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করেন। ইনি অনেক দেশ ও তীর্থ পর্যটন করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইনি চাকুরির অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি লাভ করেন। জয়নাথের তিন পুত্র, যদুনাথ, যাদবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র। যদুনাথ বাংলা ও সংস্কৃতে শিক্ষিত হন। ইহার স্বভাব অতি ধীর ছিল। ইনি পাণিগ্রহণের পূর্বেই পরলোক গমন করেন। মাধবচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান ছিল না; কেবল তাহার দুই কন্যা, হেমলতা ও বনলতা। রামগোপালপুরের রায় যোগেন্দ্রকিশোর চৌধুরি বাহাদুরের পুত্রের সহিত হেমলতা দেবীর এবং সুসঙ্গের রাজা নীরদকৃষ্ণ সিংহের সহিত বনলতা দেবীর বিবাহ হয়। যাদবচন্দ্র দেশ হিতৈষী। ছোট তরফের বলরামের পৌত্র চন্দ্রনাথের নিজ পুত্র মোহিনীকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হন। মোহিনী জোয়াড়ির অনেকের নিকট সাহায্য না পাইয়া যাদবের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু যাদব বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির সাহায্যে মোহিনীনাথের সম্পত্তি উদ্ধার করেন। যাদব সাহায্য না করিলে মোহিনীকে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। শরিক তরফের এরূপ নিঃস্বার্থ সাহায্য নিতান্ত প্রশংসনীয়। বিজয়গোবিন্দর সহিত লেখকের বিশেষ পরিচয় ছিল। বিজয়গোবিন্দ উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। যাদব বিজয়ের আন্তরিক সাহায্য পাইয়াই মোহিনীর উপকার করিতে পারিয়াছিলেন। যাদব অধিকাংশ কাল শহরে থাকিয়া সাধারণ হিতকর কার্যে যোগদান করেন এবং

নিজ গ্রামের উন্নতি চেষ্টা করেন। তাহারই যত্নে একটি চিকিৎসালয় জোয়াড়িতে স্থাপিত হইয়াছে। জেলার বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্নবান আছেন।

হারুর পুত্র রঘুনাথ বিষয় কার্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। নিজ যত্ন ও চেষ্টায় তিনি অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি অনেক ব্যয়ে মহাভারত ও রামায়ণ পুরাণ পাঠ করান। ইহার পৌত্রী সৌদামিণীকে চৌগ্রামের রাজা রোহিণীকান্ত রায় বিবাহ করেন। রোহিনীকান্ত রায় শ্রেষ্ঠ কুলীন।

রামধনের পুত্র কৃষ্ণধন বিশীর কন্যা সখীসুন্দরীর সহিত ইটালী নিবাসী কুলীন ঈশানচন্দ্র মৈত্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহে ঈশান ইটালী প্রভৃতি বার্ষিক সাত শত টাকা লাভের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র কেশবনাথ লেখকের সমপাঠী ছিলেন। যে সময় রাজসাহী জেলা স্কুলে কেশব অধ্যয়ন করেন, সেই সময় রাজসাহীর জজ লুই জ্যাক্‌সনের সহিত কেশবের পরিচয় হয়। তদপর লুইস জ্যাক্‌সন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন এবং মুনসেফের পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার ভার তাহারই উপর অর্পিত হয়। এদিকে কেশবনাথ বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লুইস জ্যাক্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেশবকে সুপণ্ডিত, সুধীর এবং সদ্বংশজাত জানিয়া লুইস জ্যাকসন তাহাকে মুনসফের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পদে অল্প দিন নিযুক্ত থাকিয়া, কেশব পরলোক গমন করেন।

ছোট তরফ— দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র বলরাম হইতে ছোট তরফ গঠিত হয়। এই তরফের বংশাবলী নিম্নে লেখা গেল ঃ—



বলরাম বিশী নাটোর রাজ সরকারে দেওয়ান ছিলেন। এই দেওয়ানি সময়ে বিস্তর ধন সঞ্চয় করেন; কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সৎকার্য নির্বাহ জন্য প্রবৃত্ত হইয়া কার্য শেষ করিবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। একটি শিবমন্দির নির্মাণ আরম্ভ করিয়া এবং নিজ কন্যা জয়সুন্দরী দেবীর বিবাহের সম্বন্ধ নিরাবিল পঠীর কুলীন তাহিরপুরের রাজা বীরেশ্বর রায়ের সহিত স্থির করিয়া, তিনি পরলোক গমন করেন। এই দুইটি কার্য তাহার পুত্র রতনকৃষ্ণ সম্পন্ন করিয়া পিতার সঙ্কল্প স্থির রাখেন।

রতনকৃষ্ণের দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। সুতরাং কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ পিতৃ জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হন। রতনকৃষ্ণ কন্যাদের নিরাবিল পঠীর কুলীনে বিবাহ দিয়া সমাজ গৌরব স্থির রাখেন।

চন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী এক পুত্র মোহিনীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা পত্নীর বাধ্য হন! এই পত্নীর গর্ভে প্রমথনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই প্রমথনাথের মৃত্যু হয়। মোহিনীকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া উইল দ্বারা কনিষ্ঠা

পত্নী মৃন্ময়ীকে চন্দ্রনাথ যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিতে ইচ্ছুক হন। যাদব বিশী ও বিজয় গোবিন্দ চৌধুরির বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় উইল পরিবর্তন করাইয়া মোহিনী বিশী পিতৃ জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হন। মোহিনী অতি সুধীর ও বিজ্ঞ। ইহার স্বভাব নিতান্ত প্রশংসনীয়। চন্দ্রনাথের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মুক্তাগাছার অমৃতলাল আচার্যের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আচার্যের এবং কনিষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁতিবন্দের জমিদার অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরির পুত্রের বিবাহ হয়। এই দুই কন্যাকে চন্দ্রনাথ বার্ষিক বার শত টাকা লাভের সম্পত্তি দিয়া যান। এই ছোট তরফের জমিদার একা মোহিনী বিশী থাকায়, বর্তমানে ছোট তরফের জমিদারি অধিক।

বলিহার রাজবংশ

নারায়ণ ভট্ট, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র ভূমের একশত গ্রাম বাস করেন। বাৎস্য গোত্রীয় ঐ ধরাধরের প্রপৌত্র বেদান্তাচার্য। বেদান্তাচার্যের পুত্র হরিহর ও লক্ষ্মীধর। লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্ধমান। কুলজ্ঞ গ্রন্থে বর্তমান বলিহারকে কুড়মইল বলে। এই কুড়মইল গ্রামে হরিহর ও লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্ধমান বাস করিত। তদপর বর্ধমান পৈতৃক সঞ্জামিনী গ্রামে বাস করেন। লক্ষ্মীধরের অধস্তন সন্তান অনন্ত ও রামনাথ অনন্তের বংশধরেরা বলিহার রাজবংশ এবং রামনাথের বংশধরেরা রঙ্পুর জেলার অন্তর্গত দিনহাটার রায়চৌধুরী বংশ বলিয়া খ্যাত।[২২] অনন্তের প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র, কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম। কৃষ্ণদেব রঙ্পুরের অন্তর্গত বাহিরবন্দর পরগণার জমিদার রাণী সত্যবতীর ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধে প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর[২৩] প্রধান কার্যকারক হইয়া যথেষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; রঙ্পুরের অন্তর্গত ভিতরবন্দর পরগণাও সত্যবতীর জমিদারি ছিল। ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৌশল জাল বিস্তার করিয়া প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম ভিতর-বন্দর পরগণা অধিকার করিলেন। এই ভিতরবন্দর পরগণার দুইজন অধিকারী হইলেন। রামরাম জ্যেষ্ঠ ও প্রাণকৃষ্ণ কনিষ্ঠ। রামরামের বংশধরেরা ।।১৫ আনা এবং প্রাণকৃষ্ণের বংশধরেরা ।৵৫ আনা জমিদারি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে রামরামের অন্যতর জ্ঞাতি কৃষ্ণগোবিন্দ সান্যাল রামরামের জমিদারির অধিকারী হইয়াছিলেন। শিকাই সান্যালের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র কৃষ্ণগোবিন্দ সান্যাল। এই কৃষ্ণগোবিন্দই দিনহাটার রায়চৌধুরী বংশ এবং প্রাণকৃষ্ণের বংশ বলিহার রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দিনহাটা জেলা রঙ্পুরের এবং বলিহার (কুড়মইল) জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত। বলিহার রাজবংশ আমাদের আলোচ্য।

প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র রাজেন্দ্র রায় নাটোর বংশীয় মহারাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্র রায় পৌত্র কৃষ্ণেন্দ্র রায়, এই বংশে বিখ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র রায় নিরাবিল পঠীর কুলীন। ইনি কুলে, ধনে এবং সম্মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিকে ইনি ধনী ও কুলীন এবং অন্যদিকে ইনি একজন গ্রন্থকার। রাজসাহী জেলার রাজাদের মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রই কেবল গ্রন্থ রচনায় জীবন ক্ষেপন করিয়াছিলেন। অতএব একবার রাজাদের শ্রেণি এবং আর একবার গ্রন্থকারদের শ্রেণিতে তাহার জীবনের আলোচনা করা উচিত হইবে। প্রথমে রাজার শ্রেণিতে তাহার জীবনের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কৃষ্ণেন্দ্র শিবপ্রসাদ রায়ের দত্তক পুত্র। বাল্যকালেই পিতা স্বর্গারোহন করেন। অতএব বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত তিনি বিপদে পতিত হন। এই বিপদ নিবন্ধনই তিনি রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন না ; কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার হন। যৌবনকালে সংসারে প্রবেশ করিয়া, তিনি রাজকার্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি "সনাতন আর্যধর্মে আশৈশব নিষ্ঠাবান" ও বিশ্বাসী থাকিলেও তাহার যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় "তাহার চরিত্রভ্রংশ সামান্যই ঘটিয়াছিল।"[২৪] গ্রন্থকারের স্বভাব চরিত্র ও মনোবৃত্তির অনেক

পরিমাণে তাহার প্রণীত নিজ গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণেন্দ্র রায় 'স্বভাবনীতি' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি যৌবনকালে যে সামান্য অসাবধান হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থে 'প্রাচীন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতেই পাওয়া যায়। কৃষ্ণেন্দ্র বলিতেছেন, "প্রাচীন! এখন আর বৃথা রোদন করিয়া বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতেছ কেন? পূর্বে বিবেচনা না করিয়াই ত, অধুনা এতাদৃশ দুর্গতি লাভ করিলে।" যদি কৃষ্ণেন্দ্র যৌবনকালে চরিত্রে সামান্য স্খলিত হইয়া থাকেন, তাহা তাহার এই অনুতাপকেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণেন্দ্র বিনয়ী, সরল ও সত্য-নিষ্ঠ ছিলেন। তাহার শিষ্টাচারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা তিনি কলিকাতার কতিপয় ভদ্রলোকদের নিজ ভবনে আহার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সে সময়ে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন। রাজা হইয়া স্বয়ং নীচ পদবী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করা তাহার অমাত্যবর্গ অনুমোদন না করিলেও, তিনি স্বয়ং উৎসাহের সহিত সেই কার্য নির্বাহ করেন। ইহাতে রাজার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি প্রজা, কি ভিক্ষুক সকলকেই তিনি মিষ্ট আলাপে এবং বিনয়-নম্র বচনে বশীভূত করিতেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া দ্বারে ধনী, দরিদ্র, ভিক্ষুক, প্রজা কেহ উপস্থিত হইলে দ্বারবানের বাধা দিবার অধিকার ছিল না। প্রজারা তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তিনিও প্রজা ও অমাত্যদের পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ইহার বদান্যতা ও ক্ষমাশীলতা নিতান্ত প্রশংসনীয় ছিল। ইনি কাহার সহিত কলহ বা মোকর্দমা করিতে ভাল বাসিতেন না। ইহার গৃহ ও ফল পুষ্পের উদ্যান নিতান্ত পরিষ্কার ছিল। কোন দ্রব্যকে সুন্দর গঠনে আনিতে ইহার বিশেষ ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছিল। তাহার গোলাপ ফুলের উদ্যানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে, তাপিত হৃদয়ও শীতল হয়।

তিনি একটি বালিকাকে ভালবাসিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং সীতা চরিতের "গ্রন্থ সূচনায়" লিখিয়া গিয়াছেন। বালিকার সুখ সম্পাদনে তাহার একান্ত বাসনা ছিল।[২৫] সেই বালিকাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়া এবং নিজ দত্তক পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি "ভগবানের উপরই সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ নির্ভর" করিয়া গিয়াছেন। আবার বার্ধক্যের ভালাবাসাকেই সংসারের নরক যন্ত্রণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই ভালবাসাই প্রথমে তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; আবার পরিণত বয়সে সেই ভালবাসাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিয়া গিয়াছেন। এই ভালবাসাই যৌবনে তাহার সুখ এবং বার্ধক্যে দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহার প্রণীত স্বভাব-নীতির "প্রাচীন" শীর্ষক নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে ইহা প্রতীতি হইবে যে ভালবাসা সংসারে নরক-যন্ত্রণার প্রধান কারণ।

কৃষ্ণেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণকুলে এবং রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাহার মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তিনি আপনাকে বড় জ্ঞানে দরিদ্র বা নীচ বংশ সম্ভূত মানবকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিতেন না। তাহার প্রণীত "স্বভাব নীতি" হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে তাহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। "অথচ রঘুকুলতিলক রঘুপতি রামচন্দ্রও নাই, আর যদুপতি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও নাই, সংসারের এবম্বিধ নশ্বরত্ব দেখিয়াও ধন অথবা পদ-মদ-গর্বে স্ফীত হইয়া সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যে কতদূর নীচাশয়তা তাহা দূরদর্শীরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। ভগবান যাহাকে কৃপা করিয়াছেন, তাহাকে সকলেইত বড় বলিয়া জানেন। তথাপি 'আমি বড়, আমি বড়', বলিয়া চীৎকারে লাভ কি?" তিনি বিলক্ষণ জানিতেন ধন ও পদ গৌরব চিরস্থায়ী নহে। তিনি কখনই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব অবলম্বন করিয়া নীচ ব্যক্তিকেও "তুমি" ও "তুই" শব্দ ব্যবহার করিয়া কাহারো মনে অযথা ব্যথা দিতেন না। দুঃখীর প্রতি সর্বদা তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাহার হৃদয় উদার ও প্রশস্ত ছিল। তিনি মহৎ এবং তাহার শরীরে মহত্ত্বের চিহ্নও বিস্তর ছিল। দুঃখীর দুঃখে তিনি যথার্থই ক্রন্দন করিতেন।[২৬]

এইরূপ নান গুণে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্র রায় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি প্রজা, কি সাহেব, কি বাঙালি সকলেরই নিকট প্রিয় হন এবং নিজ জমিদারি শাসনে সকলের নিকট যশস্বী হন। তাহার চরিত্র, দান, সর্বজন হিতকর কার্য ও প্রজারঞ্জনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া রাজোপাধি দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন।

রাজসাহী জেলা মধ্যে যত রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় মৃগয়াকার্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মৃগয়া কার্যে এরূপ পারদর্শী ও নির্ভয়চিত্ত ছিলেন যে তাহার জীবনে বিস্তর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও সিংহকে বধ করিয়া নিজ নাম ও যশঃ বহুদূর বিস্তার করিয়াছিল। তাহার লক্ষ্য কদাচিৎ ব্যর্থ হইত। তিনি হস্তী পৃষ্ঠ হইতে নীচে নামিয়াও ব্যাঘ্র শিকার করিতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। অনেক সাহেব তাহার মৃগয়া-পটুতাকে বিলক্ষণ প্রশংসা করিতেন।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের দান ও পরহিতকর কার্য প্রশংসনীয়। তিনি দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনে সতত যত্নবান ছিলেন। ক্ষুধার্তকে অন্ন, এবং তৃষ্ণার্তকে জল দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। তাহার বাটিতে অতিথি বা কোন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলে, তাহাদের আহার ও অভ্যর্থনার ত্রুটি হইত না। দেবার্চনায় বিশেষত রথ যাত্রায় তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। প্রজাপুঞ্জের শিক্ষা জন্য নিজ বলিহারে একটি মধ্যশ্রেণি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণ গ্রন্থকারদের শ্রেণিতে তাহার জীবনের আলোচনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বাল্যকালে সুপ্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা পান নাই। ইনি দেশীয় পাঠশালা ভিন্ন কোন উচ্চতম বিদ্যালয়ে শিক্ষা পান নাই। কিন্তু তাহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নগুণে, তিনি অবকাশমত নানাবিধ বাংলা পুস্তক এবং বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। তিনি অধ্যয়নে নিতান্ত নিপুণ হন। এইরূপ অধ্যয়নে তিনি শেষকালে বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আবার সংস্কৃতেও তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। বঙ্গ ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিলে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় ইহার লেখনী ধাবিত হয়। তিনি গদ্যে "এখন আসি" ও "স্বভাব নীতি" এবং পদ্যে "সীতাচরিত" ও "সুখভ্রম", রচনা করেন। তাহার রচনায় ভাষাগত দোষ থাকিলেও ভাবের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অনেক প্রবন্ধে তাহার হৃদয়ের সরল ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মোটের উপর বলিতে গেলে রাজার গ্রন্থে দোষ থাকিলেও গুণও বিস্তর আছে। তাহার গ্রন্থ পাঠে ইহা প্রতীতি হইবে যে অনেক স্থলে সুন্দর ভাব তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে এবং শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় দিয়াছে। আমরা তাহাকে শিল্পী ও কবি বলিব। রাজা হইয়া শিল্প ও কবি হওয়া আশ্চর্যের বিষয়,[২৭] যেহেতু বঙ্গের রাজা সাধারণত অলস ও বিলাস-পরায়ণ। ইহার সংগীত রচনাও প্রশংসনীয়। ইহার সংগীত শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি ছিল।

তিনি পরিণত বয়সে বৎসরাধিক হইল স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাহার দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

মুসলমান জমিদারগণ

মুসলমান জমিদারের সংখ্যা নিতান্ত কম। কেহ ফকির বা সাধক ও শিক্ষক হইয়া কেহ বা কোম্পানির প্রথম আমলে আফিসে প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়া জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নাটোরে মুসলমান জমিদার— নাটোরে রাজবংশের ধ্বংসকালে এবং কোম্পানির রাজত্বের প্রথম আমলে যখন চুরি ডাকাইতিতে প্রজারা প্রপীড়িত এবং কোম্পানির আমলারা জেলার সর্বময় কর্তা এবং জেলার কলেক্টর আমলাদের দ্বারা চালিত, সেই সময় আমলারা দুই হাতে দেশের ধন লুঠিতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেক আমলাই প্রচুর ধন সঞ্চয় করিল। নাটোরের ফৌজদারির নাজির মহম্মদ জামান খাঁ এই শ্রেণির আমলা ছিলেন।[২৮] জামান খাঁ বর্ধমান জেলার

অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রচুর সঞ্চিত ধন সম্পত্তি তাহার পুত্র চৌধুরি দোস্ত মহম্মদ খাঁকে দিয়া পরলোক গমন করেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ঐ প্রচুর অর্থ দ্বারা রাজসাহী জেলায় কলম, পিপুরুল, খোলাবাড়িয়া প্রভৃতি বৃহৎ জমিদারি ক্রয় করেন। তিনি মিতব্যয়ী ও বিনয়ী ছিলেন। দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলী খাঁ কোরাণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। মহম্মদ আলীর পুত্র রসীদ মিঞা পিতৃ জমিদারিতে অধিকারী হইয়া কিছুদিন পরে পরলোক গমন করেন। রসীদ মিঞার পুত্র নূর মিঞা নিতান্ত অমিতব্যয়ী এবং কুসংসর্গে চরিত্র দূষিত করেন। তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া সকলের অপ্রিয় হন। তাহার সময়েই ঋণের জন্য প্রায় সমস্ত জমিদারি হস্তান্তরিত হয়।

বাঘার জায়গির— ইহা বহুদিনের জায়গির। এই জায়গির দুই সনন্দে সংগৃহীত। ইহার দুই অংশ। এক অংশ শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গির প্রদত্ত এবং দ্বিতীয় অংশ শাহজাহানের প্রদত্ত। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান পিতার প্রদত্ত সনন্দ অনুমোদন করেন। এই সনন্দ বলে মৌলনা সেখ আবদুল ওয়াহেব ৪২ গ্রাম "জায়গির" বা "মদৎমাস" স্বরূপ দখল করেন। এই ৪২ খানি গ্রামের বার্ষিক আয় সকলে বলিত ৮০০০ টাকা। কিন্তু কালেক্টর সাহেব বলিতেন উহার বার্ষিক আয় ৩০,০০০ টাকা। মৌলনা পণ্ডিতের উচ্চ উপাধি। আবদুল ওয়াহেব এই জায়গির প্রাপ্ত হইয়া, ঐ মৌলনা উপাধি প্রাপ্ত হন। নিজের, ভ্রাতার, সন্তানের, চাকর ও অনুচরের ভরণ পোষণ জন্য যে ভূমি নিষ্কর দেওয়া যায় তাহাকে মদৎমাস বলে। শিক্ষার উৎসাহ জন্য শিক্ষক মৌলনা আবদুল ওয়াহেবকে এই জায়গির প্রদত্ত হয়। সেখ আবদুল ওয়াহেবের অধস্তন পুরুষেরা খোন্দকার নাম ধারণ করেন। আকহুন শিক্ষককে বুঝায়, ইহার অপভ্রংশ খোন্দকার। নিম্নলিখিত চারিটি উদ্দেশ্যে জায়গির প্রদত্ত হয় ঃ—

(১) খোন্দকার বংশের ভরণপোষণ।
(২) সর্বসাধারণের ঈশ্বরোপাসনা।
(৩) দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তির প্রতি আতিথ্য।
(৪) পারস্য ও আরব্য ভাষায় শিক্ষার উন্নতি।

বাঘায় যে মসজিদ নির্মাণ হয়, তাহাকে সাধক, ফকির ও অন্যান্য মুসলমানের দিবা রাত্রিতে পাঁচবার নমাজ করিবার অধিকার আছে। জায়গিরের অর্থ দ্বারা এই মসজিদ নির্মাণ হয় এবং জীর্ণ সংস্কার হইয়া থাকে।

এই স্টেটের কার্য নির্বাহ জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। খোন্দকার বংশীয়দের মধ্যে যিনি "রইস" অর্থাৎ মুসলমান সমাজের প্রধান, তাহারই হস্তে স্টেটের ভার অর্পিত হয়।

ইহা কথিত আছে যে এই খোন্দকার বংশের মধ্যে দুই ভ্রাতা পরস্পর শত্রুতা করিয়া বিবাদ উপস্থিত করেন। এই কারণে এই বংশের পূব সম্মানের ক্ষতি হয়। আডাম সাহেবের নিকট মুসাফরউল ইসলাম নামে এক খোন্দকার প্রকাশ করেন যে শত্রুতা বশতঃ জায়গিরের এক অংশ মোঘল সম্রাটের অধীন বাংলার এক সুবাদার বাজিয়াপ্ত করিয়া ৮৭২ টাকা কর নির্ধারিত করেন। বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের নিকট আডাম সাহেব জ্ঞাত হন যে ১৮১৯ সালের দুই আইনের বিধান অনুসারে জায়গির স্থির থাকেন।[২৯]

আডাম সাহেবের সময় বাঘা মাদ্রাসাতে, পারস্য শিক্ষার জন্য ৪৮ জন ছাত্র এবং আরব্য ভাষা শিক্ষার জন্য ৭ জন ছাত্র ছিল। পারস্য ভাষা পড়ান জন্য শিক্ষকের মাসিক বেতন ৮ টাকা এবং আরব্য ভাষা পড়ান জন্য মৌলবির বেতন ৪০ টাকা ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ আহার, পরিধেয় বস্ত্র, পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি সমুদয় ব্যয় জায়গির স্টেট হইতে পাইতেন। আডাম সাহেব বলেন "মাদ্রাসা সুনিয়মে রক্ষিত হয় না এবং শিক্ষা নিতান্ত জঘন্য।"[৩০]

তারাটিয়ার মুসলমান জমিদার—বর্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সাহাগোলা গ্রামে[৩১] গোল মহম্মদ নামে জনৈক মুসলমান বাস করিতেন। ইহা কথিত আছে যে কোন এক মোঘল সম্রাটের সময় পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া সাহাগোলা গ্রামে গোল মহাম্মদ বাস করেন। ইহার পাঁচ পুত্র— সেখ কবুল, সেখ হাজী, সেখ পিয়ার, সেখ ফাজিল, সেখ তাজ। এই পঞ্চভ্রাতার মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সেখ তাজ পশ্চিম দেশে বাস ভবন নির্দেশ করেন। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা সাহাগোলাই থাকেন। সেখ কবুল পীর খাজে ময়নউদ্দীন তিস্তির প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই সেখ কবুল একজন আরবি ও পারসি ভাষায় অদ্বিতীয় মৌলবি ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মের সাধক ছিলেন। তারাটিয়া গ্রামে এই সেখ বংশের বর্তমান বাস। এই গ্রামে সেখ কবুল একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। এই মসজিদের সম্মুখে একখানি প্রস্তর খণ্ড স্থাপিত আছে। সেই প্রস্তর খণ্ডে নির্মাতার নাম ও নির্মাণের তারিখ লিখিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে "হিজরী ১০৬৭, জিহজ আরম্ভ হইয়া হিজরী ১০৬৭ মহরমের ১৩ দিন সাইতে মসজিদ প্রস্তুত শেষ হয়। সেখ কবুলের সময় ইহা নির্মাণ হয়। এই প্রস্তরের লেখক ফকির রৌশন।" ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সময় সেখ কবুল বর্তমান ছিলেন। সেখ কবুলের জমিদারি লাভের অনেক অলৌকিক কারণ এদেশের লোকে বলিয়া থাকে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া, এ স্থলে উল্লেখ করা গেল না। ইহা অনুমান হয় যে দেওয়ান সেখ কবুল একজন সাধক ছিলেন। তাহার প্রতি কোন কারণে সন্তুষ্ট হইয়া শাহজাহান বা তৎপূর্ব কোন মোঘল সম্রাট তারাটিয়া, বিজয় কান্দী ও উলুবাড়িয়া মুসলমান সাধক প্রবরকে প্রদান করেন। উলুবাড়িয়া হস্তান্তরিত হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মৌজে তারাটিয়া ও বিজয়কান্দী ৩৬০।।৵০ আনা কালেক্টরির তৌজী ভুক্ত হইয়া সেখ কবুলের বংশধরেরা অদ্যাপি ভোগ দখল করিতেছে। সেখ কবুলের পুত্র সেখ বক্তার; সেখ বক্তারের পুত্র সেখ মমিন। এই সেখ মমিনের পুত্র সেখ দায়ম উল্লা; সেখ দায়ম উল্লার পুত্র সেখ কোকাই। সেখ কোকাইর পুত্র, সেখ কলিম বর্তমান আছে। এই সেখ বংশ এত বিস্তৃত যে সেখ কবুলের চারি ভ্রাতার বংশধরগণের নাম বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানের উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে আইন অনুযায়ী পুত্র কন্যা সকলেই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। অতএব এই জমিদারিতে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশীদার আছে যে কাহার কাহার কড়া গণ্ডারও অংশ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র অংশ জন্য সেখ কবুলের বংশধরেরা সামান্য কৃষকে পরিচিত হইতেছে। আবার ইহাদের অনেকে ঋণগ্রস্ত হওয়ায়, অনেক অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে। ২/১ জন অংশীদার ভিন্ন সকলেরই অবস্থা শোচনীয়।

---

১. From him, the Ayne Akberi continues the succession through five dynasties, till the Mohomedan Conquest"— The Elphinistone's History of India. Book IV, Chapter I.

২. "It says in explicit terms, that the reigning Raja Deb Pal Deb (or Deva Pal Deva) possessed the whole of India, from the source of the Ganges of Adam's Bridge (reaching to Ceylon) and from the river Megna or Baramputer, to the Western Sea. It specifies the inhabitants of Bengal, the Carnatic and Tibet among his subjects, and alludes to his army marching through Comboja, — a country generally supposed to be beyond the Indus; and, if not so, certainly in the extreme West of India,"— The Elphinstone's History of India, foot not, Book IV, Chapter I.

৩. "There are several Zamindars in Rajshahi who call themselves Rajas. They have certainly not been enobled by the Government, but they possess large landed properties,

on the strength of which their retainers and royats address them as Rajas. Among them may be mentioned Hara Nath Chaudhari of the Suri Caste, commonly called Raja of Duballhati; & C, — The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

৪ Ayen Akberi.

৫. The Environs of Maldah, Mahals, viz,

1. Barbuckpoor	5. Sujapoor	9. Shahnindoovy
2 Yusef Bazar	6 Sermadhelpoor	10. Tettahpoor
3 Hauelily Maldah	7 Sengoodya	11. Mavzzeddunpoor
4 Dhurpoor	8 Saluzery	

৬. The fifth Report from the Select Committee on the affairs of the East India Company.

৭ বলিহার ও দামনাশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ। ইহাতে প্রমাণ হয় রাজসাহী "বারেন্দ্র সমাজ" নাম ধারণ করার পর বলিহার রাজবংশের অভ্যুদয় এবং রাজসাহী "বারেন্দ্র সমাজ" নাম ধারণের অনেক পূর্বে দুবলহাটি রাজ্যেব অভ্যুদয়। ইহাও এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে বারবকপুরের আয়তন অনেক বেশি ছিল। ইহা বুঝা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে বারবকপুব ও বলিহার দুই স্বতন্ত্র পরগণার আয়তন ২৮১৫ বর্গমাইল এবং বর্তমান বারবকপুর পরগণার আয়তন ৯৯৬০ বর্গ মাইল। যদি বর্তমান বলিহার পরগণা দুবলহাটি রাজ্যের অন্তর্গত হয়, তবে পূর্বে দুবলহাটি রাজ্য ১২৭.৭৫ বর্গ মাইল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

৮. অতিথি সৎকারকে নৃযজ্ঞ কহে। গৃহীর পক্ষে শাস্ত্রে যে পঞ্চযজ্ঞেব বিধান আছে, তন্মধ্যে নৃযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

৯. এক্ষণ উচ্চশ্রেণি ইংরেজি স্কুলে পবিণত। এ একটি রাণীদের প্রধান কীর্তি।

১০. ইহারা ১৩০৭ সনের ফাল্গুন মাসে বিবাহিত। এই বিবাহে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। এই বিবাহে ১২০০০ কাঙালিকে ভদ্রলোকদিগেব ন্যায় লুচি, সন্দেশ, মিঠাই, ক্ষীর, দধি প্রভৃতি দ্বারা ভোজন করান হইয়াছে এবং প্রত্যেককে ।।০ আনা করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। "ইহাদিগের ভোজন ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা না হয় এই অভিপ্রায়ে কুমারদ্বয় ও সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় মহাশয় নগ্নপদে বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।" এ ব্যাপারে জাতি ও বর্ণের তারতম্যে ভোজনের ভিন্নভাব ছিল না। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভিক্ষুক সকলকেই সমভাবে যত্ন করা হইয়াছে। ইহাই প্রশংসনীয়।

১১. "There are several Zemindars in Rajshahi who call themselves Rajas. They have certainly not been enobled by the Government, but they possess large landed properties, on the strength of which their retainers and rovats address them as Rajas, Among them may be mentioned Hara Nath Chaudhuri of the Sunri caste, commonly called Raja of Dubalhati; Moheswar Rai, a high caste Brahimin commonly called Raja of Tahirpur, and Ruhini Kanto Rai, also a Brahmin, commonlv called Raja of Changaon"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.

১২. কেহ কেহ বলেন পূর্বদ্বারের অধ্যক্ষ সুসঙ্গ পরগণার আদি রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ একব্যক্তি। এই বুদ্ধিমন্ত খাঁর ভ্রাতার নাম জগদানন্দ খাঁ। বংশাবলী দৃষ্টে বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ পৃথক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয় এবং সুবুদ্ধি খাঁর ভ্রাতার নাম জগদানন্দ রায়। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে বংশাবলী দেওয়া গেল তাহা দেখিলে ভ্রম অনেক পরিমাণে অপনীত হইতে পারিবে।

১৩. জগদানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ দর্পনারায়ণী অবসাদে আন্তাড়িত হন, কিন্তু জগদানন্দের সময় অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি হয়।

১৪ সম্ভবত মোঘল সম্রাট আকবরের সময়।

১৫. "পীতাম্বরস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সাধুরুদ্র লোকনাথাঃ।
সাধুরুদ্রকৌ বাগ্‌চী লোকনাথস্থ লাহিড়ি"।।
হরিণা বাগবাটির পুস্তক।

১৬. কাপশ্রেষ্ঠ হরিপুরের চৌধরী বংশের কন্যা।

১৭. "ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী, এই তিনটি আমার শরীর"। শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, ষোড়শ অধ্যায়।

১৮. "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থমতে পিপড়া ওঝা বিনায়কবংশ হইতে সম্ভূত এবং ধূর্জটির পুত্র।

১৯. "কষ্টশব্দে পীড়াদায়ক" "যে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন কষ্ট পান তাহাকে কষ্ট শ্রোত্রিয় বলে।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

২০. সম্ভবতঃ রাণী সর্বাণী।

২১. রক্ষিত মতুর বংশ সম্ভূত। রক্ষিতের সমাজ মধ্যগ্রাম (মাঝগ্রাম)। রক্ষিতের পুত্র লক্ষ্মীধর। ইটালীর মৈত্রগণ লক্ষ্মীধরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২২. বলিহার রাজবংশাবলী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

২৩. চান্দরায় বাহিরবন্দর পরগণার জমিদাব ছিলেন। চান্দবায়ের পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথ সত্যবতীকে বিবাহ করেন। রাণী সত্যবতীর অভাবে বাহির বন্দর পরগণা নাটোর রাজত্ব ভুক্ত হয়। অবশেষে হেস্টিংস সাহেব বাণী ভবানীর নিকট হইতে বাহিরবন্দর পরগণা লইয়া বিষ্ণুচবণ ও লোকনাথকে প্রদান করেন। বিষ্ণুচরণ কান্তবাবুর বেনামদার ও লোকনাথ তাহার পুত্র। সেই হইতে এখন বাহিরবন্দর কাসিমবাজার রাজবংশের অধিকার।

২৪. "গ্রন্থকাব রাজাবাহাদুর সংসারে প্রবেশ কবিয়া বিষয়-কীটদিগের দংশনে জর্জরিত হইলেও তাহার চরিত্র-ভ্রংশ সামান্যই ঘটিয়াছিল।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি লিখিত "কি বুঝিলাম" স্বভাবনীতি গ্রন্থেব শেষ ভাগে সংযোজিত।

২৫. "আমিও একটি বালিকাকে ভালবাসিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বালিকার সুখ সম্পাদনই আমার একান্ত বাসনা"... গ্রন্থ সূচনা, সীতাচরিত।

২৬. "ক্ষুদ্রের দুর্দশা যদি মহতে হেরিত।
তবে কি ভারতে আজি দীনতা থাকিত।।"
স্বভাবনীতি।

২৭. "ধনীর গৃহে কবির জন্মও অল্প হইয়া থাকে। এই গ্রন্থকার ধনী হইয়াও কবি, আর কবি হইয়াও শিল্পী।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ির লিখিত ভূমিকা "সীতাচরিতে" সন্নিবেশিত।

২৮. "In those happy-go-lucky days, when the Amla exercised irresponsible power, the following characteristic example will be interesting. Mohammud Zaman Khan, originally an inhabitant of Burdwn was the Nazir of the Fouzdari Court and in that capacity accumulated large wealth and bequeathed it to his son Chaudhuri Dost Mohammud Khan, who set himself up as an independent gentleman and bought several Zamindaries"— The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review. *(মূল লেখাটি এই গ্রন্থে সংযোজিত)*

২৯ "One of the present incumbents Musufer ul Islam, states that from a personal feeling of hostility to the family, a part of the property was resumed by one of the Mogul Governors of Bengal and an assessment imposed of 872 Rupees per annum, which continues to be paid to the British Government. I hear also from the Commissioner of the division, that this endowment has been recently confirmed and investigated under Regulation II of 1819."— Mr. Adam's Report on Education.

৩০. "It thus appears that this institution has no organization or discipline and that the course of instruction exceedingly meagre."— Mr. Adam's Report on Education.

৩১. এই গ্রাম আমরুল পরগণার অন্তর্গত।

দ্বাদশ অধ্যায়

জমিদার ও রাইয়ত

ভারতের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্রবংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ভগবান বিষ্ণু হইতে এই দুই বংশেরই উৎপত্তি। ভগবান সূর্যের তনয় মনু সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই মনুই আদি রাজা। মনুর সময়ের পূর্বে বেদ দ্বারা আর্য জাতির আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যাইত। কোন্ সময়ে মনু সুমেরু পর্বতে রাজত্ব করেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। স্যর উইলিয়ম জোন্স অনুমান করেন যে, মনু খ্রিস্টিয় শকের পূর্বে ঊনবিংশতি শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। এই ভগবান মনু মানব পিতা। ইহারই বংশধরেরা সুমেরু শিখর হইতে নানা জাতি ও বংশে ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারই সঙ্কলিত মনু সংহিতাতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ, শাসন প্রণালী, সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্ত বিস্তৃতরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া প্রথমে সমাজ গঠিত হইল।

এই মনু সংহিতাতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু "জমিদার ও রাইয়তের" কথার উল্লেখ নাই। মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই "জমিদার ও রাইয়তের" সৃষ্টি দেখা যায়। "জমিদার ও রাইয়তের" বিষয় বিস্তারিতরূপে বলিবার পূর্বে মনু সংহিতার "রাজা প্রজা" সম্বন্ধ এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক।

রাজা সকল সমাজের সর্বময় শাসনকর্তা। রাজা কেবল ঈশ্বরের অধীন ছিলেন. কিন্তু কোন মানবের ক্ষমতাধীন ছিলেন না। অত্যাচার নিবারণ এবং কুকর্মান্বিত ব্যক্তির দণ্ড বিধান করার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজার সাতজন মন্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণ এবং অবশিষ্ট ৬ জন ক্ষত্রিয় ছিল। এই সপ্ত মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। রাজা ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু সুখ বিলাসী ছিলেন না। তিনি ক্রোধকে নিয়ত শাসনাধীন রাখিতেন এবং আলস্য পরবশ ছিলেন না। রাজা বিলক্ষণ জানিতেন যে "দণ্ড জাগ্রত যে সময় প্রহরী নিদ্রিত।" এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজা বিচার ও দণ্ডবিধান করিতেন।

রাজার অধীনে রুষিয়ার ন্যায় ভারতের সকল স্থানে "পল্লি সমাজ" স্থাপিত ছিল। এক একটি পল্লিসমাজ এক একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র। লর্ড মেটকাফ সাহেব বলেন— "এক একটি পল্লিসমাজ এক একটি সাধারণতন্ত্র। ইহা এক একটি ক্ষুদ্র দেশ যাহার শাসনকর্তা প্রজারাই মনোনীত করে। প্রজারা যাহা চায় তাহা সমস্তই এই পল্লিসমাজে আছে। বিদেশীয় সম্বন্ধে এ সমাজ প্রায় স্বাধীন।"[১] গ্রামের সমুদয় অধিবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া থাকাকে পল্লিসমাজ বলে। "গ্রামের মণ্ডল সেই দলের অধিপতি। তিনি নিজ এলাকার মধ্যে শান্তিরক্ষণ, জমা নিরূপণ, বিবাদভঞ্জন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী। তিনি রাজা ও প্রজা উভয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ পরিগণিত হন। কোন প্রজা সমাজের অমতে সমাজভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিকে, নিজ জমিজমা দান বিক্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করে, তাহার বিষয় রাজার না হইয়া সমাজেরই দখলে আইসে। মণ্ডলের সাহায্যার্থ মুহুরি কোটাল প্রভৃতি কয়েকজন কর্মচারী তাহার তাঁবে নিযুক্ত থাকে। পল্লিসমাজ অতি পূর্বকাল হইতে এদেশের নানা স্থানে সন্নিবেশিত ছিল; কিন্তু এখন ক্রমশই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।"[২] যে আত্মশাসন প্রণালীর জন্য ভারতবাসীরা আজকাল আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অতিপ্রাচীনকালে ভারতের সকল স্থানে কোন না কোন এক আকারে প্রচলিত ছিল। এক পল্লিসমাজের অধিপতি দশ পল্লিসমাজের অধিপতির অধীন। দশ

পল্লিসমাজের অধিপতি শত পল্লিসমাজের অধিপতির অধীন। শত পল্লিসমাজের অধিপতি সহস্র পল্লিসমাজের অধিপতির অধীন। এই প্রকারে রাজা পর্যন্ত শাসনকর্তা নিয়োজিত হইত। একশত পল্লি একটি পরগণার সমান। এই সকল কর্মচারীরা রাজার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া রাজকীয় কার্যনির্বাহ করিতেন। প্রজারা আপন আপন অধিপতির নিকট রাজকর দিত এবং অধিপতি পরম্পরা উচ্চতর অধিপতির নিকট রাজকর দিতেন। এইরূপে রাজা উচ্চতম অধিপতির নিকট হইতে কর প্রাপ্ত হইতেন। নিম্নলিখিত কর্মচারী দ্বারা পল্লিসমাজ গঠিত হইত;—

১. অধিপতি (মণ্ডল)
২. একাউন্টেন্ট (মুহুরি)
৩. ঘাটাল (চৌকিদার)
৪. পুরোহিত ও গুরুদেব
৫. শিক্ষক
৬. গণক
৭. কামার
৮. ছুতার
৯. কুমার
১০. ধোপা
১১. নাপিত
১২. গোরক্ষক
১৩. চিকিৎসক
১৪. বাদ্যকর
১৫. কবি, গায়ক, কুলঞ্জ

এইরূপ পল্লিসমাজে কিছুরই অভাব নাই। যাহা আবশ্যক তাহা সমুদয় পল্লিসমাজে ছিল। উপরের লিখিত ব্যক্তি দ্বারা পল্লিসমাজ গঠিত ছিল। ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য জন্য ভূমিজাত শস্যের একাংশ প্রজার নিকট পাইত। এক গ্রামের অধিপতি প্রজার নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের সামান্য অংশ, দশ পল্লির অধিপতি দুই হালের জমিন; শত পল্লির অধিপতি একটি ক্ষুদ্র পাল্লি; এবং সহস্র পল্লির অধিপতি একটি বৃহৎ নগর পুরস্কার পাইতেন। এই তাহাদের কর্মের বেতন স্বরূপ ছিল। জমিনের অবস্থা অনুসারে এবং কৃষকের পরিশ্রমানুযায়ী, জমিনের উৎপন্ন শস্যের দ্বাদশ, অষ্টম অথবা এক ষষ্ঠাংশ রাজার কর নির্দিষ্ট ছিল। রাজার কর যে কেবল কৃষিজাত শস্যের উপর নির্ধারিত ছিল এমত নহে; গৃহের উপর, বাণিজ্যের উপর, বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির উপর, বিবাহ আদি কার্য উপলক্ষে এবং অন্যান্য উপায়ে রাজার কর বিস্তর সংগৃহীত হইত। রাণী ভবানীর সময়েও এই প্রথা অবলম্বনে নানা উপায়ে কর আদায় হইত। মনুসংহিতানুসারে শস্যের এক ষষ্ঠাংশ যে রাজার কর ছিল তাহা ক্রমে পরিবর্তন হইয়া একার্ধ হইল। এই নিয়মানুসারে বর্তমানে বঙ্গদেশে যে ব্যক্তি জমিন প্রকৃত চাষ করে সে তাহার অর্ধাংশ শস্য জমিন দখিলকারীকে দেয়। সেই অর্ধাংশ হইতে জমিন দখলকারী প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে রাজস্ব দেয়। ইহাকেই রাজসাহীতে "বর্গা" বা "আদি" প্রণালী বলে। ক্রমে দেবমন্দির ও ঋষিগণের আশ্রম এবং সৈন্য রক্ষার প্রয়োজন হইল। সৈন্য রক্ষার জন্য কর্মচারীদের বেতন স্বরূপ এবং দেবমন্দির ও ঋষিদের আশ্রম রক্ষা জন্য নিষ্কর ভূমিরও সৃষ্টি হইল।

পূর্বে রাজসাহীর পল্লি যেরূপ ছিল এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্তন। পুরাকালে প্রায় সকল সময়ে এক একটি পল্লি এক একটি দ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইত; কিন্তু এখন কেবল বর্ষাকালে পল্লি দ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। পল্লির যে স্থানে বসতি আছে, সে স্থানে কেবল লোকের বসতি। আবার এক এক জাতির এক এক স্থানে বসতি। এক পল্লির যে স্থানে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, সে স্থানে কেবল ব্রাহ্মণই বাস করিতেন, যে স্থানে কায়স্থ বাস করিতেন, সে স্থানে কেবল কায়স্থই বাস করিতেন, যে স্থানে কুমার বাস করিত, সে স্থানে কেবল কুমারই বাস করিত। এই রূপে এক জাতির মধ্যে, অন্য জাতির বাস ছিল না এবং হিন্দু মধ্যে মুসলমানের বাস ছিল না। এক্ষণে কোন কোন স্থানে এপ্রথার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। এক একটি পল্লি এরূপ গঠিত যে পল্লির এক একটি স্থান গৃহস্থের গৃহ-শ্রেণি ও বৃক্ষশ্রেণি, প্রাচীর ও জলরাশি চৌকি বা পরিখার কার্য করিয়া থাকে এবং এক জাতি এক ধর্মীয় প্রতিবাসীর রক্ষক স্বরূপ দিবারাত্রি পরস্পর প্রহরীর কার্য করিয়া

থাকে। বরেন্দ্র ভূমির পল্লি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত না হইয়া মৃত্তিকা নির্মিত প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। এখন খড়ের গৃহের পরিবর্তে টিনের ঘর, ইস্টক নির্মিত গৃহ পল্লিতে প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থ চোর ডাকাইত অগ্নিভয় হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় করিয়াছে।[৩] পল্লির নিকট নদী প্রবাহিত হইলেও কূপ ও পুষ্করিণীর অভাব নাই। এক পল্লিতে জলকষ্ট থাকিলে সেই পল্লির বা অন্য পল্লির ধনবানেরা নিজ ব্যয়ে কূপ ও পুকুর খনন করিয়া দিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন। এখন এই প্রথার শিথিলতা দেখা যাইতেছে। পল্লিতে সামান্য কোন বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে পল্লির প্রধানেরা মধ্যস্থ হইয়া পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া থাকে। এ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত।

এরূপ পুরাকালেব পল্লি সমাজের গুণ ও দোষ উভয়ই ছিল। প্রজারা আপনারা একত্রিত হইয়া পরস্পর পরস্পবকে রক্ষা করিত। রাজস্বের সম্বন্ধ ব্যতীত প্রজারা সকল বিষয়ে স্বাধীন থাকিয়া পল্লির শাসনকার্য রক্ষা করিত। কিন্তু পল্লি সমাজে একটি প্রধান দোষ দেখা যায় সে রাজবিপ্লব ও দুর্ভিক্ষ সময়ে রাজার প্রজাকে রক্ষা করার কোন নিয়ম দেখা যায় না; এমন দুর্দিনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পল্লি সমাজে কোন নিয়ম দেখা যায় না।

মুসলমান রাজত্বকাল হইতে বঙ্গদেশে মনুর সময়ের রাজ কর্মচারীরা (পল্লি সমাজের অধিপতি প্রভৃতি) বিলুপ্ত হইতে লাগিল। মনুর পর আধুনিক হিন্দু রাজত্ব সময়, হিন্দুরাজার অধীন যে সকল ভূম্যধিকারীর সৃষ্টি হয়, তাহারাই মুসলমান রাজত্ব সময় হইতে জমিদার নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইহারাই গ্রাম্য ভূম্যধিকারী বলিয়া আদিতে পরিচিত ছিল। এই গ্রন্থের 'জমিদার' শীর্ষকে বঙ্গের জমিদারগণের উৎপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মোঘল সম্রাটের অধঃপতনে বাংলায় সুবাদারের অধীনে, বঙ্গদেশের জমিদারগণের ক্ষমতা এরূপ যে, তাহাদের সৈন্য, গড়, বিচারালয় প্রভৃতি সবই ছিল। রাজসাহী প্রদেশের সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঁঠিয়া-নাটোর প্রভৃতির রাজারা এই শ্রেণির জমিদার ছিলেন। মুসলমান রাজ্যের ধ্বংসের পর কোম্পানির আমলের কিছু দিন পর হইতে তাহাদের সে ক্ষমতা রহিল না। আবার নাটোর রাজবংশ পতনের পর রাজসাহীতে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের সৃষ্টি হইল। এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছোট বড় জমিদাবগণের দেওয়ানি ও ফৌজদারি কোন বিচারেরই ক্ষমতা রহিল না। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণের সহিত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সেই বন্দোবস্তানুসারে গবর্ণমেণ্টের খাজানা খানায় নির্দিষ্ট দিনে সূর্য অস্তের পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ রাজস্ব কিস্তিমত দাখিল করিবে এবং প্রজার নিকট জমির কর বা রাজস্ব ব্যতীত অন্য কোন আবওয়াব বা অন্য কোন প্রকারের কর লইতে পারিবে না।

মুসলমান সময় হইতে ভূম্যধিকারীর অধীন যে প্রজারা কর দিতে ছিল তাহারা "রাইয়ত" নামে প্রসিদ্ধ হইল। আরব্য ভাষায় "রাইয়ত" শব্দে অধীন বা বশতাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। সুতরাং মুসলমান রাজ্যে সম্রাটের অধীন ভূম্যধিকারী বা জমিদারের জমিদারির অধিবাসী বশতাপন্ন প্রজাকে "রাইয়ত" বুঝাইতে লাগিল। "যে ব্যক্তি স্বয়ং বা আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বেতন ভোগী কৃষাণদিগের দ্বারা অথবা ভাগী জুটাইয়া চাষ করিবাব অভিপ্রায়ে কোন জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ভূমিভোগের স্বত্ব পাইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে ও তাহার উত্তরাধিকারীকে রাইয়ত বলা যাইতে পারে।"[৪] বঙ্গদেশে এই "রাইয়ত" সাধারণত তিন নামে পরিচিত হয়, যথা— (১) যে ব্যক্তি জমিদারকে কর দেয়, (২) কৃষক, (৩) যে ব্যক্তি ভূমি দখল করে (খাদকস্তা ও পাইকস্তা প্রজা)। আবার কৃষক তিন শ্রেণিতে বিভক্ত যথা— (১) আদিম নিবাসী এবং অধস্তন সন্তান, (২) উপনিবেশী, (৩) পাইকস্তা। এক্ষণ এই অনুমিত হইবে যে মনুসংহিতার রাজা আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশীয় রাজা ও বড়

জমিদার—যাহাদের সহিত রাইয়তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এক, দশ, শত ও সহস্র গ্রামের অধিপতি আমাদের বর্তমান ছোট জমিদার ও তালুকদার এবং পল্লি সমাজভুক্ত প্রজা সমূহ বর্তমান "রাইয়ত"। জমিদারের অধীন থাকিয়া যাহারা কর দেয় তাহারাই রাইয়ত বলিয়া অভিহিত হইল। মনুর সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত জমিদারের সহিত রাইয়তের (প্রজা) সম্বন্ধ নির্ণয়, পরস্পর ব্যবহার ও অবস্থা বর্ণনা করার এবং রাজস্ব পদ্ধতির সহিত জমিদার ও রাইয়তের সম্বন্ধ দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মনুসংহিতায় আর্যজাতির আচার, ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে অতি প্রাচীন ভারতান্তর্গত গৃহস্থের জীবন ও ধর্ম, প্রাচীন সভ্যতা, রাজনীতি, যুদ্ধশাস্ত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। মনুর সময় হইতে রামায়ণের সময় পর্যন্ত "রাজা প্রজার" যে সম্বন্ধ ছিল সে সম্বন্ধ অনেক দিন বিলুপ্ত। এ সময়ে রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ মমতা ও পালন করিতেন এবং দুর্বৃত্ত প্রজার দণ্ডবিধান করিতেন। আবার প্রজাও পিতার ন্যায় রাজাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। রাজা কৌশলে, ছলে বা বলে প্রজার অনিষ্ট করিতেন না এবং প্রজাও সরলভাবে রাজার অনুগত থাকিয়া রাজকর যথাসময় রাজ কর্মচারী সমীপে উপস্থিত করিত এবং রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অনুমাত্র ত্রুটি করিত না। ইহা কথিত আছে, এ সময়ে রাজ্যে অকালমৃত্যু ও রোগ আদিতে প্রজাকে প্রপীড়িত করে নাই। এ সময় ক্ষেত্র প্রচুর শস্য প্রদান করিত। গাভী স্বচ্ছন্দে দুগ্ধ দিত। ছল, মিথ্যা, আলস্য, হিংসা, শোক, দুঃখ, মোহ ও দৈন্যে প্রজাকে একবারে অভিভূত করিতে পারে নাই। অন্নাভাবে প্রজার কষ্ট হয় নাই; রাজকর জন্য প্রজা প্রপীড়িত হয় নাই। সে সময়ে সুখের রাজ্য ছিল। ইহা সর্বথা কথিত হয় যে সুখের রাজ্যকেই "রামরাজ্য" বলে। হিন্দুশাস্ত্র মতে সত্য যুগে পূর্ণ ধর্ম ; ত্রেতা যুগে ধর্মের একপদ স্খলিত হয়। দ্বাপর যুগে ধর্মের দুই পদ স্খলিত হয় এবং কলিতে ধর্মর কেবল এক পদ মাত্র রইল। ইহাতে এই অনুমিত হইবে যে সত্যযুগ হইতে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের ভাব ক্রমে কমিয়া অধর্মের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বাপরের শেষভাগে মহাভারতের সময়। এই মহাভারত আর এক খানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে চন্দ্রবংশীয় কুরু পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই ভারতে ভগবান ব্যাসদেব ধর্ম ও অধর্ম, রাজা ও প্রজার ধর্ম, লোকের আচার ব্যবহার, রাজনীতি, যুদ্ধ শাস্ত্র, ভারতের সেকালের উচ্চ বীরত্ব, সাহস প্রচীন সভ্যতা প্রভৃতি এরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যে হিন্দু অপেক্ষা পৃথিবীর কোন জাতি অতীত গৌরবের ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিতে ক্ষমবান হন নাই।[৫] যেমন রামায়ণে রামরাজার বীরত্ব ও রাজ্যশাসন বর্ণিত আছে, তেমনই মহাভারতে ধার্মিক প্রবর রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজধর্ম বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়া আছে। খ্রিস্টিয় শকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠির দিল্লির নিকট ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে অতি প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতেন। অভিমন্যুতনয় মহারাজ পরীক্ষিত পাণ্ডব প্রবীর যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী। যে সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজ পৌত্র পরীক্ষিতের করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন, সেই সময় হইতে রাজ্যে কলির প্রবেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে পাণ্ডবগণ ভারতে প্রজাদিগকে দোর্দণ্ড প্রতাপে পরম সুখে প্রতিপালন করেন। যে রাজার রাজ্যে অসৎ ব্যক্তিরা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে, তাহার যশঃ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পরলোক সকলই নষ্ট হয়। অত্যাচার হইতে প্রজাকে রক্ষা করিয়া এবং অবস্থা ও কালানুযায়ী রাজস্ব গ্রহণ করিয়া প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই রাজার পরম ধর্ম। মহারাজ পরীক্ষিত এইরূপে রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। এই সময় হইতে ক্ষেত্রে পূর্বের মত বৃষ্টি না হওয়ায় শস্য কম উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রজারা শোক, দুঃখ ও রোগে ক্রমে অভিভূত হইতে লাগিল। অল্প আয়ু হইতে লাগিল। প্রজারা অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হইতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে তাহারা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতে লাগিল। রাজা প্রজার সম্বন্ধ ক্রমে অপবিত্র

হইতে লাগিল। রাজা ক্রমে প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া রাজকর আদায় করিতে লাগিলেন। ক্রমে হিন্দু রাজা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রজার সুখ সমৃদ্ধিরও হ্রাস হইতে লাগিল।

এইরূপে হিন্দু রাজার পতনে ভারত যবনাক্রান্ত হইল। সেন বংশীয় রাজার সময় দিল্লির সম্রাট কুতবুদ্দিনের অধীন বক্তিয়ার খিলিজি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অধিকার করেন। বক্তিয়ার অধিকৃত রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিয়দংশ একভাগ এবং বরেন্দ্র ভূমি লইয়া একভাগ। দিনাজপুর সন্নিহিত দেবকোট ইহার রাজধানী ছিল। রাজসাহী প্রদেশ এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। এই সময় হইতে সের সাহ পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব পদ্ধতির কোন সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। বাংলার শাসন কর্তাদের অনেকেই মুখে দিল্লির প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন। তাহারা দিল্লির সম্রাটকে করও রীতিমত দিতেন না। সেই শাসনকর্তাদের অধীনে যে সকল ভূম্যধিকারী ছিলেন তাহারা রাইয়তের নিকট কর আদায় করিতেন বটে, কিন্তু শাসন কর্তাদের নিকট রীতিমত কর দিতেন না। এসময় রাজসাহী কেন বঙ্গদেশেই অরাজকতা ছিল; এমন সময়ে সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঁঠিয়া, দুবলহাটি প্রভৃতি জমিদারেরা সর্বময় কর্তা।

মুসলমান রাজাদের মধ্যে সের সাহ প্রথমে রাজস্ব প্রণালীর প্রস্তাব করেন, কিন্তু অল্পদিন রাজত্ব করায় ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আকবরই সের সাহর রাজস্ব প্রণালী সংশোধিত করিয়া কার্যে পরিণত করেন।[৬] আকবরের প্রধানমন্ত্রী রাজা তোড়রমলের যত্নে ও কার্য দক্ষতাগুণে এই সুপ্রসিদ্ধ রাজস্ব পদ্ধতি দিল্লির সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত হইল। প্রথমত জমির জরিপ ও গ্রামের সীমা নির্দিষ্ট হইল। পরে উর্বরতা অনুসারে জমি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর দখলে কত জমি এবং কোন্ কোন্ গ্রাম তাহা নির্দিষ্ট হইল। পরিশেষে প্রত্যেক শ্রেণির জমিতে প্রতি বিঘায় গড়ে কত শস্য উৎপন্ন এবং উহার মূল্যই বা কত, তাহা নির্ধারিত হইল। তখন সম্রাট সমুদয় আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ রাজকর বলিয়া ধার্য করেন। কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত অন্য প্রকার কর বা আবওয়াব যাহা ছিল তাহা রহিত হইল। "এই বন্দোবস্ত নিবন্ধন প্রজাবর্গের ভারের অনেক লাঘব হইল, কিন্তু চুরি ও তহবিল ভাঙার বড় সুবিধা না থাকাতে ভূমি হইতে পূর্বে রাজসংসারে যে আয় হইত, উহার পরিমাণ বড় কমিল না। যাহাতে এই বন্দোবস্ত দ্বারা প্রজালোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্রাট যৎপরোনাস্তি উৎসুক ছিলেন। যাহাতে রাজস্বের ইজেরা দেওয়া হয় এবং কালেক্টরেরা গ্রামের মণ্ডল বা পাটোয়ারীর কথায় না ভুলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যেক রাইয়তের সহিত তাবৎ বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন, অন্নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। অতএব ইহা সাহসপূর্বক বলা যাইতে পারে যে, তাহার এই বন্দোবস্ত নিবন্ধন অনেকাংশ প্রজাপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্ধিত হইয়াছিল"।[৭] রাজার কর শস্যে না দিয়া প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশের বাজার মূল্য ধরিয়া নগদ টাকা দিতে হইত। বাজার দরের রাজস্বের টাকা বেশি হওয়া মনে করিলে কৃষকেরা শস্যের এক তৃতীয়াংশও দিতে পারিত। এই বন্দোবস্ত প্রথমে প্রতি বৎসর হইত; অবশেষে দশবৎসর জন্য বন্দোবস্ত হয়। এই দীর্ঘকালের বন্দোবস্তে প্রজার অনেক সুবিধা হয়। যে রাজ্যে প্রতি বিঘায় ধান্য ২০ মণ, গম ১৩ মণ এবং কার্পাস ৭।। মণ জন্মে এবং রাজার কর এক তৃতীয়াংশ মাত্র; সে দেশের প্রজার দুঃখ কোথায়? আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে, "বাংলার রাইয়তেরা রাজভক্ত এবং রাজ-কর দিতে নিতান্ত মুক্ত-হস্ত। খাজানা কিস্তি বা কিস্তি দাখিল করিত। তাহারা আপনারাই নির্দিষ্ট স্থানে কিস্তির খাজানা দিবার সময় পরিষ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া আসিত। বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ, নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে টাকায় দশ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছে এবং নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময়ও টাকায় ৪ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছে।"[৮] সে সময় রাইয়ত সুখ স্বচ্ছন্দতায় জীবিকা নির্বাহ করিয়া পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়াছে ; অথচ রাইয়ত সুখ বিলাসপরায়ণ ছিল না।

এমন সময়ে অর্থাৎ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় পর্যন্তও জমিদারগণ কম বেশি যেরূপ স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়া রাইয়তের নিকট কর আদায় করিতেন এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার কার্য সম্পাদন করিতেন; তাহা এই গ্রন্থের নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে পুনরায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সময় রাজসাহীর রাইয়তেরা জমিদারগণের অধীনে কি প্রকার কাটাইয়াছে তাহা রাজবংশীয়দের ইতিহাসেই বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন মুসলমানদিগের বঙ্গদেশ অধিকারের সময় হইতে মোঘল সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত রাজস্ব পদ্ধতির সুশৃঙ্খলা ছিল না, তেমনই ইংরেজের বঙ্গদেশ অধিকার সময় হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় পর্যন্ত রাজস্ব পদ্ধতির সুনিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং জমিদার রাইয়ত সম্বন্ধ দৃঢ়ভূত হয় নাই। মোঘল সাম্রাজ্যে যেমন আকবরের রাজস্ব প্রণালী প্রসিদ্ধ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তেমনই লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসিদ্ধ। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত বঙ্গের জমিদার রাইয়তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের উপর রাইয়তের সুখ দুঃখ, সমৃদ্ধি, দৈন্য, উন্নতি অবনতি সমুদয় নির্ভর করিতেছে। আকবরের "রাজস্ব পদ্ধতিতে" রাইয়তের সহিত জমিদারের (কালেক্টরের) যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিসের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" সেরূপ সম্বন্ধ রহিল না। সম্বন্ধের অনেক পরিবর্তন হইল। আকবরের প্রণালীতে কালেক্টর অর্থাৎ ভূম্যধিকারী রাজস্ব রাইয়তের নিকট হইতে আদায় জন্য শতকরা কিয়ৎ পরিমাণে কমিশন পাইতেছিলেন। এই কর-সংগ্রহ কার্য ক্রমে পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠে। সেই জন্য এই কালেক্টরেরা জমিদার উপাধিগ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের অধীনের মহালের প্রকৃত ভূস্বামী বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে জমিদারেরা দেওয়ানি ফৌজদারি বিচার করিবার ক্ষমতা হস্তগত করিলেন এবং স্বাধীন ভাবও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই জমিদারগণ সৈন্য, গড়, বন্দুক, কামান প্রভৃতি রাখিতে লাগিলেন। আবার কেহ রাজা, রায়রায়াণ, খাঁ, সিংহ প্রভৃতি উপাধিগ্রহণ করিলেন। সে সময় দিল্লি বহুদিনের পথ, রাজ দরবার সঙ্কটময় এবং দুরধিগম্য; অতএব বঙ্গের ক্ষমতাশালী জমিদারগণই রাইয়তের হর্তা, কর্তা, বিধাতা এবং দণ্ড মুণ্ডের কর্তা হইয়া উঠিলেন। তখন রাইয়ত একপ্রকার জমিদারের সম্পূর্ণ অধীন। বঙ্গের রাইয়ত চিরকাল রাজভক্ত। সুতরাং জমিদার যাহা চাহিতেন তাহাই রাইয়তের নিকট পাইতেন। রাইয়ত সে সময় বিলাসপরায়ণ নহে, সরল ও নিরীহ এবং অল্পেই সন্তুষ্ট। আবার মৃত্তিকাও উর্বর এবং শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়। অতএব রাইয়ত সুখে কাল কাটাইত। কিন্তু মুসলমান রাজ্য-পতনে এবং ব্রিটিশ রাজ্যের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে দরিদ্র নিরীহ রাইয়তদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নিবন্ধন কৃষি বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় রাইয়ত যে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা সংশোধন করিতে অনেকদিন লাগল।

তদপর ইংরেজেরা এ দেশ জয় করিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত আকবরের রাজস্ব পদ্ধতি অনুসারে রাজস্ব আদায় করেন না। যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর রাজস্ব দিতে চাহিত তাহারই সহিত মেয়াদি ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। কোন কোন স্থলে পুরুষানুক্রমিক পদ্ধতিরও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইজারদারেরা স্ব স্ব অধিকার নির্দিষ্টকালের জন্য মনে করিয়া রাইয়তদের উন্নতি বা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি কিছুই বিবেচনা করিতেন না। কেবল বাইয়তের রক্তশোষণ করিয়া নিজ উদর পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিত। তন্নিবন্ধন বঙ্গের কৃষি ও বাণিজ্যের একবারে হীন অবস্থা হইল। জমিদার ও রাইয়ত উভয়েই ক্রমে নিঃস্ব হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জমিদার ও রাইয়তের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর হইতে জমিদার রাইয়ত সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তদপর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদিত হইল। যে সময় লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারগণ সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করেন সে সময় রাইয়ত কি এবং রাইয়তের স্বত্ব

কি, তাহা তাহার অগোচর ছিল না। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" জমিদার প্রকৃত ভূস্বামী এবং তাহার অধীন যে জমি ভোগদখল করিবে সেই রাইয়ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। জমিদারের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইল যে জমিন সম্পর্কীয় কর ব্যতীত জমিদার রাইয়তের নিকট অন্য কোন আবওয়ার লইতে পারিবে না। এবং যে রাজস্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে তাহার কমবেশি হইবে না; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিস এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে দোষ শূন্য তাহাও বলা যাইতে পারে না। জমিদার ও রাইয়তের সুবিধা অসুবিধা দুইই হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্তোষ চিত্তে রাজস্বের সীমাবদ্ধ করিলেন; অতএব জমিদারগণও তাহাদের নিজ করের সীমাবদ্ধ করিবে। কিন্তু কার্যে তাহা পরিণত হইল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের সীমা নির্ধারিত রহিল; কিন্তু জমিদারগণ নিজ রাইয়তের রক্ত শোষণ করিয়া কর ক্রমে বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা একটি গুরুতর দোষ লক্ষিত হইল। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" একটি প্রাচীরের ন্যায় জমিদার ও রাইয়তদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইল। এই প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রায়ত নিজ দুঃখকাহিনী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীর গোচর করিবার পন্থা পাইল না।[৯] এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারকে নির্ধারিত দিনে সূর্য অস্তের পূর্বে কিস্তি কিস্তি রাজকর কলেক্টর সমীপে দাখিল না করিলে জমিদারি নিলাম হইয়া যাইবে। জমিদার অত্যাচারেই হউক বা কৌশলেই হউক রাইয়তের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া কালেক্টরিতে দাখিল করিতে পারিলেই হইত। কালেক্টর সাহেব রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথমাবস্থায় অনেক জমিদার রাজস্ব কিস্তি বা কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে দাখিল করিতে না পারায় জমিদারি নিলাম হইয়া যায়। জমিদারের এই অসুবিধা বেশিদিন রহিল না। জমিদার রাইয়তের নিকট যাহাতে সহজে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনেক আইন প্রচলিত হইল। বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন প্রচলিত হইবার পর হইতে বঙ্গের রাইয়তের অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং জমিদারের অন্যায্য রাজস্ব বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে রাইয়তের নিকট জমিদারের রাজস্ব আদায়ের এবং জমির উৎকর্ষতালাভে বা অন্য কারণে প্রজার জমা বৃদ্ধি করিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। বাকি খাজনার সুদ বা খেসারৎ লইবার জমিদারগণের অধিকার হওয়ায় রাইয়ত বাকি খাজনার সুদ বা খেসারৎ দিবার ভয়ে জমিদারের খাজানা রীতিমত দিতে লাগিল।

এক্ষণ রাজসাহীর জমি ও কৃষি ; জমিদারের রাইয়তের প্রতি ব্যবহার এবং রাইয়তের জমিদারের প্রতি ব্যবহার এবং জমিদার ও রাইয়তের অবস্থা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রাজসাহীর জমি— রাজসাহীর জমি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :— (১) পলি, (২) ভড়, (৩) বরেন্দ্র। পদ্মা নদীর চরে নীল ও কলাই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পলিতে ধান্য কম জন্মে ; কিন্তু সর্ষপ, তিল, খেঁসাবী, মটর, বুট, গাঁজা, তুত, ইক্ষু, হরিদ্রা, পাট, গম, তামাক প্রভৃতি বেশি পরিমাণে জন্মে। ভড়ে কেবল ধান্য জন্মে। আজিকালি ধান্যের জমিতেও পাট চাষ হইতেছে। বরেন্দ্রভূমিতে কেবল ধান্য জন্মে। রাজসাহীর প্রধান শস্য ধান্য; কিন্তু রাজসাহীতে সকল শস্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রাজসাহী দুগ্ধবতী গাভী। ইহাকে যথোচিত আহার দিয়া পুষ্ট করিতে পারিলে ঐ দুগ্ধ দ্বারা আমরা বলবান ও পুষ্ট থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি। জমি সাধারণত এখনও উর্বর। কিন্তু উর্বরতা শক্তির ক্রমে হ্রাস হইতেছে। পূর্বে রাজসাহীর উৎকৃষ্ট জমিতে ২০/২৫ মণ ধান্য জন্মিয়াছে। এক্ষণে সেই জমিতে ১০/১২ মণের বেশি জন্মে না। ইহার কারণ কি? বঞ্চনা পদ্ধতিই ইহার প্রধান কারণ।[১০] এক জমিতে প্রতি বৎসর দুইটি একটি শস্য প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া নিজে বলবান ও পুষ্ট হইবে; কিন্তু

মাতৃভূমিকে পুষ্টিকর আহার দিতে ইচ্ছা কর না বা জান না। কৃষক! তুমি কি ইহাও জান না যে, গাভীকে ভাত খাওয়াইলেই বেশি দুগ্ধ দেয়? যে দুগ্ধের ভাগ প্রত্যহ অপহরণ করিতেছ, তাহা আহার দিয়া পূরণ করিলে সেই দুগ্ধ পাইবে। অতএব মাতৃভূমিকে বঞ্চনা করিয়া অপহৃত অংশ, সারাংশ দ্বারা পূরণ না করিলে তোমাকে মাতৃভূমি প্রতি বৎসর পূর্বের ন্যায় প্রচুর শস্য কি প্রকারে দিবে? কৃষক! মাতৃভূমিকে প্রচুর পুষ্টিকর আহার দেও, তবে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে পূর্ববৎ শস্য পাইবে। এখনও সাবধান হও নতুবা পরে মাতৃভূমির শক্তি আরও হ্রাস পাইবে। পিতা, পিতামহ যে সে প্রণালীতে কৃষিকার্য নির্বাহ করিয়াছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে দুর্গতি উপস্থিত হইবে। বঙ্গভূমি রত্ন-প্রসবিনী। সুতরাং কৃষি পদ্ধতির উন্নতি সাধন না করিয়াও তোমরা এক্ষণ যথেষ্ট শস্য পাইতেছ।

আমি স্বীকার করি, রাজসাহীর কি সমস্ত বঙ্গের কৃষক বিজ্ঞান শিক্ষা করে নাই; তাহারা সাধারণত মূর্খ। কিন্তু বিশ হাজার বৎসর পূর্বে যে জমি যে শস্যের উপযোগী এবং যে সময় যে প্রণালীতে চাষ করিতে হইবে, কোন্ জমি কি প্রকার তাহা বঙ্গের কৃষক যেরূপ জানিত, আজও সেরূপ বঙ্গের কৃষক জানে। একজন ইউরোপীয় স্বীকার করিয়াছেন যে বঙ্গের কৃষক ইউরোপীয় উত্তম কৃষকের ন্যায় জমির গুণাগুণের ক্ষুদ্র বিভিন্নতা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে।[১১] কিন্তু এক জমিতে পুনঃ পুনঃ এক শস্য, এক জমিতে এক বৎসর ২/৩ শস্য দেওয়া, জমিকে মধ্যে মধ্যে অবকাশ এবং সার না দেওয়া নিবন্ধনে শস্য উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। রাজসাহীতে বহুতর নদ, নদী, বিল আছে। বর্ষার সময় সমুদয় শস্য ক্ষেত্র বিশেষত ধান্য ক্ষেত্র জলে প্লাবিত হইয়া এক প্রকার "রেতি" মৃত্তিকা জমির উপর পতিত হইয়া জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় রাজসাহীর কৃষকেরা জমিতে সার দিবার পদ্ধতি শিক্ষা করে নাই। কিন্তু রাজসাহীর নদ নদী বালিতে ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। অতএব পূর্বের ন্যায় সকল স্থান বর্ষার জলে প্লাবিত হইয়া "রেতি" মৃত্তিকা পায় না। গাঁজার জমিতে সার না দিলে হয় না বলিয়াই সারস্বরূপ খেল দিয়া থাকে।

রাজসাহীর কৃষকদিগের সহিত, জমির উর্বরা শক্তির হ্রাস এবং কৃষি দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থাভাব বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। রাজসাহীতে মুসলমান কৃষকই বেশি। তাহাদের সাধারণত অবস্থা ভাল না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। কৃষকদের বিলাসিতাই অর্থাভাবের প্রধান কারণ। স্বল্প মূল্যে গাভী পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা দুর্বলা গাভী দ্বারাই প্রায় কৃষি-কার্য নির্বাহ করে। বলবান বলদ বা ষাঁড় দ্বারা প্রায়ই তাহারা কৃষি-কার্য নির্বাহ করে না। অতএব জমি উত্তম কর্ষণ হয় না। অর্থাভাবে বলিষ্ঠ গরু ক্রয় করিতে না পারায়, এবং জমি ভাল চাষ না হওয়ায় ক্রমে ঘাস জন্মে এবং জমির উর্বরতা শক্তিরও হ্রাস হয়। কৃষক বিলাস-পরায়ণ না হইলে এবং বিশেষ যত্ন করিলে মন্দ জমিও ক্রমে ভাল এবং অযত্নে ভাল জমিও মন্দ হইয়া যায়। রাজসাহীর জমি যেরূপ উর্বর, সেরূপ কৃষক পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিলে আরও প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্য জন্মিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

জমিদারের রাইয়তের প্রতি ব্যবহার এবং রাইয়তের জমিদারের প্রতি ব্যবহার— রাজসাহীর জমিদারের মধ্যে কেহ "মহারাজা", কেহ "রাজা", কেহ "রাজা বাহাদুর", কেহ "রায় বাহাদুর", কেহ 'রায় বায়াণ" কেহ "চৌধুরি", কেহ "খাঁ", উপাধি মুসলমান সম্রাট বা ইংরাজ সম্রাট হইতে পাইয়া, সম্মানিত হইয়াছেন। আবার কোন জমিদারের রাজ প্রদত্ত চিহ্নিত উপাধি না থাকিলেও হিন্দু সমাজে তাহারা বিশেষ সম্মানিত। রাজসাহীতে বড় ছোট অনেক রাজা জমিদারের বাস। ইহারা প্রায় সকলেই হিন্দু এবং অধিকাংশই সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন আদি বংশও নিতান্ত কম নহে। অতি পূর্বে রাজসাহীর জমিদারগণ বিশেষত ব্রাহ্মণ জমিদারগণ সংস্কৃতে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাহাদের বিষয়জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান নিতান্ত প্রশংসনীয় ছিল।

তাহাদের অধিকাংশ নিজ রাজধানীতে থাকিয়া বা প্রত্যক্ষ সংস্রবে থাকিয়া আপন আপন রাইয়তের সুখ দুঃখের কথা শুনিয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। আজকাল বঙ্গের কোন কোন জমিদারের ন্যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বা প্রাচীন স্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় নিজ নায়েব বা দেওয়ানের প্রতি নিজ জমিদারির ভার অর্পণ করিয়া, পুর্বে জমিদারগণকে স্থানান্তর গমন করিতে হইত না। প্রাচীন স্থান অস্বাস্থ্যকর নিবন্ধনে বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে কোন কোন জমিদার স্থানান্তর বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ শ্রেণির জমিদারের সহিত রাইয়তের দেখা সাক্ষাৎ দেওয়ানের বা নায়েবের মুখে বা জমা জমির কাগজে। আবার কাহারও সহিত কোন প্রকারেই সাক্ষাৎ নাই। কোন কোন জমিদার নিজ রাইয়তকে চিনেন না এবং কোন কোন রাইয়তও জমিদারকে চিনে না। এ শ্রেণির জমিদারের দেওয়ান বা নায়েব সর্বময় কর্তা। জমিদার স্বয়ং যেরূপ স্নেহ ও মমতার সহিত রাইয়তকে পালন করিবেন, সেরূপ দেওয়ান বা নায়েব দ্বারা কোন মতেই আশা করা যায় না। যে জমিদার সম্পূর্ণরূপে দেওয়ান বা নায়েবের উপর নির্ভর করেন, তিনি তাহার জমিদারির আভ্যন্তরিক কার্যাদিতেও সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। এ শ্রেণির জমিদার কেবল মুনাফার টাকা লইয়া নিজ ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিলেই কৃতার্থ মনে করেন। ইহার আয় বৎসরের হিসাবের প্রতি দৃষ্টি নাই। আবশ্যক মত অর্থ না পাইলে দেওয়ান বা নায়েব অকর্মণ্য বলিয়া ইহার ভ্রম জন্মিতে পারে। অতএব দেওয়ান বা নায়েব অর্থের সরবরাহ করিলেই প্রভু সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাহার চাকুরি স্থির থাকিবে, তখন রাইয়তের প্রতি স্নেহ মমতা না করিয়া রাজস্ব ব্যতীত ভিক্ষা গ্রাম খরচা প্রভৃতি নানা আবওয়াবে রাইয়তের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ান বা নায়েব কিয়দংশ জমিদারকে দিয়া সরফরাজ হন এবং কিয়দংশ নিজে বাক্সবন্দি করেন। এমতাবস্থায় রাইয়তের কষ্ট ভিন্ন কি? রাজসাহীতে এরূপ জমিদারও অনেক আছে যাহারা কেবল ন্যায্য রাজস্ব, সেস, সুদ, জমিপত্তনের নজর লইয়া সন্তুষ্ট। ইহারা কোন বাবদে কখনও রাইয়তের নিকট হইতে কোন অন্যায্য কর লইতে ইচ্ছা করেন না এমত নহে, রাইয়তের গৃহে অগ্নি দাহ হইলে, দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইলে, মড়ক লাগিলে অর্থ দিয়া, আহার, ঔষধ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাদের ধনাগার জমিদারের নহে। প্রজার ধন প্রজার উপকারের জন্য জমিদারের নিকট গচ্ছিত আছে।[১২] আবার দরিদ্র রাইয়ত ন্যায্য কর দিতে অশক্ত হইলে তাহার অনাদায়ী কর মাপ দিয়া থাকেন। ইহারাই রাইয়তের পিতা, ইহারাই দরিদ্র রাইয়তের প্রকৃত জমিদার। পক্ষান্তরে দুই একটি এরূপ জমিদারের নাম শুনা গিয়াছিল যে তাহার বার্ষিক যত জমা তাহার বার্ষিক তত ভিক্ষা বা কোন স্থলে জমারও বেশি ভিক্ষা, হস্তী ক্রয়ের ভিক্ষা, স্কুল খরচা প্রভৃতিও রাইয়তের নিকট আদায় করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইহারাই রাইয়তের যমস্বরূপ। এরূপ অত্যাচারেও দরিদ্র রাইয়ত জমিদারের পদানত এবং আজ্ঞাবহ ছিল। জমিদার ও রাইয়তগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রকার দৌরাত্ম্য ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। জমিদারগণ সুশিক্ষিত এবং ধর্ম পরায়ণ হইলে রাইয়তের প্রতি অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অশিক্ষিত জমিদারগণের হিতাহিত জ্ঞান না থাকায় রাইয়তের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করাকেই কৃতার্থ মনে করেন। মোটের উপর বলিতে গেলে এক্ষণ বড় ছোট অনেক জমিদার শিক্ষিত এবং ন্যায়পরায়ণ রাইয়তের সুখ দুঃখের কাহিনী স্বকর্ণে শুনিয়া, রাইয়তের অবস্থা দেখিয়া স্নেহ ও মমতার সহিত তাহাদিগকে পালন করেন এবং কেবল উচিত রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া ইহারা যে কেবল গবর্ণমেন্ট সমীপে এবং রাইয়ত সমীপে প্রশংসনীয় হন এমত নহে ; প্রজাপালনে ঈশ্বরও জমিদারের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।[১৩] মহানির্বাণতন্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে, যে রাজা প্রজার ধনে লোভ করিবেন না এবং নিয়ম মত কর গ্রহণ করিয়া প্রজাসমূহকে পুত্রবৎ পালন করিবেন।[১৪]

"গচ্ছিত ধনের এক কপর্দকও রাজা নিজের সুখের জন্য খরচ করিতে অধিকারী নহেন।

প্রজার ধন রহিয়াছে শুদ্ধ প্রজার সুখের জন্য, প্রজার অভাবের জন্যে। যে রাজা এই ধনের এক কপর্দকও নিজের অর্থে খরচ করেন তিনি ঘোর বিশ্বাসঘাতক; তাহার মত নিমক হারাম আর দ্বিতীয় নাই। সে রাজার ইহলোকে দারুণ অযশ পরলোকেও ঘোর দুর্গতি।" বঙ্গবাসী—৯ জুন ১৯০০।

রাজসাহীর রাইয়ত সাধারণতঃ নিরীহ এবং প্রভুভক্ত; কিন্তু কোন কোন স্থলে আজ কাল রাইয়ত জমিদারের অবাধ্য দেখা যাইতেছে। কৃষক স্বভাবতঃ সরল এবং সর্বদা সন্তোষ চিত্তে কালযাপন করে। শস্যের সময় ইহারা আনন্দময়। অর্থ না থাকিলেও শস্যের সময় শস্যের বিনিময়ে কেহ মৎস্য, কেহ দধি, কেহ মিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন কৃষকের বড়ই আনন্দ। কিন্তু কৃষকজীবন বড় কষ্টকর। চাষের সময়, রোপণ সময়, শস্য কর্তন সময়, রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, কৃষকের মাথার উপর দিয়া যায়। এরূপ কষ্টে ও দুঃখেও যদি কৃষক ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ দেখে এবং সমুদয় শস্য গৃহে গোলাজাত করিতে পারে, তবে সেই দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং আনন্দে উচ্ছলিয়া উঠে। এইরূপ শ্রমলব্ধ সামান্য অর্থ মধ্যে জমিদার মহাজনের ন্যায্য কর দিয়াও যদি কৃষক সমুদয় বৎসরের সংসার উপযোগী শস্য রাখিতে পারে, তবে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। জমিদার শিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ হইলে কৃষকের কোন দুঃখের কারণ উত্থিত হয় না। নতুবা বৎসরের খোরাকের শস্য বিক্রয় করিয়া জমিদারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য আবওয়াব দিতেই সমস্ত ফুরিয়া যায়, অবশেষে পেটের দায়ে মহাজনের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। এমতাবস্থায়ও রাইয়ত জমিদারের পদানত ও আজ্ঞাবহ। জমিদারের বাড়িতে কোন কোন বিবাহ, কোন পূজা বা কোন কার্য উপস্থিত হওয়ায় রাইয়তের কায়িক সাহায্য আবশ্যক হইলে, তাহারা অতি আহ্লাদের সহিত সাহায্য করিয়া থাকে। যে রাইয়ত এইরূপ সরলভাবে জমিদারের কার্য করে, সে জমিদারও রাইয়তকে পুত্রের ন্যায় প্রচুর আহার দিয়া, মিষ্ট বাক্যে সন্তোষ করিয়া বিদায় করেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার রাইয়ত অপেক্ষা রাজসাহীর রাইয়ত অতি সরল এবং প্রভুভক্ত, আবার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা রাজসাহীর অধিকাংশ জমিদারই নিরীহ, রাইয়তের প্রশংসার পাত্র এবং পিতার ন্যায় সম্মানিত হন। রাজসাহীতে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে রাইয়তের বাড়িতে কোন নূতন ফল জন্মিলে জমিদারকে না দিয়া রাইয়ত অগ্রে ভক্ষণ করে না। ইহাই রাইয়তের জমিদারের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির চিহ্ন। রাইয়তের গৃহে শস্য থাকিতে জমিদারের ন্যায্য গণ্ডা দিতে কোন আপত্তি করে না। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে রাইয়ত জমিদারের বাধ্য এবং জমিদারের কোন অবাধ্যের কার্য করিয়া তাহার অসন্তোষের ভাজন হইতে ইচ্ছা করে না। আইন আকবরী হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাইয়তের এইরূপ ব্যবহার প্রায়ই দেখা যাইতেছে।[১৫]

এস্থলে বঙ্গের জমিদার ও রাইয়তের সম্বন্ধে একজন বাংলার সিবিলিয়ান যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "জমিদার ও রাইয়ত, যেমন রাজা ও প্রজা; যেমন সম্রাট ও অধীনস্থ প্রজা। জমিদার যাহা আদেশ করিবে রাইয়ত তাহা প্রতিপালন করিবে। জমিদার নিজ আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা, অভিমান প্রভৃতি নীচ প্রকৃতি অনুসারে রাইয়তের নিকট হইতে অন্যায্য কর আদায় জন্য অত্যাচার করিবেন। নায়েবের খোরাকী, আমলাদের বেতন, সরকারি ইন্‌কাম ট্যাক্স, নিজের হস্তী ক্রয়, নিজ কাছারির কাগজ, কলম, কালি আদির ব্যয়, দাখিলা আদি ছাপান ব্যয়, প্রতিবেশী নীলকর সহিত বিবাদ বাবত ব্যয় এবং মেজিস্ট্রেট নিকট কোন অপরাধে দণ্ডনীয় হইলে সেই দণ্ডের টাকা, প্রভৃতি জমিদার রাইয়তের নিকট অন্যায় আদায় করিবে। গোয়ালা রাইয়ত দুগ্ধ দিবে, কলু তৈল দিবে, তাঁতি কাপড় দিবে, ময়রা সন্দেশ দিবে এবং জালুয়া মৎস্য দিবে। মহোৎসব, সন্তান জন্ম, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, এবং বিবাহ উপলক্ষে জমিদার রাইয়তের নিকট হইতে অন্যায্য কর আদায় করিবে। কোন স্ত্রীর সহিত গুপ্ত সহবাসে সন্তান উৎপন্ন হইয়া

ভ্রূণ হত্যা হইলে, সেই অপরাধী রাইয়ত প্রচুর অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। জমিদারের নিজের খোয়াড় আছে এবং প্রজার শস্য ক্ষেত্রে পদার্পণে প্রত্যেক পশুর জন্য চারি আনা আদায় করিবে। জমিদারগণ মধ্যে এইরূপ অন্যান্য কর আদায় হয়"।[১৬] ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া আমরা অনুমান করি। তথাপি রাজসাহীর জমিদারগণ মধ্যে যে এ দোষের কোন একটি দোষ একবারে ছিল না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু জমিদারগণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুদক্ষ শাসন প্রণালীতে এই দোষ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ গবেষণায় এবং শাসন কৌশলে জমিদার ক্রমে সুসভ্য এবং দোষশূন্য হইয়া উঠিতেছে এবং রাইয়তের অন্যায়ভার কমিয়া আসিতেছে। রাইয়তের সহিত জমিদারের সম্বন্ধ সন্তোষজনক ও শান্তিপূর্ণ। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে রাজসাহী বিভাগের কমিশনর সাহেব বলিয়াছেন যে "ভূম্যধিকারীর সহিত রাইয়তের যে সম্বন্ধ তাহা সাধারণত শান্তিপ্রদ"।[১৭]

জমিদারের অবস্থা— দুই চারি জন বড় বড় জমিদার ব্যতীত রাজসাহীর জমিদারের অবস্থা সাধারণত সে বড় সন্তোষজনক তাহা আমাদের বিশ্বাস নাই। বঙ্গের জমিদার সাধারণত অলস, উচ্চ শিক্ষায় অরুচি, বিলাসী, অমিতব্যয়ী, অভিমানী, "খানদানী" প্রিয় ও. বৃথা আমোদপ্রিয়। রাজসাহী জমিদার মধ্যে এসকল দোষ অল্পস্থলেই দৃষ্ট হয়। রাজসাহীর জমিদার শ্রেণি মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দোষও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই প্রকারের দোষ কমবেশি জমিদারগণ মধ্যে প্রচলিত হইলে, সে জমিদারকে দেওয়ান বা নায়েবের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং রাইয়তের প্রতি অত্যাচারও কম হয় না; অবশেষে জমিদারিও ধ্বংস হয়। রাজসাহীর পক্ষে এই একটি শুভ যে, সমস্ত দোষগুলি একাধারে প্রায় দেখা যায় না। যে জমিদারের একটি বা দুইটি দোষ আছে, তাহার গুণরাশি সে দোষকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যাহাকে সমস্ত দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহার জমিদারি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজসাহীতে শিক্ষিত জমিদারের সংখ্যা আজকাল নিতান্ত কম নহে, কিন্তু বিষয় জ্ঞানবিশিষ্ট ও জমিদারি-কার্যপটু জমিদারের সংখ্য বেশি নহে। অশিক্ষিত ব্যক্তির নানা দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অশিক্ষিত বিষয়-জ্ঞানবিহীন জমিদারগণ মধ্যে অধিকাংশই অমিতব্যয়ী ও বিলাসপরায়ণ। এই দুইটি দোষই ঋণের প্রধান কারণ। ঋণের আর একটি প্রধান কারণ আছে। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি। হিন্দু আইন-অনুসারে একটি ক্ষুদ্র জমিদারিতে বহুতর অংশ ক্রমে হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ক্ষুদ্র তালুকদারেরা সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসান্তর অবলম্বন করিলে ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জমিদার বা তালুকদার মধ্যে সাধারণত উচ্চশিক্ষার অরুচিতেই নানা দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। এই জন্য রাজসাহীর জমিদারগণ মধ্যে অনেকে ঋণগ্রস্ত। যাহাদের ঘরে নগদ ঋণ সঞ্চিত নাই এবং ঋণও প্রচুর, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ শ্রেণির জমিদারগণের লাটের সময় প্রায় মহাজনের দ্বারে দ্বারে, মাড়ওয়ারির ঘরে ঘরে দৌড়িতে হয়। আবার কখন কখন অলঙ্কার প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার অভিপ্রায়ে মহাজনের দ্বারে যাইয়া তাহাদের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। তখন সুদের হারের দিকে দৃক্‌পাত নাই, টাকা পাইলেই হইল। মাসিক ২/৩ টাকা হারের সুদেও চক্রবৃদ্ধির কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই। এরূপ অবস্থায় যে জমিদার টাকা ঋণ করিয়াও লাটের টাকার জন্য, সুখ-বিলাস সম্ভোগের জন্য, বা অনাবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় জন্য প্রস্তুত হন; তাহাদের জমিদারি ধ্বংস হইবে বা মহাজনেব ঘরে যাইবে তাহার আর আশ্চর্য কি? বঙ্গের ছোট ছোট জমিদারগণও সম্ভ্রান্ত ধনী ভদ্র লোকদের মধ্যে পূর্বে অনেকে "খানদানী" প্রিয় ছিলেন। পূর্বে এরূপ রীতি দেখা গিয়াছে যে, নিজে ছাতা ধরিলে, জমিদারের পক্ষে নিতান্ত অপমানের কথা ছিল। কিন্তু বড় বড় রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনী ভদ্র লোকেরা উচ্চশিক্ষা-বলে এ প্রথা রহিত করেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত ছোট ছোট জমিদারগণের মধ্যে এ দোষ অনেক পরিমাণে সংশোধন হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা এক্ষণ বিস্তর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণ

অনেক বড় বড় জমিদারও পূর্বের ন্যায় "খানদানী" দেখান না। ইহাই রাজসাহীর পক্ষে শুভ। বড় বড় রাজা জমিদার মধ্যে একবারে "খানদানী" উঠিয়া যাওয়াও উচিত নহে। রাজ-দরবারে বা সময় কালে, অবস্থা ও ব্যক্তি বিবেচনায় "খানদানী" দেখান একবারে অনুচিত বোধ হয় না। সকল সময় সকলের নিকট এবং সকল অবস্থার "খানদানী" অপ্রিয় হইবারই কথা।

বঙ্গের অল্প সংখ্যক জমিদারের ঘরে নগদ টাকা সঞ্চিত আছে। যে জমিদারের ঘরে প্রচুর ধন সঞ্চিত থাকে, তাহার জমিদারি ধ্বংসের কোন আশঙ্কা থাকে না। কোন কোন জমিদারের আয় ব্যয় সমান।[১৮] কোন কোন জমিদার ঋণগ্রস্ত। এই দুই শ্রেণির জমিদারগণ ধ্বংসের ডালি মাথায় করিয়া লইয়া বসিয়া আছেন। দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ ইহাদের ধ্বংস হইবার কথা। যে দিন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে, যে দিন রাইয়ত ন্যায্য কর দিতেও অপারগ হইবে, যে দিন রাইয়ত মড়কে প্রপীড়িত হইয়া হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সেই দিন নিঃস্ব জমিদারগণের জমিদারি কি প্রকারে রক্ষা হইবে? তখন এই জমিদারগণ যাঁতার দুই চাকার মধ্যে মর্দিত হইবে। একদিকে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দাখিলের অপারগতা, আর এক দিকে রাইয়তের নিকট রাজস্ব আদায়ের অপারগতা; এই দুইটা চাকার মধ্যে জমিদার পেষিত হইলেই রাজ্য ধ্বংস। এই শ্রেণির জমিদারেব সংখ্যা রাজসাহীতে নিতান্ত কম নহে।

রাজসাহীর জমিদারগণ মধ্যে অধিকাংশই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। ব্রাহ্মণ কায়স্থের কন্যাদায় বিষম দায়। এক কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে সাধারণ জমিদারের ৩/৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ধনী করিতেছে এবং কোন কোন ব্যক্তিকে নিঃস্ব করিতেছে। অন্য দেশের জমিদার অপেক্ষা রাজসাহীর জমিদারগণের সামাজিক ও কুলজ ব্যয় নিতান্ত বেশি। ইহাতেও জমিদারগণকে দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত করিতেছে।

ইহা ইতিহাসে লিখিত আছে যে "হোসেন সার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনীগণ স্বর্ণ-পাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্যাদা পাইতেন"।[১৯] জমিদার ও ধনীগণের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে ইহা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। এখন বড় বড় রাজা জমিদারের গৃহেও স্বর্ণপাত্র অতিবিরল। ইহাও প্রতীত হয় যে বর্তমান জমিদারগণের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল নহে।

রাইয়তের অবস্থা— ছোট বড় জমিদাবগণের অধীন থাকিয়া যে ভূম্যাধিকারীকে কর দেয়, তাহাকেই রাইয়ত বুঝাইবে। রাজসাহীর এই রাইয়ত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ঃ—

(১) যে ব্যক্তি জমিদারকে কর দেয়। যথা— পত্তনীদার, মৌরসী, ইজারাদার, মৌরসী জোতদার, কায়েমি জোতদার, ইস্ত মুরারী জোতদার প্রভৃতি এবং অধীন মধ্য-স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্তর্গত। অর্থাৎ মোকররীহারে ভূমি-ভোগকারী রাইয়ত।

(২) উচ্চ, মধ্য বা নিম্নশ্রেণি (হিন্দু ও মুসলমান) রাইয়ত— যাহারা নিজে জমি চাষ করে না। ইহারা চাকর দ্বারা অথবা "বর্গা" বিলি দ্বারা শস্য সংগ্রহ করে। ইহারা খোদকস্তা বা পাইকস্তা; এবং দখলিস্বত্ববান রাইয়ত।

(৩) কৃষক— যে খোদকস্তা বা পাইকস্তা রাইয়ত (হিন্দু বা মুসলমান) নিজে জমি চাষ করে। দখলিস্বত্ববান ও দখলি স্বত্বশূন্য রাইয়ত এই শ্রেণিভুক্ত।

প্রথম শ্রেণির রাইয়তের অন্যায্য করের ভার বহন করিতে হয় না। ইহাদের অধীন যে কৃষক আছে, তাহারা রাইয়ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথম শ্রেণির রাইয়ত প্রায় জমিদারের ন্যায় অধীনস্থ রাইয়তের নিকট রাজস্ব আদায় করে। এই শ্রেণির রাইয়তেরা কেবল জমিদারের ন্যায্য কর, ন্যায্য মত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। ইহাদের সাধারণত অবস্থা ভাল। ইহাদের অবস্থা অনেক জমিদার অপেক্ষাও ভাল। ইহাদের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষিত। অনেক জমিদার অপেক্ষা ইহাদের আয় বেশি।

দ্বিতীয় শ্রেণির রাইয়তের মধ্যে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিরা জমিদারের নিকট সম্মানিত। ইহাদের অনেকের ৫০ বিঘা হইতে ৫০০ শত বিঘা পর্যন্ত জোত আছে। ইহাদের বার্ষিক আয় ৩০০ শত হইতে ৩০০০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। ইহারা অনেক অন্যায্য কর হইতে রক্ষা পায়। ইহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা ভাল, ইহারা প্রায়ই ঋণী নহে। আজকাল জমিদারি অপেক্ষা সরাসরি জোতের লাভ বেশি বলিয়া, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারও সরাসরি জোত ক্রয় করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে সরাসরি জোতের জন্য জমিদারের নজর বেশি হইয়াছে এবং এই প্রকার জোতেরও যথেষ্ট আদর হইয়াছে। এই প্রণালীতে কৃষক রাইয়তের ক্ষতি এবং অনেক কৃষক রাইয়ত ইহাদের "কোর্ফা" রাইয়ত বা "বর্গা" রাইয়ত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণির রাইয়তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই কৃষক রাইয়তের অবস্থা হীন হইবার সম্ভাবনা। এমন দিন হইতে পারে যে কৃষক মাত্রই "কোর্ফা" রাইয়ত হইবে। "কোর্ফা" রাইয়তের স্বত্ব ও অধিকার নিতান্ত দুর্বল।

তৃতীয শ্রেণির রাইয়ত কৃষক। এই শ্রেণির রাইয়ত স্বয়ং চাষ করে। কৃষক জমিদারের ও জমিদারের অধীনস্থ মোকররী হারে ভূমি ভোগকারীদের অধীন থাকিয়া স্বয়ং ভূমি চাষ করে। ইহাদের সহিত জমির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ইহারা হিন্দু ও মুসলমান। কিন্তু হিন্দু কৃষকের সংখ্যা নিতান্ত কম; কৈবর্ত প্রভৃতি হিন্দুরাই কৃষক শ্রেণি ভুক্ত। এই কৃষক শ্রেণির রাইয়ত আমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিলাম; যথা— উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। ৩০ বিঘা কি তদূর্ধ্ব জমি যে কৃষক চাষ করে, তাহাকে উচ্চ শ্রেণি ; ১১ বিঘা হইতে ২৯ বিঘা পর্যন্ত জমি যে কৃষক চাষ করে, তাহাকে মধ্যম শ্রেণি; এবং ১ বিঘা হইতে ১০ বিঘা পর্যন্ত জমি যে কৃষক চাষ করে তাহাকে নিম্ন শ্রেণিভুক্ত করিলাম। রাজসাহীতে উচ্চ শ্রেণির কৃষক কম; বেশি উচ্চ শ্রেণির কৃষক নাই। আবার কোন গ্রামে উচ্চ শ্রেণির কৃষক একবারে নাই।

নিম্নশ্রেণি ভুক্ত কৃষকের মধ্যে ১ বিঘা হইতে ৫ বিঘা জমি চাষ করে এইরূপ কৃষকই বেশি। গ্রামে এমন শ্রম-জীবী লোক আছে যাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের সংখ্যা শতকরা ১০ হইতে ১৫ জন পর্যন্ত দেখা যায়। নিম্নশ্রেণি কৃষকের মধ্যেও অনেকে শ্রম-জীবী। কোন্ প্রকার জমিতে প্রত্যেক বিঘার রাজস্ব ও চাষ করিবার ব্যয় বাদে কৃষকের ন্যায্য আয় কত হয় তাহার একটা মোটমুটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) ধান্য	৩৲ প্রতি বিঘায়	(৬) গাঁজা	৩০৲ প্রতি বিঘায়
(২) সর্ষপ, রাই, তিল প্রভৃতি	৪৲ প্রতি বিঘায়	(৭) তুঁত	৫৲ প্রতি বিঘায়
(৩) পাট	৮৲ প্রতি বিঘায়	(৮) নানাপ্রকার কলাই	২৲ প্রতি বিঘায়
(৪) ইক্ষু	১৫৲ প্রতি বিঘায়	(৯) গম	৩৲ প্রতি বিঘায়
(৫) হরিদ্রা	২৫৲ প্রতি বিঘায়	(১০) তামাক	৫৲ প্রতি বিঘায়

"কালেক্টর সাহেব অনুমান করেন যে বিঘা প্রতি ৯ মণ ধান্য উৎপন্ন হয়।"[২০] এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু অনেক পূর্বে ভড়ে ও বরেন্দ্র ভূমের উত্তম জমিতে ইহা অপেক্ষা বেশি ধান্য হইত। "এক হালে ১৬/১৭ বিঘার বেশি জমি চাষ হয় না।"[২১] ধান্য ও অন্যান্য শস্যে যে আয় হয় তাহার গড় ধরিয়া উচ্চশ্রেণির কৃষকেরা বার্ষিক আয় ৩০০৲ টাকা, মধ্য শ্রেণি কৃষকেরা ১২০৲ টাকা এবং নিম্নশ্রেণি কৃষকের ৬০ টাকা অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্বে লিখিত তালিকা-আনুমানিক। ঠিক তালিকা প্রস্তুত করা নিতান্ত সহজ নহে। এই তালিকা সংস্রবে ইহা বলা যাইতে পারে যে রাজসাহীর ভড় ও বরেন্দ্র ভূমিতে কেবল ধান্য এবং পলিতে ধান্য নিতান্ত কম, কিন্তু অন্যবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। তাহা বলিয়া পলিতে যে ধান্য ব্যতীত পূর্বের তালিকার সকল প্রকার শস্য এক গ্রামে হয় এমত নহে। পলির এক স্থানে হরিদ্রা ও ইক্ষু জন্মে, এক স্থানে গাঁজা ও আলু জন্মে। এইরূপ রাজসাহীর পলি জমিতে শস্য উৎপন্ন হয়।

স্থানানুসারে শস্য উৎপন্নের তারতম্যে কৃষকের অবস্থারও তারতম্য আছে। বরেন্দ্র ও ভড়ের কৃষকেরা একমাত্র ধান্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সেই ধান্য কোন বৎসর না জন্মিলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়া উঠে। পলিতে এক বৎসর একাধিক শস্য পাইলেও অন্নকষ্ট নিবারণ হয় না।

রাজসাহীতে যেরূপ সকল প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়, তাহাতে সকলেরই এই প্রতীত হইবে যে কৃষকের অবস্থা ভাল। কিন্তু গ্রাম গ্রাম বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহা জানা যাইবে যে, কৃষকের ঋণ নাই এরূপ কৃষক অতি বিরল। প্রচুর শস্য জন্মাতেও যে কৃষক এরূপ ঋণগ্রস্ত হয় কেন? ইহার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতা। এই সুখ বিলাসিতার স্রোত সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে প্রবাহিত। এ স্থলে সেকালের এবং একালের কৃষকদের অবস্থার তারতম্য করা আবশ্যক।

সেকালের কৃষকের সম্পত্তি মৃন্ময় কলস, ঘটি, বাটি, থালা, গাড়ু প্রভৃতি। শয্যা তাহার তালাই বা কাঁথা। রৌদ্র বা বৃষ্টি নিবারণ জন্য তালপত্রের বা বাঁশের পাতার ছাতা বা মাথুল। শীত নিবারণ জন্য দেশীয় মোটা কার্পাস বস্ত্র। পুণ্যাহ সময়, রাজদরবারে বা জমিদারের কাছারি যাইবার সময়, কোন কোন অবস্থাপন্ন কৃষক পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করিত। সেকালে কৃষকের চিহ্নই লেঙ্গটি পরিধান, হাতে হুঁকা ও অগ্নি-পাত্র এবং স্কন্ধে লাঙ্গল। কৃষকপত্নীর হস্তে কাঁসার খাড়ু বা লোহার খাড়ু ও মৃন্ময় চুড়ি। এরূপ অবস্থায়ও কৃষক আনন্দময়, যদি তাহার ঘরে বৎসরের আবশ্যকীয় ধান্য সঞ্চিত থাকে। সেকালের কৃষকের শস্যই সম্পত্তি, শস্যই ধন, শস্যই টাকা কড়ি। অন্ন কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে উদরপূর্ণ করিতে পারিলে, সেকালের কৃষকের আনন্দের সীমা থাকিত না। গৃহ শস্যপূর্ণ থাকিলে, সেকালের কৃষকের কোন অভাবই ছিল না। সেকালের কৃষকেরা, ঋণকে বড়ই ভয় করিত। টাকা কর্জ করিয়া কৃষক একালের ন্যায় মহাজনকে রীতিমত ষ্ট্যাম্পে খত লিখিয়া দিত না বা খত রেজেষ্টরী করিয়া দিত না। তথাপি মহাজনের সহিত সেকালের কৃষক অধর্মাচরণ প্রায়ই করিত না। দুর্ভিক্ষে বা অন্য কোন দৈব নিবন্ধনেও সেকালের কৃষক সকল ঋণগ্রস্ত হইত না। অনেক কৃষকের গোলাতে শস্য সঞ্চিত থাকিত।

একালের কৃষকের সম্পত্তি পিতলের কলস, ঘটি, গাড়ু বা বদনা; কাঁসার থালা, বাটি ও গেলাস। শয্যা শতরঞ্চ, লেপ, পাটি ও কম্বল। রৌদ্র বা বৃষ্টি নিবারণ জন্য কাপড়ের, বেতের বা লৌহ শিকের রেলির ছাতা। শীত নিবারণ জন্য বিলাতি র‍্যাপার এবং অর্ধ-গঞ্জী। এবং কাহারও পায়ে জুতা। লজ্জা নিবারণ জন্য বিলাতি লংক্লথ বা মার্কিন বা বিলাতী নানা প্রকার পাড়িয়া ধুতি। এমত বাবু পোশাকেও স্কন্ধে ধান্যভার এবং মাথায় রেলির বাড়ির ছাতা। পুণ্যাহ সময় বা রাজদরবারে অনেকে ফিট্‌বাবু। ইহাদের পরিচ্ছদ ও বেশভূষা দেখিয়া অনেক সময় ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। একালে কৃষকের পরিচ্ছদ দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। কেবল লাঙল ও মই স্কন্ধে দেখিয়া কৃষককে চিনিতে পারা যায়। কৃষক পত্নীরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন। সোনা রূপার অলঙ্কারও কাহার হস্তে দেখা যায় এবং পরিধানে পাছা পাড়িয়া বিলাতি কাপড়ও দেখা যায়। সেকালের কৃষক-পত্নীর ন্যায় একালের কৃষক পত্নী ঘরে চরকা ঘুরায় না। এই চিত্র অবলোকনে কৃষকের অবস্থা ভাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু হায়! জমিদার ও মহাজনদের দেয় দিয়া নিজ বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিলে কৃষকের গৃহে বৎসরের আহার্য ধান্য পাওয়া দূরে থাকুক, বীজের জন্য ধান্যই থাকে কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাজার রাজস্ব বাকি ফেলিয়া বাবুগিরির ত্রুটি হইবে না। কৃষক অমনি মহাজনের বাটিতে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। মহাজনের নিকট জমি বন্ধক রাখিয়া বা খাই-খালাসী দিয়া কৃষক বাবুগিরির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এক শ্রেণির কৃষক জমিদারের ন্যায্য রাজস্ব বাকি ফেলে। সেকালের কৃষক জমিদার ও মহাজনদের দেয় সমানভাবে পরিশোধ করিত। একালের কৃষক মধ্যে কেহ জমিদারের খাজানা পরিশোধ করিল, কেহ কিয়দংশ দিল এবং মহাজনকে ২/১ টাকা দিয়া হাকাইয়া দিল। মহাজন নিরুপায় হইয়া

আদালত অবলম্বন করিল। অবশেষে ঋণ করি নাই বলিয়া কৃষক আদালতে জবাব দিয়া রক্ষা না পাইলে, হয়ত মহাজন জমি নিজ নামে ক্রয় করিয়া লইল, না হয়ত চতুর জমিদারের কবুলিয়তের শর্তে অনুযায়ী মহাজন জমির ত্রি-সীমানায় যাইতে পারিল না। মহাজনের টাকাই সমস্ত নষ্ট। পূর্বের ন্যায় মহাজনের অত্যাচার নাই বটে, কিন্তু কৃষক মহাজনকে ফাঁকি দিতে পারিলে ক্রটি করে না। ২০/২৫ বৎসর পূর্বেও কৃষকেরা নিয়তকাল ঋণ জালে জড়িত থাকিত না। হন্টার সাহেবের লিখাতে ইহা বিশেষ প্রমাণ হইবে।[২২] বর্ষার সময় ঋণ করিয়া শস্যের সময় সুদ সমেত সমস্ত টাকা কৃষক পরিশোধ করিত। এখন প্রায় কৃষকের ঋণ নিয়তকাল লাগিয়া আছে। এমন অনেক কৃষক দেখা যায় যে যাহার এক হালের জমি, তাহার ঋণ ৪০০/৫০০ টাকার কম নহে। এই শ্রেণির কৃষকও কম নহে।

যেমন ভদ্রলোক বিলাসপরায়ণ হইয়াছেন, তেমনই কৃষক সন্তানেরাও বিলাসপরায়ণ হইয়াছে। রাজসাহীর অনেক স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। কোন স্থানে এক সপ্তাহ, কোন স্থানে দুই সপ্তাহ, কোন স্থানে তিন সপ্তাহ মেলা স্থায়ী থাকে। মেলায় নানা দেশ হইতে নানা প্রকার দ্রব্য আসিয়া এক একটি সুন্দর বাজার বসে। ইহাতে বিলাস দ্রব্যের আমদানিই বেশি। এই সকল দ্রব্যের চাকচিক্যে কৃষক সন্তান মোহিত হয়। কৃষক সন্তানেরা বিলাস দ্রব্যের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অর্থ না থাকিলে এবং আবশ্যক না হইলেও, অর্থ কর্জ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। ঐ প্রণালীতে কৃষকের যে কেবল অর্থনাশ হয় এমত নহে, কৃষক ঋণ গ্রস্ত হইয়া নিজ তেজ হারাইতেছে ও সুখ বিলাসিতার বৃদ্ধিতে অকর্মণ্য হইতেছে। এইরূপে কৃষক দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত হইতেছে। কৃষকের হীন অবস্থায় জমিদারের দুঃখ এবং পতন। এই মেলার প্রণালীতে কৃষকেরা সুখ-প্রিয়, বিলাস-পরায়ণ এবং ঋণগ্রস্ত হইতেছে। কৃষক শ্রমজীবী, অতএব ইহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ নির্দোষ আমোদ ও সুখ নিতান্ত ভাল। যাহাতে তেজ, বলবীর্য ও অর্থ ক্ষয় হয়, তাহা কৃষকের পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ। এই দোষাবহ সুখ ও আমোদ কৃষক সন্তানকে দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত করিতেছে। অর্থ ও শারীরিক বলবীর্য ক্ষয়ে, কু-শিক্ষার আশ্রয়ে, অসচ্চরিত্র ও অধর্ম অবলম্বনে এবং বিলাস পরায়ণতায় কৃষক নষ্ট হইলে জমিদারের জমিদারির সুখ নষ্ট হইতেছে। কৃষকের অর্থে জমিদারের অর্থ, কৃষকের বলে জমিদারের বল, কৃষকের সৌভাগ্যে জমিদারের সৌভাগ্য। রাইয়তের অর্থ বৃদ্ধি করা, তাহাকে সুশিক্ষিত করা, বলবান করা, সচ্চরিত্র করা এবং ধার্মিক করা জমিদারের কর্তব্য কর্ম। আইন আকবরীতে দেখা যায় "আমিল গুজার" ও "কানুনগো" নামক কর্মচারীর সহিত কৃষকের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। "আমিল গুজার" কৃষকের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। ইনি কৃষকের বন্ধু ছিলেন। কৃষক যাহাতে উন্নতি লাভ করে, ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। কানুনগো কৃষককে রক্ষা করিতেন। এই দুই জনের উপর কৃষক সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। আমাদের জমিদার বা জমিদারের দেওয়ান কৃষকের নিকট এখন "আমিল গুজার" (বা রাজস্ব আদায় করেন) এবং তাহার নায়েব বা গোমস্তাকে "কানুনগো" বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। জমিদার, তাহার দেওয়ান, নায়েব ও গোমস্তা "'আমিল গুজার" ও "কানুনগোর" ন্যায় কৃষককে পালন ও রক্ষা করিলে কৃষকের কোন দুঃখের কারণ হয় না।[২৩] কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা রাজা জমিদারের শুভ। কৃষকের মঙ্গলেই রাজা জমিদারের মঙ্গল।

---

১. "The Village Communities", Says Lord Met-Calfc, "are little republics, having nearly everything that they want within themselves and almost independent of any foreign relations"— The Fifth Report From the select committee on the affairs of the East India Company—

২. ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৩. "The villagers are neither attacked at home by robbers in the night, nor are their homes laid in ruins by an invading army."— The Citizen of India

৪. Raiyat means primarly a person who has acquired a right to hold land for the purpose of cultivating it by himself or by members of his family or by hired servants or with the aid of parteners, and includs also the successors in interest of persons who have acquired such a right"— The Bengal Tenancy Act.

৫. Mr Dutt says in his epilogue— "The Mahabharata depicts the political life of ancient India, with all its valour and heroism, ambition and lofty chivalry The Ramayan embodies the domestic and religious life of ancient India, with all its tenderness and sweetness, its indurance and devotion The one picture without the other was incomplete, and we should know but little of the ancient Hindus, if we did not comprehend their inner life and faith as well as their political life and their warlike virtues The two together give us a true and graphic picture of ancient Indian life and civilization, and no nation on earth has preserved a marc faithful picture of its glorious past."— Quoted in the Indian Review, Vol.1, 1900

৬ "Akbar's revenue system, though celebrated for the benifits, it conferred on India, presented no new invention. It only caried the previous system into effect with greater precition and conectness : it was in fact, only a continuation of a plan commenced by Shirshah, whose short regin did not admit of his extending to all parts of his kingdom."— Elphinistone's History of India, Book IX, Chapter III.

৭. ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৮. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাস।

৯. "But amongst the many evils resulting from this permanent settlement, perhaps the worst has been that it has acted as a wall shutting out the great agricultural population from the cognizance of the British officials."— The Statesman, September I, 1880.

১০. "Agriculture in India has become and becomes, daily more and more what Liebig happily designated a system of Spoliation."— The Statesman, November I, 1880

১১. "Native cultivators as keenly appreciate the smallest differences in the relative qualities of different soils as do the best European farmers."— The Statesman, Novemeber, 1880

১২. কাবুলেব আমীর যথার্থই পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন, "মনে থাকে যেন, রাজকোষ রাজার নহে, প্রজার ধন ভাণ্ডার, বাজার তত্ত্বাবধানে আছে মাত্র, প্রজার ধন রাজার হস্তে গচ্ছিত আছে মাত্র।"

১৩. শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়।

১৪. "অনোভীস্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্ণীয়াৎ সম্মিতং করম্
রক্ষণঙ্গীকৃতং ধর্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ।
মহানির্বাণ তন্ত্র অষ্টম-উল্লাস।

১৫. "The ryats (ravjyat) of Bengal are obedient and ready to pay taxes. During eight months of the year they pay the required sums by instalments They personally bring the money in rupees and gold-mohurs in the appointed place. Payment in kind is not usual. Grain is always cheap The people do not object to a survey of the lands and amount of the land tax is settled by the collector and the ryat. His majesty, from kindness, has not altered this system."— Ain Akbari.

১৬. "The Zemindar and ryat are as king and people; they are monrch and subject What the Zemindar asks, the ryat will give; what the Zemindar orders, the ryat will obey. The

land-lord will tax his tenants for every extra-vagance that avarice, ambition, pride, vanity or other intemperance may suggest. He will tax him for the Khuraki of his naib, for the salary of his amin, for the purchase of an elephant for his own use, for the cost of the stationery of his establishment, for the cost of printing the forms of his rent receipt, for the payment of his expenses & C.... ... These cesses pervade the whole Zemindari system."— The Statesman, Septemper I 1880.

১৭ "The relations between land lords and tenants are generally peaceful."— Rajsahi Division's Administration Report for 1898-99.

১৮. The expression "living from hand to mouth" is alluded to here.

১৯ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

২০-২১. Hunter's Statistical Accounts.

২২. "Very few cultivators of Rajshahi are continuously in debt ; but most of them incur liabilities to the village merchant at seed time in the shape of advances of grain which are repaid with interst after the rice crop has been harvested".. .... Hunter's Statistical account, Rajshahi.

২৩. "The Amilguzzor is the collector of revenues He must consider himself the immediate friend of the husband-man" "The Canoongoo is the protector of husbandman.". ... Ayan Akbari.

ত্রয়োদশ অধ্যায়
সেকাল আর একাল

মহারাণী ভবানীর সময় পর্যন্ত যে সময় তাহা "সেকাল" এবং তাহার পরের সময় "একাল" বলিয়া নির্ধারিত করিলাম। সেকালের বিবরণের সহিত একালের বিবরণে তুলনা করিলে রাজসাহীর অবস্থা প্রতীয়মান হইবে।

রাজসাহীবাসীদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতির আলোচনা করিলেই দেশের অবস্থা বিশেষরূপে জানা যাইবে। প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিত বলিতে গেলে. পুস্তকের কালেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। অতএব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) শরীর, বলবীর্য, আয়ু।

(২) বিদ্যাশিক্ষা।

(৩) সমাজ, আচাব-ব্যবহার, চবিত্র।

(৪) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।

(৫) ধর্ম।

রাজসাহী প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতিই প্রধান। রাজা জমিদারেরা প্রায় সমুদয় হিন্দু—বিশেষত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। রাজসাহীতে হিন্দুর মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য। মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও এ জাতির মধ্যে ধনবান ও প্রধান লোক অতি বিরল। মুসলমান জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষক। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণই সমাজের নেতা। ইহাই স্বাভাবিক প্রকৃতি যে সকলেই শ্রেষ্ঠের ধর্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া থাকে। অনুকরণ প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। হিন্দুর রাজত্ব সময়ে অনেকে হিন্দুকে অনুকরণ করিতে যত্নবান হইতেন, আবার মসুলমান রাজস্ব সময়ে কেহ কেহ কোন কোন স্থলে মুসলমানকে অনুকরণ করিতেন। কিন্তু আজিকালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অনেকে কোন কোন ইংরাজকে অনুকরণ করিতেছেন। সদ্‌গুণের অনুকরণ মহতের কার্য। কিন্তু অসদ্‌গুণের অনুকরণ জাতীয় স্বভাব বিরুদ্ধ।

১। **শরীর, বলবীর্য, আয়ু**— পূর্বাপেক্ষা শারীরিক বলবীর্যের বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। রাজসাহীর ইতিহাস পাঠে জানা যাইবে তাহিরপুরের রাজবংশের বিজয় লস্কর বাংলার পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিয়া অস্তাচলের জমাদার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি সিংহ উপাধি এবং ২২ পরগণা জমিদারি দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং সৈন্য, গড় প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। সেইরূপ সাঁতুলের রাজা রামেশ্বর বলবীর্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। নাটোর রাজবংশের আদি রাজা রামজীবন এবং তাহার মন্ত্রী দয়ারাম বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ নবাব সরকার হইতে সম্মান ও জমিদারি লাভ করেন। আমরা দেখিয়াছি এবং পিতা বা বৃদ্ধের নিকট শুনিয়াছি যে রাজসাহীর অনেক লোক বলবান, দীর্ঘকায় এবং দীর্ঘজীবী ছিলেন। এখন আর সে দিন নাই। এখনকার পুরুষেরা খর্বকায়, রুগ্ন এবং অল্প আয়ু দেখা যায়।

নৈসর্গিক-প্রকৃতির পরিবর্তন একালের লোকের বলবীর্য ক্ষয়ের ও অল্প আয়ুর একটি কারণ

বলিয়া বোধ হয়। একালে ঋতুর পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুরও পরিবর্তনে বলবীর্যের ক্ষয় হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজসাহী জলময় প্রদেশ। নদ, নদী, বিলের জলের উপর রাজসাহীর লোকদের বেশি নির্ভর করিতে হয়। এক্ষণ অনেক নদ, নদী, বিল প্রভৃতি শুষ্ক প্রায়। পানীয় জল পূর্বাপেক্ষা যে ভাল নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জলবায়ু দূষিত হওয়াতে বলবীর্যের অনেক ক্ষয় হইতেছে।

মনুষ্যের পরিশ্রম দুই প্রকার— মানসিক ও শারীরিক। মানসিক পরিশ্রম দ্বারা আত্মার এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দেহের উন্নতি হয়। সেকালে লোকেরা নিয়মিতরূপে উভয়বিধ পরিশ্রম করিত, কিন্তু একালে লোকেরা এ উভয়বিধ পরিশ্রমই নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করে না। একালের লোকের শারীরিক বলবীর্য ক্ষয়ের একটা প্রধান কারণ, অতিশয় পরিশ্রম ও অসময় পরিশ্রম। শীতপ্রধান দেশবাসী ইংরাজদের যেরূপ পরিশ্রম করার শক্তি আছে, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদের সেরূপ ক্ষমতা নাই। আমাদের প্রাতে ও বৈকালে ভিন্ন অন্য সময় পরিশ্রম করা সঙ্গত নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ের বালকদের শিক্ষা এবং আফিসের কর্মচারীদের খাটুনি মধ্যাহ্নকালে সম্পন্ন হয়। এ প্রথা কার্যের সুবিধাজনক কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকদের পক্ষে বলবীর্যক্ষয়ের একটি কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। শীত-প্রধান দেশের প্রণালী গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পক্ষে অশুভ তাহার আর ভুল নাই। এতন্নিবন্ধনেই এতদ্দেশে প্রাতে ও বৈকালে বিদ্যাশিক্ষা ও রাজকার্য প্রভৃতি নির্বাহ হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণে শারীরিক বলবীর্য ও আয়ু বৃদ্ধি করে। এখন এরূপ আহারের প্রতি লক্ষ্য কম। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা অনুমোদিত যে কটু ও তিক্ত দ্রব্য স্বাস্থ্যকর, মাংস ও দুগ্ধ বলকর এবং ঘৃতে পরমায়ু বৃদ্ধি করে। আমাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্যই ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল, কিন্তু এই তিনটি দ্রব্য বিশুদ্ধ পাওয়া আজিকালি নিতান্ত কঠিন। ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল প্রায়ই কৃত্রিম দেখা যায়। সেকালের লোকেরা দুগ্ধে জল দেওয়া এবং ঘৃতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করা মহাপাপ জ্ঞান করিত। এই তিনটি দ্রব্য কৃত্রিম হওয়ায় শারীরিক বলবীর্য ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইয়াছে।

বিবাহের সঙ্গে শারীরিক বলবীর্যের অনেক সম্বন্ধ আছে। পুত্র কন্যার উপযুক্ত সময় বিবাহ না হইয়া অপরিপক্ক বীজে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান বলিষ্ঠ হইবার আশা নাই। সেকালে পুরুষ বেশি বয়সে বিবাহ করিতেন। এখন অনেক পিতা মাতা শ্রদ্ধা জন্য ও স্নেহের বশবর্তী হইয়া পুত্র কন্যাকে অল্প বয়সেই বিবাহ দিতেছেন, পুত্রকে সেরূপ বেশি বয়সে বিবাহ দিতেছেন না। পুত্র কন্যা উভয়েরই বেশি বয়সে এবং উপযুক্তকালে বিবাহ দেওয়া উচিত।

সেকালে তান্ত্রিক মতের প্রাধান্যে সুরা দেবীর উপাসনা রাজসাহীতে নিতান্ত যে কম ছিল না, ইতিহাস পাঠেই তাহা জানা যাইবে। একালে তান্ত্রিক মতের সুরা পানের প্রাবল্য হ্রাসে বর্তমান সভ্যতা প্রণালীর সুরাপানের আধিক্য স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। যে প্রণালীতেই সুরাদেবীর উপাসনা করা যাইবে, তাহাতেই শারীরিক বলবীর্যের হানি করিবে সন্দেহ নাই। দেশীয় সুরা অপেক্ষা বিদেশীয় সুরা অধিক তীব্র। দেশীয় কি বিদেশীয় সুরাকে আশ্রয় করিয়া অনেক লোক রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে।

আমাদের শরীরের গঠন একরূপ; ইংরেজদের শরীরের গঠন অন্যরূপ। আমাদের জন্ম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ইংরেজদের জন্ম শীতপ্রধান দেশে। আমাদের দেশের জলবায়ু একরূপ, ইংরেজদের দেশের জলবায়ু অন্যরূপ। আমাদের আহার পরিচ্ছদ হইতে ইংরেজদের আহার পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব শরীর সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারে ইংরেজদের অনুকরণ আমাদের নিতান্ত অকর্তব্য। সেকালে হিন্দুরা বিশেষত ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া পুষ্পচয়ণ, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া সংসারের কার্যে লিপ্ত হইতেন। একালে এ কার্যের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। এই

পরিবর্তনে ইংরেজদের আচার ব্যবহার অনুকরণে শুদ্ধ শারীরিক বলবীর্যের ক্ষতি হইতেছে এমত নহে, পবিত্রতাও অন্তর্হিত হইতেছে। পবিত্রতার সহিত শরীর ও মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে।

সেকালের লোক একালের লোকের ন্যায় সুখপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন না। সেকালের লোক অল্প অর্থলাভে সন্তুষ্ট এবং সর্বদা আনন্দময় থাকিতেন। বাবুগিরি কাহাকে বলে সেকালে লোক জানিতেন না। সেকালের হিন্দুরা বিদ্যা শিক্ষার সময় ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সত্যকথন, স্বার্থত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতেন। ইংরেজি শিক্ষা করিয়া ইংরেজদের সদ্‌গুণের অনুকরণ করাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু একালের লোকেরা ইংরেজি শিক্ষা বা ইংরেজদের আচার ব্যবহারের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাবুগিরি শিক্ষা করিয়া অতিশয় স্বার্থপর হইতেছেন। বাবুগিরির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়। স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠে। বর্তমান সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা। এইরূপ আচরণে একালের লোকেরা বাহ্যিক ও আন্তরিক পবিত্রতার প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে ত্রুটি করেন না। এসকল দোষে বলবীর্যের হানি করে তাহার আর সন্দেহ নাই। সুখপ্রিয়তা, বিলাস-পরায়ণতা, বাবুগিরি ও স্বার্থপরতা মানবের তেজ নষ্ট করিয়া হীনবল করিয়া তুলে।

ব্যায়ামে দেহ লঘু হয়, কার্য করিবার শক্তি দৃঢ় হয় ও সহিষ্ণুতা, বল, উৎসাহ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সাধারণত ব্যায়ামে শারীরিক বলবীর্য বৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ হয়। মস্তক হইতে পা পর্যন্ত যে অঙ্গ যেরূপ চালনা করা যায় সে অঙ্গ সেইরূপ বলিষ্ঠ হয়। মুটিয়াদের মস্তক দৃঢ় এবং ভার বহনে সক্ষম। ভারি ও বেহারাদের স্কন্ধ বলিষ্ঠ। দাঁড়িদের বাহু বলিষ্ঠ এবং বক্ষঃ প্রশস্ত, ভ্রমণকারীদের পা বলিষ্ঠ। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক সাংসারিক কার্যের সহিত ব্যায়ামের সম্বন্ধ। আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাবিধান অনুসারে এখন চালনা না করিয়া বাবুর ন্যায় অলসভাবে অন্যের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতেছি বলিয়া, বিদেশীয় প্রণালীর ব্যায়াম শিক্ষার জন্য প্রয়াসী হইতেছি। চলিবার আবশ্যক হইলে চলিয়া যাও, কার্য নির্বাহ আবশ্যক হইলে হস্তাদি নিয়োগ কর, যে কার্য করিলে শারীরিক বলবীর্য বৃদ্ধি পায়, তাহা নিজে সম্পন্ন কর, তখন দেখিবে বিদেশীয় ব্যায়ামের আবশ্যক হইবে না। যথা সময় ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রচুর পুষ্টিকর আহারে শরীর বলিষ্ঠ হইবে। ভাই! যদি পদব্রজে গমন করিলে মান সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, এই জ্ঞান করিয়া ২/৩ মাইল পথও চলিয়া যাইতে গাড়ি বা পাল্কীর প্রয়োজন হয়, তবে দীর্ঘজীবী হইবার আশা ত্যাগ কর। আমাদের বাঙালির পক্ষে পরিমিত রূপ প্রত্যহ ভ্রমণ একটি প্রধান ব্যায়াম। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেরই পক্ষে ভ্রমণ একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। রাজসাহীবাসীদের মধ্যে অনেকের মনে এই কুসংস্কার যে, পদব্রজে গমন করিলে মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া শারীরিক বলবীর্যের ও আয়ুর ক্ষয় করা আমাদের নিতান্ত অকর্তব্য।

২। **বিদ্যাশিক্ষা**— এই বিষয় এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল দুই একটি কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সেকালে রাজসাহীতে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ উন্নতি ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজে এই সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য ছিল। সেকালে মহারাণী ভবানী ও জমিদারগণের প্রভূত সাহায্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উৎসাহিত হইয়া শিক্ষাদানে মুক্তহস্ত ছিলেন। সেকালে রাজসাহীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অভাব ছিল না। "দারিদ্র্য সকল অনিষ্টের মূল।" অর্থাভাবে মানবের বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। একালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দরিদ্র। দরিদ্রতাবশতই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জ্ঞান চর্চ্চার অভাব দৃষ্ট হইতেছে। জ্ঞান চর্চার অভাবে ধর্মভাবে বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইতেছে। সেকালের ন্যায় একালের জমিদারেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্য করেন না। জমিদারের সাহায্য বিহীনে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বিলুপ্ত প্রায়। বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কার্য জ্ঞান-বিকাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে অনেক বিএ, এমএ হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ অর্থ উপার্জন জন্য যে জ্ঞান, তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকেন। যে জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পিতৃমাতৃ

সেবা শুশ্রূষা করিতে যত্নবান হইতে পারা যায় এবং ঈশ্বরের নির্মল জ্যোতিতে আনন্দলাভ করিতে পারা যায়, সে জ্ঞান তাহারা লাভ করিতে পারেন না। প্রকৃত নির্মল জ্ঞান এবং প্রকৃত সভ্যতার অনেক দূরে তাহারা বসতি করেন। সেকালে অনেক লোক সে জ্ঞান ও সভ্যতার শীর্ষভাগে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সেকালের অনেক লোক আত্মাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু একালের প্রায় লোকেই আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করেন না এবং আত্মা ও রিপুর কার্য করিতে প্রস্তুত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই কর্তব্য কর্ম প্রতিপালনে দৃঢ়ব্রত হন। আত্মাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান সে জ্ঞান একালের লোকের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

৩। **সমাজ, আচার ব্যবহার, চরিত্র**— বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কৌলীন্য প্রথার সহিত আচার ব্যবহার ও সমাজ-নীতির যথেষ্ট সম্বন্ধ। সেকালে সমাজের যেরূপ বন্ধনী ছিল, একালে তাহার অনেক শিথিল হইতেছে। তথাপি একালে কন্যা বিবাহের ব্যয়ের আধিক্যে কন্যার পিতৃপক্ষ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। একালে বহুবিবাহ যেরূপ ঘৃণার চক্ষুতে পতিত হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। "ধনেন কুল" এবাক্যের মর্যাদা একালেও খর্ব হয় নাই। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি নীতির পরিবর্তন হইয়া বর্তমান সভ্যতার দিকে একালের লোক অগ্রসর হইতেছেন সত্য; কিন্তু জাতীয়ভাব ও ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমাজের নেতারা এখনও বদ্ধ পরিকর হইয়া অটলভাবে বিদ্যমান আছেন। জাতীয় মর্যাদা ও ধর্ম রক্ষা করাই বীরের কার্য। ইংরেজি ভাষা রাজভাষা। ইহা শিক্ষা করা মহতের কার্য কিন্তু ইংরাজদিগের রীতিনীতি, ভাবভঙ্গির অনুকরণ করা বাঙালির বিরুদ্ধ প্রকৃতিরই পরিচয় পায়। ইংরেজ তো কখন হিন্দুর আচার ব্যবহার ভাবভঙ্গি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন না; তবে আমরা তাহাদের ভাবভঙ্গি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি কেন?

অতিথি সেবা করা গৃহস্থের একটি প্রধান কর্তব্য কর্ম। পূর্বে রাজসাহীতে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবৎ ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশ হীনবল হইতেছে। সেকালে কোন গৃহস্থের বাটিতে অতিথি আসিলে, অতিথির প্রত্যাখ্যান করাকে গৃহস্থ মহাপাপ জ্ঞান করিতেন। এবং কর্তব্য কর্ম-জ্ঞান-ভ্রষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইতেন। আগন্তুক পরিচিত হউক কি অপরিচিত হউক, তাহাকে গৃহ-স্বামী অতি সমাদরে গ্রহণ করিতেন। সে ভাবের অনেক বৈলক্ষণ্য রাজসাহীতে এখন দৃষ্ট হইতেছে। তথাপি অন্য প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী প্রদেশে অতিথি সৎকার অনেক ভাল। রাজসাহীতে অনেক রাজা জমিদার অপেক্ষা সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে অনেকে অতি পবিত্রভাবে এবং কর্তব্য-কর্ম জ্ঞানে অতিথির যথাসাধ্য সেবা করিয়া থাকেন। সেকালে রাজসাহীর গৃহে গৃহে আতিথ্য সৎকারের প্রথা প্রচলিত ছিল। একালে কোন কোন গৃহস্থ অতিথির আগমনের ভয়ে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সর্বদা বাস করেন এবং কোন কোন গৃহস্থ অতিথিকে নিকটে দোকান, হাট, বাজার দেখিয়া দেওয়া, নিকটে একটি গৃহস্থ ভালরূপে অতিথি সেবা করে, "এখনও বেলা আছে অনায়াসে সে স্থানে সন্ধ্যার পূর্বে যাইতে পারেন"— ইত্যাকার বলিতে ত্রুটি করেন না। কেহ বা কটু বাক্য দ্বারা অতিথিকে মধ্যাহ্ন বা সায়াহ্নে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেও সঙ্কুচিত হন না।

চরিত্র সম্বন্ধীয় দুই একটি কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন হইতেছে। চরিত্র মানবের একটি প্রধান ভূষণ। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, অথচ বিদ্বান নহেন, তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বিদ্বান অথচ অসচ্চরিত্র, তাহাকে কোন মতে উচ্চাসন দেওয়া উচিত নহে। সেকালের লোকেরা রামচন্দ্র, ভীষ্ম প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া পিতার আজ্ঞা সর্বদা প্রতিপালন করিতেন এবং পিতাকে ভক্তি করিতেন। একালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি বা তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, কোন কোন পুত্র পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া এবং সর্বদা তাহাদের নিন্দা করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। এরূপ পতির প্রতি স্ত্রীর ভক্তির হ্রাস দেখা যাইতেছে। ইহাই বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার

ফল। একালের লোক অপেক্ষা সেকালের অনেক লোক সরল, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। একালের অনেকে মিথ্যা কথনে যেরূপ অগ্রসর, সত্য কথনে সেরূপ আগ্রহ করেন না। একালের অনেকে বেশি স্বার্থপর। ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয় যে একালের লোকদেরও রাজ ভক্তির হ্রাস হয় নাই। সেকালের লোকদের ন্যায় একালের লোকেরা উৎকোচ গ্রহণ করেন না। একালের অনেকেই উৎকোচ গ্রহণকে মহাপাপ জ্ঞান করেন। যেমন এখন লোকদের মধ্যে স্বদেশ-প্রিয়তার প্রাবল্য দেখা যায়, তেমনই একতার প্রাবল্য দেখিলে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কোন ব্যাঘাত দৃষ্ট হইত না। দ্বেষ, হিংসা ও স্বার্থপরতা একতা প্রবৃত্তির মূল উচ্ছেদ করে।

৪। **কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য**— গো সেবার উপযোগী তৃণপূর্ণ মাঠ আর নাই; গোচর আর দেখা যায় না। যে দিকে নয়ন-নিক্ষেপ করি সেই দিকেই হরিদ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্র দেখিতে পাই। সেকালে গাভী মাঠে প্রচুর পরিমাণে তৃণ আহারে পুষ্টি লাভ করিয়া যথেষ্ট দুগ্ধ দিত। একালে গাভী গৃহস্থের ঘরে থাকিয়া মুষ্টিমেয় আহারে কেবল জীবন ধারণ করিয়া নিজ বৎসকেই দুগ্ধ দিতে কাতর হয়। এখানেই গাভীর দুঃখ শেষ হয় না। যে গাভী দুগ্ধ দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, সেই গাভী দ্বারা নিষ্ঠুর মুসমানেরা ভূমি-কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া লয়। সেকালে মাঠে শস্যক্ষেত্র কম, গোচরই বেশি ছিল। একালে গোচর প্রায়ই নাই; সমুদয় জমি শস্যে পরিপূর্ণ। জমিদারের জমি পত্তনের নজর যথেষ্ট এবং জমিও পতিত নাই। তথাপি পূর্বের ন্যায় শস্য জন্মে না। কিন্তু শস্যের দর অক্রেয় বলিয়া প্রজার এবং জমি পতিত নাই বলিযা জমিদারের পূর্বাপেক্ষা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। মোটের উপর দেখিতে গেলে কৃষি উন্নতি লাভ করিয়াছে। তথাপি জমিদারের ও প্রজার অভাব দূর হইতেছে না। সুখপ্রিয়তা ও বিলাস পরায়ণতা এই অভাবের প্রধান কারণ। একালের জমিদার ও প্রজা যেরূপ সুখপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ হইয়াছেন, সেকালের জমিদার ও প্রজা সেরূপ সুখপ্রিয়, বিলাসপরায়ণ ও বাবু ছিলেন না। এখন সুখ-প্রিয়তা. বিলাস-পরায়ণতা ও বাবুগিরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেকালে রাজা জমিদারেরা ২/৪ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমনাগমন করিলে অপমান বোধ করিতেন না, বা অশক্ত ছিলেন না। এখন দুই মাইল পথ চলিয়া গেলে বাবু একবার ক্লান্ত হইয়া পড়েন অথবা অসম্মান জ্ঞান করেন। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে কৃষক সন্তানও স্কুলে আসাবধি ফিটবাবু— পায়ে মোজা ও বিলাতি জুতা, গায়ে সার্ট, হাতে রেলির বাড়ির উৎকৃষ্ট ছাতা। এই পোশাকে কৃষক সন্তান প্রত্যহ স্কুলে আসিতে আসিতে তাহার অভ্যাস এরূপ হইয়া যায় যে, সে আর মাঠে যাইয়া হালের মুঠা ধরিয়া ঘর্মাক্ত কলেবর হইতে পারে না। ভদ্র লোকদের সংসর্গে থাকিয়া সেই কৃষক সন্তান ঠিক বাবু। সে বাহ্যিক সভ্যতার অনুকরণ করে বটে, কিন্তু আচার ব্যবহার রীতিনীতিতে প্রকৃত সভ্যতার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না।

সে কালে রাজসাহী প্রদেশের সহস্র সহস্র বস্তা কার্পাস ও পট্ট বস্ত্র বিলাতে ও ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। কিন্তু এ কালে রাশি রাশি বস্ত্র বিলাত হইতেই রাজসাহীতে আসিতেছে। সেকালে গৃহস্থের ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত। একালে কাহারো ঘরে আর চরকা ঘুরে না। রাজসাহীতে পূর্বাপেক্ষা হাট বাজার মেলার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহাতে দেশীয় শিল্প অপেক্ষা বিদেশীয় শিল্পেরই প্রাধান্য বেশি। বাণিজ্যে পূর্ণ লক্ষ্মী, কৃষিতে তাহার অর্ধেক,— এই বাক্য এখন পুস্তক গত। এ কালের লোকেরা দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার জন্য যেরূপ আগ্রহাতিশয় হইয়াছেন, কৃষি বা বাণিজ্যের জন্য সেরূপ ব্যস্ত নহেন। বাণিজ্যের প্রবৃত্তি হইলে সামান্য মূলধনেও বাণিজ্য করা যাইতে পারে।

৫। **ধর্ম**— ধর্মের সহিত সমাজ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, চরিত্র প্রভৃতির বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। অতএব ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধর্মের পথ বহুবিধ এবং দুর্জ্ঞেয়। ধর্ম সম্বন্ধীয় বেদের মতের অনৈক্য, স্মৃতির মতের অনৈক্য, ঋষি বাক্যের অনৈক্য দৃষ্ট হয়। অতএব ধর্ম সম্বন্ধীয় মীমাংসা নিতান্ত দুরূহ। তন্নিবন্ধনে শাস্ত্র বাক্যে ইহা বলে মহাজনগণ যে

পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত। মনুসংহিতাতে ইহাই প্রতিপাদ্য হইয়াছে :—

যে নাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে।।

যে পথে পিতা পিতামহ গমন করিয়াছেন, সেই পথ সৎ হইলে সেই পথে আমাদেরও গমন করা উচিত। এই মনু বাক্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের দেশীয় ভাব, দেশীয় ধর্ম, দেশীয় রীতিনীতি হইতে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সেকালের লোকেরা যেরূপ সত্যপ্রিয়, সৎ, বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু ছিলেন; একালে সেরূপ দেখা যায় না। সেকালে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক পাঠের প্রণালী প্রচলিত ছিল, একালে সে প্রথার হ্রাস দেখা যায়। সেকালে গৃহস্থেরা পূর্ববেলা নিত্যক্রিয়া ও সংসারের কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন, বৈকালে বা সন্ধ্যার পর গৃহস্থের অবকাশ ছিল, সেই সময় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ একজন পাঠ করিত এবং তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া পুরুষ স্ত্রীলোক শ্রোতা বসিত। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি মানবের মুক্তির সোপান স্বরূপ। একালে অবকাশ সময় গৃহস্থেরা তাস, পাশা, দাবা ক্রীড়ায় বা উপন্যাস পাঠ করিয়া বা পরের নিন্দা করিয়া সময় ক্ষেপণ করেন। উপন্যাস পাঠে চিত্তশুদ্ধ না হইয়া চিত্ত অপবিত্র হয়; এবং হৃদয়ের ভাব তমসাচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম প্রবৃত্তিকে কলুষিত করে। আজিকালি দুই এক খানা ধর্ম ভাবাপন্ন উপন্যাস পুস্তক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতেই এই প্রতীয়মান হইবে ধর্ম পথে বিপ্লব উপস্থিত। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেই যে দেশের মঙ্গল।

উপরে আমরা যাহা বলিলাম তাহার বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্পূর্ণরূপে হইতেছে না। যে উন্নতিকে আমরা উন্নতি বলি সে প্রকৃত উন্নতি নহে। দেশ, কাল অবস্থাভেদে পূর্ব পুরুষের চক্ষুতে দেখিতে বর্তমান উন্নতিকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না। আমরা স্বীকার করি যে কোন কোন বিষয়ে দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে দোষ ধীরে ধীরে দেশে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে প্রকৃত উন্নতির আশা নিতান্ত কম। আমাদের পূর্ব গুণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয়দের অসদগুণগুলি অথবা কেবল তাহাদের উপযোগী গুণগুলির অনুকরণ করিতেছি। বিদেশীদের একতা, সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্ গুণগুলির অনুকরণ না করিয়া, যে সকল গুণগুলি এতদ্দেশীয় লোকের উপযোগী নহে তাহাই আমরা অনুকরণ করিতেছি। কেবল অনুকরণ নহে; আমাদের হিন্দুর আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি আমরা সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছি। আমরা বাংলার প্রকৃতি সম্ভূত। কিন্তু বিদেশীয় প্রকৃতিগত গুণগুলিকে আমরা অনুকরণ করিতেছি। ইহাই আমাদের প্রধান দোষ; ইহাই আমাদের উন্নতি পথের কণ্টকস্বরূপ। কিন্তু এই দুর্দিনে অনেকের মনে এই সংস্কার যে বিদেশীয় ভাবাপন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে শুভকর নহে এবং প্রকৃত ধর্মভারের আধিক্যে দেশের মঙ্গল। এই স্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হইলে, সেকালের অপেক্ষাও একালে দেশের অধিক উন্নতি হইবে। রাজসাহীতে যেরূপ বুদ্ধির ও কার্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে যত্ন ও অধ্যবসায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজসাহী একদিন উন্নতির উচ্চ সোপানে সমারূঢ় হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি রাজসাহীকে শিক্ষা, ধর্ম শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে চাহ, তবে একতা, সাহস, নিস্বার্থপরতা, অধ্যবসায় ও ঈশ্বর-নিষ্ঠার আশ্রয় অবলম্বন কর। হে ভাই! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের উন্নতির ও সমৃদ্ধির জন্য যে যে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে যে সকল সদ্ গুণের আবশ্যক তাহা অবলম্বন কর এবং কার্য সফল জন্য দৃঢ়ব্রত হও।

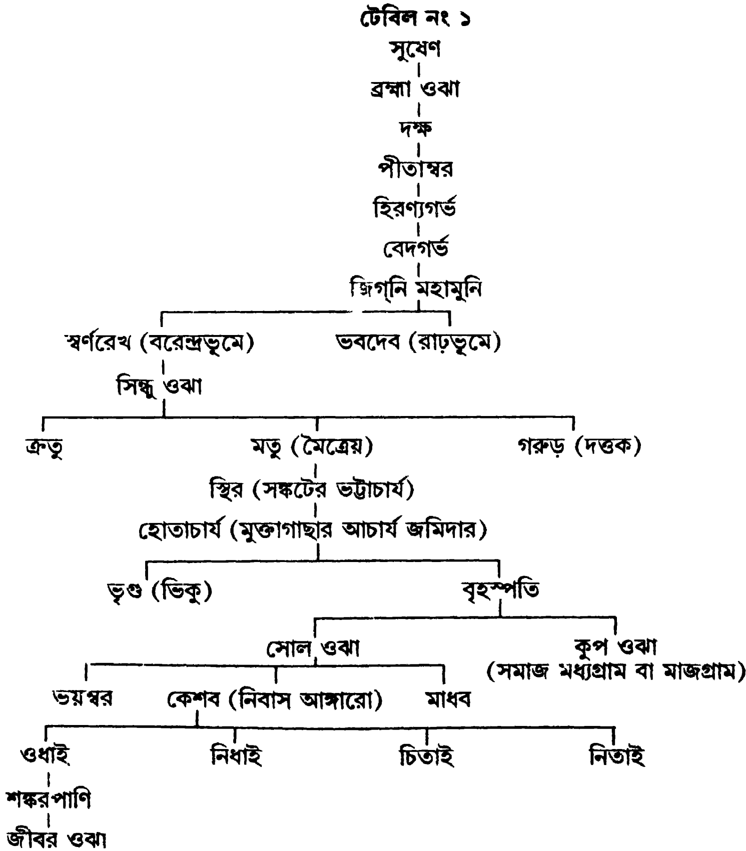
সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন, তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ মণি একজন। এই সুষেণ হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। অতএব সুষেণ হইতে যে নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে এবং নাটোর রাজবংশের সঙ্গে যে যে বংশের সংশ্রব আছে, তাহা নিম্নলিখিত বংশাবলীতে জানা যাইবে।

সুষেণ হইতে জীবর মৈত্র পর্যন্ত এই প্রথম টেবিলে (Table) দেওয়া গেল। এই টেবিলের অন্তর্গত কেহ কেহ রাজসাহী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর বাস ভবন নির্দেশ করেন। জীবর ওঝা (মৈত্র) কামদেবের পূর্বপুরুষ ;

টেবিল নং ১

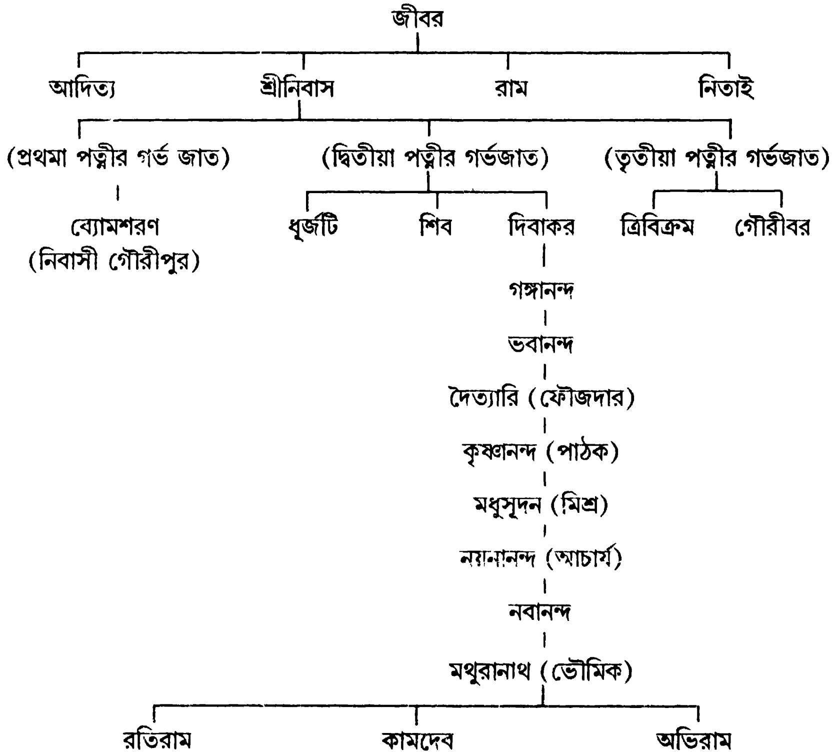


যে সময়ে বল্লাল সেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপন করেন, সেই সময় ক্রতু ভাদুড়ী গাঞি (গ্রাম) এবং মতু মৈত্র গাঞি (গ্রাম) প্রাপ্ত হন। ক্রতু হইতে উদয়নাচার্য এবং মতু হইতে নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

জীবর ওঝার বংশাবলী দ্বিতীয় টেবিলে দেখা যাইবে।

টেবিল নং ২

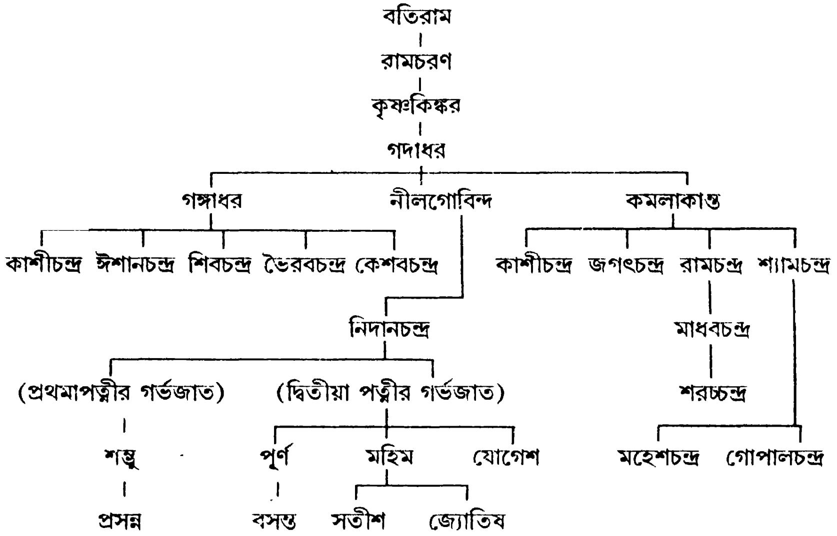
এই দ্বিতীয় টেবিলে জীবর হইতে কামদেব পর্যন্ত লিখিত হইল। এই কামদেব নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের পিতা।



রতিরামের বংশধরেরা নাটোরে বাস-ভবন নির্দেশ করেন। ইহারাই চৌকির পাহাড়ের রায় নামে প্রসিদ্ধ। কামদেবের বংশাবলী নাটোর রাজবংশের ইতিহাসের শেষভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অভিরামের দুই পত্নী। প্রথমাপত্নীর পুত্র রামনারায়ণ রায়চৌধুরী মাধবনগরে বাস-ভবন নির্দেশ করিলেন এবং দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র মহাদেব রায় আটগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। অতএব রতিরাম ও অভিরামের বংশধরেরা নাটোর রাজার জ্ঞাতি।

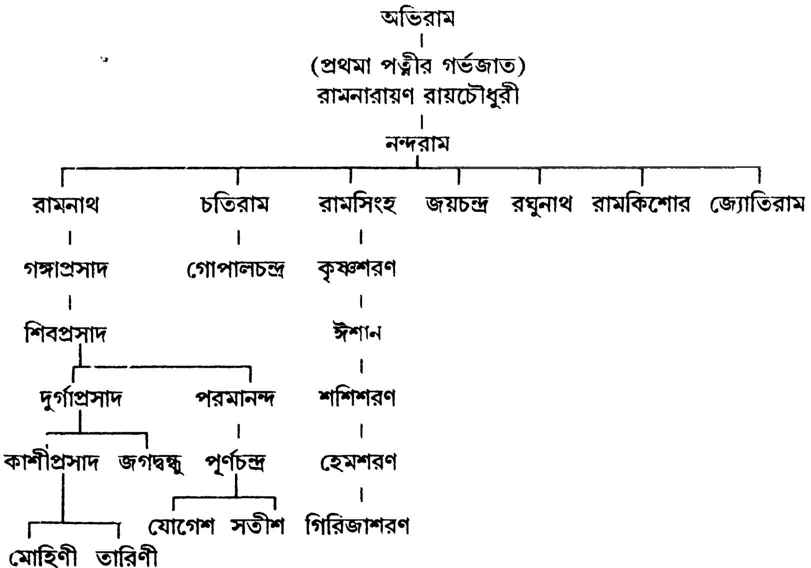
রতিরামের বংশাবলী তৃতীয় টেবিলে দেখান হইল।

টেবিল নং ৩

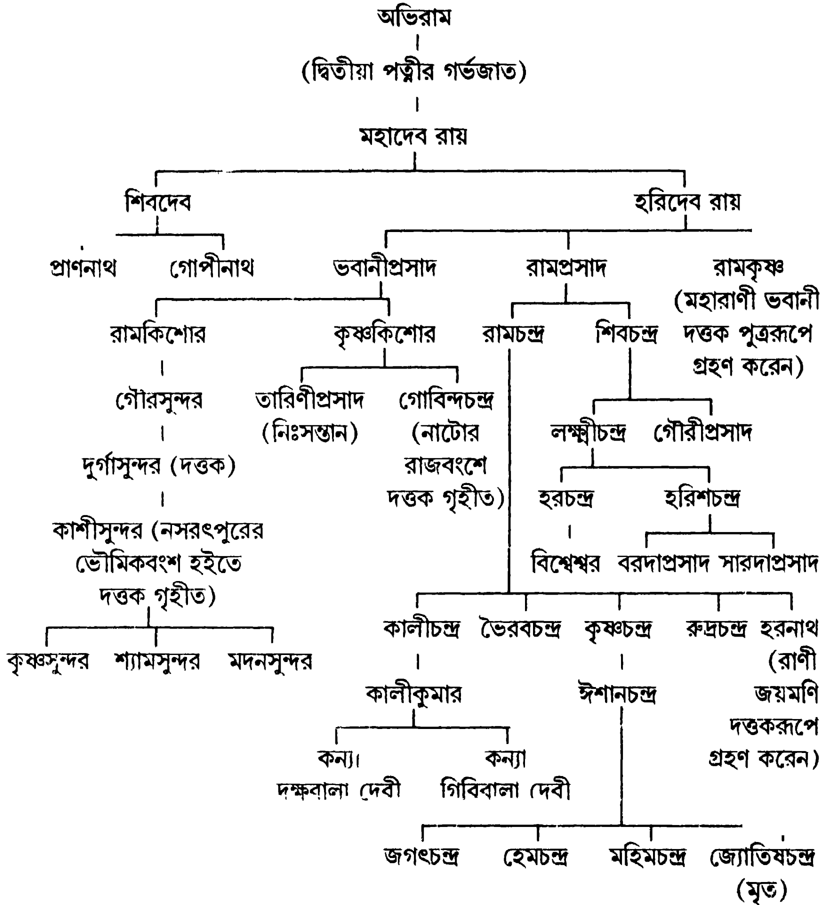


মাধবনগরের রায় বংশাবলী চতুর্থ টেবিলে এবং আটগ্রামের রায় বংশাবলী পঞ্চম টেবিলে দেখান হইল।

টেবিল নং ৪



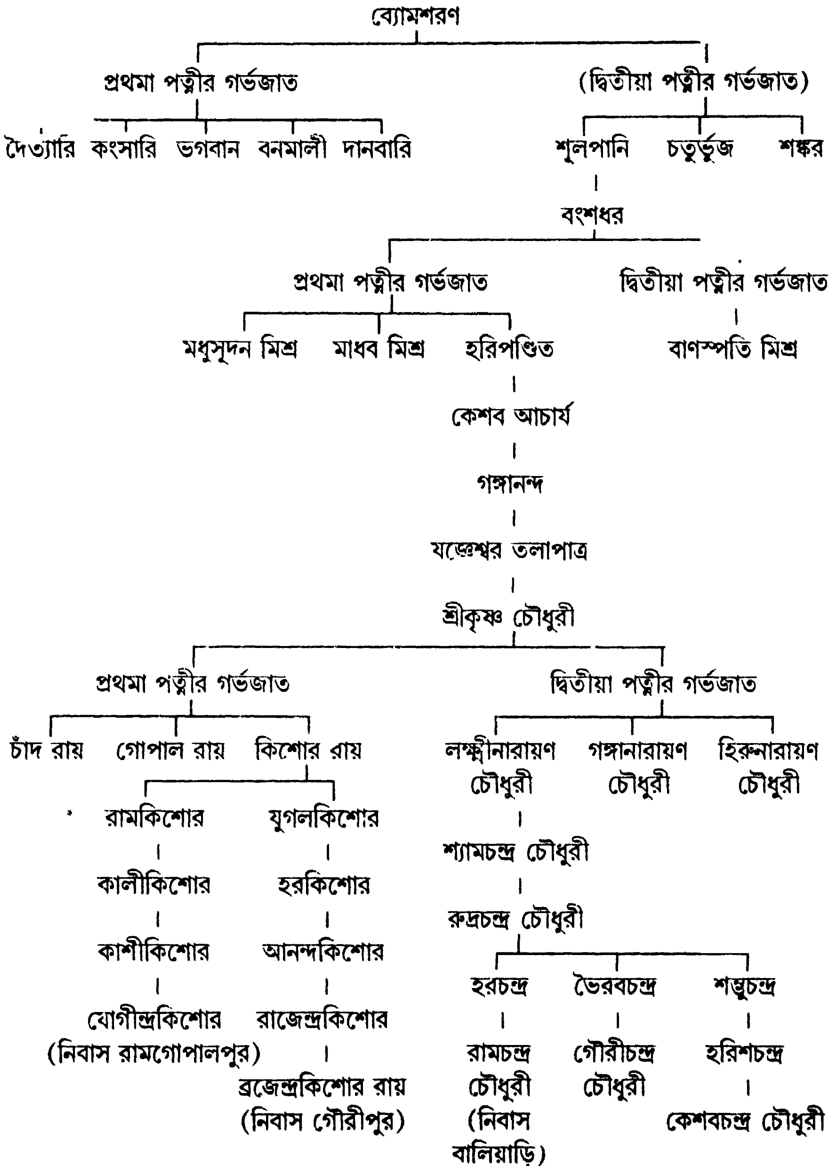
টেবিল নং ৫



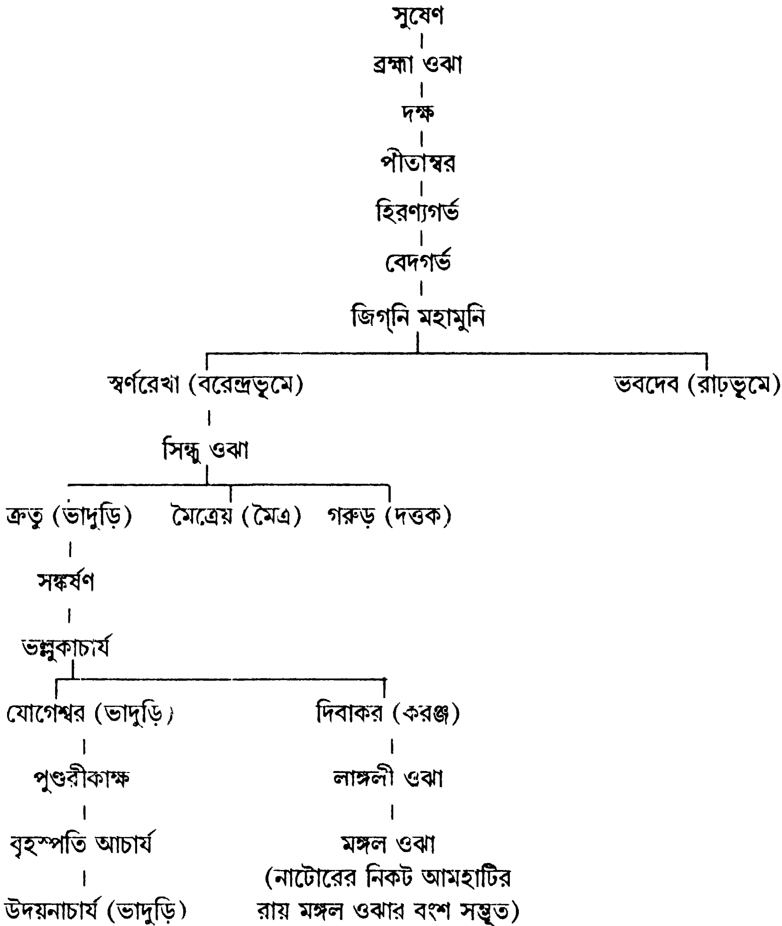
এই মহাদেব রায়ের বংশ হইতে নাটোর রাজ সরকারে ক্রমান্বয়ে তিনটি দত্তকপুত্র গৃহীত হইয়াছে। মহারাণী ভবানী রামকৃষ্ণ, রাণী কৃষ্ণমণি গোবিন্দচন্দ্র এবং রাণী জয়মণি হরনাথকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। দত্তক পুত্রদের জনক জননীর ভরণপোষণের জন্য আট গ্রাম, হালতী খোলাবাড়িয়া প্রভৃতি প্রচুর লাভের ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়। আটগ্রাম রায় বংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং মাননীয়।

জীবর মৈত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসের তিন পত্নী। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ব্যোমশরণ গৌরীপুরে বাস-ভবন নির্দেশ করেন। এই ব্যোমশরণের বংশাবলী ষষ্ঠ টেবিলে দেখান হইল।

টেবিল নং ৬

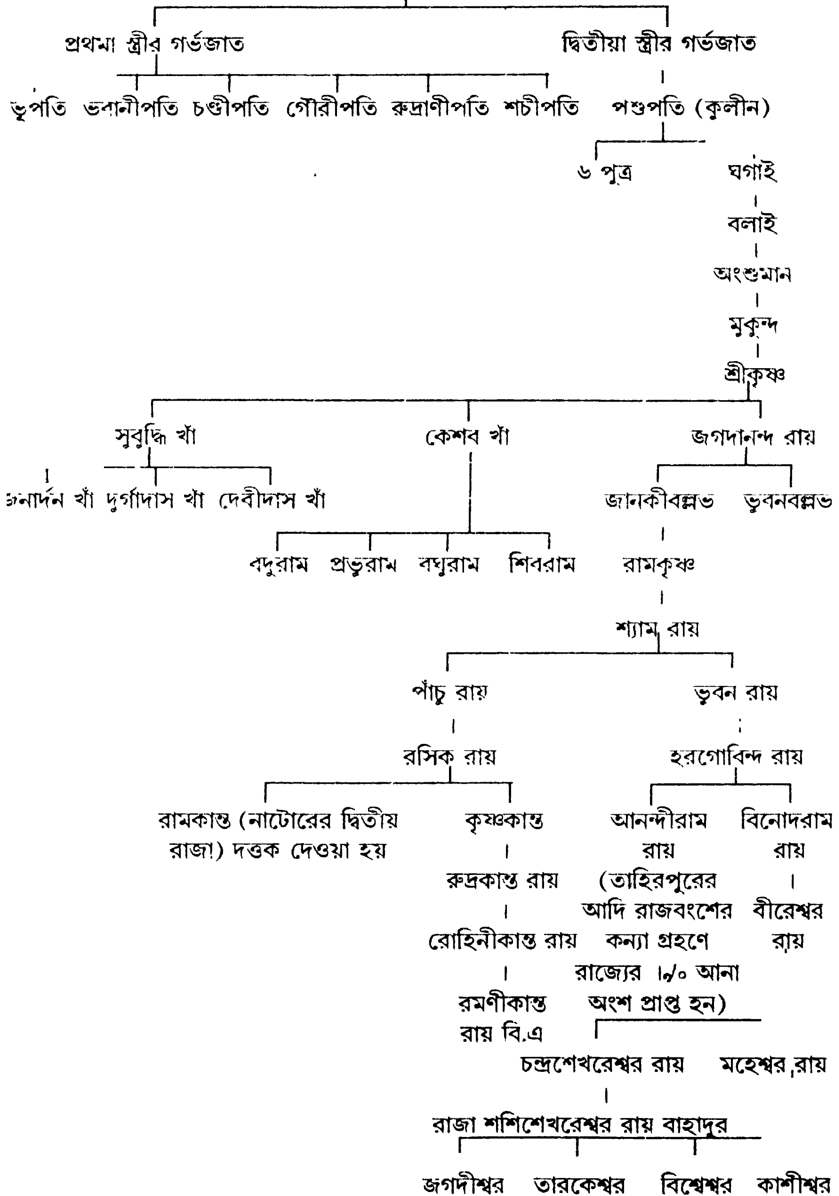

ব্যোমশরণ
প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত
(দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত)
দৈত্যারি
কংসারি
ভগবান
বনমালী
দানবারি
শূলপানি
চতুর্ভুজ
শঙ্কর
বংশধর
প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত
দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত
মধুসূদন মিশ্র
মাধব মিশ্র
হরিপণ্ডিত
বাণস্পতি মিশ্র
কেশব আচার্য
গঙ্গানন্দ
যজ্ঞেশ্বর তলাপাত্র
শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী
প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত
দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত
চাঁদ রায়
গোপাল রায়
কিশোর রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী
গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী
হিরন্নারায়ণ চৌধুরী
রামকিশোর
যুগলকিশোর
শ্যামচন্দ্র চৌধুরী
কালীকিশোর
হরকিশোর
রুদ্রচন্দ্র চৌধুরী
কাশীকিশোর
আনন্দকিশোর
হরচন্দ্র
ভৈরবচন্দ্র
শম্ভুচন্দ্র
যোগীন্দ্রকিশোর
(নিবাস রামগোপালপুর)
রাজেন্দ্রকিশোর
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়
(নিবাস গৌরীপুর)
রামচন্দ্র চৌধুরী
(নিবাস বালিয়াড়ি)
গৌরীচন্দ্র চৌধুরী
হরিশচন্দ্র
কেশবচন্দ্র চৌধুরী

সুষেণ হইতে উদয়নাচার্য্যের উৎপত্তি



ক্রতু বল্লালসেনের সময় বর্তমান ছিলেন। উদয়নাচার্য মধু মৈত্রের পিতামহ নরসিংহ মৈত্রের সমসাময়িক লোক। ইনি কুল্লূকভট্টের নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়া জয়লাভ করেন। উদয়নাচার্য কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত মর্যাদা স্থাপন করেন। ইহার প্রণীত "কুসুমাঞ্জলি" দর্শনশাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই উদয়নাচার্য হইতে বর্তমান তাহিরপুর ও চৌগ্রাম রাজবংশের উৎপত্তি হয়। বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিসিদ্ধা গ্রামে উদয়নাচার্য ভাদুড়ির আদি নিবাস ছিল।

উদয়নাচার্যের বংশ



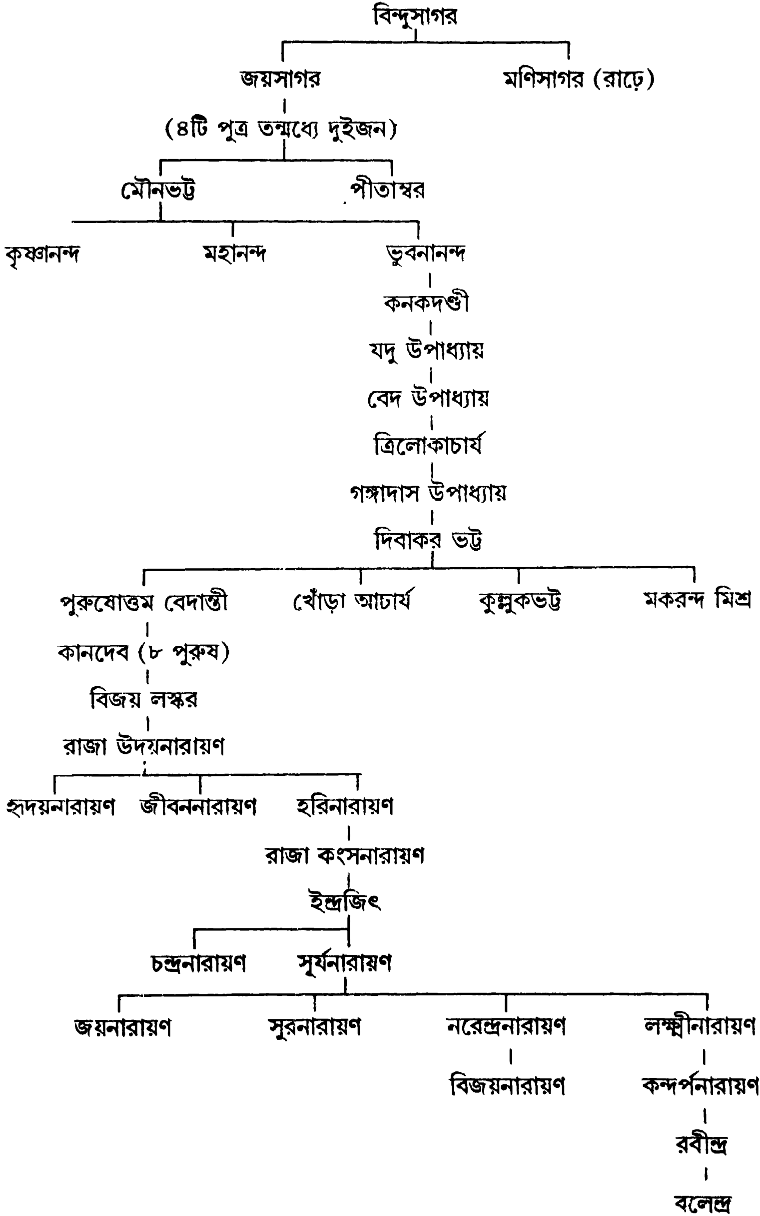
উদয়নাচার্য (ভাদুড়ি)
প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত
দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত
ভূপতি
ভবানীপতি
চণ্ডীপতি
গৌরীপতি
রুদ্রাণীপতি
শচীপতি
পশুপতি (কুলীন)
৬ পুত্র
ঘগাই
বলাই
অংশুমান
মুকুন্দ
শ্রীকৃষ্ণ
সুবুদ্ধি খাঁ
কেশব খাঁ
জগদানন্দ রায়
জনার্দন খাঁ
দুর্গাদাস খাঁ
দেবীদাস খাঁ
জানকীবল্লভ
ভুবনবল্লভ
যদুরাম
প্রভুরাম
রঘুরাম
শিবরাম
রামকৃষ্ণ
শ্যাম রায়
পাঁচু রায়
ভুবন রায়
রসিক রায়
হরগোবিন্দ রায়
রামকান্ত (নাটোরের দ্বিতীয় রাজা) দত্তক দেওয়া হয়
কৃষ্ণকান্ত
রুদ্রকান্ত রায়
রোহিনীকান্ত রায়
রমণীকান্ত রায় বি.এ
আনন্দীরাম রায় (তাহিরপুরের আদি রাজবংশের কন্যা গ্রহণে রাজ্যের ।৵০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন)
বিনোদরাম রায়
বীরেশ্বর রায়
চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়
মহেশ্বর রায়
রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর
জগদীশ্বর
তারকেশ্বর
বিশ্বেশ্বর
কাশীশ্বর

আনন্দীরাম রায় নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে **বিনোদরাম রায়** রাজত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব **বিনোদরাম রায়ই** বর্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ। চৌগ্রাম রাজবংশের আদিপুরুষ **রসিক রায়**। খাজুরা নিবাসী ভোলানাথ খাঁ উদয়নাচার্য বংশ সম্ভূত। ভোলানাথ খাঁর পুত্র জীবন্তীনাথ খাঁ। ইনি নিরাবিল পটির কুলীন এবং একটি সম্ভ্রান্ত জমিদার।

ভট্টনারায়ণ হইতে তাহিরপুরের আদি রাজবংশ

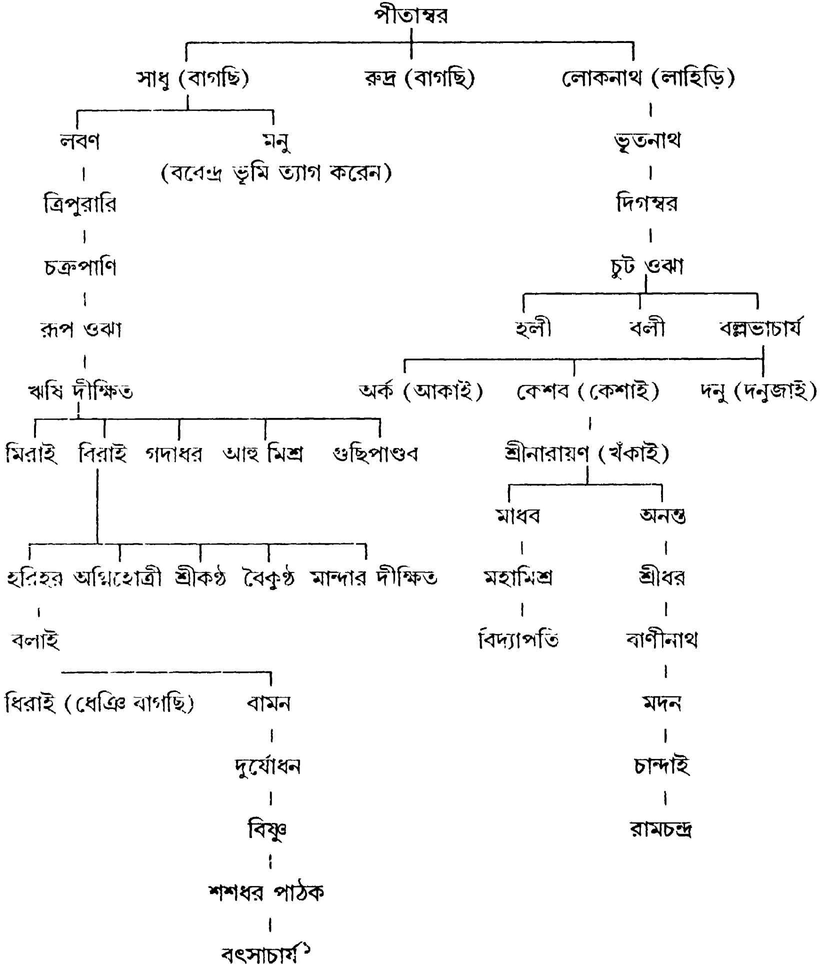
ভট্টনারায়ণ
।
আদিগাঞি ওঝা
।
জয়মনি ভট্ট
।
হরিকুজ
।
বিদ্যাপতি
।
রঘুপতি
।
শিবাচার্য
।
সোমাচার্য
।
উগ্রমণি
।
তপোমণি
।
সিন্ধুসাগর
।
বিন্দুসাগর

তাহিরপুরের আদি রাজবংশ



মৌনভট্ট হইতে রাজা কংসনারায়ণের বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশ সম্ভূত রাজা বলেন্দ্রনারায়ণ নিজ কন্যা উমা দেবীর সহিত আনন্দীরাম রায়ের বিবাহ দেন। রাজা বলেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহিরপুর পরগণার ।৶০ আনা অংশ আনন্দীরামের অধিকৃত হয়। এই আনন্দীরাম হইতে বর্তমান তাহিরপুর রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

পীতাম্বরের বংশ হইতে পুঁঠিয়ার রাজবংশ ও কাসিমপুরের রায়বাহাদুরের বংশের উৎপত্তি

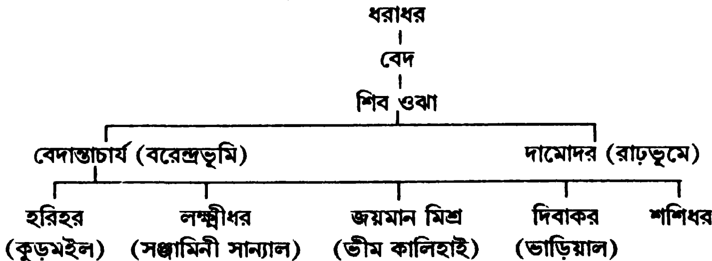


১. পুঁঠিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ বৎসাচার্য

পীতাম্বর বংশ

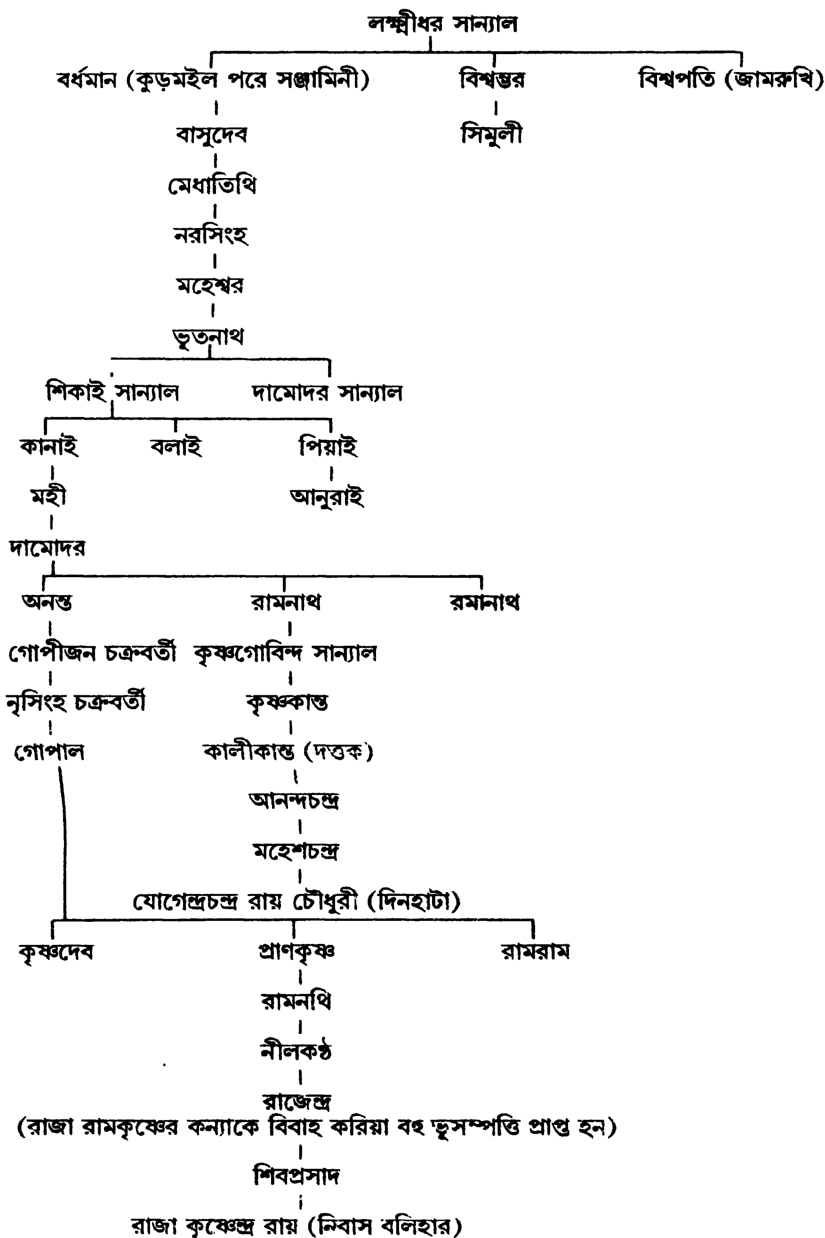
- বৎসাচার্য
  - পীতাম্বর
  - নীলাম্বর
    - রাজা আনন্দীরাম
      - রতিকান্ত ঠাকুর
        - রামচন্দ্র[1]
          - রূপনারায়ণ
          - নরনারায়ণ
            - প্রেমনারায়ণ
              - নরেন্দ্রনারায়ণ
                - ভুবেন্দ্রনারায়ণ
                  - জগন্নারায়ণ
                    - হরেন্দ্রনারায়ণ
                      - যোগেন্দ্রনারায়ণ (পত্নী প্রসিদ্ধা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী)
                        - জোতিন্দ্রনারায়ণ (পত্নী শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী)
          - দর্পনারায়ণ
          - জয়নারায়ণ
  - পুষ্করাক্ষ (তাহিরপুর পরগণার ।।৹ আনা অংশ প্রাপ্ত হন)

- রামচন্দ্র
  - অনন্ত
    - ইহার চারিপুত্র তন্মধ্যে একজন বাচাই
      - কৃষ্ণদাস লাহিড়ি
        - অধস্তন সন্তান গদাধর (কাশীপুরের রঘুনাথ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ কবিয়া কুলীন হইতে কাপ হন)
          - রামকিশোর
            - কালীকান্ত
              - সারদাকান্ত (দত্তক)
            - কাশীকান্ত
              - কমলাকান্ত
              - রজনীকান্ত (পরে সারদাকান্ত)
            - কালীশঙ্কর
              - রায় গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুর
                - রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ি বাহাদুর
  - বাসুদেব
  - গঙ্গাধর

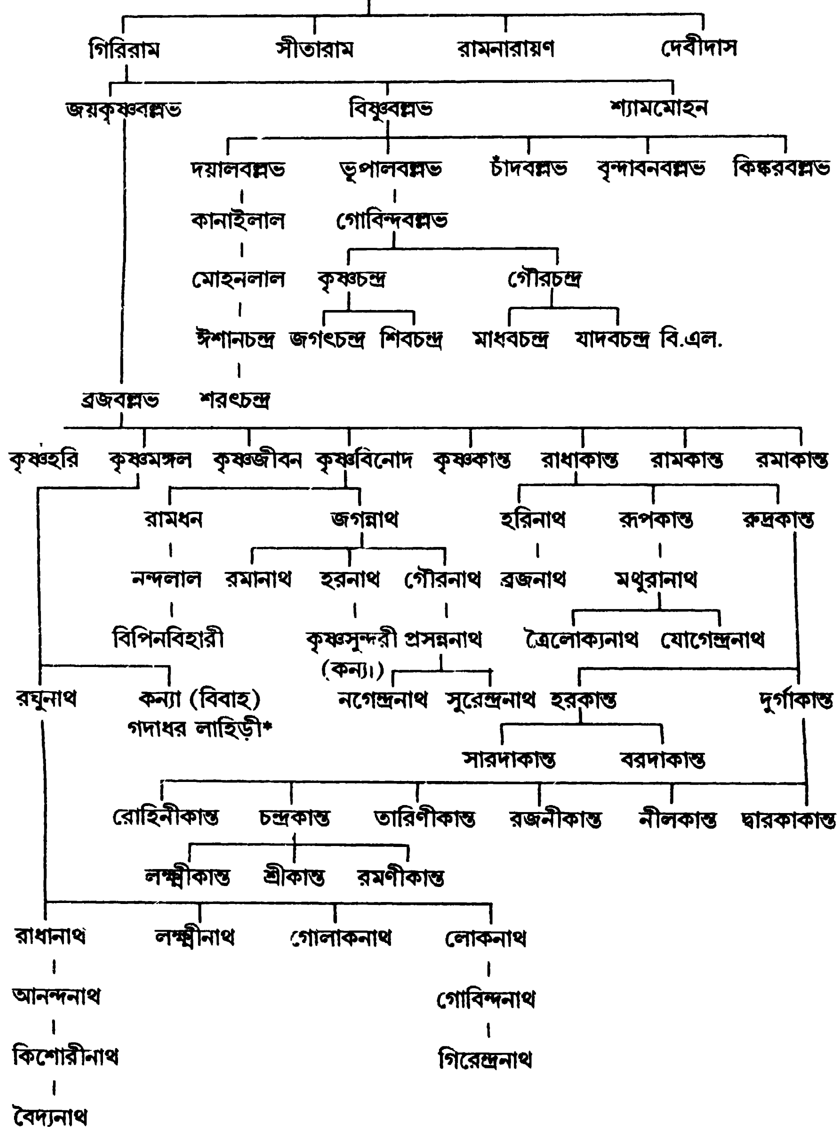


১. রামচন্দ্র হইতে কুলে সম্পূর্ণরূপে দোষ স্পর্শ করে।

বলিহার রাজবংশ


লক্ষ্মীধর সান্যাল
বর্ধমান (কুড়মইল পরে সঞ্জামিনী)
বিশ্বম্ভর
বিশ্বপতি (জামরুখি)
বাসুদেব
সিমুলী
মেধাতিথি
নরসিংহ
মহেশ্বর
ভূতনাথ
শিকাই সান্যাল
দামোদর সান্যাল
কানাই
বলাই
পিয়াই
মহী
আনুরাই
দামোদর
অনন্ত
রামনাথ
রমানাথ
গোপীজন চক্রবর্তী
কৃষ্ণগোবিন্দ সান্যাল
নৃসিংহ চক্রবর্তী
কৃষ্ণকান্ত
গোপাল
কালীকান্ত (দত্তক)
আনন্দচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (দিনহাটা)
কৃষ্ণদেব
প্রাণকৃষ্ণ
রামরাম
রামনথি
নীলকণ্ঠ
রাজেন্দ্র
(রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন)
শিবপ্রসাদ
রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় (নিবাস বলিহার)

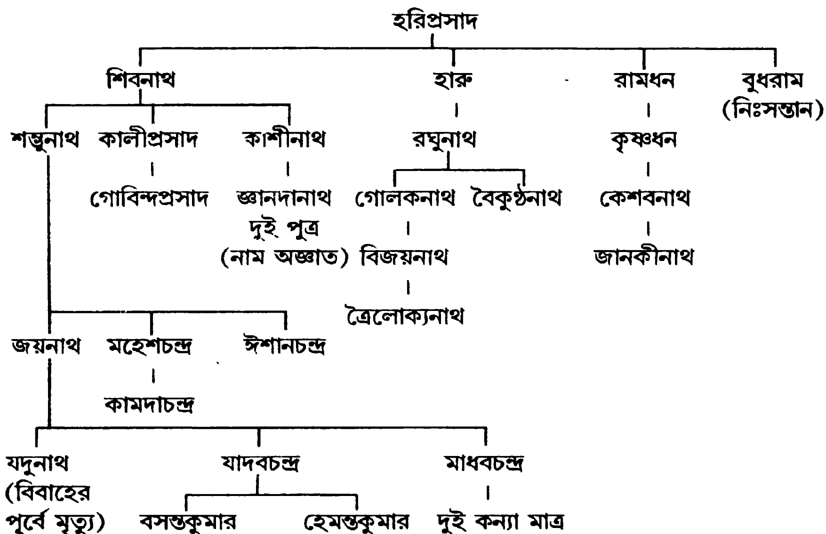
কাসিমপুরের চৌধুরী বংশাবলী



* গদাধর লাহিড়ী হইতে কাসিমপুর রায়বাহাদুর বংশের উৎপত্তি।

বিশীবংশ

বড়তরফ হরিপ্রসাদের বংশাবলী



বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ

রাজসাহীর ইতিহাসে রাজসাহীর অন্তর্গত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। মাঝগ্রাম— কুলজ্ঞের আদিস্থান, লালুরের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র রক্ষিতের এবং বৃহস্পতির পুত্র কুপের সমাজ।

২। গুড়নই— আত্রাই স্টেশনের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র আন্দাইর সমাজ।

৩। ভাতুড়িয়া (ভাদুড়ি)— রাজসাহীর পূর্বভাগে; সাঁতুল রাজার রাজ্য ছিল। ভাদুড়ি কুলে মুকুন্দ ও উদয়নাচার্য অতিশয় বিখ্যাত। এই মুকুন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি। এই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ ও কেশব খাঁ গৌড়ের বাদসাহের সরকারে প্রধান কার্যকারক হইয়া খাঁ এবং জগদানন্দ রায়, রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাতুড়িয়া ক্রতের সমাজ।

৪। গাঙ্গইল— লালুরের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র নান্দাইর সমাজ।

৫। বাগসর— মাঝগ্রামের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র গদাইর সমাজ।

৬। মাটিকোপা— লালুরের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র মাধাইর সমাজ।

৭। চামারি— হালসার নিকট। মধুর পৌত্র ধরাধরের সমাজ।

৮। আঁচলকোট— লালুরের নিকট। মনোহর মৈত্রের পুত্র যগাইর সমাজ। মনোহর বৃহস্পতির পৌত্র।

৯। বাগডোর— নাটোরের নিকট। বৃহস্পতির প্রপৌত্র পুয়াইয়ের সমাজ।

১০। বলিহার (কুড়মইল)— নওগাঁও মহকুমার অধীন। ধরাধরের বংশ সম্ভূত হরিহরের সমাজ। সান্যাল গ্রামী ব্রাহ্মণদের বলিহার অঞ্চলে বসতি।

১১। সীমলা অথবা সীমলী— আত্রাই স্টেশনের নিকট। ধরাধরের বংশ সম্ভূত লক্ষ্মীধরের পুত্র বিশ্বম্ভরের সমাজ।

১২। করঞ্জ— সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। দিবাকরের সমাজ।

১৩। কুজিল— কাসিমপুরের নিকট বর্তমান কুজাইলই সম্ভবপর কুজিল। শিকাই সান্যালের পৌত্র পিয়াইর পুত্র অনুয়াইর সমাজ কুজিল। অনুয়াই ধরাধর বংশ সম্ভূত।

১৪। দেউলা বা দেউলী— পতিসরের নিকট। জয়মান মিশ্রের পুত্র হলধরের সমাজ।

১৫। ধুরাইল বা ধরুল— তানোরের নিকট ধুরইল সম্ভবপর। বাঙ্গালা ওঝা জয়মান মিশ্রের বংশ সম্ভূত। ধুরাইল বাঙ্গালের পুত্র ধুমাইর সমাজ।

১৬। হাপানিয়া— নাটোরের নিকট। জয়মান মিশ্র বংশ সম্ভূত বাঙ্গলা ওঝার পৌত্র ধুরাইল সমাজ।

১৭। লক্ষ্মীকোল— বড়াই গ্রামের নিকট লক্ষ্মীকোল সম্ভবপর। দিঘাপতিয়ার নিকটও এক লক্ষ্মীকোল আছে। আকাইর পৌত্র মাধাইর সমাজ লক্ষ্মীকোল।

১৮। ঢাকঢোর— ডাঙাপাড়ার নিকট। উদয়নাচার্যের জামাতা বল্লভাচার্যের পুত্র অর্কের সমাজ ঢাকঢোর।

১৯। নিদ্রালী বা নিদাঁইল— সম্ভবত রাজসাহীর পূর্বভাগে। জয়মান মিশ্রের পুত্র হয়গ্রীবের সমাজ।

২০। কালীগ্রামী— মাঁদার নিকট। জয়মান মিশ্রের বংশ সম্ভূত কামদেবের সমাজ।

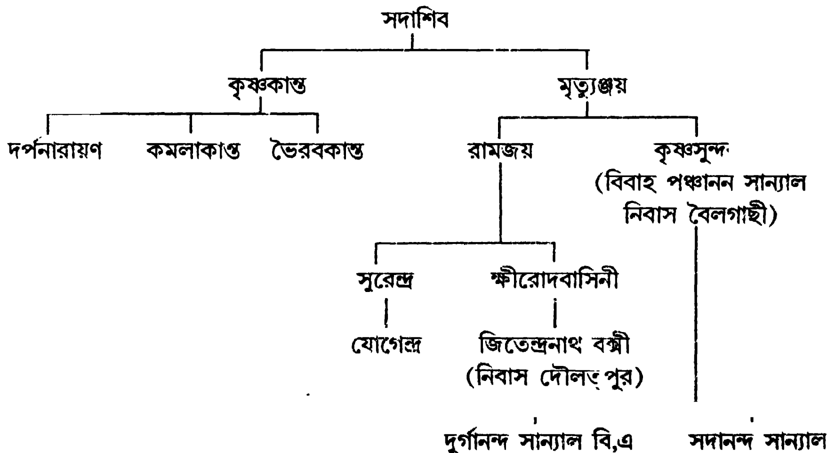
২১। যোয়ালিয়া— আমরুল পরগণার অন্তর্গত। বাঙ্গলা-ওঝার পুত্র অচ্যুতের সমাজ।

২২। জোনালী (জোনাইল)—হরিপুর ও দারীকুশীর নিকট। এই গ্রামের নামানুসারে জোনালী-পটি কুলীনের নাম হয়। লালুরের নিকট মাঝগ্রাম ও মাধারি গ্রাম এবং হাপানিযার নিকট শ্যামনগরের কুলজ্ঞগণ এই জোনালীপটির কুলীন। ইহারা সদাচারী এবং শূদ্রের দানাদি গ্রহণ করেন না।

২৩। চম্পটি (চামটা)— জোনাইলের নিকট। আদি মাধববংশ সম্ভূত বৎসাচার্যের পুত্র প্রজের সমাজ। বালুভরার চৌধুরী ও বোনগ্রামের রায় চম্পটি গাঞি। আটগ্রামের রায়েদের পূর্বে বোনগ্রামে বাস ছিল। নাটোর রাজবংশ হইতে আটগ্রাম জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া রায়েরা আটগ্রামে বাসভবন নির্দেশ করেন।

সাধুবংশীয় অসহায় রামজয় ঃ

আদিশূর যে সকল ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে আনেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ এক ব্যক্তি। ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে বাসভবন নির্দেশ করেন; কিন্তু তাহার পুত্রগণ বরেন্দ্র ভূমেই থাকেন। এই পুত্রগণ মধ্যে আদি গাঞি ওঝা নামে এক পুত্র ধামসার গ্রামে বাসভবন নির্দেশ করিয়া ধামসার গ্রামী আখ্যা প্রাপ্ত হন। আদি গাঞি ওঝা হইতে সাধু বাগচি পর্যন্ত ব্যক্তিগণের নাম পরিশিষ্টে যে সকল বংশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে বিস্তৃতরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এস্থলে তাহাদের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধু বাগচির আদি বাস গাঙ্গইল। সাধুর পুত্র লবণ ও মনু। মনু রাঢ়দেশবাসী হন। লবণের পুত্র ত্রিপুরারি; ত্রিপুরারির পুত্র চক্রপাণি; চক্রপাণির পুত্র রূপ ওঝা; রূপ ওঝার পুত্র ঋষি দীক্ষিত। এই ঋষি দীক্ষিতের পঞ্চ পুত্র অগ্নিহোত্রী, তন্মধ্যে বিয়াই দ্বিতীয় পুত্র। বিয়াইর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিহর এবং হরিহরের দ্বিতীয় পুত্র বলাই। এই বলাই দুই বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষীয় বনিতার গর্ভে ধিয়াই প্রভৃতি ছয় পুত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষীয় বনিতার গর্ভে দুই পুত্র বামন ও কমল জন্মগ্রহণ করে। এই ধিয়াই বাগচি বংশে প্রসিদ্ধ এবং ধেঞি বাগচি নামে কুলঞ্জ গ্রন্থে পরিচিত। আমাদের শীর্ষোক্ত রামজয় এই ধেঞি বাগচি সম্ভূত এবং পুঁঠিয়ার রাজগণ বামন বাগচি সম্ভূত। পুঁঠিয়ার রাজগণ ও রামজয় এক সাধু বাগচির অধস্তন সন্তান। ধেঞি বাগচির নবাই প্রভৃতি চারি পুত্র। নবাই কৈলমোহর অবসাদ প্রাপ্ত হন। নবাইর বেটাই প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র। বেটাইর রাম মিশ্র প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র; আবার রাম মিশ্রের বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র। বৈকুণ্ঠের পুত্র মধুসূদন; মধুসূদনের পুত্র চূড়ামণি; চূড়ামণি মিশ্রের পুত্র কমলাকান্ত ও রাধাকান্ত বাগচি। রাধাকান্তের পুত্র রামকৃষ্ণ গুড়নইয়ের শ্রীনারায়ণ মৈত্রেয় ও চৌগ্রামের মঙ্গল কারকুনে করণ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রামকৃষ্ণের সদাশিব প্রভৃতি চারি পুত্র। এই সদাশিবের আর এক নাম ব্রজরাম ছিল। ব্রজরাম বনাম সদাশিব হইতেই রামজয় বাগচির ধারা প্রচলিত। সদাশিব হইতে বংশাবলী নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—



সদাশিব পাইকশার গণেশ চক্রবর্তীতে, পুঁঠিয়ার কৃষ্ণগোবিন্দ বৈরাগীতে এবং ভাবনীর রঘুদেব চৌধুরীতে করণ করেন। সদাশিবের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় বৈলগাছি নিবাসী পঞ্চাননকে কৃষ্ণসুন্দরী নাম্নী একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করেন। মৃত্যুঞ্জয় বাগচির ঔরসে এবং জয়দুর্গাদেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রামজয় জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জয়দুর্গা দেবীর এবং ১২৬০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। সাধু হইতে মৃত্যুঞ্জয় পর্যন্ত সকলেই গাঙ্গইলে (গঙ্গাগ্রাম) বাস করিতেছিলেন। কিন্তু "পিতৃ মাতৃহীন সহায়-সম্বল-বিহীন রামজয় এই কোমল বয়সে" পৈতৃক প্রসিদ্ধ সমাজ গাঙ্গইল ত্যাগ করিয়া বৈলগাছি তাহার ভগিনী কৃষ্ণসুন্দরীদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে "অসহায় রামজয়ের" জীবনবৃত্তান্ত ১৩০৩ বঙ্গব্দের ৪ আষাঢ়ের "হিন্দুরঞ্জিকায়" মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার জীবনের কাহিনী এ স্থলে লিখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে রামজয় দশ মাস বয়সের সময় মাতৃহীন হইয়া এবং "দারিদ্রের ভীষণ দংষ্ট্রাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া" একজন গণ্যমান্য এবং যশস্বী হইয়াছেন এবং সমাজক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে পরিচিত হইয়াছেন, তাহার জীবন বৃত্তান্তের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করা জনসমাজের কর্তব্য কর্ম। সেই জন্যই তাহার বংশাবলী সন্নিবেশিত হইল এবং যে যে বিষয় "হিন্দুরঞ্জিকায়" উল্লেখ হয় নাই, তাহারই উল্লেখ এস্থলে করা প্রয়োজন বোধ করিলাম।

যে রামজয় "পিতৃমাতৃহীন, সহায়-সম্বল-বিহীন" সে কোন বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও গ্রন্থকার এবং কবি। তাহার "কবিতা-কুসুম" ও "সঙ্গীত কুসুমে" (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ধর্মের উচ্ছ্বাস ও ভগবানে ভক্তি এবং সমাজের বিচিত্রতা অঙ্কনে তিনি একজন প্রকৃত চিত্রকর। যে পথের ভিখারি হইয়াও প্রচুর অর্থ উপার্জনে সক্ষম, সেই অর্থের স্বার্থকতা সম্পাদনে মুক্তহস্ত, অন্নদানে, জলদানে ও পুণ্যকীর্তিতে যশস্বী, তীর্থপর্যটনে বিদুরের ন্যায় ভক্তবৎসল, তাহার জীবন ধন্য, তাহার যত্ন ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। যে রামজয় এক মুষ্টি অন্নের জন্য উকিল গৌরসুন্দরের সামান্য মহরের হইতে একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার হন, সেই রামজয় অন্নদানের আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করেন। তাই তাহার বাসায় বহু অনাথ দরিদ্র ছাত্রবৃন্দকে অন্ন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছেন এবং করাইতেছেন। ইহাই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয়। সর্বভূতের মঙ্গলসাধনে, দেব, গো ও ব্রাহ্মণের সেবায় স্বোপার্জিত অর্থের প্রায় সমস্তই ব্যয় করাতে, রামজয়ের নিঃস্বার্থতাই প্রমাণ হয়।

রামজয় রাজা নহেন, জমিদার নহেন, মহাজন নহেন, তিনি একজন দীন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের সন্তান। কিন্তু তাহার হৃদয় অনেক রাজা জমিদার অপেক্ষা উচ্চ। যাহার সুখ দুঃখে সমভাব, যাহার সর্বভূতে সমান দয়া, যাহার তত্ত্বানুসন্ধানে মন লালায়িত, তাহার দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি। তাহার হৃদয়ে ধর্মভাব প্রবলবেগে বহিতেছে বলিয়া, তিনি সম্প্রতি বোয়ালিয়া ধর্মসভার ভারগ্রহণ করিয়া অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন। যে রামজয় আদিতে "অসহায়" বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিলেন, সেই রামজয়ের প্রতি আজ ভগবান সহায়। ভগবদ্ভক্তের সহায়ই ভগবান। ভগবান সহায় হইলেই, সমস্ত জগৎ তাহার সহায় হয়। তখন সে শান্তিময় রাজ্যে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে— সে সুখ ধন, অধ্যয়ন, যজ্ঞ দান বা তপাদি দ্বারা পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তি দ্বারাই পাওয়া যায়। সে গৃহস্থ ভগবদ্ভক্তিকেই আশ্রয় করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, সে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি রিপুকে পরাজিত করিয়া হৃদয়ে সর্বদা শান্তি অনুভব করে। তাহার দুঃখ কোথায়? সকল স্থানেই এবং সকল অবস্থাই তাহার সুখ।

উপসংহার

রাজসাহীর প্রাচীনত্ব—উপক্রমণিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা জনশ্রুতিমূলক। মহাভারতোক্ত "মৎস্য দেশ" প্রাচীন ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত ছিল। পাণ্ডবগণ কালিন্দীর দক্ষিণ তীর অতিক্রম করিয়া উত্তরে দশার্ণ, দক্ষিণে পঞ্চাল ও তন্মধ্যবর্তী শূরসেন প্রভৃতি জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া "মৎস্য দেশস্থ বিরাট রাজ্যে" প্রবেশ করিবার কথা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] পঞ্চালের নাম কান্যকুব্জ; শূরসেনের নাম মথুরা;— সুতরাং মহাভারতোক্ত "মৎস্য দেশ" বঙ্গভূমির অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রাজসাহী প্রদেশে জনশ্রুতি বড়ই প্রবল। যাহা হউক, রাজসাহী যে পুরাতন পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত প্রাচীন জনপদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রদেশে পাল ও সেন বংশীয় নরপাল বর্গের অনেক কীর্তি চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে; সুবিখ্যাত বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন দেবের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবমন্দিরের ফলকলিপি রামপুর বোয়ালিয়ার অদূরবর্তী গোদাগাড়ির নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। রাজসাহীর অন্তর্গত তাহিরপুর ও সাঁতুল বহুপুরাতন স্থান। এই দুই নামে কোন "সরকার" থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রেমতলী— পদ্মাতীরবর্তী বর্তমান প্রেমতলী গ্রাম বহু পুরাতন। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারের প্রধান সহায় ভক্তপ্রবর বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস ঠাকুর এই প্রেমতলীর নিকটবর্তী খেতরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তথায় এখনও বর্ষে বর্ষে তাহার স্মরণার্থ বৈষ্ণবগণের মেলা বসিয়া থাকে। নরোত্তম দাসের পদাবলী ভাবে, ভাষায় ও রচনাকৌশলে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। তাহার সময়ে রাজসাহী প্রদেশে সংকীর্তন স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তৎসূত্রে যে অভিনব মৃদঙ্গবাদন-কৌশল প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নরোত্তমের জমিদারির নামানুসারে অদ্যাপি "গড়ের হাটি" নামে পরিচিত রহিয়াছে। নরোত্তম দাস ঠাকুর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশোদ্ভব কৃষ্ণানন্দ দত্ত মজুমদারের পুত্র। কৃষ্ণানন্দ মুসলমান জায়গিরদারের অধীনে একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন।[২] খেতরির মেলার বয়ঃক্রম চারিশত বৎসরের উপর হইবে। এই স্থানে নরোত্তমের "ভজনটোলা" নামক বৃক্ষবটিকা "আসন বাড়ি" নামক জীর্ণ মন্দির ও পুরাতন পুষ্করিণী ছিল। আসন বাড়ি ও পুষ্করিণী সম্প্রতি রাজসাহীর অন্তর্গত করচ মাড়িয়া নিবাসী রামকুমার সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার সরকার মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছে। রামকুমার সরকারের পিতার নাম নিমাই সরকার, পিতামহের নাম মাণিকচন্দ্র। ইহাদের আদি বাসস্থান করচমাড়িয়ার নিকটবর্তী ছাতারদিঘি গ্রামে ছিল। মাণিকচন্দ্রের মহাজনী কারবারের অর্থের সহিত তাহার পুত্র নিমাইচন্দ্র স্বোপার্জিত অর্থ সংযুক্ত করিয়া করচমাড়িয়ায় বাসস্থান নির্দেশ করেন এবং পুষ্করিণী খননাদি করিয়া অনেক পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করেন। তাহার পৌত্র সুপণ্ডিত কার্যদক্ষ রাজকুমার রাজসাহী এসোসিয়েসন সভার সর্বপ্রথম সম্পাদক এবং উক্ত সভা সংস্থাপক স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায়ের বিবিধ সৎকার্যের প্রধান পরামর্শদাতা ও রাজসাহীর উপকারী বন্ধু বলিয়া পরিচিত।

১. মহাভারত, বিরাট পর্ব।
২. শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত নরোত্তমচরিত।

কলম। কাংস্য শিল্পের জন্য কলম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কলমের কাঁসারিরা রাজসাহীর আদি নিবাসী নহে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানাঞ্চল হইতে জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে একজন কাঁসারি আসিয়া চলনবিলের তীরে উপবেশন সংস্থাপন করে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কলমের অনেক মুসলমানও এক্ষণে কাংস্য শিল্পের অনুশীলনে জীবিকা অর্জন করিতেছে।

গ্রাম্য কবি। তাহিরপুরের নিকটবর্তী সাধনপুর নিবাসী রামেন্দ্র সরস্বতী স্বভাব কবি ছিলেন। ইহার পুত্র কামেন্দ্র সরস্বতী এখনও জীবিত আছেন। মুসলমান মৎস্য ব্যবসায়ী মিল্‌না ধাওয়ার গীত ও রাজকিশোর জালিয়ার জাগর গান রাজসাহীর গ্রাম্য কবিতার নিদর্শন। চৌগ্রামের রুদ্রকান্ত রায় একজন দ্রুত কবি ছিলেন। ইহার প্রণীত উর্দু ভাষায় চণ্ডীর কবিতা অতি প্রসিদ্ধ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ যাত্রা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁঠিয়ার নিকটবর্তী পীরগাছা নিবাসী। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় গুড়নইর মৈত্র কুলোদ্ভূত। রচনাকৌশলে মতিবাবুর যাত্রার পালা সর্বত্র সুপরিচিত ও প্রশংসিত।

সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের মধ্যে হাণ্ডিয়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "রাজসাহী সংবাদ" নামক পত্রিকা পুরাতন, উহা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। জগচ্চন্দ্র সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশোদ্ভব। তাহার "অজোদ্বাহ" কাব্য ও "রাজসাহী সংবাদ" তদীয় সাহিত্যচর্চার নিদর্শন। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর "বৈষয়িক তত্ত্ব" ও "শিল্প ও কৃষি পত্রিকা" নামক দুইখানি পত্রিকা ও "রেশম তত্ত্ব" এবং কতিপয় ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রচারিত করিয়া সাহিত্য চর্চার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উদিত নারায়ণ। উদিত নারায়ণ ব্রাহ্মণবংশীয়। ইহার বংশধর এখনও জীবিত আছেন।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ। তাহিরপুর রাজবংশের আদি পুরুষ বিজয় লস্করের অধস্তন রাজা কংসনারায়ণ। সিদ্ধ শ্রোত্রীয় রাজা কংসনারায়ণের অধস্তন লক্ষ্মীনারায়ণ নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের "উৎসাহে" এই বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রদ বলিয়া সিদ্ধ হইল।

ধর্মশালা। রাজসাহী "ধর্মশালা ও দাতব্য সমাজ" উঠিয়া গিয়াছে।

পদাঙ্কদূত। পদাঙ্কদূত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ শর্মা একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার কবিত্বশক্তির পরিচয় 'পদাঙ্কদূতে' প্রকাশিত আছে। ইহার বাসস্থান ঘুরকা গ্রামে ছিল— অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্তমান আছে।

রামকান্ত। মহারাজ রামকান্ত ইরাজী ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন; ভ্রমক্রমে ৪৮ স্থলে ৮৪ হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ। মহারাজ রামকৃষ্ণ মহারাণী ভবানীর সম্মুখে বড়নগরে গঙ্গাতীরে তনুত্যাগ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোর রাজত্ব মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে ছিল। তাহার অভাবে মহারাণী ভবানী পুনরায় কিছুদিন রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়াছিলেন। মহারাণী ভবানীর মৃত্যুর পর মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ভ্রম।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের জলপ্লাবন— এই প্লাবনে রাজসাহীর বহু স্থানের ভূমি যেরূপ উর্বর হয় সেইরূপ বালুকারাশি পড়িয়া অনুর্বরও হইয়াছে।

নুন-নগর— কেহ কেহ নুর নগর বলিয়া থাকে।

মুষাখাঁ— হোজা নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া দিঘাপতিয়ার নিকট গদাই নামে খ্যাত।

বারানই— ইহার প্রাচীন নাম বারাহী। মহানন্দা হইতে বহির্গত হইয়া রামপুর বোয়ালিয়ার বড়কুঠির পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বায়ার নিকট প্রবল ছিল। ইহার স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে।

হাজরাহাটি— প্রাচীন কালে একটি অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল। এই স্থানের সাঁচী পান অতি সুবিখ্যাত।

ছোট পেঁয়াজ— তাহিরপুর অঞ্চলে যথেষ্ট ছোট পেঁয়াজ ও রশুন উৎপন্ন হয়।

দেশীয় শিল্প— খাজুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ খাঁ মৃত্তিকা দ্বারা লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, শুপারি প্রভৃতি ফল প্রস্তুত করিতে পারেন; তাহা প্রকৃত লবঙ্গ, এলাইচ প্রভৃতি হইতে সহজে বিভিন্ন করা যায় না। তিনি একজন জমিদার হইয়াও প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও শিল্পী।

সত্যাচার— সত্যাচারেরা নিরামিশভোজী।

নাটোরের রাজধানী— যে বিলের মধ্যে প্রাচীন নাটোর রাজধানী স্থাপিত হয়, তাহার নাম চন্দ্রাবতী।

কুমারপুর— রামপুর বোয়ালিয়ার পশ্চিম ও গোদাগাড়ির পূর্বদিক কুমারপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে রাজা কুমার পালের রাজধানী ছিল। এখনও ইহার ভগ্নাবশেষ আছে। প্রায় ৪৫ বৎসর পুর্বে এই স্থানে কুমার পালের সময়ের একখানি প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হয়। ঐ প্রস্তর খণ্ড ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে।

জিলিম— একটি প্রাচীন স্থান। মান্দার রঘুনাথের বাড়ির তিন ক্রোশ পশ্চিম। এই স্থানে এক প্রকাণ্ড বাড়ির ভগ্নাবশেষ এবং কাচ নির্মিত অঙ্গন বর্তমান আছে। সম্প্রতি একখানি প্রস্তর ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উদিশা— এই গ্রাম চৌগ্রামের নিকট। এই স্থান জ্যোতিষ শিক্ষা ও পঞ্জিকা প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ প্রদেশে পূর্বে উদিশার পঞ্জিকাই প্রচলিত ছিল।

রাণী ভবানী প্রদত্ত টোলের সাহায্য— এখনও রাণী ভবানী প্রদত্ত অর্থ নবদ্বীপের চতুষ্পাটীতে বিতরিত হইয়া থাকে।

বৈদ্য বেলঘরিয়া— সংস্কৃত চর্চ্চায় দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত। শিবচন্দ্রের প্রণীত "চণ্ডীর ব্যাখ্যা" ও "সিদ্ধান্ত কৌমূদী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

রাজা গোবিন্দনাথ— রাণী শিবেশ্বরীর দত্তক পুত্র। নাটোরের শ্যাম বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক বেশ্যা প্রজার নামে বাকি খাজানার মোকর্দমা উপলক্ষে দত্তক পুত্রের অসিদ্ধির মোকর্দমা উপস্থিত হয়।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়— ইনি বলিহারের প্রসিদ্ধ রাজা। চরিত্রে এবং বদান্যতায় ইনি একটি আদর্শ জমিদার ছিলেন। ইহার পিতামহ নাটোর বংশের রাজা শিবনাথের কন্যা জয়দুর্গাকে বিবাহ করেন।

রণেন্দ্রনারায়ণ— তাহিরপুরের আদি রাজবংশের শেষ রাজা। ইহাকে সাধারণত রনু রাজা বলা হইত। ইনি রাজা রঘুনন্দনের দৌহিত্র।

তামলী লুট— তামলী জাতি কুসীদ ব্যবসায়ী। ইহারা এত বর্ধিত হারে কুসীদ লইত যে দরিদ্র প্রজারা অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়। তাহিরপুরের রাজা বীরেশ্বরের প্রজারাই অধিক প্রপীড়িত হয়। রাজার আদেশে প্রপীড়িত প্রজারা তামলীর খত খাতা লুট করে। এই মোকদ্দমায় রাজাকে এক দিনের জন্য কারাবাসে যাইতে হয় এবং লক্ষাধিক মুদ্রাও ব্যয় হয়। এইরূপ ব্যয় তাহার ঋণের প্রধান কারণ।

কালিদাস সাণ্ডিল্য— ইহার প্রকৃত নাম কালীচন্দ্র সান্যাল। নাটোরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে হরিদা খলসী গ্রামে ইহার নিবাস ছিল।

নাটোরের দেবোত্তর সম্পত্তি— বড় তরফ ও ছোট তরফ উভয়েরই দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। কিন্তু ছোট তরফের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই দেবোত্তর। বড় তরফের দেবোত্তর সম্পত্তি নিতান্ত কম নহে। ডিহি রামরামা নাটোর সুকুল ছোট তরফের জমিদারি।

রাণীভবানীর দানের আদি সূত্র— রামকান্তের মৃত্যুর পর প্রথম দ্বাদশীর দিবস দয়ারাম রায় রাণী ভবানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একটি রৌপ্য ষোড়শ উৎসর্গের আয়োজন করিয়াছিলেন। আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ সকল দান উৎসর্গ করিতে রাণী ভবানী অসম্মতি প্রকাশ করেন। দয়ারাম অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী ভবানী বলিলেন, "আমি বালিকা নহি। বিধবা হইয়া একাদশীর উপবাস করিতেও কষ্ট বোধ করি না; এমতাবস্থায় প্রথম দিনে আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এরূপ আয়োজন করার প্রয়োজন কি? যাহা প্রতি দ্বাদশীতে দান করিতে পারিব না, তাহা আমি অদ্য দান করিতে ইচ্ছা করি না। প্রত্যেক দ্বাদশীতে আমার অবস্থানুযায়ী যে প্রকার দান করিতে পারি, তাহারই আয়োজন অদ্য করা হউক।" দয়ারাম হাস্য কবিয়া এই বলিলেন যে— "মা; এরূপ রৌপ্য ষোড়শ আপনি আজীবন প্রত্যেক দ্বাদশীতে কেন, প্রত্যহ দান করিলেও আপনকার অনটন হইবার নহে"। এই ঘটনা হইতেই রাণী দান মুক্তহস্ত হন।

নবাবী আমলের যাতায়াতের পথ— নবাবের আমলে প্রথমে ঢাকা, তদপর মুরশিদাবাদ বাংলার রাজধানী ছিল। রাজসাহীতে জোয়াড়ীর নিকট চাপিলায় নবাবের ফৌজদারি কাছারি ছিল। নাটোর মহারানী ভবানীর রাজধানী। সে সময় পদ্মানদীর তীরস্থ ভগবানগোলা মুরশিদাবাদের দ্বার স্বরূপ ছিল। ঢাকা, নাটোর, চাপিলা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে ভগবানগোলা হইয়া যাইতে হইত। নিম্ন টেবলে ঢাকা ও মুরশিদাবাদ হইতে যাইবার পথ ও দূরত্ব দর্শিত হইল :—

বর্ষার সময় ঢাকা হইতে
প্রথম পথ।
জাফরগঞ্জ .... ৫৭$^{১}/_{২}$ মাইল।
শীতলাই .... ১৩৩ মাইল।
নাটোর .... ১৬৩ মাইল।

শীত ও গ্রীষ্ম কালে ঢাকা হইতে
দ্বিতীয় পথ।
জাফরগঞ্জ .... ২১৮ মাইল।
শীতলাই .... ২৯৩$^{১}/_{৪}$ মাইল।
নাটোর .... ৩২৩ মাইল।

বর্ষার সময় মুরশিদাবাদ হইতে
প্রথম পথ।
ভগবানগোলা .... ৭৭ মাইল।
সরদহ .... ১০০ মাইল।
চাপিলা .... ১৩৭ মাইল।
নাটোর .... ১৫৯ মাইল।

বর্ষার সময় মুরশিদাবাদ হইতে
দ্বিতীয় পথ।
বোয়ালিয়া .... ৯০$^{১}/_{২}$ মাইল।
কাপাশিয়া .... ৯৯ মাইল।
পুঁঠিয়া .... ১১২ মাইল।
নাটোর .... ১২৬ মাইল।

নবাবী আমলে রাজসাহী প্রদেশের আয়তন— নিম্ন টেবিলে রাজসাহী রাজ্যের আয়তন প্রদর্শিত হইল ঃ—

প্রদেশ	বর্গমাইল
রাজসাহী (প্রকৃত)	৪,০৭১
ভাতুরিয়া	৩,৯৪২
ভূষণা	২,২৩০
পুকরিয়া	৭১১
বাহিরবন্দ	৫২০
ভিতরবন্দ	২২১
পাতিলাদহ	৪৮৭
স্বরূপপুর	২৪৯

কোতয়ালী হোসেনপুর	৬৫
বারবকসিঙ্গ	৮১
সাহজোলা	৩৩১
	১২,৯০৮

একবর্গ মাইলে ৬৪০ একর। ১২,৯০৮ বর্গমাইলে ৮২৬১১২০ একর রাজসাহী রাজ্য ছিল।

পরগণা	বর্গমাইল
লস্করপুর	৪৯৯
তাহিরপুর	৮৩
বারবকপুর	১৫৩

এই তিন প্রদেশ ব্যতীত সমুদয় স্থান রাজসাহী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

রাজসাহী রাজ্য— ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনেল সাহেব তাহার মানচিত্রে বাংলা ও বিহার ৮ অংশে বিভক্ত করেন। উক্ত আট ভাগের মধ্যে ছয় ভাগ রাজসাহী রাজ্য বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

রাজসাহী জেলার বোর্ড— ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার বোর্ড নামক সভা স্থাপিত হয়। মধ্য ও নিম্ন শিক্ষা, পথ, পাউন্ড প্রভৃতি এই সভার অধীন। সেই সভার কার্য নির্বাহার্থ নিম্নলিখিত মহাত্মারা সভ্য পদে আদিতে গবর্ণমেন্ট দ্বারা নিযুক্ত হন।

১। ই, এইচ, রডক (চেয়ারম্যান ও ম্যাজিস্ট্রেট)।
২। ছি, আর, মেরিয়ট।
৩। ই, এ, ল্যাঙ্গ।
৪। ছি, বি, ওয়ালটন।
৫। এছ, জে, এনড্রুজ।
৬। ডবলিউ, জে, ডনেল।
৭। ডাক্তার ডি, মরিশন।
৮। এল, কেমিরেন।
৯। বাবু ব্রজগোপাল বাগচি।
১০। বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরি।
১১। বাবু মাধবচন্দ্র রায়।
১২। বাবু রাজকুমার সরকার।
১৩। বাবু দুর্গাগোবিন্দ চৌধুরি।
১৪। বাবু কালীনাথ চৌধুরি।
১৫। বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৬। বাবু কেদারেশ্বর আচার্য।
১৭। বাবু হরিচরণ মৈত্রেয়।
১৮। বাবু শশিভূষণ রায়।
১৯। বাবু কালীকুমার দাস।
২০। সৈযদ তফজ্জল হোসেন।
২১। সাহ জুহরল হোসেন।
২২। মৌলবি মহাম্মদ তাহির।

আদিতে ডাক্তার এল, কেমিরেন ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তৎপর ১৮৮৮ খ্রিঃ অব্দের ১৫ ডিসেম্বর বাবু ব্রজগোপাল বাগচি এম-এ-বি-এল ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খ্রিঃ অব্দের ৪ মে তারিখে ঐ পদ তিনি ত্যাগ করেন; কিন্তু ১৮৯০ খ্রিঃ অব্দের ২৯ এপ্রিল তারিখে তাহার প্রতি ঐ কার্যের ভার পুনরায় অর্পিত হয়। ১৮৯৭ খ্রিঃ অব্দের ২১ জুলাই তারিখে তাহার অকাল মৃত্যুতে জেলার বোর্ড শোক প্রকাশ করিয়া সে মন্তব্য লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"Proposed by Babu Prasanna Kumar Bhattacharjee : "That this Board desires to put on record their theart-felt sorrow at the untimely death of Babu Broja Gopal Bagchi who was the vice-chairman for over 8 years, and who as such rended valuable services to the Board'. Seconded by Babu Kishori Mohon Chaudhuri. The propasal was passed nemine contradicente. Resolved also that a copy of the resolution be forwarded to the bereaved family."

বাবু ব্রজগোপাল বাগচি বুদ্ধিমান, ধর্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যেরূপ কার্য করেন

তাহাতে রাজসাহীবাসী তাহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবেন। তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরি এম-এ, বি-এল ১৮৯৭ খ্রিঃ অব্দের ২ আগস্ট তারিখে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি যশের সহিত স্বীয় কার্য নির্বাহ করিতেছেন।

মিউনিসিপালিটি—১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের বাংলা মিউনিসিপাল আইন III (B.C) অনুসারে রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপালিটির ২১ জন কমিশনর এবং নাটোর মিউনিসিপালিটির ১৮ জন কমিশনর নির্ধারিত হয়।

রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপালিটির কমিশনরগণ

নির্বাচিত

১। গোঁসাই রামরতন ভারতী
২। বাবু ব্রজগোপাল বাগচি এম, এ; বি.এল
৩। বাবু হরিচরণ মৈত্রেয়
৪। বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী বি, এ
৫। বাবু শশধর রায় এম, এ : বি, এল
৬। বাবু হরগোবিন্দ সেন
৭। বাবু হরকুমার সরকার
৮। বাবু কেদারেশ্বর আচার্য এম, বি
৯। বাবু গুরুনাথ মুন্সী এম, এ
১০। বাবু শশিভূষণ রায়
১১। মৌলবি ওয়াজীব উদ্দিন আহম্মদ
১২। বাবু মথুরানাথ মৈত্রেয়
১৩। বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য
১৪। মিঃ পি, মুখোপাধ্যায়

মনোনীত

১৫। মিঃ ই, লিলিবর
১৬। বাবু কাশীকিঙ্কর সেন
১৭। বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
১৮। ডাক্তার এল, কেমিরণ
১৯। সৈয়দ তফজ্জল হোসেন
২০। বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরি
২১। ডাক্তার মরিশন

নাটোর মিউনিসিপালিটির কমিশনরগণ

নির্বাচিত

১। মৌলবি ফজলার রহমান খাঁ চৌধুরি
২। বাবু সর্বানন্দ সাহা
৩। বাবু মহিমচন্দ্র রায়
৪। বাবু তারকচন্দ্র রায়
৫। বাবু বিহারীলাল সান্যাল
৬। বাবু নীলমণি দাস
৭। সের মহম্মদ খাঁ
৮। বাবু রাজকুমার চক্রবর্তী
৯। বাবু মহিমচন্দ্র রায়

মনোনীত

১০। বাবু রাধিকালাল সোম
১১। বাবু নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১২। বাবু কেদারনাথ চৌধুরি
১৩। বাবু বাবু শরচ্চন্দ্র বসু
১৪। নুর মহাম্মদ খাঁ চৌধুরি
১৫। বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচি
১৬। বাবু শ্রীকৃষ্ণ মৈত্রেয়
১৭। বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী
১৮। বাবু মহেন্দ্রকুমার বসু

রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান পদে প্রথমে বাবু হরগোবিন্দ সেন নিযুক্ত হন। বর্তমানে জজ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ভুবনমোহন মৈত্র ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে হইতে চেয়ারম্যান কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভুবনবাবু শহরের এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি রেশম স্কুলে ৩০০০, মালোপাড়া জুবলি বাগান প্রস্তুত জন্য ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ ব্যয়ই সার্থক।

রাজসাহী সভা— "রাজকার্য সমালোচনা ও জনসাধারণের হিতকর কার্য সাধনের নিমিত্ত ১১৭৯ সালের ৭ শ্রাবণ এক সাধারণ অধিবেশন হইয়া এই সভা সংস্থাপিত হয়।" এই সভার বয়ক্রম এখন ২৮ বৎসরের কম নহে। রাজসাহী সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই সভার কার্য বিবরণ হইতে উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১। "দেশীয় লোকদিগের শিক্ষার উন্নতি সাধন।"

(ক) "ব্যবসায়, শিল্প কার্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ এবং সাধারণ উপদেশ দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং অধ্যাপক নিয়োগাদি করা, অথবা তত্তৎ বিষয়ের ব্যয় সঙ্কুলনের সাহায্য প্রদান করা।"

(খ) "পূর্বোক্ত কোন বিদ্যা শিক্ষার্থীদিগকে সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদান করা।"

(গ) "সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন, অথবা স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করা কিম্বা তাহার ব্যয় সঙ্কুলন করা।"

(ঘ) "ভৈষজ্য উদ্যান এবং উদ্ভিদ্ বিদ্যার অনুশীলনার্থ উদ্যান প্রস্তুত ও চিত্র শালিকা স্থাপন করা অথবা তত্তৎ বিষয়ে সাহায্য করা।"

(ঙ) "শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য ও পদ্ধতির সংস্কার সাধন বিষয়ে উপায় ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করা এবং তত্তৎ কার্যে যোগ দেওয়া।"

২। "দেশীয়দিগের শিল্প, বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন।"

(ক) "প্রচলিত ভাষায় দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক এবং সাহিত্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান ও পুস্তক প্রণয়ন অথবা পুস্তক অনুবাদ বিষয়ে সহায়তা করা।"

(খ) "ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সকলের পুনর্মুদ্রাঙ্কন এবং প্রাচীন ভাষার অনুবাদ করার বিষয়ে সাহায্য করা।"

৩। "ন্যায়ানুগত সাধারণ মত বিকাশের সহায়তা।"

(ক) "সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে পত্রাদি লেখা এবং অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করা।"

(খ) "রাজসাহীতে কোন সাময়িক অথবা সংবাদপত্র প্রকাশিত করা বা তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।"

(গ) "অন্য সভা এবং অন্য সমাজের মতামত গ্রহণ ও প্রকাশ করা।"

৪। "দেশের সমৃদ্ধির উপকরণ সমূহের বিকাশ সাধন বিষয়ে যত্ন করা।"

(ক) "তৎউপযোগী কোন কার্যে লোকের সহকারিতা বা যোগ উৎপাদন করার চেষ্টা করা।"

(খ) "বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির জন্য নূতন পথ ও নূতন উপায় অনুসন্ধান এবং তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করা এবং বর্তমান তাদৃশ কোন পথ ও উপায়ের উন্নতি সাধন প্রস্তাব করা।"

(গ) "প্রদর্শনী মেলা সংস্থাপন, শিল্প ও কৃষিকার্য সংক্রান্ত আবিষ্কার। নৈপুণ্য, পারগতা ও কৃতিত্বের পুরস্কার দেওয়া এবং অন্য কোন প্রকারের উৎসাহ প্রদান করা।"

(ঘ) "অস্বাস্থ্যজনক জলাশয়ের জল নিঃসারণ, প্রচলিত পয়ঃপ্রণালীর পুনঃসংস্কার, কদর্য পুষ্করিণী, গর্ত ইত্যাদি পূরণ, অথবা পরিষ্কার করণ, জঙ্গল কর্তন এবং স্বাস্থ্যকর পেয় জল আনয়ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় নির্দেশ করা ও অন্য কোন প্রকারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।"

(ঙ) "দাতব্য, চিকিৎসালয়, হাসপাতাল এবং ঔষধের দোকান সংস্থাপনের উপায় নির্দেশ অথবা তৎ সমুদায় সংস্থাপনের উদ্যোগ করা।"

(ঘ) "গবর্ণমেন্ট সাধারণ স্বাস্থ্য বর্ধনের জন্য যে সকল কার্য করেন, তাহার উন্নতির উপায় ব্যক্ত করা, অথবা তাদৃশ কার্যে লোকের রুচি সম্মানের চেষ্টা করা।"

৬। "দুর্ভিক্ষ, ঝড়, জল প্লাবন বা তাদৃশ অন্য কোন দৈবদুর্ঘটনায় পীড়িত কোন স্থানীয় লোকের কষ্ট মোচন করা এবং তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।"

(ক) "আর্থিক সাহায্য প্রদানে অন্নকষ্ট মোচন জন্য কোন কার্যের অনুষ্ঠান অথবা তত্তৎ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করা।"

৭। "সাধারণের ভ্রমণ ও গমনাগমনের উপায় বিধান এবং তদ্বিষয়ে সুবিধা করার উপায় নির্দেশ করা।"

(ক) "রাস্তা, সেতু এবং জলপথ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় উদ্ভাবন করা।"

(খ) "কোন স্থানে নূতন টেলিগ্রাফ অথবা ডাকঘর খোলার অথবা সরাই ইত্যাদি সংস্থাপনের উপায় নির্দেশ করা।"

৮। "সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য সহায়তা করা।"

(ক) "দেশীয়দিগের স্বাস্থ্য ও শারীরিক উন্নতির বাধা দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করা।"

(খ) "যে সকল কারণ দ্বারা জাতীয় মূলধন বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার উত্তেজক উপায় অবলম্বন করা।"

(গ) "বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা।"

৯। "ব্যবস্থাপক সভার কি কোন রাজকর্মচারীর কি গবর্ণমেণ্টের অন্য কার্যকারকের কোন কার্য ও বিধি সম্বন্ধে দেশীয়দিগের মনের ভাব ও তাহাদিগের অভাব রাজসমীপে, ব্যবস্থাপক সভায় বা কোন রাজকর্মচারীর নিকট কিম্বা কোন সমাজ কি সভার নিকট এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য ও বিচার সম্বন্ধীয় কর্মচারীগণের নিকট প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞাপন করা।"

(ক) "মেমোরিয়াল, আবেদনপত্র, প্রার্থনাপত্র ও সাধারণপত্র দ্বারা দেশীয়দিগের ভাব প্রকাশ করা।"

(খ) "অভিনন্দনপত্র প্রদান এবং সভার কার্যকারক ও সভ্যদিগের প্রতিনিধি রূপে জ্ঞাপন, বাচনিক সংবাদ প্রেরণ করা।"

১০। "দেশীয়দিগের অর্থনাশ ও কলহ নিবারণের উপায় অবলম্বন করা অথবা তদ্বিষয়ে যোগ দেওয়া।"

(ক) "শালিসী বিচারালয় স্থাপন এবং স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করা।"

(খ) উভয় পক্ষের প্রার্থনা মত কোন বিচার মীমাংসার জন্য শালিস নিযুক্ত করা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করা।

জমিদার, প্রজা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও মহাজন, শাস্ত্র ও ব্যবহারজীবী ও চাকরিয়া দ্বারা এই সভা গঠিত হইয়া আজ পর্যন্ত রাজসাহীর উন্নতিসাধন করিতেছে। এই সভার সাহায্যে ও যত্নে যে বোয়ালিয়া জেলা স্কুল ক্রমে প্রথম শ্রেণির কালেজে পরিণত হইয়াছে তাহা রাজসাহীর ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭২-৭৩ সালে দুবলহাটির অধিপতি স্বর্গীয় রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর সর্বপ্রথমে ঐ স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে পরিণত করার জন্য অর্থাৎ রাজসাহীতে এফ, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত অধ্যাপনা হইবার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০০০ টাকা লভ্যের একটি মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি অর্পন করেন। রাজসাহী সভা সেই সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বি, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াইবার জন্য বার্ষিক ৬০০০্ টাকা লভ্যের ১৫০০০০্ টাকার কোম্পানির কাগজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আইন শিক্ষার জন্য পুঁঠিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী মনোমোহিনী দেবীর প্রদত্ত ২০০০০্ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। *এই কালেজের গৃহ নির্মাণ ও ছাত্রনিবাস রাজসাহীর রাজা জমিদার বিশেষতঃ পুঁঠিয়া নিবাসিনী প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্তা রাণী হেমন্তকুমারী দেবী বিস্তর অর্থ দান করিয়াছেন। যে সময়ে গবর্ণমেণ্ট এই কালেজ উঠাইয়া দিবার জন্য মন্তব্য

' এই টাকার সুদ এখন কলেজের সাধারণ বিভাগের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইতেছে।

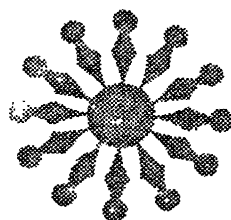
প্রকাশ করেন, সে সময়ে রাজসাহী সভার যত্নে এবং চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় না। এইরূপ মহৎকার্যের জন্য রাজসাহী সভার নিকট রাজসাহীবাসী চিরঋণী থাকিবেন।

এ সভা সংস্থাপিত হওয়া অবধি ক্রমে যে সকল মহাত্মা সভাপতি ও সম্পাদকের আসন গ্রহণ করে তাহাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

রামপুর বোয়ালিয়া নাটোর

সভাপতি	সম্পাদক
১। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর (দিঘাপতিয়া)	১। বাবু রাজকুমার সরকার
২। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর (বালিহার)	বাবু প্রমথকৃষ্ণ সিংহ এম, বি, এ
	২। বাবু কৃষ্ণচৈতন্য ভৌমিক বি, এল
৩। রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর (দিঘাপতিয়া)	৩। বাবু কেদারেশ্বর আচার্য এম, বি
৪। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর (তাহিরপুর)	৪। বাবু ব্রজগোপাল বাগচি এম এ; বি এল
৫। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (বর্তমান)-নাটোর সভাপতি প্রতিনিধি।	৫। বাবু তরুণকৃষ্ণ ভৌমিক
	৬। বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য বি, এল
	৭। বাবু সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয় বি. এল
৬। রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর (বর্তমান)- (দিঘাপতিয়া) মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সময়ে প্রতিনিধি সভাপতির পদ সৃষ্ট হয়।	৮। বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল
	৯। বাবু কেদারেশ্বর আচার্য এম, বি (বর্তমান)

নানা চোখে রাজসাহী



কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজসাহীর ঐতিহাসিক বিবরণ*

দেশীয় প্রবাদে সাধারণের বিশ্বাস যে, রাজসাহীর উত্তরাংশ মহাভারতের মৎস্যদেশ। রাজসাহীর ইতিহাস লেখকও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ রেলের পাঁচবিবি নামক স্টেশন হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে বিরাটনগর নামে গ্রাম আছে; ঐ স্থানেই মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানী ছিল, বলা হয়। এই বিরাট নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে এক স্থানে লোকে কীচকের ভবন, এবং তাহার নিকটেই পাণ্ডবের ধনুর্বাণ-রক্ষার শমী-বৃক্ষের স্থান বলিয়া দেখাইয়া থাকে। কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা রাজপুতানার উত্তরাংশে বিরাটের প্রাচীন মৎস্যদেশের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। সেখানে এখনও বিরাটের রাজধানী বিরাট নামক স্থান আছে। এ রাজসাহীর 'মৎস্য' সাধারণ মৎস্য কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার বিচার করুন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রাজসাহীর অধিকাংশই অধুনাতন কালে নদীবাহিত মৃত্তিকার দ্বারা উদ্ভূত। কিন্তু তাহাদের কাল নরলোকের কালের মত নহে; দশ বিশ হাজার, বা লক্ষ বৎসর তাহারা বড় একটা গ্রাহ্যই করেন না। রাজসাহীর বরিন্দা অংশ অন্ততঃ প্রাচীনকালে গঠিত, ইহার বোধ হয় কেহই অস্বাকীর করিবেন না। কিন্তু এ ভাগেও রামায়ণ, মহাভারত, বা পুরাণাদিতে বর্ণিত অন্য কোনও স্থান নাই— এ কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

উল্লিখিত ব্যাপার যাহাই হউক, রাজসাহীর পশ্চিমোত্তর ভাগ যে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভূক্ত ছিল, এ কথা আমরা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের তমোময় অরণ্যে কণ্টকজাল-পরিবৃত নানা জটিল সমস্যার মধ্য হইতেও স্থির করিয়া লইতে পারি। মহাভারতে হরিবংশ ও পুরাণে কয়েক স্থানে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্রের নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ' না হয় অন্য স্থানের লোক, স্বীকার করা গেল। বিষ্ণুপুরাণে এক পুণ্ড্র দক্ষিণাপথের দেশসমূহের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। আবার অন্যত্র বলি রাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, এই পঞ্চ পুত্রের কথা, এবং তাহারই ঐ সকল রাজ্যের স্থাপয়িতা,— এই আখ্যায়িকা আছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আর এক পৌণ্ড্রদেশ হিমালয় পর্বতের উত্তরাংশে স্থান পাইয়াছে। অন্যত্র 'জ্যোতিষ্মান্ পৌণ্ড্রান্' প্রাচ্য প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনু-সংহিতায় নির্দেশ আছে, পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা ক্রিয়ালোপের এবং ব্রাহ্মণাদর্শনের হেতু অর্থাৎ সর্ববিধ সংস্কারের অভাবে বৃষলত্ব (শূদ্রতা) প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বচনটি বর্তমানে মুদ্রিত মনু-সংহিতা গ্রন্থে নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু পরবর্তী স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে যখন ইহা মনুর বচন বলিয়া ধৃত হইয়াছে, তখন ইহা মনুতে ছিল, বা বৃহন্মনুর বচন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে মনুর সময়ে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়েরা 'ব্রাত্য' বলিয়া আংশিক ম্লেচ্ছ-ভাষাভাষী— 'দস্যু' নামে কথিত হইয়াছেন, দেখা গেল। কিন্তু মহাভারতের

কর্ণপর্বে লিখিত আছে যে, পৌণ্ড্র, মগধ ও কলিঙ্গ দেশের মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতনধর্ম অবগত আছেন। মহাভারতের এই উক্তি মনুর পরবর্তী, এরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় কোনরূপ ভ্রমের আশঙ্কা নাই। তাহা হইলে, পুণ্ড্রদেশ মনুর সময়ে অসভ্যের দেশ ছিল, কিন্তু মহাভারতের সময়ে সুসভ্য হইয়া আর্য-সমাজে বরণীয় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত মহাবল পুণ্ড্রক বাসুদেব যে এই প্রাচ্য পুণ্ডের অধীশ্বর, এ কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। প্রাচীন পুরাণেতিহাস প্রভৃতির উক্তির সহিত বর্তমান পুণ্ড্র বা পুঁড়ো জাতির বাসভূমি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা পুণ্ড্র জনপদের যে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, সেই মতই এক্ষণে সাধারণে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন সংহিতাকারের দোহাই দিয়া বর্তমান পুঁড়ো বা পুণ্ডরীক মহাশয়েরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের কথা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, তাহারাই যে পুণ্ড্র দেশের প্রাচীন লোক, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই।[১] বর্তমান রাজসাহী বিভাগ সেই লোকবিশ্রুত পুণ্ড্রের অধিকাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এই পুণ্ড্রের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনের কথা লইয়াও নানা তর্কের অবতারণা হইয়াছে। কেহ বা বগুড়ার মহাস্থানগড়কে এই প্রাচীন রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিতে চান, কিন্তু অনেকেই বড় পেঁড়োর—হজরৎ পাণ্ডুয়ার পক্ষপাতী। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে যে, গৌড়বিজয়ী কাশ্মীররাজ জয়াপড়ী গঙ্গাতীরে সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। চীন পরিব্রাজক প্রথিতনামা হুনেয়্ সাং-এর বিবরণীর যথাযথ সমালোচনা করিলেও পাণ্ডুয়া নগরই পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনও উহা প্রাচীন হিন্দুকীর্তির এবং ভাস্কর-শিল্পের ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পরবর্তী রাজধানী গৌড় নগর ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। বর্তমানে গঙ্গা পাণ্ডুয়া ও গৌড় হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাগীরথীর প্রবাহলীলা লক্ষ্য করিলে পূর্বকালে গতি যে অন্যরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এই পুণ্ড্র নাম হইতে পুঁড়ি বা পুরী ইক্ষুর নাম হইয়াছে, এবং বৈদ্যক গ্রন্থে সমাদৃত 'পুণ্ড্র-শর্করা'ও এখানকার বস্তু, ইত্যাদি মতও প্রচারিত হইতেছে। কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া 'গুড়' হইতে গৌড় নাম হইয়াছে বলিতে চান। সে কালে এ প্রদেশ ইক্ষুর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল কি না, বর্তমানে তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এই পৌণ্ড্র জনপদ সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এই তিন সম্প্রদায়ের নানা পুণ্যস্থান এই প্রদেশে সংস্থাপিত ছিল। জৈনগণের তৃতীয় শাখা 'পৌণ্ড্রবর্ধনীয়া', এই পুণ্ড্রবর্ধন হইতেই নাম গ্রহণ করিয়াছে। এখনও ভাগীরথী হইতে করতোয়া তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে গৌড়ের পুরাতন কাহিনীর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির অধিকাংশ যে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা সর্বদাদিসম্মত। রাজসাহী যে পূর্বে 'গৌড় বিষয়ে'র মধ্যে ছিল, ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেই আমাদের উপস্থিত কার্যসাধন হইল। নিকটবর্তী বলিয়া বরেন্দ্রভূমি পূর্বাহ্ণেই গৌড়ীয় সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

করতোয়া, আত্রেয়ী ও বারাহী নদী বহু দিন হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইলেও, প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের নাম নাই। বৈদিক 'সদানীরা' করতোয়া— এই করতোয়া কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে।[২] তবে তীর্থ উপলক্ষেই এই সকল নদীতীরে স্থানে স্থানে পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজাদিগের উৎসাহে বিহার বা হিন্দু দেবালয় নির্মিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। নাটোর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে ভবানীপুর নামক গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে করতোয়া, আত্রেয়ী ও যমুনার সঙ্গমস্থল ছিল। ইহা ভবানী দেবীর অন্যতম

পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপাসকেরা বলেন, এই স্থানে সতীর তল্প বা বাম কর্ণ পতিত হইয়াছিল।[৩] প্রথম যুগের মুসলমান শাসনে এই তীর্থ লুপ্ত হয় বলিয়া কথিত আছে। জনপ্রবাদ এই যে, জনপ্রিয় গৌড়-বাদশা হোসেন শাহের সময়ে মোহন মিশ্র নামক সাধু এই পীঠের উদ্ধার করেন। জনৈক মুসলমান সেনাপতি দেবীর কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া এখানে এক জোড়-বাংলা নির্মাণ করিয়া দেন। সেই বাংলা ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি কথাও প্রচলিত আছে। বারেন্দ্র-সমাজে প্রবাদ এই যে, উক্ত মোহন মিশ্র ভবানীর আজ্ঞায় কুমুদানন্দ চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন; এই বিবাহ লইয়া একটি ছড়া আছে,—

"কোথা হ'তে এলো বামুন পাকুড়তলা বাড়ি,
কেহ বলে কামরূপী কেহ বলে রাঢ়ী।"

প্রকৃত কথা এই যে, কুমুদানন্দ এই অজ্ঞাতকুলশীল মিশ্রকে কন্যাদান করায় সামাজে কিছু দিন পতিত ছিলেন। পরে বারেন্দ্র-সমাজপতি তাহিরপুর-রাজ কংসনারায়ণ তাহাকে ও মোহন মিশ্রকে সমাজে তুলিয়া লন। এইরূপে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে 'ভবানীপুর পটি'র উৎপত্তি হয়। সান্তোষের রাণী শর্বাণী এবং রাণী ভবানী এই পীঠের সংস্কার ও দেবসেবার নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই সময় হইতেই এই পীঠের নাম লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ— যিনি গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান বাদশার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপন করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির অনুরাগভাজন হইয়া আদর্শ নরপতি হইয়াছিলেন, সেই গণেশ বরেন্দ্রভূমির হিন্দু ভূস্বামী ছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে দিনাজপুরনিবাসী বলিয়াছেন ; কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাস রিয়াজ উস্ সালাতিন্ গ্রন্থে তিনি ভাতুড়িয়ার রাজা বলিয়া উল্লিখিত। ভাতুড়িয়া পরগণা বর্তমান রাজসাহীর উত্তরাংশে। কেহ কেহ মুসলমান ইতিহাসে 'কংস' নাম পড়িয়া তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের সহিত গণেশের গোলযোগে বাধাইয়াছেন। কিন্তু ঈশান নাগর রচিত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে স্পষ্ট "শ্রীগণেশ রাজা" গৌড়িয়া বাদশাহ মারিয়া রাজা হইয়াছিলেন, এই উল্লেখ থাকায়, এই তর্কের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ পরবর্তী সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাহিরপুরের প্রাচীন রাজবংশ পূর্বকালের ভৌমিক। বারাহী নদীর পূর্ব-তীরে তাহাদের গড়বেষ্টিত রাজধানীর চিহ্ন রামরামা গ্রামে এখনও দৃষ্ট হয় বলিয়া কথিত আছে। সম্প্রতি মহাকবি কৃত্তিবাসের যে আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, কবি বড়গঙ্গা-পারে পাঠ শেষ করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া শ্লোক পাঠ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনায় রাজপারিষদবর্গের অনেকে যে কংসনারায়ণের আত্মীয় বা সমসাময়িক, বারেন্দ্র ঘটক গ্রন্থের সাহায্যে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই জন্য রাজা কংসনারায়ণ এক সময়ে প্রবল হইয়া গৌড়েশ্বর উপাধি লইয়া থাকিবেন, এই মত আমরা কয়েক বর্ষ পূর্বে সমর্থন করিয়াছি (বঙ্গদর্শন; ১৩১০)। রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারসাধন করেন। বর্তমান তাহিরপুর-রাজবংশ পূর্ব-রাজবংশের দৌহিত্র সন্তান।

সান্তোল বা সাঁতুল রাজ্য— আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে প্রাচীন সান্তোল বা সাঁতুল রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সাঁতুল রাজ্য বা জমিদারি রাজা গণেশের সমকালীন বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রথমে তপ্পে ভাতুড়িয়া ও তাহার অন্তর্ভূত ১৩টি পরগণা এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর হস্তে আইসে। এই রাজবংশের বিলোপসাধনের বিবরণ রাজসাহীর জমিদারি সনন্দ হইতে আমরা কয়েক বৎসর পূর্বে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছি[৪]। কথিত আছে, সান্তোলরাজ সীতানাথ বৃদ্ধাবস্থায় নিজ কনিষ্ঠ রামেশ্বরের হস্তে বিষয়কর্মের ভার ন্যস্ত করেন। শেষে রামেশ্বরের দারুণ অবিশ্বাসের কার্যে শোকসন্তপ্ত হইয়া সীতানাথের মৃত্যু

হয়। রামেশ্বর 'পঞ্চ পাতকী' বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং লোকের বিশ্বাস যে, তাহার পাপেই সাঁতুল রাজ্যের ধ্বংস হয়। রামেশ্বরের পুত্র রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী ধর্মশীলা রাণী শর্বাণী পুণ্যকীর্তির জন্য উত্তর-বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি করতোয়া-তীরে ভবানী মাতার মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, তিনিই এই পীঠের উদ্ধারসাধন করেন। যাহা হউক, তাহার সময়ে যে এই তীর্থ বিশেষ জাগ্রত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অন্যান্য কীর্তিও অনেক ছিল। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পরে রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারি কার্য পরিচালনে অসমর্থ বলিয়া বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া জমিদারির কার্যভার তৎকালের একমাত্র সমর্থ নাটোরবংশ স্থাপয়িতা রঘুনন্দন তাহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন[৫]। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী করতোয়া-তটের মন্দির প্রভৃতির সংস্কার করাইয়া দেবসেবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে পুনরায় এই পীঠের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পুঁঠিয়া-রাজবংশের অনুগ্রহে নাটোর-বংশ-স্থাপয়িতা রঘুনন্দনের অভ্যুদয়ের কথায় এবং নাটোরের অনুগৃহীত দিঘাপতিয়ার প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামের বিবরণে আমার বাংলার ইতিহাসের অনেক স্থান পূর্ণ হইয়াছে। সেই সমস্ত কথা লইয়া পুনরায় আপনাদের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিতে চাহি না। তবে একটি কথার পুনরুক্তি আবশ্যক মনে করি। রাজসাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রে দশ বৎসর পূর্বে আমি রাজসাহী নামের উৎপত্তির কথা আলোচনা করিয়াছি; পরে আমার সামান্য ইতিহাসেও সেই কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু জনপ্রবাদের জীবন বড় কঠিন। কা'লও কথায় কথায় এখানকার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, 'এ রাজসাহী—এখানে রাজার অভাব নাই'। এখনকার রাজার সঙ্গে রাজসাহী নামের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, সে কথা প্রত্যেকের জানা উচিত। 'নিজ চাক্‌লা রাজসাহী রাজমহলের দক্ষিণ হইতে বর্তমান মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর-পূর্বে দিকে বোয়ালিয়ার অপর পার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "সাহী" অর্থাৎ বাদসাহী রাজা মানসিংহের নামে রাজসাহী নাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আইন-আক্‌বরীতে রাজসাহী পরগণার নাম নাই। নিকটবর্তী কুমারপ্রতাপ পরগণা মানসিংহের ভ্রাতা কুমারপ্রতাপ সিংহের নামে কথিত বোধ হয়। রাজসাহীর ইতিহাস লেখক কালীনাথ বাবু বলেন, এ অনুমান আমি সঙ্গত মনে করি না, কারণ, 'শ' এবং 'স'য়ে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। দন্ত্য 'স' দিয়া বানান করা যে উচিত নয়, তাহা তাহার মনে হয় নাই। নিজে চাক্‌লা রাজসাহী যখন পূর্ব-জমিদার উদয়নারায়ণের হস্ত হইতে রঘুনন্দনের কৃতিত্বে রাজা রামজীবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন অবধি তিনি রাজসাহীর জমিদার বলিয়া কথিত হইলেন। পরে তাহার প্রাপ্ত সমস্ত জমিদারি লইয়া এক লাটে সমগ্র রাজসাহী চাক্‌লা এক জন কালেক্টরের হস্তে স্থাপিত হইয়া রাজসাহী জেলা নাম হইল। কিন্তু তখন লস্করপুর (পুঁঠিয়া) ও তাহিরপুর ইহার অন্তর্গত ছিল না; এ দুই পরগণা মুরশিদাবাদের অধীন ছিল— এক জন সহকারী কলেক্টর এই দুইটির রাজস্ব আদায় লইতেন। তখনকার রাজসাহীর আয়তন কিরূপ ছিল, তাহা কোম্পানির রাজস্ব সেরেস্তাদার গ্রাণ্টের নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণী হইতে অনুমিত হইবে।

"Rajshahi the most unwiedly and extensive Zemindary in Bengal or perhaps in India; intersected in its whole length by the great Ganges &c, producting within the limits of its jurisdiction at least four fifths of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from the empire of Hindustan, with a superabundance of all the other richest productions of nature and art to be found in the warmer climates of Asia fit for commercial purposes; enclosing in its circuit and benefitted by the industry and population of the over-grown

capital of Murshidabad, the principal factories of Kasimbazar, Banleah Kumar khali &c and bordering on almost all the other great provincial cities & ...was conferred in 1725 on Ramjeon, a Brahmin, the first of the present family."

Grant's Analysis— Fifth Report.

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই রাজসাহী (নাটোর জমিদারি) পশ্চিমে রাজমহল হইতে পূর্বে চাকী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুরশিদাবাদ জেলা অর্ধাংশ, নদিয়া যশোহরের উত্তরাংশ, সমগ্র পাবনা, বগুড়া, রঙ্পুর, দিনাজপুরের কিয়দংশ, পুঁঠিয়া, তাহিরপুর বাদে এখনকার রাজসাহী এবং মালদহের অর্ধাংশ এই রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল। তখন ইহার পরিমাণফল ১২৯০৯ বর্গমাইল। এক জন জজ— কলেক্টরের দ্বারা ইহার কার্য চালান অসম্ভব বলিয়া দুই জন সহকারি কলেকক্টর (নাটোর ও মুরাদবাগে) নিয়োজিত ছিলেন। ইহাতেও কোম্পানির প্রথম আমলে রাজস্ব আদায়ে মহা গোলযোগ এবং চলনবিল প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ডাকাইতি ও রাহাজানী হইত। শেষে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে— যখন জেলা-বিভাগ ভাগ করিবার কথা হইল, তখন এই রাজসাহীর পার্শ্বের স্থানগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া রাজসাহী জেলাকে পদ্মার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে স্থাপিত করা হইল। এই সময়েই 'নিজ রাজসাহী' ইহা হইতে বাদ গেল। কিন্তু তখনও মহানন্দা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র রাজসাহী জেলার সীমা থাকিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চোর-ডাকাইতের দমন প্রভৃতি কারণে রাজসাহী জেলা হইতে চাঁপাই, রোহনপুর প্রভৃতি থানা লইয়া এবং পুর্ণিয়া ও দিনাজপুর হইতে কিছু কিছু লইয়া বর্তমান মালদহ জেলা গঠিত হইল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় রাজসাহী হইতে সেরপুর, বগুড়া প্রভৃতি মহকুমা কাটিয়া এবং রঙ্পুর ও দিনাজপুর হইতে কিছু কিছু লইয়া বগুড়া জেলা হইয়াছিল। সর্বশেষে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে— অবশিষ্ট রাজসাহী জেলা হইতে শাজাদপুর, পাবনা প্রভৃতি পাঁচ থানা ও যশোহর হইতে কিছু লইয়া বর্তমান পাবনা জেলা হইয়াছে। এ প্রবন্ধে পূর্বতন রাজশাহী জেলাই আমাদের লক্ষ্য। ইহা প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণাংশ।

সাহিত্যচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত বরেন্দ্রভূমি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেন বরেন্দ্রভূমির অনিরুদ্ধ নামক মহাপণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চতুর্বেদাচার্য এবং সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নান্নসী গ্রামী কুল্লুকভট্ট বরেন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়ানাচার্যও এই বরেন্দ্র-সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে গৌড়ের মুসলমান বাদশা এবং বরেন্দ্রভূমির ভৌমিক রাজাদিগের সভায়ও বহুতর পণ্ডিত ও মনস্বী লোকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। রাজা কংসনারায়ণের প্রধান পণ্ডিত মুকুন্দ ও তৎপুত্র ধর্মাধিকার শ্রীকৃষ্ণ এবং পরবর্তীকালের লঘুভারতকারের নাম এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামজীবনের সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ১৬৪৫ শকে (বাং ১১৩০ সাল) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া শেষ যুগের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুণ্যকীর্তি মহারাণী ভবানী অসংখ্য সৎকার্যের মধ্যে বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের জন্য যে সমস্ত বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া যান, তাহার কথা এখনও দেশীয় প্রবাদে পরিচিত আছে;—

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, রাণী ভবানীর বৃত্তি।
দিনাজপুরের নগদ দান, বর্ধমানের কীর্তি।।

প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানী দান, বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর-দান বা কীর্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন না হইলেও, তাহার বিদ্যা-বিতরণের নিমিত্ত দেশব্যাপী বৃত্তিই উক্ত কবিতার প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান রাজসাহীতে মুসলমান কীর্তির মধ্যে বাঘার মসজিদ (১৫৩০ খ্রিঃ) এবং কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮) প্রধান।

প্রাচীন রাজসাহী শিল্প-বাণিজ্যের নিমিত্তও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পুণ্ড্রদেশ বহু প্রাচীন

কাল হইতে রেশমের চাষ ও ব্যবসায়ের স্থান ছিল। রামায়ণের একটি শ্লোকের[৬] ব্যাখ্যায় অনেকে পুণ্ড্রই কোষকারদিগের ভূমি বলিয়া নির্দেশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীট বা কৃমির অন্যতম নাম পুণ্ডরীক। এখনও মালদহ জেলায় পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো জাতিই প্রধানত রেশম কীট পালন করিয়া থাকে। ইহারই অপভ্রংশে পৌঁড়ু, পোলু, বা পলু হইয়াছে; সমগ্র বাংলায় রেশম-কীটের বর্তমান নাম পলু। মালদহ হইতে বগুড়া পর্যন্ত প্রদেশে এককালে প্রচুরপরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত। অনেকে 'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য'— শকুন্তলার এই শ্লোক এবং অন্যান্য উল্লেখ হইতে বলিতে চান, রেশমের চাষ চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অংশুপট্ট বা রেশম বস্ত্রের কথা আছে; এই 'অংশু' কথার সহিত 'চীন' শব্দ যোগ কারায় বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, রেশম ভারতে বহু দিন অবধি ছিল। মহাভারতের রাজসূয়পর্বাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, চীনেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে রেশমবস্ত্র উপহার দিয়াছিল। চীনদেশীয় পট্টবস্ত্র উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া বিলাসীরা উহা ব্যবহার করিতেন। ক্রমে চীনা পলুও এ দেশে আসিয়া থাকিবে। পুণ্ডরীকের প্রাচীন বাসস্থল এই বরেন্দ্রভূমি ভারতে রেশম-চাষের প্রসূতি না হউক, রেশমের যে অন্যতম প্রধান স্থান ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোম্পানিরা কাশিমবাজারে প্রধান কুঠি করিয়া মালদহ ও রাজসাহীর আড়ঙ্গ হইতে রেশমী বস্ত্র আনাইয়া লইতেন। সে সময়ে মুরশিদাবাদ রেশম-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজসাহীতে ইংরেজ কোম্পানি এক পৃথক কুঠি করেন। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজসাহী অঞ্চলের রেশম কোম্পানির লাভের অন্যতম সহায় ছিল। এখনকার অবস্থা কি, কাহারও অজ্ঞাত নাই। রেশমের কথা দূরে থাকুক, রাজসাহীর প্রচুর রবিশস্যে প্রসিদ্ধ বন্দর গোদাগাড়ি সে কালের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল, তাহাই বা আজ কোথায়? রাজসাহী কি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ, এই প্রশ্নের উত্তরে এক বালক বলিয়াছিল, 'গাঁজা'!

সাহিত্য ১৩১৫, বৈশাখ

---

* রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

১. শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
ম্লেচ্ছাবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।।

২. স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত করতোয়া-মাহাত্ম্যে নির্দেশ আছে,—
করতোয়া-সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুত।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।
এ বচন আধুনিক বলিলেও, রঘুনন্দনের কৃত বলিয়া তত আধুনিক বলা যায় না।

৩. করতোয়াতটে তল্পং বামে বামনভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা।।— পীঠমালা।

৪. উৎসাহ মাসিক পত্র— ১৩০৪ ও নবাবী আমলের ইতিহাস।

৫. ভাতুড়িয়া সনন্দ— নাটোর-রাজ (নবাবী আমলের ইতিহাস)।

৬. মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রসুহ্মাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাংভূমিঞ্চ রজতাকরাম্।।—কিষ্কিন্ধ্যা—৪০।৩২।

সুরেন্দ্রমোহন বসু

রাজসাহীর রাজবংশ

পুঁঠিয়া রাজবংশ

রাজসাহী বিভাগের মধ্যে পুঁঠিয়া রাজবংশ অতি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। পুঁঠিয়ার রাজগণ সিদ্ধপুরুষবংশ সম্ভূত।

কথিত আছে, বৎসরাচার্য নামে জনৈক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পুঁঠিয়ায় একটি আশ্রম করিয়া ভগবদুপাসনা করিতেন। তৎকালে মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের লস্কর খাঁ নামক একজন কর্মচারী দিল্লিশ্বরের নিকট হইতে লস্করপুর পরগণা জায়গির প্রাপ্ত হন। তাহার মৃত্যুর পর উহা মুসলমান সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বাংলার রাজস্ব সংগ্রাহকগণ দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণ না করায় সম্রাট তাহাদের দমনার্থ একজন মুসলমান সেনাপতিকে মোঘলবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তিনি বৎসরাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ তাহার অভিষ্ট বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনন্তর বৎসরাচার্য পুরস্কারস্বরূপ পদ্মা নদীর তীরবর্তী লস্করপুর পরগণা, জায়গির প্রাপ্ত হন। বৎসরাচার্য বিষয় বাসনারহিত ছিলেন, তিনি জমিদারির ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না। তাহার অনেকগুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে চতুর্থ পীতাম্বর ও পঞ্চম নীলাম্বর রায়।

পীতাম্বর রায়

বৎসরাচার্যের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর রায় একজন চতুর লোক ছিলেন। তিনি মোঘল সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া 'রায়' উপাধিসহ পৈতৃক জমিদারি লস্করপুর পরগণা লাভ করেন।

নীলাম্বর রায়

পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর রায় এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি জমিদারির আয় কথঞ্চিত বৃদ্ধি করেন। নীলাম্বর অহমিকা শূন্য আচরণ দ্বারা প্রজাপুঞ্জের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্র রায়

অনন্তর নীলাম্বরের কনিষ্ঠপুত্র আনন্দচন্দ্র রায় জমিদারি লাভ করেন। তিনি পিতার জীবিতকালে দিল্লিশ্বর কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় তিনি এই বংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন। তাহার সহিত লস্করপুর পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া ১,৮৯,৫৯২ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হয়।

রতীকান্ত রায়

অতঃপর আনন্দচন্দ্রের পুত্র রতীকান্ত রায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েকটি অসন্তোষকর কার্য করিয়া রাজা উপাধিলাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু সাধারণ্যে "তালুকদার" উপাধিতে খ্যাত ছিলেন।

রামচন্দ্র রায়

রতিকান্তের পর তাহার পুত্র রামচন্দ্র রায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি রাধাগোবিন্দ জীউ নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র মৃত্যুকালে তিন পুত্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণকে রাখিয়া যান।

নরনারায়ণ রায়

তৎপরে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নরনারায়ণ রায় এই বংশের প্রতিনিধি হন। তাহার সময় নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব মৈত্র বারুইহাটি পরগণার একজন তহশীলদার নিযুক্ত হন। নরনারায়ণ অভাবগ্রস্ত জনসমূহের অভাব মোচন করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন।

দর্পনারায়ণ রায়

তদনন্তর রামচন্দ্রের মধ্যমপুত্র দর্পনারায়ণ রায় পুঁঠিয়ার জমিদারি প্রাপ্ত হন। তাহার সময় নাটোরের রঘুনন্দন রায় সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় ধীশক্তি বলে মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে পুঁঠিয়া রাজের মোক্তার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর দর্পনারায়ণ নবাব মুরশিদকুলি খাঁর প্রধান কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতা প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের যাবতীয় আয় ব্যয় সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করেন। তাহার যত্নে ও যোগ্যতার গুণে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত সুব্যবস্থা করিয়া সাধারণ প্রজাবর্গের শ্রদ্ধাভাজন হন। তিনি অতি কর্তব্যপরায়ণ ও সাধু প্রকৃতি ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় অতিথিশালা প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দর্পনাবায়ণ রায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ রায়

রামচন্দ্রে কনিষ্ঠপুত্র জয়নারায়ণ রায় বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে রাখিয়া যান।

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়

জয়নারায়ণের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় কোনরূপ অন্যায় কার্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সকল বিষয়ে গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগ করিতেন। প্রজাদিগের হিতসাধন করিবার চেষ্টা তাহার চরিত্রে প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

এই বংশের অন্যতম প্রতিনিধি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন করেন। ১৮০৭ খ্রিঃ তিনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পুখরিয়া, রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী পরগণা কালীগ্রাম ও কাজিহাটা, নদিয়া জেলার অন্তর্গত ভবানন্দদিহার এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি ক্রয় করেন। তিনি উহা হইতে কিছু সম্পত্তি বারাণসী ধামের সদকার্যের জন্য দান করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তথায় একটি অতিথিশালা ও স্নানঘাট নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি বিহারের অন্তর্গত ফল্গু নদীতীরে আর একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৯ খ্রিঃ যোগেন্দ্রনারায়ণ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮১৬ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

শরৎসুন্দরী দেবী

যোগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পত্নী শরৎসুন্দরী দেবী বিষয় সম্পত্তিপ্রাপ্ত হন। তাহার পিতা ভৈরবনাথের তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। পাঁচ বৎসর মাত্র বয়সে পুঁঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত শরৎসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে পিতৃদেবের

অতিথিশালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ করিতেন। সেই সময় নানা শ্রেণির দুঃস্থ ও আতুর লোকদিগের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ মোচনের চেষ্টা মানব জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য বুঝিয়াছিলেন। পঞ্চদশ মাত্র বয়সে তাহার স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিধবা হইয়া তিনি ব্রত উপাসনাদিতে ঘোরতর ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় সরল ও বিলাসশূন্য ছিলেন। রাজকার্য পরিচালনা করিবার পর অনেক সময় জপে নিবিষ্ট চিত্ত হইতেন। ১৮৬৫ খ্রিঃ ষোড়শ বৎসর বয়সে তাহার হস্তে স্বামীর সম্পত্তির ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বিষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য চিকের অন্তরাল হইতে কর্মচারীদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া দাসীর দ্বারা স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের পরামর্শ ব্যতীত কার্য করিতেন না। কাহারও নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন নাই, দীর্ঘকাল ভোগ দখলকেই উৎকৃষ্ট দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন। ১৮৬৫ খ্রিঃ পিতা ভৈরবনাথের সহিত গয়াধাম গমন করেন। অতঃপর বারাণসীধামের সমস্ত তীর্থ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনপূর্বক পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগত হন। ১৮৬৬ খ্রিঃ তাহার পিতা ভৈরবনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি পিতৃদেবের সম্পত্তির প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী দাক্ষিণ্য ও দানশীলতায় রাজবংশের মান ও আপনার ব্যক্তিগত মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাহার অকপট ব্যবহার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় নামক একজন অংশীদার দৈব দুর্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেন ; ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ এবং তাহার পরিবারবর্গের তীর্থবাস ও ভরণপোষণের সমস্ত ভার শরৎসুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হন। কুমার গোপালেন্দ্র রায় নামক আর এক অংশীদারের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনকালে উক্ত কুমারের বিবাহ উপলক্ষে কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বিবাহের ব্যয় অতি অল্প মঞ্জুর করিলে শরৎসুন্দরী সেই বিবাহ উপলক্ষে ৬০০০ টাকা দান করেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি পুঁঠিয়ায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে পণ্ডিতগণকে লাখরাজ ভূমিদান করেন। প্রতিবৎসর শীতকালে পণ্ডিতগণকে শীতবস্ত্র এবং বর্ষাকালে দরিদ্রদিগকে আহার করাইতেন। তিনি অনেক দাতব্যালয়ে এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বহু অর্থ দান কবিয়াছেন। প্রতিবৎসর জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও দরিদ্রগণকে অর্থদান করিতেন। তাহার অনন্ত চতুর্দশীর ব্রত প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় ১৫,০০০ টাকা দান করেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্মাণকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। রাজসাহীর ইংরাজি বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইলে, তিনি প্রাচীর ও রেলিং নির্মাণ জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খ্রিঃ দুর্ভিক্ষের সময় বহু টাকার খাজানা রেহাই দিয়াছিলেন এবং প্রায় চারিমাস কাল প্রত্যহ অসংখ্য আতুরকে আহারীয় দ্রব্য ও নগদ টাকা দান করিতেন। পুঁঠিয়া, বৃন্দাবন ও কাশীধামে দেবালয় নির্মাণ এবং অন্নসত্রের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৭৫ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে তদীয় পোষ্যপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষ্যে ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রিঃ ১২ মার্চ গবর্ণমেণ্ট তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া "রাণী" উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লির দরবারে শরৎসুন্দরী "মহারাণী" উপাধি সম্মানে বিভূষিতা হন। ১৮৮১ খ্রিঃ ৬ মার্চ তাহার পোষ্যপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় ১,৩০,০০০ টাকা শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ হইয়াছিল; ১৮৮৩ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে মহারাণী শরৎসুন্দরী বারাণসী ধামে গমন করেন। তিনি তথায় দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা ও সরস্বতী পূজা মহাসমারোহে সমাপন করিয়াছিলেন। তিনি আট বৎসর মাত্র রাজ্য পরিচালনা করিয়া জমিদারির বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করেন। প্রায় দশ লক্ষ টাকার নূতন ভূসম্পত্তি ক্রয় ভিন্ন নগদ টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন

নাই। ১৮৮৬ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি পুনরায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সেই সময় তাহার জননী দ্রবময়ীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাহারা বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা, চিত্রকূট, ওঙ্কারেশ্বর, নর্মদেশ্বর, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ্যারণ্য, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, জ্বালামুখী— এই স্থানে তাহার জননীর মৃত্যু হয়— মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া বারাণসীধামে প্রত্যাগত হন। অতঃপর ১৮৮৭ খ্রিঃ ৮ মার্চ ৩৮ বৎসর বয়সে পুণ্যভূমি কাশীধামে শরৎসুন্দরীদেবী শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মহারাণীর জীবদ্দশায় তাহার দত্তকপুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

হেমন্তকুমারী দেবী

মহারাণীর দেহত্যাগ হইলে তাহার পুত্র বধু রাণী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী বিষয় কার্য পরিচালনা করিতেছেন। ইনি দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোকহিতৈষিণী রমনী। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ পাঠে ইহার আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। ইনি বহু লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন। দেবমন্দির, ধর্মশালা, রাজপথ নির্মাণ ও অন্যান্য সদানুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া থাকেন। ১৯১২ খ্রিঃ ইনি মানিকগঞ্জ-ধুল্লা গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেন্টকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ১৯১২ খ্রিঃ মে মাসে ঢাকার নর্থ ব্রুক লাইব্রেরির গ্রন্থ ক্রয় জন্য ৫,০০০ টাকা দান করেন। ১৯১২ খ্রিঃ বারাণসী ধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ইনি বহু অর্থ ব্যয়ে কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটের সংলগ্ন প্রয়াগঘাট সুন্দররূপে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রিঃ ইনি পুরীধামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুঁঠিয়ার পাঁচ আনার অধিকারিণী রাণী হেমন্তকুমারী সহৃদয়া, বুদ্ধিমতী ও সরল প্রকৃতির রমণী। ইহার মনে হিংসা দ্বেষ কখন স্থান পায় নাই। অসহায় দরিদ্রদিগকেও অর্থদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটোর রাজবংশ

খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে চন্দ্রবংশীয় হিন্দুরাজ আদিশূর কাণ্যক্যুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের মতে শাণ্ডীল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেন, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আগত হন। কুলজ্ঞগণ উক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতেই বারেন্দ্র সমাজের সূচনা করেন। উল্লিখিত কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ হইতে নাটোর তাহিরপুর, আলাপসিংহ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চের অন্যতম সুষেণের পুত্র ব্রহ্মা ওঝা— দক্ষ-শান্তনু-হিরণ্যগর্ভ-ভূগর্ভ-বেদগর্ভ। তাহার পুত্র জিগনী একজন মহাসাধক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠা ও তপস্যাদির দ্বারা লোকসমাজে জিগনী মহামুণি নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি প্রতিষ্ঠার সহিত সংসারধর্ম সম্পাদন করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক হিমাচলে জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া তথায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। জিগনী মহামুণির স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের শ্রেণি বিভাগ সময় স্বর্ণরেখ বারেন্দ্রভূমে ছিলেন, কিন্তু ভবদেব রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হন। স্বর্ণরেখের পুত্র সিন্ধু ওঝা। তাহার কৈতাই, মৈতাই ও গরুড় নামে তিন পুত্র ছিলেন। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপনকালে বাস গ্রামের নামানুসারে কৈতাই ভাদুড়ি ও মৈতাই মৈত্র গাঞি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। মৈত্র গ্রাম নাটোরের সন্নিকটে অবস্থিত। নাটোর রাজবংশ এবং ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার বংশ এই মৈতাই মৈত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মৈতায়ের পুত্র স্থির। তৎপুত্র দৌয়াচার্যের সময় বঙ্গরাজ্য মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। দৌয়াচার্যের পুত্র মহানিধি আচার্য

পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ভৃগু ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ বৃহস্পতি ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাহার দুই পুত্র সোল ওঝা ও কুপ ওঝা উপাধ্যায়। তাহারা উভয়ে সাতটা ও মাঝগ্রাম নামক দুইটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কুপ ওঝার তিনপুত্র — অম্বর ওঝা, কেশব ওঝা ও মাধব ওঝা। জ্যেষ্ঠ—অম্বর ওঝা পিতার প্রতিষ্ঠিত সাতটা সমাজভুক্ত থাকেন, কিন্তু কেশব ওঝা ও মাধব ওঝা পৃথক স্থানে গমনপূর্বক বিভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কনিষ্ঠ মাধব ওঝা আচড়াতে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সিতরার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য বংশ এই মাধব ওঝা হইতে সমুদ্ভুত। মধ্যম কেশব ওঝা আঙ্গোরা গ্রামে গিয়া স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। তাহার জীবর ওঝা নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। জীবরের চারি পুত্র— শুধাই, সিধাই, বিভাই ও মিওয়াই। জ্যেষ্ঠ শুধাইয়ের পুত্র শঙ্করপানি। তাহার তিন পুত্র আদিত্য, শ্রীনিবাস ও রামনিতাই। মধ্যম শ্রীনিবাসের ছয় পুত্র— রামশরণ, ধূর্জটি, শিব, দিবাকর, ত্রিবিক্রম ও গৌরীধর। তদীয় চতুর্থ পুত্র দিবাকর হইতে নাটোর রাজবংশের শাখা বহির্গত হইয়াছে।

কামদেব মৈত্র

দিবাকরের অধস্তন পুরুষ কামদেব মৈত্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত নাটোর মৌজায় বাস করিতেন। তিনি পুঁঠিয়া রাজবংশের নরনারায়ণ রায়ের অধীনে বারুইহাটির একজন তহশীলদার নিযুক্ত ছিলেন। কামদেব নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব রায় নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ। তাহার তিনপুত্র— রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম রায়। কণিষ্ঠ বিষ্ণুরাম পিতার জীবিতকালে গতাসু হইয়াছিলেন।

কামদেবের মধ্যমপুত্র রঘুনন্দন রায় বাংলার ইতিহাসে একজন প্রতিভাশালী শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া পরিচিত। পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ রায় তাহাকে প্রথমতঃ আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে রাখিয়াছিলেন। তিনি তথায় শীঘ্র মুসলমান আইনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নবাবের কানুনগোর প্রিয়পাত্র হন। তৎপরে কানুনগো তাহার কর্মদক্ষতা দেখিয়া আপনার অধীনে নায়েব-কানুনগো পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তাহার প্রতি এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে আপন মোহর পর্যন্ত রঘুনন্দনের নিকটে রাখিতেন। মুরশিদাবাদের নবাব মুরশিদকুলি খাঁ সেই সময় সরকারি রাজস্ব নষ্ট করিলে ১৭১২ খ্রিঃ দিল্লিশ্বর বাহাদুর সাহ তদপরাধে তাহাকে পদচ্যুত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই অপমান নিবারণার্থ নবাব একটি কৃত্রিম জমা-খরচ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ; কিন্তু কানুনগো কোন কাগজে স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কন না করিলে সম্রাট উহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই বিপদকালে রঘুনন্দন নবাবের মনোরঞ্জনার্থ সেই কাগজে কানুনগোর মোহর মুদ্রিত করেন। পরিশেষে উহা দিল্লিশ্বরকে প্রেরিত হইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া নবাবের পদচ্যুতি রহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর পুরস্কারস্বরূপ নবাব তাহাকে সুবা বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া "রায় রাঁইয়া" উপাধি প্রদান করেন। রঘুনন্দন অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। নবাব দরবারে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়া রঘুনন্দন স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তর ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

রামজীবন রায়

কামদেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র রামজীবন রায় পুঁঠিয়ার রাজাদিগের অধীনে নাটোরে বাসভবন নির্মাণ করিয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। ১৭০৬ খ্রিঃ তিনি নবাব মুরশিদকুলি খাঁর অনুকম্পায় দিল্লিশ্বর আরঙ্গজীবের নিকট হইতে রাজদণ্ড, রাজছত্র প্রভৃতি ২২ খানি খেলাত সহ "রাজাবাহাদুর" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া নাটোরের রাজা বলিয়া প্রখ্যাত হন। ১৭০৮ খ্রিঃ পরগণা বানগাছির জমিদার গণেশরাম চৌধুরী যথাসময়ে রাজস্বপ্রদানে অক্ষম হইলে নবাব মুরশিদকুলি

খাঁ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রামজীবনকে বানগাছির জমিদারি প্রদান করেন। তৎকালে রাজসাহীতে উদিতনারায়ণ রায় নামে জনৈকি জমিদার বাস করিতেন। তিনি রাজসাহীর রাজা ও নবাব দরবারের সর্বপ্রধান সমান্তরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উদিতনারায়ণ মৃত্যুকালে নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ নামে দুইটি অল্প বয়স্ক পুত্র রাখিয়া যান। ১৭১৪ খ্রিঃ নবাব মুরশিদকুলি খাঁ রামজীবনকে ঐ রাজসাহী রাজ্য প্রদান করেন। রাজসাহী রাজ্য লাভ করিয়া রামজীবন "মহারাজা" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া নবাব দরবারের সর্বপ্রধান সামন্তরাজের সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৭২০ খ্রিঃ যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের পতন হইলে তাহার ভূষণা রাজ্য রামজীবন লাভ করেন। আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর নিকটে সান্তোল নামে একটি রাজ্য ছিল। তাহার বাৎসরিক দুই কোটি টাকা আদায় ছিল, তন্মধ্যে ৫২,৫৩,০০০ টাকা মুসলমান সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। সান্তোলপতি রাজা রামকৃষ্ণ রায় দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া ১৭২০ খ্রিঃ স্বর্গারোহন করেন। হরিপুর নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী সান্তোল রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৭২১ খ্রিঃ রাণী সর্বাণী গতাসু হইলে উত্তরাধিকারী হীন সান্তোল রাজ্য রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় নাটোরধিপতি রামজীবন রায়ের রাজ্য ভুক্ত হয়। তৎপরে ক্রমে বহু পরগণা তাহার হস্তগত হইলে মহারাজ রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার লাভ করেন। তিনি সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাসনভার তাহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৭২৪ খ্রিঃ মহারাজ রামজীবনের একমাত্র পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ রায় সহসা কালগ্রাসে পতিত হন। গৌড়ের শাসনকর্তাদিগের অধীনে সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ ভাদুড়ি নামে তিন ভ্রাতা উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান সরকার হইতে তাহারা "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ জগদানন্দ খাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র পাঁচু রায়ের পুত্র রসিকচন্দ্র রায়, মহারাজ রামজীবনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন; তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে নাটোরাধিপতি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৩০ খ্রিঃ মহারাজ রামজীবন রায় প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

রামকান্ত রায়

রামজীবনের দেহান্তে ১৭৩০ খ্রিঃ তাহার পোষ্য পুত্র রামকান্ত রায় জমিদারি প্রাপ্ত হন। তখন রামকান্তের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর এবং তদীয় পত্নী ভবানী দেবীর বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। ১৭৩৪ খ্রিঃ রামকান্ত স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৩৭ খ্রিঃ যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙার রাজা রঘুদেব দেবরায় রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইলে নবাব সুজাউদ্দৌলার আদেশে তাহার জমিদারি রামকান্তের হস্তে অর্পিত হয়। ক্রমে মহারাজ বিষয়কার্যে অত্যন্ত অমনোযোগী হন। ভূতপূর্ব মহারাজ রামজীবনের সময়াবধি দয়ারাম রায় নামে এক ব্যক্তি রাজ সরকারের দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ রামকান্ত সঙ্গিগণের কুপরামর্শে দেওয়ান দয়ারামকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর ১৭৪২ খ্রিঃ দয়ারাম মুরশিদাবাদ গমনপূর্বক নবাব আলিবর্দি খাঁর নিকট রামকান্তের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করেন এবং সেই সময় নিয়মিত রাজস্ব না পাইয়া নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় পিতৃব্য পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়কে জমিদারি দিয়াছিলেন। তৎপরে দয়ারাম রায় কতকগুলি সৈন্য লইয়া দেবীপ্রসাদের সহিত নাটোর রাজপুরী আক্রমণ করেন। সেই সময় মহারাজ রামকান্ত রায় গর্ভবতী রাণী ভবানীকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া নবাবের ধনরক্ষক মুরশিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের জগৎশেঠ ফতেচাঁদের শবণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুগ্রহে কয়েকমাস পরে নবাব আলিবর্দি খাঁ পুনরায় মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৪৬ খ্রিঃ

মহারাজ রামকান্ত রায় গতাসু হন। রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিন গ্রাম নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর সহিত মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল। তখন ভবানী দেবীর বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ মাত্র। তাহার দুই পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শশীকান্ত রায় একাদশ মাসে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অন্নপ্রাশনের পূর্বে অকাল মৃত্যু মুখে পতিত হন। তৎপরে তারামণি নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ির সহিত সপ্তম বর্ষমাত্র বয়সে তারামণির শুভ পরিণয় হয়, কিন্তু বিবাহের সাত দিন পরে তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তারামণি জননীর সহিত থাকিয়া পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনিও মাতার ন্যায় বড়নগরে একটি গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

রাণী ভবানী

রামকান্তের পরলোকান্তে তাহার সহধর্মিনী বঙ্গবিখ্যাতা রাণী ভবানী দেবী দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে উত্তরাধিকারিণী হন। ১৭৪৭ খ্রিঃ নবাব আলিবর্দি খাঁ তাহাকে সনন্দ প্রদান করেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রদিগের উপদ্রবে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নবাবের সহায়তা করিলে নবাব দরবারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। সেই সময় তিনি বঙ্গের প্রধান ভূম্যধিকারিণী মধ্যে গণ্য হন। তাহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। প্রজাগণের প্রাণদণ্ডাদি সর্ববিধ দণ্ডাদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার সময় নাটোর রাজ সরকারের বার্ষিক আয় দেড় কোটি টাকার উপর হইয়াছিল। নবাব সরকারের রাজস্ব সত্তর লক্ষ টাকা দিয়া তিনি অবশিষ্ট অর্থ সৎকার্যে ব্যয় করিতেন। ১৭৫১ খ্রিঃ রাণী ভবানীর বিশেষ গৌরবের অবস্থা হইয়াছিল। দিল্লিশ্বর সম্রাট আরঙ্গজীবনের কঠোর শাসনে কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির, বেণীমাধবের মন্দির প্রভৃতি বহু হিন্দুমন্দির চূর্ণ হইলে রাণী ভবানী প্রভূত অর্থ ব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার করেন। ১৭৫৩ খ্রিঃ তিনি কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার বিখ্যাত দুর্গাবাড়ি ও দুর্গাকুণ্ড তাহার ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। দুর্গাকুণ্ডের সন্নিকট "কুরুক্ষেত্র তলাও" নামে একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। কাশীধামে তিনি অনেকগুলি বিগ্রহ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপানি, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, তারা প্রভৃতি প্রধান; এতদ্ভিন্ন প্রায় চারিশত প্রস্তরময় ক্ষুদ্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তথায় অতিথিশালা স্থাপন করেন। কাশীধামের মধ্যে তিনশত বাটি বাসস্থান শূন্য লোকদিগের জন্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে বহু তীর্থবাসী বাস করিত। কাশীধামের চতুর্দিকে প্রায় পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা স্থানে ছায়াতরু রোপন এবং তাহার পার্শ্বে কূপ খনন ও একটি স্তম্ভ নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাশীধামে তাহার অনেক কীর্তি আছে, তন্মধ্যে অন্নসত্র, সরোবর, স্নানঘাট, মন্দির, ধর্মশালা অদ্যাপি রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্তি ঘোষণা করিতেছে। গয়াধামেও তিনি অনেক সৎকার্য ও দেবালয় স্থাপন করেন। তিনি অধিকাংশ সময় মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জাহ্নবী তীরবর্তী বড়নগর গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। তথায় তাহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দির আছে। তিনি বড়নগরে ভবানীশ্বর মন্দির, রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রভৃতি স্থাপন করেন, এতদ্ভিন্ন অতিথিশালা ও আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার জন্মস্থানের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া স্বীয় জননী জয়দুর্গা দেবীর নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়দুর্গার পূজার জন্য পার্শ্ববর্তী ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান। রাজসাহী জেলায় ও নাটোর রাজধানীতে তিনি অনেক দেবালয়ে ও পুণ্যকীর্তি করেন; বিশেষত এই জেলাতে অনেক লাখেরাজ ও ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। স্বীয় জমিদারির মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্যাদায়ের সমুদয় ব্যয় নাটোর রাজ সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। তিনি রাজ্যের রোগীদিগের চিকিৎসার

জন্য কবিরাজ ও হকিম নিযুক্ত করেন। ১৭৭০ খ্রিঃ বঙ্গদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত; সেই সময় তিনি প্রজার কষ্ট নিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, গঙ্গাবাসী, আখড়াধারী, মহান্ত ও অতিথিদিগের জন্য প্রতি বৎসর এক লক্ষ আশী হাজার টাকা দানাদি বৃত্তি ছিল, তন্মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা অধ্যাপক ও পণ্ডিতদিগকে প্রদত্ত হইত। এই বৃত্তি চিরস্থায়ী জন্য তিনি ১৭৮৮ খ্রিঃ হইতে কোম্পানির ভাণ্ডারে প্রতিবৎসর অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা দাখিল করিতেন। তিনি স্বীয় অধিকারস্থ বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, মুরশিদাবাদ, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি জেলার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণকে বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয়ের ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা ভূমি দান করেন। সেই সকল ভূমির রাজস্ব ছিল না, কিন্তু অধুনা গবর্ণমেণ্ট অনেক ভূমির খাজানা ধার্য ও অনেকের বৃত্তি লোপ করিয়াছেন। রাণী ভবানী স্বদেশের কল্যাণ কামনায় বহু সদনুষ্ঠান করেন; অধিকন্তু লোকহিতকর ব্রতে মুক্ত হস্তে পঞ্চাশ কোটির উপর অর্থ ব্যয় করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার দান যেরূপ অদ্বিতীয়, সম্মানও তদ্রূপ ছিল। হিন্দুমুসলমান সকলেই তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। অর্ধবঙ্গব্যাপী রাজসাহী রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেন। সেই সময় হইতেই তিনি পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্রিঃ রংপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ "বাহারবন্দ" পরগণা ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব অন্যায়পূর্বক রাণী ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়া মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুকে প্রদান করেন। হেস্টিংসের ব্যবহারে মর্ম পীড়িত হইয়া রাণী ভবানী তাহার পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বড়নগরে গিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করেন। অতঃপর ১৮০৩ খ্রিঃ মাঘী পূর্ণিমার দিবস অর্ধবঙ্গাধিকারিণী নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানী সগৌরবে অর্ধশতাব্দীকাল দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনাপূর্বক অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতার পরলোকান্তে স্বামীর অনুমত্যানুসারে রামকৃষ্ণ রায় নামক একটি বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ রায়

রাণী ভবানী লোকান্তরিতা হইলে তাহার পোষ্যপুত্র মহাসাধক রামকৃষ্ণ রায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৯০ খ্রিঃ তিনি মোঘল সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" রাজোপাধি লাভ করেন। তিনি জমিদারির কার্য কিছুই দেখিতেন না। তজ্জন্য তাহার সময় হইতেই নাটোর রাজবংশের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। তিনি যে সকল পুরাতন কর্মচারীদিগকে জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন, তাহারা সেই সকল বিষয় কৌশলে আপনারা গ্রাস করেন। ১৭৯৩ খ্রিঃ লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে ভূস্বামীবৃন্দের বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে নাটোরাধিপতির অনেক ভূসম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যায়। যশোহর নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় এবং দীঘাপতিয়ার দয়ারাম রায় উভয়ে নাটোররাজের দেওয়ান ছিলেন। রাজস্ব বাকি হইয়া নাটোর রাজের পরগণা বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা কয়েকটি পরগণা নিলামে ক্রয় করেন। তৎপরে অনেকগুলি বিষয় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হয়। সেই সময় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙার খেলারাম মুখোপাধ্যায় আড়পাড়া, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ডিহি খনেশপুর ও স্বরূপপুর, পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদি পরগণা ক্রয় করেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়বাসনা ছিল না। তিনি যোগী, তাপসিক, বিষয়বিরাগী ও আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, তজ্জন্য প্রবালপ্রতাপ ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৯৫ খ্রিঃ রাণী ভবানীর জীবিতকালে মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি

রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। মহারাজের দুই পুত্র— বিশ্বনাথ ও শিবনাথ রায়। তাহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে "বড়তরফ" ও "ছোট তরফ" নামে নাটোর রাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান।

বিশ্বনাথ রায়

মহারাজ রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বিশ্বনাথ রায় যে জমিদারির অংশপ্রাপ্ত হন তাহার রাজস্ব আঠারো লক্ষ টাকা ছিল। তিনি অপুত্রক থাকায় তাহার পত্নী কৃষ্ণমণি, গোবিন্দচন্দ্র রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

গোবিন্দচন্দ্র রায়

বিশ্বনাথের দত্তকপুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র রায় সাবালক হইবার পর কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি যশ ও প্রতিপত্তির সহিত জীবনের কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি গতাসু হইলে তাহার বিধবা পত্নী শিবেশ্বরী দেবী, গোবিন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

গোবিন্দনাথ রায়

গোবিন্দচন্দ্রের দত্তক পুত্র গোবিন্দনাথ রায় বিবিধ রাজোচিত গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও বিষয় কার্যে নিপুণ ছিলেন। তাহার কার্যকলাপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি অপুত্রক অবস্থায় তনুত্যাগ করিলে তাহার বিধবাপত্নী জগদিন্দ্রনাথকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রিঃ ২ সেপ্টেম্বর ৬৫ বৎসর বয়সে নাটোরের বৃদ্ধারাণী পরলোকগমন করিয়াছেন।

জগদিন্দ্রনাথ রায়

গোবিন্দনাথের দত্তক পুত্র মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় এক্ষণে নাটোরের বড় তরফের রাজপদে সমাসীন। ১৮৭৭ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি ইনি "মহারাজা" উপাধি সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যশোহর-মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতরাম রায়ের রাজধানীতে অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল দেবতার জন্য তিনি যে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সেবাইত রূপে সেই সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেবসেবা পরিচালনা করিতেছেন। ১৯১০ খ্রিঃ মহারাজ পূর্ববঙ্গের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খ্রিঃ কলিকাতায় ভারত সম্রাট ও রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে মহারাজ ২৫০০ টাকা দান করেন। ১৯১১ খ্রিঃ ১২ ডিসেম্বর দিল্লির বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খ্রিঃ ৪ জানুয়ারি কলিকাতার লাট ভবনে ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও তদীয় মহিষীর এক সভা হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুর মহারাজকে সম্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ খ্রিঃ রাজসাহী বিভাগের জমিদারবৃন্দের পক্ষ হইতে মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রিঃ মহারাজ পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে ফাণ্ডে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহারাজ "মানসী" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে পাবনা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে বারেন্দ্রভূমির বরেণ্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। মহারাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নানা প্রকার সৎকার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজের প্রতিপত্তি ও সম্মান দৃষ্ট হয়। মহারাজ বাহাদুরের একটি পুত্র ও কন্যা হইয়াছে।

মহারাজের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ১৯১৪ খ্রিঃ ৬ মে কুমার বাহাদুরের সহিত শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাগচির কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীর শুভপরিণত হইয়াছে।

শিবনাথ রায়

মহারাজ রামকৃষ্ণর কনিষ্ঠপুত্র রাজা শিবনাথ রায় সকল দেবোত্তর ও নিষ্কর জমিদারি প্রাপ্ত হন। তাহার আয় নয় লক্ষ টাকা ছিল। তাহার সন্তানাদি না হওয়ায় বিধবা পত্নী আনন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

আনন্দনাথ রায়

শিবনাথের দত্তক পুত্র রাজা আনন্দনাথ রায় দানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিঃ তিনি তাহার পিতামহের উপাধিপ্রাপ্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া নিষ্ফল হন। অতঃপর ১৮৬৬ খ্রিঃ জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে "সি-এস-আই" উপাধি প্রদান করেন। তাহার কিয়দ্দিবস পরে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজসাহীতে একটি বৃহৎ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ রায় নামে চারিপুত্র রাখিয়া যান।

চন্দ্রনাথ রায়

আনন্দনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজাবাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। চন্দ্রনাথ নানা প্রকার সদনুষ্ঠান ও দানধর্মে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি রামপুর বোয়ালিয়ার একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বাৎসরিক ১৫০০ টাকা ব্যয়ভার বহন করিতেন। রাজাবাহাদুর সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন; তাহার ব্যয়ে নদীয়া ও বারাণসীতে বহু ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নয় বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাজা বাহাদুরের দুইটি ভ্রাতা কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথ তাহার জীবিতকালে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হইলে সমুদয় সম্পত্তি তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রাপ্ত হন।

যোগেন্দ্রনাথ রায়

আনন্দনাথের কনিষ্ঠপুত্র রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী জমিদার ছিলেন। তিনি বিপন্নের দুঃখ মোচন জন্য নীরবে দান করিতেন। স্বধর্মে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। ১৯০১ খ্রিঃ ১৮ আগস্ট রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

রাণী শ্রীমতী হেমাঙ্গি দেবীর সদানুষ্ঠানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নাটোরের ছোট তরফের দেবসেবার ব্যবস্থা ইহার তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে; ইহাতে বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। রাণীর শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে; সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। প্রজাগণের হিতসাধনে ইহার বিশেষ যত্ন আছে। ইনি মঙ্গলপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কতিপয় পল্লীগ্রামের জলাভাব মোচন জন্য ইহার ব্যয়ে সুটকিগাছা গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন হইয়াছে। ইনি নাটোরের নারদ নদের উপর একটি লৌহ সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ১৯১১ খ্রিঃ ১২ ডিসেম্বর ভারতেশ্বর ও তৎপত্নীর অভিষেক দিবসে ইনি বহু দীন দরিদ্রকে আহার ও শীতবস্ত্র প্রদান করেন।

রাজা যোগেন্দ্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় দেশের নানাবিধ সৎকার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যতীন্দ্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি। গবর্ণমেন্টের নিকট ইহার সুখ্যাতি আছে।

দীঘাপতিয়া রাজবংশ

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দীঘাপতিয়া রাজবংশ একটি প্রাচীন জমিদার বংশ। নাটোর রাজবংশের পতন সময় এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহারা জাতিতে তিলি।

দয়ারাম রায়

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় প্রথমতঃ নাটোরের মহারাজা রামজীবন রায়ের অধীনে একজন সামান্য কর্মচারী নিযুক্ত হন; তৎপরে তিনি স্বীয় প্রতিভা ও কার্যদক্ষতাগুণে দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি, রামজীবনের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্যন্ত নাটোর রাজসরকারের দেওয়ান পদে কার্য করিয়া প্রভূত অর্থার্জন করেন। দয়ারাম নাটোর রাজভবনে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। মুরশিদাবাদের নবাব সরকারেও তাহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীনরাজা সীতারাম রায়কে বন্দি করিবার সময় তিনি মুরশিদাবাদের নবাব মুরশিদ কুলি খাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন; অতঃপর সেই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ নবাব তাহাকে "রায় রাইয়ান" উপাধি দিয়াছিলেন। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের জমিদারি রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইবার সময় দয়ারাম সাহ-উজিয়াল প্রভৃতি পরগণা নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন, অধিকন্তু রাজসাহীতে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীঘাপতিয়া রাজবাটিতে কৃষ্ণজীউ, গোবিন্দজীউ ও গোপালজীউ নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহাদের সেবার জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারির মধ্যে অনেকগুলি সরোবর খনন এবং রাজবাটিতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ারাম রায় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন।

জগন্নাথ রায়

দয়ারামের পর তাহার পুত্র জগন্নাথ রায় উত্তরাধিকার লাভ করেন। তিনি অল্প দিবস মাত্র বিষয় ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকালে একমাত্র পুত্র প্রাণনাথ রায়কে রাখিয়া যান।

প্রাণনাথ রায়

জগন্নাথের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র প্রাণনাথ রায় বিষয়সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বিষয়কার্য পর্যালোচনা করিতেন। তাহার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাদর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন। তিনি রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন জন্য অতি দক্ষতার সহিত জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিদর্শন করিতেন। তাহার সন্তানাদি না হওয়ায় বিষয়সম্পত্তি তদীয় পোষ্যপুত্র প্রসন্ননাথকে দিয়া যান।

প্রসন্ননাথ রায়

প্রাণনাথের পরলোকান্তে তাহার দত্তক পুত্র প্রসন্ননাথ রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি প্রতিভাশালী ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। দীঘাপতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণকল্পে তিনি গবর্ণমেন্টকে ৩৫০০০ টাকা দান করেন, অধিকন্তু, ইহার সংস্কারার্থে বহু অর্থ দিয়াছিলেন। তিনি দীঘাপতিয়ায় একটি ইংরাজি বিদ্যালয় এবং নাটোর ও বোয়ালিয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাদের পরিচালন জন্য এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টকে দিয়া যান। তিনি বিবিধগুণের পরিচয় দিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করেন। ১৮৫৪ খ্রিঃ ২০ এপ্রিল প্রসন্ননাথ "রাজাবাহাদুর" উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খ্রিঃ ১০ সেপ্টেম্বর রাজসাহী জেলায়

এসিস্টেন্ট মাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীঘাপতিয়ার রাজভবন সুসজ্জিত এবং একটি নাচঘর ও "সিংহী-হল" নির্মাণ করেন। হোলি ও ঝুলনের সময় তথায় অতি সমারোহ হইত। তিনি স্বদেশানুরাগী, দাতা ও পরোপকারী জমিদার ছিলেন। ১৮৬১ খ্রিঃ রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় প্রমথনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যান।

প্রমথনাথ রায়

প্রসন্ননাথের পোষ্যপুত্র প্রমথনাথ রায় বাহাদুর ১৮৪৯ খ্রিঃ দীঘাপতিয়া রাজভবনে ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় কলিকাতার ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউসনে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে কুমার বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দীঘাপতিয়ায় প্রত্যাগমনপূর্বক বিষয় সম্পত্তি পরিচালনাভার প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত রামপুর-বোয়ালিয়ার প্রসন্ননাথ দাতব্য ঔষধালয়ের বাটি নির্মাণকল্পে ১০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৬৮ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ২০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। অধিকন্তু বোয়ালিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে তিনটি বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি তাহার নাখিলার কাছারিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭১ খ্রিঃ রাজসাহী বিভাগের কমিশনাব বাহাদুর তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিঃ দিল্লির দরবারে প্রমথনাথ "রাজাবাহাদুর" উপাধি সম্মানপ্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসর রাজা বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যশোহর-মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের পতন হইলে তাহার দুর্গ মধ্যে একটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন, ১৮৮১ খ্রিঃ রাজাবাহাদুর তাহাকে দীঘাপতিয়ার রাজভবনে আনয়ন করেন। তিনি শিল্প বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। শিল্পানুষ্ঠানের অভাব উপলব্ধি করিয়া এদেশে শিল্প বিস্তার করিবার জন্য যত্নবান হন। রাজাবাহাদুর কলিকাতা হইতে নিপুণশিল্পী আনাইয়া স্বদেশীয় শিল্পকারগণকে নানাপ্রকার কারুকার্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাহার অনেকগুলি গজদন্ত ছিল। তিনি মুরশিদাবাদ হইতে মথুর ও রামেশ্বর নামক দুই জন সুদক্ষ শিল্পীর আনাইয়া স্বীয় বৈঠকখানার একটি কক্ষে গজদণ্ডের শিল্প কারখানা স্থাপন করেন; কিন্তু তাহার উদ্যম সাফল্যলাভ করিবার পূর্বেই ১৮৪৩ খ্রিঃ চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রমথনাথ রায় বাহাদুর রাজলীলা সম্বরণ করেন। তাহার প্রমদানাথ, বসন্তকুমার, শরৎকুমার ও হেন্দ্রেকুমার নামে চারিটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একখানি উইল করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী এবং অন্যান্য বিষয়ের উত্তরাধিকারী এবং অন্যান্য পুত্রগণের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

প্রমদানাথ রায়

রাজা প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় বাহাদুর ১৮৭৬ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে দীঘাপতিয়ার রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ইহার নাবালক সময় জামদারি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৯৪ খ্রিঃ ২৯ জানুয়ারি সাবালক হইয়া ইনি পৈতৃক সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খ্রিঃ প্রমদানাথ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট রাজা প্রসন্ননাথ দাতব্য ঔষধালয় স্থানান্তরিত করিলে ইনি সেই নূতন বাটি নির্মাণের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেন এবং হাসপাতালের জন্য ভূমিদান করিয়াছেন। ইনি স্বীয় পিতামহী রাণী ভবসুন্দরীর নামে স্ত্রীলোকদিগের একটি ওয়ার্ড ঐ হাসপাতালের সহিত নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। রাজা বাহাদুর ইহার জমিদারির অন্তর্গত বনাগাঁতিতে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী নৃপতি। রাজসাহী কলেজের সহিত ছাত্রদিগের জন্য

ইহার পিতার নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন রাজসাহী কলেজের অনেকগুলি বৃত্তিস্থাপন করিয়াছেন। দীঘাপতিয়ার বিদ্যালয়েও উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি নির্ধারিত হইয়াছে। ইনি রাজসাহীর রেশমের কার্য শিক্ষার বিদ্যালয়ে ৫০০০ টাকা মূল্যের ভূমিদান করেন। রামপুর বোয়ালিয়ার একটি আদর্শ কৃষিকার্যের নিমিত্ত ভূমিদান করিয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রিঃ ভূমিকম্পে দীঘাপতিয়ার রাজভবনের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় রাজাবাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে রাজপ্রসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতা ও নাটোরে ইহার রাজভবন আছে। রাজাবাহাদুর রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, বঙ্গীয় জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক। ইনি পূর্ববঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার ল্যান্সলেট হেয়ার সাহেবের স্মৃতি রক্ষাকল্পে ২৫০ টাকা দান করেন। ১৯১০ খ্রিঃ কলিকাতায় রাজ প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তরময়ী মূর্তি স্থাপন জন্য ৫০০ টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ খ্রিঃ "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের জমিদার সম্প্রদায় কর্তৃক ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ খ্রিঃ কলিকাতা শহরে নবীন ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয় ও রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার জন্য চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ২৫০০ টাকা দিয়াছেন। ১৯১২ খ্রিঃ ৪ জানুয়ারি কলিকাতার লাটভবনে ভারত সম্রাট ও তৎমহিষীব একটি সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর দীঘাপতিয়ারাজকে সম্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খ্রিঃ বারাণসীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা বাহাদুর স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০০০ টাকা ব্যয়ে প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুন্দর বাটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত ঐ বিদ্যালয়ের গাড়ি ঘোড়া ক্রয় জন্য ১০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি হন। রাজসাহী কলেজে তদীয় স্বর্গীয়া জননী "দ্রবময়ী হিন্দু বোর্ডিং" নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে রাজাবাহাদুর ১২০০০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজাবাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত প্রতিভানাথ, শ্রীযুক্ত বিজনেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ, শ্রীযুক্ত চঞ্চলনাথ, শ্রীযুক্ত তুষারনাথ রায় প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা হইয়াছে।

রাজসাহী কলেজে তদীয় স্বর্গীয়া জননী "দ্রবময়ী হিন্দু বোর্ডিং" নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় এম.এ-বি.এল. ১৮,০০০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বঙ্গ সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত। ইহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে , তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমিতাভ রায়।

দীঘাপতিয়ার রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রাজসাহী শহরে বাস করেন। ইনি সাহিত্যানুরাগী ও নিপুণ চিত্রশিল্পী। ইহার কয়েকটি সন্তান বিদ্যমান।

পাকুড়িয়া জমিদারবংশ

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ বারেন্দ্র সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহন মিশ্র ঠাকুর একজন সাধনাসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গ করতোয়া নদী তীরে ভাবনীপুর মহাপীঠ প্রকাশ করেন। তাহার বংশধরগণ মধ্যেও অনেকগুলি সিদ্ধসাধক ও সুপণ্ডিত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহা ঠাকুর বংশ নাম প্রখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক গণমান্য ব্যক্তি সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ঠাকুর বংশীয়গণ এক সময় বিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানীর মাতুল বংশ বলিয়া এই ঠাকুর বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিল্লির মোঘল দরবারেও এই বংশের বিশেষ সম্মান ছিল। পাকুড়িয়া ঠাকুর বংশ এক সময়

"দেশগুরু" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ এবং নাটোর, বলিহার, সুসঙ্গ, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ বংশ ইহাদের শিষ্য মধ্যে পরিগণিত। এক সময় ঠাকুর বংশ ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। নাটোর রাজবংশের অধঃপতনের সহিত ঠাকুর বংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

রাঘবেন্দ্র ঠাকুর

এই বংশোদ্ভব অশেষ শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ রাঘবেন্দ্র ঠাকুরের নিকট রামগোপালপুরের শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরি, নাটোরের রঘুনন্দন রায় এবং মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় ও রাণী ভবানী একসময় মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঘবেন্দ্রের দুইপুত্র বাচস্পতি ও হরিদেব ঠাকুর।

হরিদেব ঠাকুর

রাঘবেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র হরিদেব ঠাকুরের বংশ সৌভাগ্যের চরমসীমায় অধিরূঢ় হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বিষয় সম্পত্তির উন্নতি সাধন করেন। তাহার চারিপুত্র বিশ্বেশ্বর, রামমোহন, হরেশ্বর ও রূপচন্দ্র ঠাকুর এবং এক কন্যা কস্তুরীদেবী জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বেশ্বর ঠাকুর

হরিদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বেশ্বর ঠাকুর বিশেষ জ্ঞানবান ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। তাহার স্বভাবে সকল সদ্‌গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি একমাত্র পুত্র সর্বেশ্বর ঠাকুরকে রাখিয়া যথা সময়ে গঙ্গালাভ করেন।

বিশ্বেশ্বর পুত্র সর্বেশ্বর ঠাকুর সাধারণের হিতসাধনের জন্য নিরন্তর আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র রামমোহন ঠাকুর।

সর্বেশ্বরের পুত্র রামমোহন ঠাকুর সৎস্বভাব, লোকের পরম বন্ধু ছিলেন। তাহার দুই পুত্র—কৃষ্ণমোহন ও দুর্গামোহন ঠাকুর।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণমোহন ঠাকুর সদাচারী, বুদ্ধিমান ও নিরীহ প্রকৃতি ছিলেন। তিনি দুই বিবাহ করেন, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর সন্তানাদি হয় নাই এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে রজনীমোহন ও কিশোরীমোহন ঠাকুর নামে দুই পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রজনীমোহন ঠাকুর পৈতৃক গৌরব রক্ষা করেন। তিনি বারেন্দ্র সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি অতিশয় সরল ও বিলাসশূন্য ছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের দেহান্তের কিয়দ্দিবস পরে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরীমোহন ঠাকুর ত্রয়োদশ বর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হন।

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গামোহন ঠাকুর দুই বিবাহ করেন; তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভে সারদামোহন নামে পুত্র এবংএকটি কন্যা হয়। দ্বিতীয়া সহধর্মিনীর গর্ভে শশিমোহন, চন্দ্রমোহন ও বসন্তমোহন নামে তিন পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রগণকে নাবালক রাখিয়া দুর্গামোহন ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সারদামোহন ঠাকুর, রাজবালা দেবী নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

রামমোহন মজুমদার

হরিদেবের দ্বিতীয়পুত্র রামমোহন মজুমদার "ঠাকুর" উপাধি হইতে বঞ্চিত হন। তাহার শিবরাম মজুমদার নামে একমাত্র পুত্র হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার অবস্থায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রামমোহনের বংশ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই।

হরেশ্বর ঠাকুর

হরিদেবের তৃতীয় পুত্র হরেশ্বর ঠাকুর অতি বিচক্ষণ ও খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিবমন্দির অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাহার দুই পুত্র— চন্দ্রনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর

হরেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর "চাঁদ ঠাকুর" নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়শালী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। পাকুড়িয়া ঠাকুর বংশে তাহার ন্যায় বৈষয়িক বিষয়ে যশস্বী পুরুষ আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার সময় এই বংশ বারেন্দ্র কুলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। রাণী ভবানীর সহিত আত্মীয়তার অনুরোধে তিনি নাটোরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। চাঁদ ঠাকুর বিশাল নাটোর রাজ্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হইয়া এরূপ সুনিয়মে রাজকার্য নির্বাহ করেন যে, তাহার সময় নাটোরের সৌভাগ্য-রবির সমুজ্জ্বল প্রভা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি মুরশিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। নবাব দরবারে তাহার সুপরামর্শ সমাদরে গৃহীত হইত। তিনি নবাব সরকার হইতে তিনখানি "তাম্রলিপ্তি" সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ খ্রিঃ মোঘল সম্রাট সাহ আলম বাহাদুর চাঁদ ঠাকুরকে স্বীয় মোহরাঙ্কিত "ফারমান" দ্বারা এক সহস্র বিঘা ভূমি জায়গির প্রদান করেন। তিনি পরম ধার্মিক, পরোপকারী ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। তিনি পাঁচটি শিবমন্দির সংস্থাপিত করেন; এতদ্ব্যতীত মহাসমারোহে অষ্টধাতু নির্মিত দশভুজা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সেবায় সুবন্দোবস্ত করেন; অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ যথানিয়মে পালন করিতেছেন। চাঁদঠাকুর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণকে উপযুক্ত দেখিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাহার হস্তে নাটোরের কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাহার দুই পুত্র রুদ্রনারায়ণ ও কাশীপতি ঠাকুর।

হরিদেব ঠাকুর তাহার চতুর্থ পুত্র রূপচন্দ্র ঠাকুরকে স্বীয় জ্ঞাতি মজুমদার বংশে দত্তক প্রদান করিয়াছিলেন।

ছাতিন গ্রামের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আত্মারাম চৌধুরির সহিত হরিদেব ঠাকুরের কন্যা কস্তুরী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৭২৪ খ্রিঃ তাহার গর্ভে বঙ্গের অদ্বিতীয়া রমণী নাটোরাধিশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী দেবী জন্মগ্রহণ করেন।*

'ভারত গৌরব' গ্রন্থ থেকে

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

রাজসাহী বিবরণ

জেলা রাজসাহী। ৩০ অগ্রহায়ণ, ১২৬১

সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি আমি কলিকাতা নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক নৌকাযোগে জলপথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজসাহী উপস্থিত হইয়াছি। অধুনা পদ্মানদীর ক্রমে ক্রমে পরাক্রমের হ্রাসতা হইতেছে। মধ্যে মধ্যে চর বিরচিত হইতেছে, জল এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে নির্মল হয় নাই। বোয়ালিয়ার নীচে এবারে পূর্ব্ববৎ স্রোতঃ না হওয়াতে জেলার লোকেরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, কারণ এই ঘটনায় ভাঙ্গনের অনেক হ্রাসতা হইয়াছে। আমি অষ্টাহকাল দিবারাত্র বড় কুটির ঘাটে কাপ্তেন সাহেবের বাটীর নীচে নৌকার উপর বাস করিতেছি, ইতিমধ্যে কোন দিবস ক্ষণকালের নিমিত্ত একটি ধাপ ভাঙ্গিতে দেখিলাম না। এ বৎসর এ সময়ে পূর্ব্ববৎ ভাঙন ধরিলে কাপ্তেন সাহেবের মনোহর কুটি ও রম্য উদ্যান, ঘোড়ামারার বাজার—কমিস্যনরের প্রধান কেরানি কমলবাবুর বাসা, কালেক্টরের প্রধান কেরানি শিব বাবুর বাসা, ডেপুটি কালেক্টর মথুরবাবুর বাসা, সদর আমিন গঙ্গাচরণবাবুর বাসা এবং গবর্ণমেণ্টের স্কুল বাটি প্রভৃতি এতদিনে কোথায় মুখে করিয়া লইয়া যাইত, বোধকরি পদ্মাদেবী খরতর তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিলে নারদকে উদরস্থ করিয়া বড় কুটিকে কুটি কুটি করিয়া ভাসাইতেন। তাহা হইলে জেলার দফা একেবারেই রফা হইত। ফলে সম্প্রতি প্রবাহের ও তটের যদ্রূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে হঠাৎ তাদৃশ সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, তবে আগামী বর্ষায় আবার কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু সম্মুখে তীরের উপর নীরের ক্রোড়ে যেরূপ চটান পড়িয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনেকাংশেই মঙ্গল বোধ হইতেছে, তাহাতে ভাঙ্গা বন্ধ হইলেও হইতে পারে।

এবারকার অতি বৃষ্টিতে পদ্মা অত্যন্ত প্রবলা হওয়াতে অনেকের ঘর, বাটি, পথ, ঘাট ও স্থল সকল জলে প্লাবিত হইয়াছিল, স্থানে স্থানে অদ্যাপি সে জলের শেষ হয় নাই। খানা ডোবা সমুদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এ জন্য ভূমি অত্যন্ত আর্দ্র হওয়াতে মধ্যে প্রায় একমাস জ্বর রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য হইযাছিল, তাহাতে বহু প্রাণির হানি হইয়াছে, এইক্ষণে জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ক্রমে তাহার ন্যূনতা হইয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি এখানে যত লোক লোকান্তরিত হইয়াছে তন্মধ্যে এমত বিশেষ ব্যক্তি কেহই নাই, যাহার নাম উল্লেখ করিলে সাধারণে অবগত হইতে পারেন, কেবল এক মৈত্রবাবু শেষাবস্থায় কীর্তির দ্বারা অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, এই মৃত ব্যক্তির নাম "লোকনাথ মৈত্র" ইনি অন্যায়ার্জিত ধনের দ্বারা ভাগ্যধর হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি ও অন্য প্রকার বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি অশেষবিধ অপকর্মে রত থাকাতে ও নিয়ত পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার ইষ্টসাধন করাতে এখানকার কেহই তাহার অনুরাগ করেন না। এমত জনরব যে আসন্নকাল দেখিয়াও কোন মনুষ্য বিষণ্ণ হয়েন নাই, বরং চিত্তকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। যাহা

হউক, মৃত লোকের ব্যবহার-বিষয় অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন করে না, এই মৈত্র দুইটি মহতী কীর্তি করিয়াছেন, তদুপলক্ষে তাহার সুখ্যাতি ঘোষণা অবশ্যই করিতে হইবে। ইহার প্রথম কীর্তি রামপুরে "লোকনাথ স্কুল" নামে এক স্কুল এবং দ্বিতীয় কীর্তি কাশীধামে "অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা"। ঐ স্কুলের ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত মাসিক ১০০ একশত মুদ্রা আয়ের উপযুক্ত ভূমি নির্দিষ্টরূপে দান করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অনায়াসেই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাশীতে যে কীর্তি করিয়াছেন তাহাতে কয়েকজন লোক প্রতিপালিত হইতেছে এবং প্রতি দিন ১০০ একশত জনের অধিক মানুষ উত্তমরূপে আহার প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইতেছে। কীর্তি কর্তার এই দুই কীর্তি পৃথ্বীব্যাপিকা হইবে তাহাতে সংশয় কি?

মৈত্রবাবুর শ্রাদ্ধকার্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইয়াছে, কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্বেই বিষয়ের শ্রাদ্ধ হওনের উপক্রম হইয়াছে, কারণ ইনি আপনার "উইল মত" অর্থাৎ ইচ্ছামত উইল করাতেই সর্বনাশ করিয়াছেন। ইহার তিন স্ত্রী, কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়াকে এককালে বঞ্চনা করত কেবল কনিষ্ঠাকে যথাসর্বস্বের অধিকারিণী ও কর্ত্রী করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারি উপর পোষ্যপুত্র গ্রহণের ভারার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে প্রথমা ও দ্বিতীয় উভয়ে একত্র হইয়া সেই উইলের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে যথারীতি ক্রমে আদ্দাস উপস্থিত করিয়াছেন, আবার মৃত মহাত্মার কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী স্বতন্ত্ররূপে আর এক অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন। এই প্রকারে নালিশ হইলে আর কিছুই থাকিবে না, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই উচ্ছন্ন যাইবে, অধুনা যদি পরস্পর ঐক্য হইয়া ঘরে ঘরে মীমাংসা করত ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন তবেই মঙ্গল, বিষয়টি রক্ষা পায়। নচেৎ কাঁথা ঝুলি প্রভৃতি সমুদয় উকিল, মোক্তার, সাক্ষী ও বিবাদ বাঞ্ছিত বঞ্চকব্যূহের উদরায় স্বাহা হইবেক।

কি পরিতাপ! মৈত্র মহাত্মা জীবিতাবস্থায় যাহা করিবার তাহাই করিয়াছেন, মরণ সময়ে সত্যকে স্মরণ করিয়া একবারও ধর্মপানে দৃষ্টি করিলেন না?

সম্প্রতি কয়েক দিবস "লোকনাথ স্কুলে"র ছাত্রদিগের পাঠের বিষয়ে অত্যন্ত গোলযোগ হইতেছে, যেহেতু প্রধান শিক্ষক সাহেবটি ছুটি লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় শিক্ষকটি কর্ম হইতে অপসৃত হইয়াছেন। সুতরাং শিক্ষক না থাকিলে কেবল "মনিটরে"র দ্বারা কি প্রকারে প্রতুলরূপে কার্য সম্পন্ন হইতে পারে? অধুনা যাহারা এই স্কুল কমিটির অধ্যক্ষতার পদে অভিষিক্ত আছেন, এ বিষয়ে তাহারদিগের বিশিষ্টরূপ মনোযোগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সংবাদ প্রভাকর। ২০ পৌষ ১২৬১

এই ক্ষণে বোয়ালিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের কর্ম অতি উৎকৃষ্টরূপে সমাধা হইতেছে, শিক্ষকগণ এবং পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় উপযুক্ত ও সজ্জন, শিক্ষা প্রদান কল্পে পরম পারদর্শী, ইহাতে সুনীতিক্রমে সদানুশীলন সহযোগে ছাত্র মাত্রেই সুপাত্র হইবে তাহাতে সন্দেহাভাব। যিনি Head Master অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক তিনি হুগলি কলেজের ছাত্রীয় বৃত্তিধারি পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক, ইহার বৈচক্ষণ্য, সৌজন্য এবং নৈপুণ্যের ব্যাপার দেখিয়া আমি সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। অপরাপর শিক্ষকেরা তাবতেই কার্য নিপুণ, সুশীল ও সুশিক্ষক। পণ্ডিত নানা শাস্ত্রমণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র ধারণ করেন, এবং উপদেশ প্রদানে তৎপর। আপাতত ইংরেজি শিক্ষা যদ্রূপ হইতেছে বাংলা ভাষা তদনুরূপ হইলে আরো অধিক সুখের নিমিত্ত হইতে পারে। ইহাতে আমি পণ্ডিতের দোষ দেখিতে পাই না, কারণ পূর্বে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি "ফিরিঙ্গি" বঙ্গভাষার প্রতি কিছুমাত্র আদর করিতেন না; সুতরাং তৎকালে তাহার অনাদরে ছাত্রেরাও আলোচনায় অনুরত হয় নাই, এইক্ষণকার প্রধান মহাশয় নিজে বাঙালি, ইনি জাতীয় ভাষার অনুশীলনে অবশ্যই অনুরাগী হইবেন। যাহাতে বালকেরা উত্তমরূপে

পড়িতে, শুদ্ধরূপে লিখিতে ও রচনা করিতে পারে, সে পক্ষে যথাবিহিত মনোযোগ করিবেন। আমি এ বিষয়ে তাহার প্রতি যদ্রূপ প্রত্যাশা করি, ভবিষ্যতে যদি তদ্রূপ দেখিতে না পাই, তবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইব এবং প্রধান মহোদয় কর্তব্য কর্মে আলস্য ও অমনোযোগ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ্য পত্রে আক্ষেপ প্রকাশ করিব। সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা সত্বে যদি বিষয় বিশেষের ব্যাঘাত হইয়া সুফল সিদ্ধ না হয়, তবে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের ব্যাপার আর কি আছে? ইহারদিগেরি বা দোষ কি? কারণ এ পক্ষে সুদৃষ্টির বিষয়ে কমিটির কমিটি দেখিতে পাই। মেম্বারগণ সর্বদা তত্ত্বাবধাবণ করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য কর্মে মনোযোগ না করিলে কোন মতেই সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না।

গত ২৬ অগ্রহায়ণ বেলা দশ ঘটিকার পরে "লার্ড বিসাপ" সাহেব এখানে আসিয়া রোয়ালিয়ার স্কুলে গমন করত ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি হাস্য বদনে মধুর বচনে বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া বিদায় হইলেন।

এইক্ষণে এখানকার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব "সরকুটে" গমন করিয়া নানা স্থানে শিবির স্থাপন করিতেছেন। কালেক্টরের অনবস্থান জন্য সুযোগ্য ডেপুটি কালেক্টর বাবু মথুরানাথ বন্দোপাধ্যায় কালেক্টরি অফিসের চলিত কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, ইনি অতি সজ্জন ও কর্মদক্ষ। কালেক্টর সাহেব ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহার ভাতা রহিত করিয়াছেন. এই ভাতা বন্ধ হওয়াতে বোধ হয় তাহাকে শীঘ্রই আপনার হাতার মধ্যে মাথা ঢুকাইতে হইবে।।

সংবাদ প্রভাকর ।। ৭ পৌষ ১২৬১

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোম্পানির ভাতায় পুষ্ট হইতেছেন। সুতরাং তাহাকে শীঘ্র হাতায় প্রবেশ করিতে হইবে না। বিচক্ষণ প্রধান সদর আমীন বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত শান্তি সম্বন্ধীয় সমুদয় চলিত কর্ম নিষ্পাদন করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় স্বীয় কর্মে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! কি আশ্চর্য! জেলার সিবিল সাহেবেরা যৎকালে মফঃস্বলে গমন করেন, তৎকালে সরকার হইতে খোরাকি পাইয়া থাকেন, হাতার বাহিরে মাতা বাড়াইলেই খাতার পাতা খুলিয়া ভাতার টাকার অঙ্কপাত কবিযা বসেন, কিন্তু এই ধর্মাবতাবেরা ধর্মেব প্রতি একবারো দৃষ্টি করেন না। কেননা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া পাকেট পরিপূর্ণ করেন। কিন্তু এদিকে নীল ও রেসম প্রভৃতির কুটির মধ্যে প্রবেশ করত কুটিয়াল সাহেবদিগের অন্নধ্বংসিয়া উদর পূর্ণ করিতে ত্রুটি করেন না। তাহারা কি এই কর্মে ন্যায়সঙ্গত কর্ম করিতেছেন? সিবিলের মধ্যে প্রায় অনেকেই সরকুটে আসিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি কোন কোন স্থানে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি ও সকলেই দেখিয়াছেন যেখানে শ্বেত-পুরুষের কুটি, সেইখানেই যেন সাহেবদিগের তাম্বুন পড়িয়াছে। এই জেলার দুই হুজুর প্রথমে কয়েক দিবস সরদহে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। এইক্ষণে কোন্ স্থানে কোন্ দিবস কোন্ কুটিতে অবস্থান করিতেছেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি নাই।

রাজসাহীর কমিস্যনর সাহেব অতিশীঘ্র এস্থান হইতে দিনাজপুরে গমন করিবেন, তাহার সরকুটে কতদিন বিলম্ব হইবে এবং তিনি পরে কোন কোন স্থানে গমন করিবেন তাহা জানিতে পাবি নাই।

এখানকার ইঞ্জিনিয়র আফিস উঠিয়া সম্প্রতি দিনাজপুরে স্থাপিত হইবে। কিন্তু ঐস্থানে চিরস্থায়ী হয় এমত বোধা নহে। কারণ রঙ্পুরে স্থাপিত হওনেরি অধিক সম্ভাবনা আছে। এইক্ষণে রাজসাহী মুরশিদাবাদ ইঞ্জিনিয়র আফিসের অধীন হইল। এখানে কেবল একজন মাত্র গোমস্তা থাকিবে।

প্রসন্ননাথ ফণ্ড হইতে এখানে যে এক "ডিস্পেন্সরি" স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয় না। কারণ তথাকার ডাক্তারটি উপযুক্ত নহে, মেডিকেল কলেজে শিক্ষা করে নাই, লেখাপড় জানে না। ডাক্তার ইজডেল সাহেবের নিকটে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়ে যাহা শিখিয়াছে, তাহাই তাহার পুঁজিপাটা, এরূপ অভ্যাসে যতদূর হইতে পারে তাহা বিবেচনা করুন। চিকিৎসা বিদ্যায় যাহার সংস্কার না থাকে তাহার নিকট কি সাহসে শরীর ও প্রাণ সমর্পণ করা যাইতে পারে? তাহার দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা কেবল আপনার সর্বনাশ করাই হইয়া উঠে। ঐ ব্যক্তি ৪০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়। তাহার পক্ষে এ বেতন যথেষ্টই হইয়াছে। কেননা ফোড়া কাটা ও পটি বসানো প্রভৃতি কর্মই তাহার চূড়ান্ত কর্ম। হয় গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করুন। নয় রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর অতিরিক্ত আর কিঞ্চিৎ মূলধন প্রদান করুন। তাহা হইলে ১০০ একশত টাকা মাসিক বেতনে জনৈক সুশিক্ষিত সব অ্যাসিস্টান্ট সারজন নিযুক্ত করিতে পারিবে। এতদ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা হইবেক। সরকার বাহাদুরের পক্ষে এ বিষয় কোন্ তুচ্ছ? সমুদ্র হইয়া গোষ্পদ পূর্ণ করা, জলধর হইয়া চাতক চক্ষুর তৃষ্ণা কৃষা করা অতি সামান্য, গণ্য মধ্যেই নহে। অপিচ দীঘাপতি পতি রায়বাহাদুর, অতি দয়ালু। স্বভাবদাতা, দেশের হিত সাধানের কার্য তাহার অন্তঃকরণে নিরন্তরই জাগরুক রহিয়াছে। অতএব তিনি কৃপা-কটাক্ষ পূর্বক আর কিঞ্চিৎ আনুকুল্য করিলে অনায়াসেই এতন্মহ মাঙ্গলিক কর্ম সুসম্পন্ন হইবেক।

সংবাদ প্রভাকর ।। ৮ পৌষ ১২৬১

এখানকার কালেক্টরী খাজাঞ্জি শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বেতন ১১৩ মুদ্রা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সুসংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন, কেননা যাহারা রাজকার্য উপেক্ষা না করেন, তাহারদের বেতন যতই বৃদ্ধি হয় ততই আনন্দের কারণ। এ পদের অল্প বেতন বিধান সেজন্য অনেকেই রাজনিয়মে দোষারোপ করিতেন, কারণ যে ব্যক্তি এক প্রকার চাকলার সমস্ত রাজস্বের ভার আপনি একাকী বহন করেন, যে ব্যক্তি বহু মূল্যের জমিদারি প্রতিভূ রাখিয়া এতদ্রূপ গুরুতর সংশয় সংঘটিত প্রচুর পরিশ্রমের কার্য সম্পন্ন করেন, তাহাকে যৎসামান্য কর্মকারকের ন্যায় যৎসামান্য বেতন দান করা কোনমতেই বিধেয় নহে। এই খাজাঞ্চি বাবু সর্বতোভাবে সুযোগ্য, সম্ভ্রান্ত, সদ্বংশ, তিনি বহুকাল পর্যন্ত অতি সুন্দররূপে প্রশংসার সহিত এতৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, ইনি যেরূপ রাজার বিশ্বাস্য, সেইরূপ প্রজার প্রিয়পাত্র; সুতরাং এমত ব্যক্তির বেতন বৃদ্ধিতে আহ্লাদিত না হইবেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই।

এ বৎসর এ অঞ্চলে দ্রব্যাদি সকলি দুর্মূল্য, ভালরূপ খাদ্যদ্রব্য প্রায় পাওয়া যায় না, নূতন তরকারি কিছুই উঠে নাই, মৎস্য অন্য বৎসরের ন্যায় সুলভ নহে।

শীতের প্রাদুর্ভাব কিছুমাত্র নাই, বরং সময়ে সময়ে গ্রীষ্মানুভব হয়। অদ্যাপি এক দিবসের নিমিত্ত লেপ গায়ে দিতে হইল না, শীতের এতদ্ভুত স্বল্পতা জন্য লোকের পীড়া হইতেছে, পবনের প্রবলতা প্রযুক্ত গত রাত্রিতে শীতের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহাতে স্বচ্ছন্দ, শরীরে আহার নিদ্রার সুখ সম্ভোগ হইয়াছে, এইরূপে ক্রমে ইহার যত প্রাবল্য হইবে প্রজারা ততই সুস্থ ও সুখি হইবেন।

অধুনা এই জেলায় কি স্থলপথে কি জলপথে উত্তমরূপে শান্তি রক্ষা হইতেছে, দস্যু ভয় অনেক নিবারণ হইয়াছে, ইহা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখানকার এতদ্দেশীয় হাকিম সকলেই অতি সদগুণান্বিত, প্রতিষ্ঠাভাজন, কর্মতৎপর ও

সুবিচারক। প্রধান সদর আমিন বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, সদর আমিন বাবু গঙ্গাচরণ সোম, ডেপুটি কালেক্টর বাবু মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মে অশেষানুরাগ লাভ করিয়াছেন। কি জমিদার, কি বাদী প্রতিবাদী, কি উকিল, মোক্তার, কি বিচারার্থী এবং কি অপরাপর ব্যক্তি তাবতেই, মুক্তকণ্ঠে ইহারদিগের গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

রাজসাহীর অন্তঃপাতি নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয় সম্প্রতি শান্তি রক্ষার কর্মে সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিতেছেন। তাহার শাসনে চুরি ডাকাইতি নাই বলিলেই হয়, পরন্তু ইনি বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, বাংলা পাঠশালা ও পুস্তকালয়ের প্রতি প্রখর প্রযত্ন প্রচার করিতেছেন। আমি তাহাকে এজন্য অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া লেখনী সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এখানকার আদালতের পেস্কার বাবু শিবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় "ট্রান্সলেটর" অর্থাৎ অনুবাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই কর্মের বেতন ৭৫ পঁচাত্তর টাকা, আমলার মধ্যে শিববাবুর ন্যায় নির্দোষী, নির্লোভী, নিরহঙ্কৃত, পরিশ্রান্ত ও যোগ্যব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ইংরেজি, পারস্য ও বঙ্গভাষায় সমান উপযুক্ত, জজ মেং চিপ সাহেব ইহাকে বিশেষ বিশ্বাসপাত্র ও কার্যক্ষম জানিয়া মনের সহিত সম্মান ও স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহার পদোন্নতির নিমিত্ত অনেকবার উচ্চস্থানে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। এই শিব সর্বদাই শিবময়, প্রকৃত শিব বলিলেই হয়।

এ জেলার আদালতের শিরিস্তাদার ও কালেক্টরি শিরিস্তাদাব উভয়েই অতি ভদ্র ও কার্যনিপুণ ইহারদিগের উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

সংবাদ প্রভাকর ।। ৯ পৌষ ১২৬১

কমিস্যনরেব হেড কেরানি বাবু কমল, যাহার নিকট কমল স্থিত কমল, সমল, অমল নহে, ইহার সদগুণের বিষয় আমি লিপিদ্বারা ব্যক্ত করণে অশক্ত, ইনি পরমেশ্বরের যথার্থই প্রিয়পাত্র, ইনি এবং কালেক্টরি হেড কেরানি বাবু শিবপ্রসাদ সান্যাল, এই শিব সাক্ষাৎ শিব, নির্মল গুণ ভূষণে ভূষিত। ইহারা উভয়েই এককালীন দোষ শূন্য, শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে সৎকার্য সাধন করিয়া থাকেন, এখানে ইহারদিগের মিত্র ভিন্ন শত্রু কেহই নাই! কারণ উপকারের কার্য ভিন্ন অন্য ব্যাপারে ভ্রমেও প্রবৃত্ত নহেন। সম্প্রতি এই উভয় বন্ধু একত্র সংযুক্ত হইয়া "চাহর-দরবেশ" নামক পারস্য পুস্তক বঙ্গভাষার গদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। আমি তাহার কিয়দংশ দৃষ্টি করত অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। যেহেতু তাহা অতি সুসাধু সরল শব্দে অনুবাদিত হইতেছে।

নাটোর ডিস্পেন্সরির ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশয় অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন, তাহার গুণে তথাকার সকলেই বদ্ধ, ইনি যেমন সুচিকিৎসক, সেইরূপ সদগুণান্বিত সুশীল, দয়ালু ও পরোপকারী। চন্দ্রবাবুর ব্যবহার চন্দ্রে কলঙ্ক মাত্রই নাই। এখানকার আপামর সাধারণ তাবতেই তাহার প্রেমে বিশেষ বাধ্য হইয়াছে।

এ জেলার প্রধান ভূম্যধিকারী নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর সম্প্রতি স্বীয় বাজধানী পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতা মহানগরে গমন করিয়াছেন, এজন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, উক্ত মহাশয় সাধারণ হিতকর ব্যাপারে অত্যন্ত অনুরত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি অগণ্য ধন্যবাদের আস্পদ হইতেছেন।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর "খেলয়াৎ" প্রাপনার্থ অবিলম্বে কলিকাতা গমন করিবেন, এদেশে এমত জনরব হইয়াছে, ইনি প্রকাশ্য কার্য দ্বারা অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সভ্যতা ও অসভ্যতা এবং বাক্যালাপ বিষয়ে কিরূপ, সংসর্গ বিহীনতা প্রযুক্ত তদ্বিশেষ জানিতে পারিলাম না।

এখানকার অধিকাংশ জমিদারেরা বিদ্যালোচনায় আমোদি নহেন। ধনাঢ্য মহাজনেরা এবিষয়ের প্রসঙ্গমাত্র করেন না। এ কারণ তাহারদিগের সন্তানেরা জ্ঞানালোকের অভাবে নিরন্তর অসভ্যতারূপ অন্ধকারে আবৃত থাকেন। গৃহস্থ বিষয়ে ভদ্র লোকেরাও এ পক্ষে তাদৃশ প্রেমিক নহেন, এ জন্য বালকেরা বিদ্যারসের রসিক না হইয়া ইতর রসেই রসিকতা করিয়া থাকেন, যদিস্যাৎ সকলে জ্ঞানালোচনার যথা কর্তব্য উৎসাহ করিতেন তবে এতদিন "বোয়ালিয়া বিদ্যালয়ে"র গৃহ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইত। কি পরিতাপ! অধুনা এই স্কুলে যতগুলিন বালক অধ্যয়ন করিতেছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ভিন্ন জেলাস্থ আমলাগণের সন্তান। রাজসাহী জেলার বালকের সংখ্যা তাহার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ হয় কিনা, তাহাতেও সন্দেহ আছে।

সংবাদ প্রভাকর ।। ১২ পৌষ ১২৬১

জগদিন্দ্রনাথ রায়

রাজসাহী-স্মৃতি

হরজটারণ্য-বিহারিণী জাহ্নবীর পতিতপাবনী ধারা ইহার প্রান্তবাহিনী বলিয়াই এ স্থানের মাহাত্ম্য আমার অন্তরকে অভিভূত করিতে পারে না; পুণ্যশ্লোক রাজন্যবর্গের নামানুকরণে ইহার নাম 'রাজসাহী' হইয়াছে, এই একমাত্র কারণে এ স্থান আমার হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না;— যে কয়টি দিন আমি এখানে যাপন করিয়া গিয়াছি, দুঃখ-শোক রোগ-আরোগ্য ক্ষোভ-ক্ষতি বিয়োগ-ব্যথায় পরিপূর্ণ আমার অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ জীবনে তেমন দিন আর কখনই আসে নাই— বাল্য কৈশোর এবং যৌবনের আদি প্রান্তের সেই কয়েকটি দিনের আনন্দস্মৃতি আমার বেদনাতুর অন্তরে কি অমৃতরসায়নের প্রলেপ দিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমিই জানি।

দুহিতার সদ্য-মৃত্যুশোক-প্রপীড়িতা অশ্রুপ্লুতা জননীর একমাত্র আনন্দদুলাল আমি, যেদিনে তাহার স্নেহবাহুর নিবিড় বন্ধনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্তব্যপালন জন্য অপরিজ্ঞাত ধরণীর ধূলিময় পথে বাহির হইয়াছিলাম, সেদিনের বিয়োগ-ব্যথায় রাজেন্দ্রাণীর ইন্দীবর-নয়ন কেমন করিয়া প্রলয়ের প্লাবন সৃজন করিয়াছিল, তাহা একমাত্র তিনিই জানিতেন; এবং মাতৃক্রোড়বিচ্যুত শিশুর হৃদয় আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় কেমন করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ইতিহাস, শিশুহৃদয়ের যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানিয়াছিলেন।

একবার চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া আমার দুইটি চক্ষুই একান্ত দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছিল: শীত-শরৎ-বসন্তাদি ঋতু-পরিশোভিতা নদ-নদী-সরিৎ-সাগর সমন্বিতা এই বিচিত্র ধরণী একদিন আমার চক্ষুর উপর হইতে মুছিয়া গিয়াছিল; শশি-সূর্য-তারকার প্রতীপ্ত-দীপকে দিনযামিনী নির্বিশেষে নিরলস প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন অনন্তারতির অপূর্ব শোভা দর্শনের আমি একান্ত বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; শেফালিগন্ধাকুলা শারদপূর্ণিমা ও রাস-রজনীর প্রসন্ন নির্মল হাস্য এবং শ্রাবণের অমানিশীথিনীর অবিরল অশ্রুপাত আমার অন্ধনয়নের নিকট সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিকিৎসার অনিশ্চিত ফলাফলের আশানিরাশায় দোলায়মান চিত্ত লইয়া মাতৃহৃদয়ের স্নেহশৃঙ্খল একদিন মাতাকে স্বেচ্ছায় ছিঁড়িতে হইয়াছিল; রাজাবরোধের চিরন্তন প্রথার নিকট মাতৃহৃদয়কে নতশির হইয়া শিশুর বাহ্যচক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবার জন্য তাহাকে একাকী বিদায় দিতে হইয়াছিল—আর একদিন সেই শিশুর অন্ধকার চিত্ততল তুষারহারধবলা কুন্দেন্দুশঙ্খোজ্জ্বলা শ্বেতাব্জসমাসীনা সরস্বতীর করুণাপ্রসাদে উদ্ভাসিত করিয়া দিবার জন্য যখন তাহাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাইবার সময় সমাগত হইল, সেই কালের এক স্বল্প-পরিসর শীতার্ত দিবসের মলিন মধ্যাহ্ন আলোক মাতা-পুত্র উভয়ের চক্ষেই কেমন করিয়া নিভিয়া গিয়াছিল, স্নেহকাতর জননীহৃদয় এবং অপরিচিত-পথের যাত্রী ভয়াতুর শিশুর কম্পিত অন্তরই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সত্যের মর্যাদা রক্ষার্থ একথা আজ আমাকে বলিতে হইতেছে যে,

শিক্ষাপ্রণালী এবং শিক্ষকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার পূর্ব সংস্কার বারম্বার সেদিনে মনে আসিয়া আমাকে আশ্বস্ত করে নাই।

গণনা করিয়া দেখিয়াছি, যে দিনের কথা আজি বলিতেছি, উহা ছত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। সে দিন এ শহরে আসিবার জন্য বাষ্পীয় পোত বা শকট কাহারও অপেক্ষা করিত না। পাশ্চাত্য মহাদেশেও পাঞ্চজন্যশঙ্খস্বননশীল বায়ুরথের সেদিনে ভ্রূণাবস্থা কি না তাহাও বলা কঠিন; সেদিনে "দীননাথ সিংহের" সিংহদ্বারে রোমন্থনপরায়ণ মন্থরগামী বলীবর্দ্দবাহিত বংশশকটিকা (মৃৎ নহে) অপেক্ষা করিত; অর্থশীলের পক্ষে নরস্কন্ধমাত্র সুলভ ছিল।

কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক দশমবর্ষ বয়ক্রমকালে শিশিরধৌত এক প্রভাতের শুভমুহূর্তে আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। আশৈশব-পরিচিত স্নেহের চিরনির্ভর মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গিদিগের সাহচর্য ছাড়িয়া যাহাকে অপরিচিতের মধ্যে জীবনে-যাপনের জন্য যাত্রা করিতে হয়, তাহার অন্তরে বিষাদ-বিন্ধ্যগিরির গুরুভার কেমন করিয়া চাপিয়া বসে, সেই তাহা জানে।

প্রাতে যাত্রা করিয়া এই নগরীতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমাসন্ন রজনীর শ্যামায়মান অন্ধকার নগরীর প্রান্তবিহারিণী বীচি-বিভঙ্গ-বিহ্বালা পদ্মার পরপারস্থিত শিশির-বাষ্পাচ্ছন্ন শ্যাম বনশ্রেণি যেমন চক্ষের উপর হইতে সেদিন সরিয়া যাইতেছিল, তেমনি স্নেহাশ্রয়বিচ্যুত বালকের কণ্ঠও সেদিনে কেমন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল সে কথা কেবল সেই বালকের হৃদয়-দেবতাই বুঝিয়া ছিলেন। তখন বুঝি নাই, বিশ্বের চিরন্তন 'ক্ষয়োপচয়'-নিয়মের বলে নদীতরঙ্গের প্রবলাভিঘাতে এক কূল ভাঙিয়া গেলে তৃণ শষ্প-লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-বল্লরী সমস্তই পরপারে গিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। ধনধান্য-সুখ-সম্ভোগ-সমন্বিতা নগরী আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসের মধ্যে বিলীন হইতে দেখা যায়, ইহা যেমন সত্য—পরপারের সিকতাময় মরুক্ষেত্রের উপর কাঞ্চনবৃষ্টির সূচনাও ঐ ধ্বংসের মধ্য হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া উঠে তাহাও তেমনই সত্য। মাতৃবক্ষের স্নেহনীড়ভ্রষ্ট মানবক বিষাদাশ্রুপ্লুত মলিনমুখ লইয়া এই নগরীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছিল; যে স্নেহকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহা অমূল্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন স্থানের অপূর্বপরিচিত বান্ধব সম্প্রদায়ের নিবিড় স্নেহ অবিরল অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার যে অধিকাব বিধাতা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও কোটি কোহিনূর!

অনুত্তীর্ণ-শৈশবে যে স্থানে ব্রহ্মচারী-জীবনের কর্তব্য পরিপালন জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, সমাসন্নপ্রায় জীবন-প্রদোষের পরিম্লান আলোকে অকৃত্রিম সুহৃদ্ সঙ্ঘের অপরিমেয় প্রীতির নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে আজ যে ভূমিতে আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সে ভূমি বিজয় বল্লাল প্রভৃতি একচ্ছত্র নরপালবর্গের কীর্তিকলিত বরেন্দ্রভূমি। এ ভূমির গৌরববার্তা এক দিন দেবভাষায় ছন্দোবদ্ধ হইয়া চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে; এ সেই ভূমি, যে ভূমির পুণ্যমাহাত্ম্যের পরিচয় একদিন তানলয়-সংযুক্ত গোবিন্দগীতিকার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া চিরন্তনী বৃন্দাবনলীলার রাগ অনুরাগ পূর্বরাগ বিরহ মিলন মহারাস প্রভৃতির রসমাধুর্যে মানবের মনঃপ্রাণ একদিন বিমোহিত করিয়া দিয়াছিল; এ সেই ভূমি, যে ভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থিত বনে-প্রান্তরে কাননে-কান্তারে সরিৎ-সাগরে ভূগর্ভে ভূধরে অতীত গৌরবে পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সেই অতীত গৌরবের শ্লাঘ্য স্মৃতির জন্য এ ভূমি আমার আদরের ভূমি নহে। শৈশবের শেষ সীমারেখা হইতে যৌবনারম্ভের বাঞ্ছিততম লগ্ন পর্যন্ত আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের বহু সুখ সৌভাগ্য আশা-নিরাশা ক্ষোভ-ক্ষতি হর্ষ ও বিষাদের স্মৃতি ইহার সহিত বিজড়িত বলিয়া, এ ভূমি আমার নিকট পরম-প্রিয়ভূমি। যদিও এ ভূমি আমার জন্মভূমি নহে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ইহারই নির্মল অরুণালোকের সহিত যদিও আমার শিশুনয়নের প্রথম পরিচয় হয় নাই, যদিও এই স্থানের

অন্তরীক্ষচারী সুস্নিগ্ধ সমীরণ আমার হৃৎস্পন্দনের প্রথম সূচনা করিয়া দেয় নাই, যদিও শৈশবের চিরনির্ভর, সংসারের চিরনির্ভয় মাতৃঅঙ্কের স্নেহদুর্গে বসিয়া পর্বরজনীর পরিপূর্ণচন্দ্রমার আকাঙ্ক্ষার ইহারই নির্মল নীলাকাশের উদ্দেশে আমার শিশুহস্ত বিফলপ্রয়াসে প্রসারিত হয় নাই, যদিও এই ভূমির বিদারিত বক্ষ হইতে উৎসারিত সলিলের বিমলধারা আমার শিশুকণ্ঠের প্রথম তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া দেয় নাই,— তথাপি এই ভূমি আমার নিকট তপোভূমি অপেক্ষা পবিত্র, তীর্থভূমি অপেক্ষাও পুণ্যতর; সর্বত্যাগী মুমুক্ষু শৈবসন্ন্যাসীর নিকট শিবপুরী বারাণসীর শ্মশানভস্ম যেমন সমাদরের সামগ্রী, ভগবদ্ভক্ত একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের নিকট ব্রজসুন্দরের লীলানিকেতন বৃন্দাবনের রেণুকণা যেমন দুর্লভ হইতেও দুর্লভতর, আমার জীবন-প্রভাতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এই ভূমি—যে ভূমিতে আজ আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,— তাহার প্রতি ধূলিকণাও আমার নিকট তেমনই পবিত্রতম অপার্থিব পরম পদার্থ।

পুরাকল্পের নিয়মানুসারে যদিও সেদিন মৌঞ্জী-মেখলা ও গৈরিক ধারণ করিয়া গুরুগৃহে গোচারণ ও সমিধ্-সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম না, যদিও উপমন্যুর ন্যায় গুরু-আজ্ঞায় বৎস-মুখনিসৃত দুগ্ধফেন এবং স্বচ্ছন্দ-বনজাত-ফলভোজন হইতেও আমাকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই, তথাপি স্বীকার করিতে হইতেছে, মাতৃঅঙ্কে সুখাসীন শৈশবের দিনশেষে পল্লিনিকেতনের অজস্র করুণাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যেদিন গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেদিনে হাস্যমুখে যাত্রা করিতে পারি নাই। আষাঢ়ের বর্ষণসিক্ত মেঘম্লান দিনগুলির মত বিষণ্ণতা আমার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তরীয়াঞ্চলে বারম্বার অশ্রুমার্জনার অপবাদ সেদিনে অস্বীকার করিলেও, সত্যের জন্য আজ সে কথা আমাকে অঙ্গীকার করিতেই হইবে। সে দিনে বিয়োগ-বেদনাতুর এই বালককে যাহারা তাহাদের স্নেহব্যাকুল বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনিন্দিত জীবনের কর্তব্য সমাপন করিয়া আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছেন। যেখানে দেহ থাকিলেও ব্যাধি নাই, মন থাকিলেও মনঃপীড়া নাই, স্নেহের অবিচ্ছেদ-মিলনে যেখানে বিরহ-বিচ্ছেদের বিভীষিকা নাই, সেখানে রোদনের রূপান্তরসদৃশ নীরস হাস্যদ্বারা ব্যর্থজীবনের হা হুতাশকে ঢাকিয়া রাখিবার সকরুণ উদ্যমের প্রাণপণ প্রয়াস প্রযত্ন নাই ; সেই অশ্রুহীন অমরলোকে বয়োবৃদ্ধ অধিবাসীদিগের উদ্দেশে কায়মনের সভক্তি প্রণতি আমার বদ্ধাঞ্জলি দ্বারা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতেছি; সতীর্থ সহপাঠীগণের নিমিত্ত বন্ধু-হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিসম্ভার বারম্বার প্রেরণ করিতেছি; আর, আজ যাহারা এই আনন্দমিলনের আয়োজন করিয়া, স্নেহের আহ্বানে এই অকিঞ্চনকে তাহার প্রথমাশ্রমের পুরাতন পুরীতে টানিয়া আনিয়াছেন, মিলনমহোৎসবের সুচনা করিয়া, এই বয়োভারবক্র ব্যর্থজীবনের অবসান প্রায়-মুহূর্তে, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে, তাহার ইহসংসারের গোধূলিলগ্নে, তাহার আয়ু অপরাহ্নের ঘনায়মান অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে যাহারা শারদসন্ধ্যার সূর্যাস্তশোভার সমুজ্জ্বল আলোকলেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, সেই সকল একান্ত স্নেহপরায়ণ বান্ধবজনকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য আমার বুভুক্ষিত স্নেহের লক্ষবাহু তাহাদের দিকে আজ কত আগ্রহে প্রসারিত হইতেছে, তাহা আমার অন্তরদেবতাই জানিতেছেন। আশৈশব-পরিচিত আত্মীয়স্বজনগণের স্নেহপুটের মধ্যে নিরন্তর জীবন যাপন করিতে করিতে অজস্র স্নেহের অকাতর দানসম্ভারকে নিজের প্রাপ্য বলিয়া লোকের ধারণা হয়, না পাইলে ক্ষোভ জন্মে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা পাইতেছি, তাহার মূল্য এবং মর্যাদা অনেক সময়ে আমরা রক্ষা করিতে ভুলিয়া যাই। যেদিনে সেই স্নেহদুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, যেদিনে মাতার স্নেহমন্দাকিনীর প্রচ্ছায়-তট-তরুর আশ্রয় ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল, সেইদিনে বুঝিয়াছিলাম, অযাচিত স্নেহ কি অমূল্য সামগ্রী ; এবং আজ বুঝিতেছি, সে স্নেহ কি অনির্ভিন্ন গভীর এবং কত দীর্ঘস্থায়ী।

সম্বৎসরের অবসানে মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিনে সরস্বতীর আরাধনার্থ ফলপত্রপুষ্পের আহরণ বালকের পক্ষে যে পরম বাঞ্ছিত তাহা যেমন জানিতাম, বসন্ত ঋতুর প্রথম সমাগমদিনে পীতাম্বর পরিধান করিয়া মন্ত্রঃপূত পুষ্পাঞ্জলি সারদার চরণে সমর্পণের আনন্দে বালকের মন কেমন করিয়া একান্ত অধীর হইয়া উঠে তাহাও যেমন জানিতাম, ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা সিতাব্জবাসিনীর নিত্য আরাধনা যে তাদৃশ আনন্দদায়ক নহে, তাহাও তেমনিই জানিতাম। বর্ণমালার পরিচয়-ব্যপদেশে সে পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম। ছত্রিশটি বর্ণের মালা ইন্দ্রপ্রসাদী পারিজাত পুষ্পমালিকার ন্যায় অনায়াসে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারি নাই। বর্ণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবার ভার যাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা স্বর-ব্যঞ্জনাদি বর্ণের প্রতি তেমন মনোযোগ না দিয়া, এই কৃষ্ণকায় বালকের বর্ণ যাহাতে অরুণরাগরঞ্জিত হইয়া উঠে তৎপ্রতিই সমধিক মনঃসংযোগ করিতেন।

শিক্ষা এবং শিক্ষকের এই সংস্কার লইয়া এই সারস্বতনিকেতনের অভিমুখে একদিন সভয়ে যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অনির্বচনীয়। দেখিলাম, অভীপ্সিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল-নৃত্যপরায়ণা কলনাদিনী পদ্মা স্নেহরসসিঞ্চনে যেমন তাহার দুই তীরকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, পদ্মার তটান্তস্থিত এই নগীরর অধিবাসীজনের হৃদয়ভূমিকেও তেমনি স্নেহ-সরস করিয়া দিয়াছে। পরিণত বয়সে কাশ্মীরের কেশরকুসুমাস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি হইতে মলয় চন্দনদিগ্ধ-সমীরণ-শীতলা কুমারিকা পর্যন্ত, সিন্ধু-সলিল-ধৌত সোমনাথের ইতিহাস-প্রথিত মন্দিরতল হইতে বৈদেহী-বিরহ-ব্যথিত রামভদ্রের সেতুবন্ধ পর্যন্ত, বহু দেশ দেশান্তর, পরিভ্রমণের বহু সুখদুঃখের স্মৃতি এই বক্ষতলে সঞ্চিত রহিয়াছে; কিন্তু রাজাবরোধের স্নেহ-কুলায়-পরিভ্রষ্ট এই মানবশিশু রাজসাহীবাসী বান্ধবসম্প্রদায়ের নিকট হইতে অযাচিত স্নেহের পর্যাপ্ত ধারা যেমন করিয়া পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। বালকের পৃষ্ঠদেশে বায়ুপথে ভ্রাম্যমাণ বিভীষিকা-উৎপাদনকারী শব্দশীল বেত্রাগ্রের ঘন-সন্নিপাতই গুরুর দক্ষিণহস্তের দান বলিয়া সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। তৎপরিবর্তে শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে যখন পিতৃস্নেহের অবাধ ধারায় স্নাত হইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম, রোগকম্পিত কলেবরে শিক্ষকের উদ্বিগ্ন মনের দিনযামিনীর চিন্তা ও শুশ্রূষার মধ্যে আশঙ্কাকুলা জননীর মাতৃহৃদয় যখন দেখিতে পাইলাম, সেদিনে এই পিতৃহীন এবং মাতৃঅঙ্ক-পরিভ্রষ্ট বালকের অন্তরাত্মা কি অনির্বচনীয় আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল তাহা এক মুখে বলিবার সাধ্য আমার নাই। সেদিনের পূজ্যপাদ শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই আজ স্বর্গলোকবাসী। জননী কর্তৃক শিক্ষার্থ প্রেরিত বালকের শারীরিক মানসিক সর্বপ্রকার উন্নতি সম্পাদনার্থ তাহাদের চিরনিশ্চল নিরলস ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণার কথা যখনই স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগবশে আমার নয়নের ক্ষীণদৃষ্টি কেমন করিয়া ক্ষীণতর হইয়া আইসে, তাহা কেবল আমিই জানি। অধ্যয়নের নির্দিষ্ট দিনগুলির অবসানে যখন সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদের চরণাশ্রয় হইতে সুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম, তখনও অবিকম্পিতজ্যোতি স্নেহের পঞ্চপ্রদীপ তাহাদের হৃদিমণ্ডপে সমভাবেই জ্বলিতে দেখিয়াছি। আজ এই মিলন-মহোৎসবের দিনে তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রসন্ন-মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতেছি না সত্য; কিন্তু লোকলোকান্তর হইতে তাহাদের স্নেহশীর্বাদের পুণ্যধারা যে আমার মস্তকে অবিরলভাবে বর্ষিত হইতেছে, তাহা আমি আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতেছি।

প্রাচীন অভিজাতবংশের বংশধরগণকে শৈশবাবধিই কতকগুলি চিরাচরিত পুরাতন প্রথার অধীন হইয়া আয়ুযাপন করিতে হয়; ধুলার ধরণীর মানবশিশু ধূলিতলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু আভিজাত্যের সহিত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোন প্রকারে সংসৃষ্ট হইবামাত্র সর্বংসহা

স্নেহময়ী ধরিত্রীর ধূলির সহিত সে শিশুর সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; মমতাময়ী মূক মাতা মেদিনীর স্নেহক্রোড় হইতে তুলিয়া এক নিমেষে মণিমন্দিরের মহোচ্চশীর্ষে তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ষণস্নাতা নবোদ্ভিন্ন-শষ্পশয্যা, বসন্তের বর্ণবৈচিত্র্যময়ী বনশ্রী কৌমুদী-সমুজ্জ্বলা ভুবনমেখলা তটিনীর নটনলীলা, পরিপূর্ণ চন্দ্রমার হাস্যসমুজ্জ্বলা কোজাগরনিশীথিনী, মধুন্মত্ত মধুকরের গুঞ্জনগীতি তাহার নয়ন-মনকে যেমন করিয়াই কেন আকর্ষিত করুক না, রাজহর্ম্ম্যের কঠিন শিলাতলস্পর্শকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়া শত দৌবারিক-পরিবেষ্টিত রাজকুমারকে রাজশালায় একপ্রকার শৃঙ্খলিত বন্দি হইয়াই কালযাপন করিতে হয়। কোন্ জন্মজন্মান্তরীণ পুণ্যবলে জানি না, আমাকে দীর্ঘকাল ঐরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। বাল্যাবস্থায় শিক্ষার্থ এই রাজসাহীর বিদ্যামন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম, সতীর্থ সহপাঠী ও সমবয়স্ক বন্ধুজনের সাহচর্যে, তাহাদের সহিত উন্মুক্ত প্রান্তরে বর্ষাবিস্ফারিতা তরঙ্গভঙ্গচপলা পদ্মার বিস্তীর্ণ বালুবেলায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং ক্রীড়াকৌতুকের অনির্বচনীয় বিমলানন্দেই আমার বাল্য কৈশোর কাটিয়া গিয়াছে। বহুবর্ষ পরে যেখানে আজ আসিয়া আবার দাঁড়াইয়াছি, বিদ্যার্থীর এই তীর্থাধিক পবিত্র ভূমিতে দাঁড়াইয়াই আমার কিশোর-মনের নবজাগরণের দিনে এই পুণ্যভূমিসঞ্জাত তরুপল্লবে বসন্তলক্ষ্মীর অপরূপ সম্পদশোভা আমার তরুণ নয়নে প্রথম মোহাঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিল। দুর্জয় জীবনসংগ্রামের ভৈরব ভেরীনিনাদের মধ্যে নিরাশা ও দুরাশার দুঃখদুর্দিনে বন্ধুজনের যে অকৃত্রিম প্রাণকর প্রীতির মোহন বেণুরব মানবজীবনকে বহনীয় করিয়া রাখে, বন্ধুত্বের সে বংশীধ্বনি আমার কিশোর-মনের কর্ণমূলে এইখানেই প্রথম বাজিয়া উঠিয়াছিল। যে সকল সতীর্থ ও সহপাঠীগণের সহিত বন্ধুস্নেহের পুষ্পরজ্জুর কোমল কঠিন বন্ধনে সুখের কৈশোরে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, আমার একান্ত সৌভাগ্যের বলে আজ তাহাদের অনেককেই আমার চতুর্দিকে দেখিতেছি। তাহাদের এই প্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বহুবৎসর পূর্বের পুরাতন সুখস্মৃতি আমার অন্তরতলে কেমন করিয়া জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? অন্তরের কথার কোন ভাষা নাই,— অন্ততপক্ষে আমার তাহা জানা নাই,— যাহা ভাষা দ্বারা আজ ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, আভাসে তাহা বুঝিবেন, আমার একমাত্র সেই ভরসা।

পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী মহিলা ভবানীর বংশধর বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে যে গৌরবের অভিনন্দন আমি আজ পাইলাম, আমি তাহার একান্তই অযোগ্য। করীন্দ্রকুন্দচন্দ্রমানিন্দী শুভ্রযশোমণ্ডিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেই বংশের সংস্রবে ভাগ্যবলে আসিয়া আমি ধন্য হইযা গিয়াছি— আমার এই একমাত্র শ্লাঘা। সেই বংশের উপযুক্ত বংশধররূপে নিজের পরিচয় রাখিয়া যাইবার মত কোন গুণই আমার নাই এবং সাধ থাকিলেও শক্তি-সাধ্য-সামর্থ্য সমস্তেরই একান্ত অভাব। অর্ধবঙ্গেশ্বরী অন্নপূর্ণ স্বরূপিণীর যাহা সহজসাধ্য ছিল, আজ আর কাহারও কি সে সাধ্য আছে! বন্ধ্যার জননী হইবার সুখসাধের মত, আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফল বেদনা কেবল চিত্ততলে বারম্বার আঘাত করিয়া যায়— অক্ষমতার ব্যথাকাতর সাশ্রু নয়ন তখন সেই উত্তমতম লোকের অধিবাসিনী ভবানীর উদ্দেশে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,— "নিষ্ফল বেদনায় কাতর করিয়া, ব্যর্থতার মধ্যে বিদায় দিবার জন্য, তোমার বংশসংস্রবে এ অক্ষমকে কেন আনিয়াছিলে মা?"

যে রাজসাহীর "সার্বজনীন সভা" আজ সর্বজনসমক্ষে আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন, তাহার সংস্রবে কোন কথা বলিতে গেলেই দীঘাপতিয়ার সর্বগুণধার সৌম্যমূর্তি প্রিয়দর্শন স্বদেশবৎসল আদর্শ-চরিত্র ভক্তিভাজন রাজা প্রমথনাথের কথা মনে আসিয়া, তাহার অকালমৃত্যুর শোকে চিত্ত বিকল হইয়া উঠে। পরিপূর্ণ যৌবনে আরব্ধ কার্যসমূহ অসমাপ্ত

রাখিয়া, তাহার দেশবাসীকে গভীর শোকসাগরে ভাসাইয়া, আত্মীয়স্বজন ও তাহার অগণিত বন্ধুবর্গের হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া তিনি পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার লোকান্তর গমনে যেস্থান শূন্য হইয়াছে, ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, আজও তাহা শূন্যই পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশের অভিজাতবংশের বংশধরগণ মধ্যে তাহার ন্যায় সর্বগুণালঙ্কৃত আদর্শ পুরুষ তাহার জীবমানে কেহ ছিল না, আজও নাই। কবে কে সে স্থান পূরণ করিবেন, তাহা যিনি সব জানেন সেই সর্বকার্যকারণের নিয়ন্তাই বলিতে পারেন। বঙ্গদেশের সর্বত্র যখন উচ্চশিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত, দক্ষিণ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে শহরে নগরে যখন উচ্চশিক্ষা বিস্তারকল্পে রাজশক্তি এবং সাধারণের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, দেশব্যাপী সেই জাগরণের দিনে উত্তরবঙ্গের অতি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অসংখ্য জনসংঘ তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। যে বরেন্দ্রভূমির একচ্ছত্র অধিপতি লক্ষ্মণসেনের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে সারদার ষোড়শোপচারের পূজারতির শঙ্খঘণ্টারবে প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত একদিন শব্দায়মান ছিল, যে বরেন্দ্রীর পাল-নরপালের চারণ-কবি সন্ধ্যাকরের কলকণ্ঠবিনিসৃত ঐতিহাসিক কাব্যের মধুঝঙ্কার হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়াছে,— এমন একদিন ছিল, যখন সেই বরেন্দ্রীর অধিবাসীবৃন্দ আলস্যবিজড়িত তন্দ্রাতুর নেত্রে শ্বেতাব্জসমাসীনা বীণাবাদিনীর পূজাহীন ব্যর্থ দিনযামিনী যাপন করিয়াছে। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দিনে রাজা প্রমথনাথ দীপহস্তে বাণীমন্দিরের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাহার রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অপরিমেয় অর্থব্যয়ে রাজসাহী কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমগ্র উত্তরবঙ্গের শ্লাঘার সামগ্রী করিয়া গিয়াছেন।

অশেষ কল্যাণকর, রাজসাহীবাসীর সর্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান রাজসাহীর 'সার্বজনীন সভা' রাজা প্রমথনাথের আর এক মঙ্গলানুষ্ঠান। তাহার জীবিতকালে এই সভা লোক-হিতকর বহুবিধ শুভকার্য সম্পাদন করিয়াছে। তাহার অকালমৃত্যুর ফলে একদিন এই সভারও মৃত্যু সমুপস্থিত হইয়াছিল। তখন প্রমথনাথের উপযুক্ত পুত্র, আমার পরম বন্ধু সহোদরাধিক, দীঘাপতিয়ার সর্বগুণসমন্বিত বর্তমান রাজা প্রমদানাথ অপ্রাপ্তবয়স্ক বিদ্যার্থী। পিতার অনুষ্ঠিত আরব্ধ কার্য শেষ করিবার, পিতার প্রতিষ্ঠিত জনহিতকর সভাসমিতিসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য প্রভৃতি হইয়া মঙ্গল অনুষ্ঠানগুলিকে জীবিত রাখিবার, সময় তাহার তখনও আসিয়াছিল না। সেইজন্য এই সভায় তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য, পরলোকগত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি মহাশয়গণ এই অযোগ্যকে সভাপতির আসনে উপলক্ষ-স্বরূপ বসাইয়া, দেশবাসী অপরাপর বুদ্ধিমান কৃতী ও বিদ্বজ্জনের সহায়তায় তাহারাই সকল কার্য নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। সেদিনের কার্য কুশলতার জন্য প্রশংসা পুরস্কার যাহা কিছু প্রাপ্য, সে সকল পাইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র তাহারাই। গচ্ছিত ধনসম্পদকে লোকে যেমন রক্ষা করিয়া, প্রাপ্তকালে যাহার ধন তাহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, আমিও তাহাই করিয়াছি। বয়ঃপ্রাপ্ত প্রমদানাথ সংসারে প্রবেশ করিয়া যখন সকল কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন, এই রাজসাহী সভাকেও আমি সেদিনে তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলাম।

প্রমদানাথ পিতার কীর্তি রক্ষা করিতেছেন স্বয়ং রাজোচিত সমস্ত কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া, দেশের কল্যাণকর নানা অনুষ্ঠান করিয়া, দেশে বিদেশে যশোলাভ করিতেছেন;— কেবল মাত্র সেই কারণে হর্ষপ্রকাশ করিতেছি তাহা নহে। প্রমদানাথ আমার চক্ষে কেবলমাত্র রাজা নহেন, সতীর্থ নহেন, সমবয়স্ক নহেন— তিনি আমার সহোদরাধিক বন্ধু। একদিন দুই দিন দুইমাস ছয় মাসের বন্ধু নহেন— আমাদের উভয়ের জীবন প্রভাতে এই বান্ধবতার বীজ রোপিত হইয়াছিল। তাহার পরে, জীবনের বন্ধুর পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উভয়েরই জীবনের

উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, অনেক পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী প্রলয়ের মেঘান্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে, তথাপি আমাদের সেই জীবন-প্রভাতের সংরোপিতা প্রীতিলতিকার শ্রীহানি হইতে পারে নাই। আজ আমার জীবনের সমাসন্ন রজনীমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতে পারি— "বন্ধু, আমার দিন আমি কাটাইয়া দিলাম; জানিয়াও গেলাম, আমার অবসানের বার্তা পাইয়া তোমার চক্ষু শুষ্ক রহিবে না।"

এই সভায় এমন কয়জন আজ উপস্থিত আছেন, যাহারা আমার পল্লিবাসী নহেন, যাহারা আমার সতীর্থ বা সহপাঠী নহেন, কিম্বা আমার প্রসন্ন অরুণালোকোদ্ভাসিত জীবন-প্রভাতেও তাহাদের সহিত বান্ধবতা সূচনা হইয়াছিল না। বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল আমার এই জীবনের সুখ-দুঃখময় পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদের অন্তরের স্পষ্ট পরিচয় আমি পাইয়াছিলাম, তাই বন্ধুস্নেহের পরম প্রয়োজনের দিনে আমি তাহাদের গভীর প্রীতি ও সমবেদনার সচ্ছায় পাদপতলে আশ্রয় লইয়াছি। সেই আশ্রয়-তরুর শীতল ছায়া এখানেও আমার মস্তকের উপর সঞ্চারিত দেখিয়া, কি আনন্দে এবং কত সুখে আমার সকল বুক ভরিয়া উঠিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা আমার নাই।

গতকল্য এই শহরে আসিয়া এক উৎসব-ব্যাপারে আমি যোগ দিয়াছিলাম। অন্বেষণলব্ধ বিগত গৌরবের ইতিহাস-উপাদান সংরক্ষণের জন্য যে মন্দিরের শিলাবিন্যাস বঙ্গের প্রধানতম রাজপুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হইল, কতিপয় বৎসর পূর্বে কেমন করিয়া কাহার দ্বারা ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত সকলেই অবগত আছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যে মন্দির অভ্রভেদ করিয়া তাহার স্বর্ণশীর্ষ ঊর্ধে উত্তোলন করিবে, তাহার উপরে রমার আননানুকারী শরচ্চন্দ্রমার অক্ষয়কিরণ অবিরতধারে বর্ষিত হইতে থাকুক।

জীবন-বসন্তের পুষ্পিত প্রভাতে আশার আনন্দরাগিণীর মধ্যে যেমন করিয়া জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, আজ তাহার অবসানপ্রায় মুহূর্তে দেখিতেছি, নানা দুঃখদৈন্যের ঝড়ঝঞ্ঝায় এবং করকাভিঘাতে হৃদয়ের সে পুষ্পোদ্যান ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্তে শিশু মুষ্টিবদ্ধ করিয়াই এ ধরণীর ক্রোড়ে জন্মলাভ করে; বিদায়লগ্নে, শুনিয়াছি, মুষ্টি খুলিয়া দেখাইয়া যায় যে 'কিছুই পাই নাই, রিক্তহস্তেই এ আশার বাসা হইতে বিদায় লইলাম।' আমাকে তাহা করিতে হইলে না। বাল্যে যাহাদের নিকট হইতে অযাচিতরূপে অফুরন্ত স্নেহ পাইয়াছি, আজ এই সমাসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে তাহারাই ডাকিয়া আনিয়া, স্নেহের দানে আমার শূন্যমুষ্টি পূর্ণ করিয়া দিলেন। যে স্নেহক্রোড়ে আমার পরিশ্রান্ত মস্তক রাখিয়া মরিতে পাইলে, বিশ্বনাথের মোক্ষপুরী বারাণসীতে মৃত্যুযাত্রা আমার নিকট তুচ্ছ, সেইখানেই আমার অবসান হউক, কিম্বা বান্ধববর্জিত দেশান্তরের পথে প্রান্তরে আমার নয়নের শেষনিমেষপাত হইয়া যাউক,—যেখানে যেভাবে যে অবস্থাতেই আমার অজ্ঞাত দেশের অফুরন্ত নিরুদ্দেশযাত্রার আরম্ভ হউক না কেন,—জীবনারম্ভের দিন হইতে হৃদয়মন্দিরে যে আরাধ্য দেবতার পূজার্চ্চনা করিতেছি, সেই ইষ্টনামের সহিত আজকার এই আনন্দমিলনের সুখস্মৃতিকে আমার অন্তরতলে শেষতম নিমেষ পর্যন্ত সজীব রাখিয়াই দিব।

মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৩ অগ্রহায়ণ

Rajshahi People's Association কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে পঠিত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

পাহাড়পুর

বাঙালির জীবন-বসন্তের স্মৃতি-নির্দশন

বাঙালির পূর্ব কাহিনী বাঙালির নিকট অপরিচিত। তজ্জন্য বাঙালি এখন সর্বতোভাবে বহির্মুখ। আত্ম-পরিচয়হীন অর্বাচীন উচ্চশিক্ষার অলৌকিক আলোক-পুলক তাহাকে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের অধিক পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছে। তাহার নিকটে স্বদেশের পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ-কাহিনী—"অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্।" তথাপি তাহার মধ্যেই বাঙালির জাতীয় জীবনের গৌরব যুগের প্রকৃত পরিচয় নিহিত হইয়া রহিয়াছে।



পাহাড়পুরের দৃশ্য

সে অনেক দিনের কথা। তখন বাঙালি এক পরাক্রান্ত আত্ম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিল। তাহাই তখন সমগ্র প্রাচ্য-ভূমণ্ডলে আত্মজ্ঞান-মন্দাকিনীর প্রধান প্রস্রবণ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বাঙালি কবি কলি-বাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দী তাহার কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র-মণ্ডলকে 'বসুধার শীর্ষস্থান' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে কবিজন-সুলভ অতিশয়োক্তি বলিয়া সম্পূর্ণরূপে

প্রত্যাখ্যান করা সহজ ; কিন্তু বরেন্দ্র-মণ্ডলের নানাস্থানে যে সকল পুবাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কবি কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ সত্য ;—যেমন সত্য, সেইরূপ বিস্ময়াবহ। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ তাহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই "আগুন ভরা ফাল্গুন মাসের বসন্ত সমাগমে" সেখানে পদার্পণ করিতে পারিলে, বাঙালির জীবন-বসন্তের পরিচয় লাভের সম্ভাবনা আছে। তাহা এখন রচনা-লালিত্যহীন ধ্বংসাবশেষ হইলেও, তাহার সর্বাঙ্গে এক প্রবল পুরুষকার জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা কোনও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ব্যক্তিগত পুরুষকার নহে; বংশপরম্পরাগত জাতীয় অধ্যবসায়পূর্ণ অসামান্য আত্মচেষ্টার অনির্বচনীয় সাফল্য-নিদর্শন।

শতবর্ষ পূর্বে বুকানন্-হামিল্টন্ তাহাকে একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তিচিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন।[১] প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ওয়েস্টমেকট তাহার খনন-কার্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরামর্শ দান করিয়াছিলেন।[২] বাঙালি তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিলেও, তাহার অব্যবহিত পরবর্তীকালে কানিংহাম খননকার্যের ব্যবস্থা করিতে আসিয়া, বাঙালি ভূস্বামীর নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সদস্যগণ রহস্যোদ্‌ঘাটনের আশায় একাধিকবার নানাভাবে এই স্থানের পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

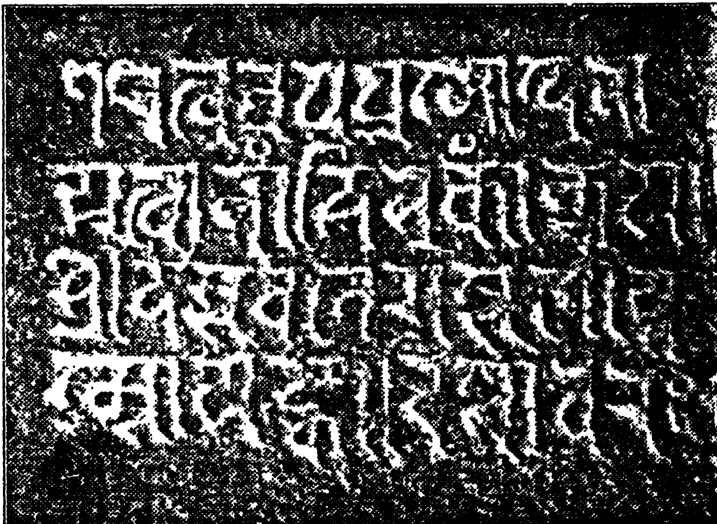


পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তি

তথাপি এখনও খননকার্যের সূত্রপাত হয় নাই। কারণ, এই বিস্ময়াবহ ধ্বংসাবশেষ এত বৃহৎ যে, ইহার খনন-কার্য অনায়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। বাংলা দেশের অন্য কোনও স্থানে এরূপ সুবৃহৎ ধ্বংসাবশেষ এ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই কারণে ইহা অনন্য-সাধারণ। ইহা বহুদূর হইতে পাহাড়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়। তজ্জন্যই স্থানের নাম পাহাড়পুর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ববেন্দ্র-মণ্ডলের আরও অনেক স্থান এইরূপ কারণে পাহাড়পুর নামে পরিচিত। কিন্তু ইহার তুলনায় অন্যান্য পাহাড়পুর অকিঞ্চিৎকর। বহু শতাব্দীর অযত্নসম্ভূত বৃক্ষলতা অবলীলাক্রমে বৃদ্ধিলাভ করিয়া, ইহাকে পাহাড়ের মতই দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কানিংহামের পরিদর্শন-কালে কয়েকটি সরোবর ভিন্ন অন্য স্থান নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন ছিল, প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ বনপাদপগুলি এরূপ বৃহৎ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল যে, মানবের পক্ষে তন্মধ্যে

প্রবেশলাভের উপায় ছিল না।[৩] সম্প্রতি স্থানে স্থানে হলকর্ষণের সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ মূল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিলক্ষণ জঙ্গলাকীর্ণ।

এখানে যাহা ছিল, তাহা আর সেভাবে বর্তমান নাই। তথাপি তাহার ধ্বংসাবশেষও দর্শনীয় হইয়া রহিয়াছে। এখানে কি ছিল, এবং তাহা কাহার কীর্তি ঘোষণা করিত, তাহার প্রকৃত জনশ্রুতি পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে! শতবর্ষ পূর্বে যে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, তাহা ইহাকে "গোপাল-চিতার ভিটা" বলিয়া বিঘোষিত করিত। বুকানন্-হামিল্টন্ তাহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুরাতন অধিবাসিবর্গের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে, কিছুদিনের জন্য লোকালয় বিজন বনে পরিণত হইয়াছিল। এখন যাহারা বসতি সংস্থাপিত করিয়াছে, তাহারা নবাগত। তাহাদিগের নিকট এই ধ্বংসাবশেষ "মৈদল রাজার বাড়ি" বলিয়া পরিচিত। তিনি সত্যপীরের জন্মদাতা বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছেন। এই জনশ্রুতি, যে ঐতিহাসিককালের পরিচয় প্রদান করে, তাহা মুসলমান-শাসনকাল। ধ্বংসাবশেষটি তাহার বহু পূর্ববর্তী কালের স্মৃতিচিহ্ন ; তাহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার চতুর্দিকে পরিখা-চিহ্ন বর্তমান না থাকায়, ইহাকে রাজবাড়ি বা রাজদুর্গ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত। ইহা বরং ধর্মসংক্রান্ত আরাধ্য স্থান বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ইংরাজ-রাজপুরুষগণ সেইভাবেই ইহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন ;—বাহ্যদৃশ্যও তাহারই পক্ষ সমর্থন করে। এই সকল কারণে, আধুনিক জনশ্রুতিকে কাল্পনিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে যে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, তাহাও কাল্পনিক কিনা, তাহার মীমাংসা করা সহজ নহে। বাহ্যদৃশ্য তাহার প্রতিকূল বলিয়া কথিত হইতে পারে না। সে জনশ্রুতি একালের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনন্যসাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, সেকালের পক্ষে কিছুমাত্র বিস্ময়াবহ হইতে পারে না। সেকালে চিতার উপর চৈত্য-নির্মাণের প্রথা সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। এখনও দুই এক স্থান হইতে সে প্রথা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।



পাহাড়পুরে প্রাপ্ত শিলালিপি

পাহাড়পুরের চারিক্রোশ মাত্র দূরে আর একটি "ভিটা" দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এখনও

প্রতি বর্ষের বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে দেবপাল রাজার নামে পূজা হইয়া থাকে। কানিংহামের নিকট লোকে "দেবপাল রাজাকা ছত্রী" বলিয়া এই স্থানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি তাহাকে দেবপালদেবের চৈত্যাবশেষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।[৪]

"গোপাল চিতার ভিটা" এইরূপ আর একটি চৈত্যাবশেষ হইলে, ইহাকেও বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে,—ইহাকে পাল-রাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের ভস্মাধারপূর্ণ চৈত্যাবশেষ বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা অধিক হইয়া পড়ে। প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্য-ন্যায়" নামক অরাজকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিল। তাহার পুত্র ধর্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।[৫] একথা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গোপাল ও তাহার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাহারাই মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিলেন ; সে কথা তিব্বতীয় গ্রন্থে সুপরিচিত। নারায়ণপালদেবের সময় হইতে মদনপালদেবের সময় পর্যন্ত পালরাজগণের যে সকল তাম্রশাসন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক শাসনের প্রথম শ্লোকে গোপালদেব দ্বিতীয় "দশবল লোকনাথ" বলিয়া উল্লিখিত।[৬] রাজকবি তাহার সহিত ভগবান বুদ্ধদেবের তুলনাকে সর্বাংশে সফল করিবার অভিপ্রায়ে, শ্লিষ্ট কবিতার অবতারণা করিয়াছিলেন ;—তাহার এক অর্থ ভগবান লোকনাথকে, অন্য অর্থ গোপালদেবকে সূচিত করিতে পারে। যথা,—

মৈত্রী কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যা-সরিদমলজল-ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং
স শ্রীমাল্লোঁকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ।।

"যিনি কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন,—যিনি তত্ত্বজ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারার অজ্ঞানপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন,—যিনি কামক [কামদেব] অরির [পরাক্রমসঞ্জাত] আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তিলাভ করিয়াছিলেন,—সেই শ্রীমান দশবল লোকনাথের জয় হউক।

এবং

"যিনি করুণারত্নোদ্ভাসিত-বক্ষে [প্রজাবর্গের] মিত্রতা ধারণ করিয়া,—সম্যক্-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় [লোক সমাজের] অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া,—[দুর্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী] কাম-কারিগণের [পরাক্রম-সঞ্জাত-মাৎস্যন্যায়ের] আক্রমণ পরাভূত করিয়া [রাজ্য মধ্যে] চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর [রাজাধিরাজ] লোক-নাথেরও জয় হউক।[৫]

গোপালদেবের পুণ্যস্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার বংশধরগণ রাজশাসন-লিপিতে এই শ্লোক সন্নিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেব সমগ্র আর্যাবর্তে আত্মপ্রভাব সুবিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কি পিতার চিতাভস্ম সংরক্ষণের যথাযোগ্য আয়োজন করিয়াছিলেন না? "গোপাল-চিতার ভিটা" কি তাহারই ধংসাবশেষ হইতে পারে? এই প্রশ্ন বহুপূর্বেই উত্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু পাহাড়পুবের ধ্বংসাবশেষ আদৌ একটি বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন কি না, তাহা লইয়াই তর্ক-বিতর্ক প্রচলিত হইয়াছিল।

ধ্বংসাবশেষের বাহ্যদৃশ্য ধরিয়াই তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বুকানন্-হামিল্টন্ তাহার যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মাপকাঠি ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত না হইয়া. কানিংহাম তাহার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। তাহার নিজের গ্রন্থে মাপকাঠির সাহায্যে আয়তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচয় প্রকাশিত হইলেও, তাহার সহিত বুকানন

হামিল্টনের মূল বর্ণনার অধিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ!

কানিংহাম লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই বৃহৎ ধ্বংসস্তূপ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে ১৫০০ ফুট দীর্ঘ পার্শ্ববিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজক্ষেত্র-বেষ্টনী দেখিতে পাওয়া যায় ;—তাহা বিপুলায়তন মৃৎপ্রাচীরে গঠিত হইয়াছিল। তাহার পূর্বদিকের বিস্তাব ১৫০ ফুট,—অন্যান্য দিকের বিস্তার ১০০ ফুটের অধিক হইবে না।"[৭] এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষটির উচ্চতা ১০০-১৫০ ফুট হইতে পারে বলিয়া বুকানন্-হামিল্টন্ অনুমান করিয়াছিলেন। কানিংহাম মাপিয়া ঠিক করিয়া গিয়াছিলেন,—প্রকৃত উচ্চতা ৮০ ফুট মাত্র। তিনি ইষ্টকের আয়তন ধরিয়া গণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—অট্টালিকাটি যখন অক্ষত কলেবরে দণ্ডায়মান ছিল, তখন তাহার উচ্চতা ঠিক ১০০ ফুট ছিল। তাহা যেরূপ বৃহৎ সেইরূপ সুন্দর ছিল। কারণ,—তাহার বহির্ভাগ কারুকার্য-খচিত ইষ্টকসজ্জায় সুসজ্জিত ছিল।[৮] তাহার প্রমাণরূপে কানিংহাম একখানি ইষ্টকচিত্রও মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন।

বুকানন্ হামিল্টন্ এই অত্যুচ্চ বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে হিন্দু-দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই ; এবং কেন পারেন নাই, তাহার কারণ বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহা সকলের নিকটই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইবার যোগ্য। হিন্দু-দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে "গর্ভ" নামক কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-দেবমন্দির ধ্বংসাপ্রাপ্ত হইলে ভিতরে ভাঙিয়া পড়ে ; বাহিরে অধিক উচ্চতা রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং পাহাড়পুরের প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ ধ্বংসাবশেষের অত্যধিক উচ্চতাই তাহাকে গর্ভশূন্য বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিভাত করে। ধ্বংসাবশেষের যে অংশ প্রাচীর-সংলগ্ন, তাহা অতি বিস্তৃত, অথচ বিস্তৃতির অনুপাতে উচ্চতা রক্ষা করিতে পারে নাই। তজ্জন্য তাহার প্রাচীর সংলগ্ন কক্ষসমূহের ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বোধ হয় এই কারণে ওয়েস্টমেকট তাহাকে ভিক্ষুগণের আবাস-কক্ষের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এ সকল কথার যথাযোগ্য আলোচনা না করিয়া, কানিংহাম পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষকে "ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ের" ধ্বংসাবশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল কারুকার্যখচিত ইষ্টকখণ্ড কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহার একখণ্ডে একটি কৃশোদরী কালীমূর্তি অঙ্কিত ছিল মনে করিয়া, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এরূপ একখণ্ড ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, তাহার চিত্র মুদ্রিত করাই কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাহাও নিতান্ত অপ্রচুর প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় কানিংহামের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া, পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষকে বৌদ্ধ-কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইহা যে সত্যসত্যই বৌদ্ধ-কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, এতদিন পরে তাহার সংশয়শূন্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইষ্টক আহরণ করিবার চেষ্টা প্রচলিত হইয়াছে। বরেন্দ্রমণ্ডলের অনেক স্থানেই পুরাতন ইষ্টক আহরণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ রেলপথ প্রস্তুত হইবার সময়ে, অনেক স্থান হইতে ইষ্টক আহৃত হইয়াছিল। রেলওয়ের সাহেবগণ পাহাড়পুরেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ যে গর্ভহীন ইষ্টকস্তূপ, তাহারা কানিংহামকে সে সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে ; কানিংহামের আগমনের কয়েক বৎসর পূর্বে ঘনশ্যাম নামক এক ব্যক্তি স্তূপের খননকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতেও ধ্বংসাবশেষটি গর্ভশূন্য ইষ্টকস্তূপ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। ঘনশ্যাম যেস্থান খনন করিয়াছিল, তথায় ইষ্টকরাশির মধ্যে একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তরের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পূর্বেও কতকগুলি প্রস্তরনির্মিত দ্বার-শাখা বাহির হইয়াছিল। সুতরাং ধ্বংসাবশেষ-নিহিত

অট্টালিকাটি যে ইস্তক-প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কানিংহাম যাহাকে মৃৎপ্রাচীর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরেও কোনরূপ প্রস্তর বা কক্ষ নিহিত আছে কি না, পূর্বে তাহার কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিলে, কোন কোন স্থানে ইষ্টকনির্মিত ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হইত। সম্প্রতি ইষ্টক-প্রাচীরের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে তাহা হইতে ইচ্ছামত ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছে। প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ মূল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, চারি পাঁচ রশি ব্যবধানে অবস্থিত প্রাচীর হইতে এইরূপে ইষ্টক আহরণের চেষ্টা করিতে গিয়া, পাহাড়পুর নিবাসী সমীর সোনার একটি প্রস্তরস্তম্ভের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।[৯] উহা একটি অষ্টকোণ-সমন্বিত "বজ্র"শ্রেণীর স্তম্ভের অগ্রভাগ। তাহাতে চারি পংক্তি খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সদস্য শ্রীমান শ্রীরাম মৈত্রেয় তাহার সন্ধান লাভ করিয়া, লিপিযুক্ত স্তম্ভাংশটি সমিতির সংগ্রহালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাই পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষকে বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যথা,—

শিলালিপি

১। ওঁ রত্নত্রয়-প্রমোদেন।
২। সত্বানাং হিতকাংক্ষয়া।
৩। শ্রীদশবলগর্ভেণ। স্ত-
৪। স্তোয়স্কারিতো বরঃ।

অনুবাদ

ওঁ

ত্রিরত্নের [ধর্ম-বুদ্ধ-সঙ্ঘের] প্রমোদসাধনার্থ, জীবসমূহের কল্যাণাকাঙ্ক্ষায়, শ্রীদশবলগর্ভ নামক ব্যক্তি কর্তৃক এই উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্মাণ করান হইয়াছে।

টীকা

শিল্পী এই অনুষ্টুভের প্রত্যেক চরণের শেষে বিরামচিহ্ন খোদিত করিয়াছিলেন। দশবল-শব্দটি প্রথমে 'দসবল'-রূপে খোদিত হইয়া, পরে সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। "প্যাগ্-সাম-জন্-জঙ্গ" নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে বৌদ্ধগণের নামের মধ্যে দশবলশ্রী, কমলগর্ভ, পদ্মগর্ভ, আনন্দগর্ভ প্রভৃতি নামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপি-প্রণালী দেখিয়া, ইহাকে খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়।

এই স্তম্ভ-লিপি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও, উপাদেয় ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। ইহাতে কোনও অট্টালিকা নির্মিত হইবার পরিচয় উল্লিখিত হয় নাই, কেবল একটি প্রস্তর-স্তম্ভ নির্মিত হইবার কথাই খোদিত রহিয়াছে। তাহাতে বুঝিতে পারা যায়,—দানপতি দশবলগর্ভ পুণ্যস্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে সর্বসত্ব-হিতাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হৃদয়ে এই প্রস্তর-স্তম্ভটি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে পুণ্যস্থানে এই পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হইয়াছিল, তথায় পূর্ব হইতেই অট্টালিকাদি বর্তমান না থাকিলে, এরূপ স্তম্ভোৎসর্গ-ব্যাপার সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। সুতরাং খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই পাহাড়পুরে অট্টালিকাদি নির্মিত হইয়া থাকিতে পারে।

রত্নত্রয়ের প্রমোদ-বিধানার্থ এই প্রস্তর-স্তম্ভটি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহা সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাকে একটি ত্রিরত্ন-মন্দিরে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রস্তর-স্তম্ভ বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তরস্তম্ভের আবিষ্কার স্থানের খননকার্য সুসম্পন্ন না হইলে ইহার প্রকৃত তথ্য

প্রকাশিত হইতে পারে না। তথাপি ইহাকে আপাতত কেবল বৌদ্ধধর্মানুরাগ-সূচক সাধারণভাবের স্তম্ভলিপি বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ইহার সাহায্যে সেকালের লোকসমাজের আশা-আশঙ্কার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এবং তাহার সহিত একালের লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য বিচার করিবারও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে ধর্মবিশ্বাস বা লোকব্যবহার এই শ্রেণির দান-কর্মের উৎসাহদান করিত, তাহা সর্বসত্ত্ব-হিতাকাঙ্ক্ষাকেই দানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার উপদেশ দান করিত। ইহাতে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বহির্মুখী নহে,—অন্তর্মুখী ;—তাহার নিকট আত্মসম্ভোগ অপেক্ষা আত্মত্যাগ অধিক আদরণীয়,—আত্মহিতাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা সর্বসত্ত্বহিতাকাঙ্ক্ষা অধিক প্রার্থনীয় ছিল। তাহার মর্মে মর্মে যে মর্মবাণী কলগুঞ্জনে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা পরকে আপন করিতে চাহিত,—আপনকে পর করিয়া তুলিত না,—যেন দিগন্ত-সম্প্রসারিত বাহুযুগলের আকুল আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্ব-সংসারকে টানিয়া আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। তাহার জন্যই ধর্মভেদ, জাতিভেদ, অবস্থাভেদ, অভ্যুদয়-লাভের অন্তরায় না হইয়া, বাঙালিকে দীর্ঘকালস্থায়ী বিপুল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-সাধনের শক্তিদান করিয়াছিল। যে সাম্রাজ্য-কাহিনী আত্মজয়-কাহিনী। তাহার জনশ্রুতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আধুনিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে তাহার যাহা কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে এই এক তথ্যই নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সে বিপুল সাম্রাজ্যের শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্য মানব-চরিত্রকে দানব-চরিত্রে পরিণত করিয়া ধ্বংস-লীলার প্রশ্রয়দান করিত না ;—গঠন-প্রতিভার উন্মেষসাধনে মানব-চরিত্রকে দেব-চরিত্রে সমুন্নত করিয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করিত, মুমূর্ষুকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত, সবলের প্রবল পীড়ন হইতে দুর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য আত্ম-বিসর্জন করিত। যেখানে দুষ্ট-দলনের জন্য মমতাশূন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইত, সেখানেও ব্যবহার গুণে অল্পদিনের মধ্যে পরাজিত শত্রু অন্তরঙ্গ মিত্রপদবী লাভ করিতে পারিত।

যেখানে এই স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা রাজসাহী জেলার বাদলগাছি থানার অন্তর্গত,—উত্তরবঙ্গ রেলপথের জামালগঞ্জ অথবা আক্কেলপুর স্টেশনের তিন মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি এখনও পাল-রাজগণের শাসন-সময়ের বিবিধ কীর্তি-চিহ্নের ধ্বংসাবশেষে খচিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার আট ক্রোশ দূরে ভট্টগুরবের গরুড়-স্তম্ভ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধ রাজবংশের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিবংশ কিরূপ মন্ত্রণাশক্তি-প্রভাবে বাঙালির জীবন-বসন্তে সাম্রাজ্য-বিস্তারের সহায়তা-সাধন করিয়াছিল, ইহাতে তাহার গৌরব-গাথা খোদিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ বিপুল সাম্রাজ্যের শিক্ষা কেন্দ্র জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পুনরায় বাঙালির নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। এই মহাবিহার ব্যতীত বরেন্দ্রমণ্ডলে আরও বহুসংখ্যক বিহার লোকশিক্ষার অধিষ্ঠান বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার অনেকগুলির ধ্বংসাবশেষ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধান-চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইতেছে। পাহাড়পুরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে এইরূপ একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—তাহা এখনও "হলুদ-বিহার" নামে পরিচিত। পাহাড়পুরের আধুনিক নিরক্ষর অধিবাসিবর্গের বিশ্বাস, সত্যপীরের অভিশাপে পাহাড়পুরের উচ্চস্তূপের উন্নত মস্তকটি উড়িয়া গিয়া হলুদ-বিহারে পতিত হইয়াছিল। উভয় স্থানের মধ্যে এক সময়ে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এই জনশ্রুতি তাহারই আভাস প্রদান করে। ইহার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত হইয়া রহিয়াছে। খনন-কার্য সুসম্পন্ন না হইলে, তাহার পূর্ণ পরিচয় উদ্ভাসিত হইতে পারে না। তখন হয়ত পাহাড়পুরের অজ্ঞাত অখ্যাত অপরিচিত ধ্বংসাবশেষ একটি চৈত্য-সংযুক্ত সঙ্ঘারাম বলিয়াই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ; এবং একালের বাঙালির নিকট সেকালের বাঙালির বিজয়-গৌরব বিঘোষিত করিতে পারিবে।

এই বহুবিস্ময়পূর্ণ ধ্বংসাবশেষের খনন-কার্যে পুরাতন বরেন্দ্র-মণ্ডলের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন

উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিলে, আত্মবিস্মৃত বাঙালি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিবে—তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর—সৌন্দর্যগাম্ভীর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ—বাঙালির জীবন-বসন্তের সংশয়হীন সুকুমার স্মৃতি-নিদর্শন।

---

১. Eastern India, Vol II p. 669.

২ J A. S. B. 1875 ; p. 191

৩. On the low ground inside the enclosure the jungle was so high and so dense, that it was quite impenetrable to a man.–Cunningham's Archæological Survey Report, Vol XV p. 118.

৪. The name given to it by the people is *Raja Deva Palka Chhatri*, which is the usual term for a Mausoleum built over the ashes of a person of consequence. I think, therefore, that this must be the place where Raja Deva Pala died, and where his body was burned —Ibid, p 121

৫ গৌড়-লেখমালা ১১-১৭ পৃষ্ঠা।

৬ গৌড়-লেখমালা ৫৬-৬২ পৃষ্ঠা।

৭. The great mound stands in the middle of a large enclosure, about 1500 feet square outside, formed by a massive earthen embankment, about 150 feet broad on the East side, and not more than 100 feet on the other three sides.-Cunningham's A. S R. Vol XV. p 118

৮. The temple was therefore an exceptionally large one, and to judge from the quantity of carved and ornamented bricks, must have been a very fine one –Ibid, p 120

৯. পুবপ্রাচীরের কোণগুলিব নিকট শতবর্ষ পূর্বে বুকানন ইষ্টকালযের চিহ্ন দেখিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ একটি কোণ হইতেই প্রস্তর-স্তম্ভ বাহিব হইযাছে, তাহা ঐ কোণের কোনও ইষ্টকালয়ের অংশ বলিযাই বোধ হয।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা

গত ২৭ নভেম্বর (১৯১৬) তারিখের খবরের কাগজে দেখা গিয়াছে যে বাংলার লাট সাহেব বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির নূতন বাড়ি উন্মুক্ত করিলেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্বন্ধে এইটুকু-মাত্র খবরে সাধারণের কিছুই আসিয়া যায় নাই। একে তো জনসাধারণ এসব বিষয়ে একেবারে উদাসীন তাহাতে খবরের বহর ঐটুকু। সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে এমন একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার দুই এক কথার সংবাদে সাধারণের মনে কি ছাপ রাখিবে? পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হইলে এমন একটি ঘটনায় চারিদিকে কত কৌতূহল ও আন্দোলন জাগিয়া উঠিত। সকল শ্রেণির লোকের মধ্যে কৌতূহল না জাগিতে পারিত, কিন্তু অন্তত শিক্ষিত সমাজ তো আন্দোলিত



কুমার শরৎকুমার রায়, এম-এ
বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি



অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অধ্যক্ষ

হইতেন। সে-সব দেশে খবরের কাগজওয়ালারা প্রতিনিধি পাঠাইয়া এমন স্মরণীয় ঘটনার বিস্তৃত কাহিনী লিখিবার কত না আয়োজন করিতেন! এ বিষয়ে বাংলা দেশ কিন্তু অনেক

পিছাইয়া আছে। তাই সে ঘটনাটিকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে তুলিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দুই চারিটি কথা মার্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু একটি প্রদেশের শিক্ষার ইতিহাসে মানুষের উন্মোচনের কি স্থান তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে অনেক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিতে হইবে। কারণ আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থাপত্রে এরূপ যাদুঘরের কোনই স্থান ছিল না। ম্যাট্রিকুলেশন, এম-এ, বি-এ, পি-এইচ ডি প্রভৃতি পরীক্ষার ফলাফলের লম্বা ফর্দ ধারণ করিয়া কলিকাতা গেজেটের পৃষ্ঠাগুলি যেখানে শিক্ষার উন্নতির পরিমাণের যথেষ্ট নিদর্শন, সেখানে শিক্ষা (জ্ঞানার্জন ও কালচার (ভাবানুশীলন) অন্যান্য দেশের ন্যায়। সুহৃদ প্রতিশব্দ না হইয়া পরস্পর-বিরোধী শব্দ হইয়াই থাকিবে। কথায় আছে মানুষ যত জ্ঞান অর্জন করিতে থাকে ততই তার সৌন্দর্য-বোধ লোপ পায়—"বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ।" আমাদের সংস্কার বা কুসংস্কার আছে যে সাহিত্য-চর্চার মধ্যেই শিক্ষার আবদ্ধ। এই সংস্কারের ফলেই জ্ঞানানুশীলন ও মূল্য-বোধ দুইটি পৃথক জিনিস বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। চোখ দিয়া যে জ্ঞানের সহিত পরিচয় ঘটানো যায় তাহা আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্তারা আমাদিগকে বুঝিবার অবসর দেন না। জ্ঞানের পথে আমাদের অলবম্বন কেবল স্তূপীকৃত পাঠ্যপুস্তকের কল, ব্যাখ্যার বই আর নোট বই। নানা জিনিসের প্রদর্শনীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা আমেরিকার লোকেরা বিশেষভাবে বুঝিয়াছে, এখানে কিন্তু বুঝিবার দিন এখনও আসে নাই। এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কোন প্রদর্শনী বা যাদুঘর শিক্ষার কোন



রমাপ্রসাদ চন্দ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন



রাধাগোবিন্দ বসাক বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক

অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হয় না। জন্তু-প্রদর্শনী ও উদ্ভিদ-প্রদর্শনী সাধারণের কৌতূহল খানিকটা জাগায় মাত্র। এসব জায়গা লোকে তামাসার জায়গা বলিয়া মনে করে, ছুটির দিনে এক-আধ ঘণ্টা এখানে আমোদ করিয়া কাটাইয়া যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষিত সমাজও যাদুঘর বা মিউজিয়মকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া উঠিতে পারেন না। মিউজিয়ম কিন্তু

বাস্তবিকই একটি শিক্ষার অঙ্গ। এখানে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়, জাতির সৌন্দর্য-বোধ ও উদ্যম মূর্তি ধরিয়া দর্শককে উৎসাহিত করিয়া তুলে। কালচারের নানা ক্ষেত্রের মধ্যে মিউজিয়ম অন্যতম ; এখানে সৌন্দর্যের উপভোগ তো হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ এবং আবিষ্কৃত ও সৃষ্ট জিনিস দেখিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডারও পূর্ণ হইতে থাকে। বিদ্যা এবং কালচারের মধ্যে আজকাল তফাৎ থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ও কালচারের মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে একথা স্বীকার করা যায় না। অতএব যে জ্ঞানবহুল ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং কালচার পাশাপাশি থাকিয়া তাহাদের পরিচয় উজ্জ্বলভাবে ঘটাইয়া তুলে সে মিউজিয়মের মূল্য স্কুল কলেজ অপেক্ষা কোনমতেই কম নহে।



বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির গৃহের প্রবেশতোরণ



নৃত্যপর গণেশ

রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় গত নভেম্বর মাসে যে যাদুঘর বা মিউজিয়ম খোলা হইয়াছে তাহা বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। শিক্ষার যে আদর্শ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সকলের স্বপ্নেরও অতীত হইয়া রহিয়াছে সেই আদর্শকে সফল করিবার এই এক সর্বপ্রথম উদ্যম। সাধারণভাবে প্রশংসা করিলেই চলিবে না, এ ঘটনাটি বিশেষ প্রশংসারই যোগ্য, কেননা বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এমন কয়েকটি কর্মপরায়ণ শিক্ষিত লোকের অক্লান্ত চেষ্টা ও নিষ্ঠার গুণে এমন একটি জিনিসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিক্ষার সকল কেন্দ্র হইতে বহুদূরে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; ইহাতে আমাদের শিক্ষাকার্যকে পরের কর্তৃত্বের হাত হইতে মুক্ত করা যায় কি না তাহার অন্তত পরীক্ষা করিবার অবসর ঘটিতে পারে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে যে-সমস্ত মূর্তি সংগৃহীত ও রক্ষিত



মকর-মুখ



গরুড়



চণ্ডী

হইয়াছে তাহা হইতে পুরাবৃত্তের ছাত্ররা প্রাচীন বাংলা এবং গৌড়ের সাহিত্য কলা ধর্ম ও নানা রাজবংশের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানিতে পারিবেন। বরেন্দ্র সমিতির কয়েকটি জিনিসের প্রচার কার্যে চারিদিক হইতে যে তীব্র বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনেকে সমিতির সংগৃহীত মূর্তিগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেমন বিরাগযুক্ত হইয়াছেন, এবং পুরাবৃত্তানুসন্ধিৎসু লোকের মনেও এই ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি একটি প্রাদেশিক সমিতি মাত্র, ইহার কার্যকলাপ বিশেষ আলোচনার বিষয় নহে। নাগরিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঔপনাগরিক কোন-কিছু উন্নতিকর কার্যকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া উড়াইয়া দিবার একটা প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ আমাদের নাগরিক অনুশীলন ও আলোচনা অনেক সময়ে বাস্তবিকই ঔপনাগরিক। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘর কোন মতেই একটি প্রাদেশিক অনুষ্ঠান মাত্র নহে। ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরের ইহা অনুসরণ করিবার জিনিস। বোলপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় নানাদিক হইতে যেরূপ দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, এই অনুষ্ঠানটিও সেইরূপ দৃষ্টি ও শ্রদ্ধার যোগ্য। এই অনুষ্ঠানের যারা প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোগী তাহাদের সাধুকার্যে আমরা সহায়তা না করিলেও তারা আজ আমাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছেন তাদের প্রচুর পরিশ্রমের ফল তাহাদেরই সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করিতে এবং তাদের সংগৃহীত ও আমাদের সকলকার উত্তরাধিকার-লব্ধ মূর্তিসকল প্রাচীন গৌড়ের যে সৌন্দর্যের পরিচয় দিতেছে সেই সৌন্দর্যকে একই সঙ্গে উপভোগ ও আদর করিতে।



বুদ্ধদেব



সরস্বতী

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি খোলা হয়। প্রথমে রাজসাহীর সাধারণ পাঠাগারে ইহার কাজ চলিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার সংগৃহীত জিনিস এতই বাড়িতে থাকে



সূর্য



বিষ্ণু



যম

যে ইহার একটি আলাদা বাড়ির দরকার হইয়া উঠে। সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক দিঘাপতিয়া রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় মহাশয় সমিতিকে একটু জমি দান করেন। তাহারই উপর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ সালে ১৩ নভেম্বর তারিখে সমিতির বর্তমান ভবনের গোড়াপত্তন করেন। ইহার প্রধান গৃহটি গৌড়ের প্রাচীন স্থপতিকলার অনুকরণে তৈরি। ইহা দেখিতে বেশ জমকালো, দুইপাশে খানিকটা করিয়া খোলা জায়গা রাখা হইয়াছে। একটি ফটকের পরেই একটি বড় দালান—আয়তনে ১৮ বর্গফুট। তাহার পরই দুই পাশে দুইটি বসিবার ঘর, প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে ১১০ ফুট, তার পরেই বারান্দা—২২২ ফুট লম্বা। ইহার মধ্যে একটি পুস্তকাগার, একটি পড়িবার ঘর, একটি পরামর্শ-ঘর ও একটি অভ্যাগতদের থাকিবার ঘর আছে। তাহারই পাশে অন্যান্য দরকারি ঘর, চাকরদের ঘর, কর্মচারিদের ঘর ও রান্নাঘর। বাড়িটি তৈয়ারি করিতে সবসুদ্ধ খরচ পড়িয়াছে ৬৩০০০ টাকা। সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, সভাপতি, ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়।



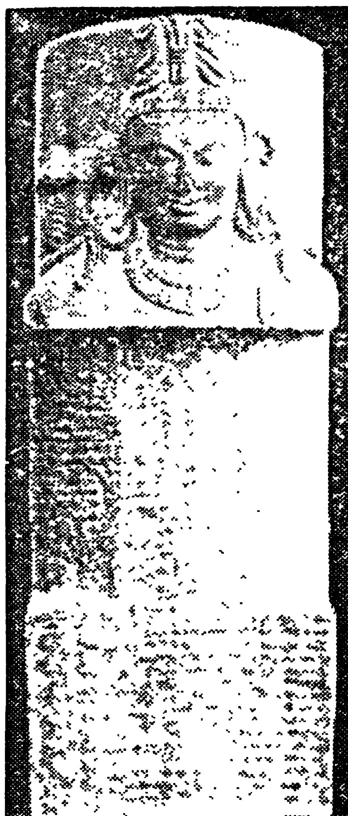
মরীচি



চণ্ডী

এবার সমিতির রক্ষিত মূর্তির কথা। প্রাচীন র আদর্শস্বরূপ যেসব স্মৃতি-চিহ্ন

সংগৃহীত হইয়াছে তাহা প্রস্তর-ভাস্কর্য, তাম্রমূর্তি, শিলাখণ্ড, স্থপতি-কলার নানা নিদর্শন, বহুমূল্য অতি প্রাচীন তাম্রফলক (যাহার মধ্যে একটি এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্যত্র আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে প্রাচীনতম) এবং নানাবিধ মুদ্রা। পুস্তকাগারে ৮৫২ খানি বই আছে, ইহাদের সংগ্রহকার্য জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। এ সমস্ত পুস্তক কলিকাতার বাহিরে ইতিবৃত্তের ছাত্রগণকে প্রচুর সাহায্য করিতে পারে। ১৩৪৮ খানি সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এখানে রক্ষিত হইয়াছে, এগুলি সমিতির রত্নরাশি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।



শিবলিঙ্গ



চণ্ডী

পুরাতত্ত্ব বা বঙ্গীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসের যারা আলোচনা করেন তাদের কাছে এই সমস্ত প্রস্তরমূর্তি বিশেষ অনুশীলনের জিনিস। সেন এবং পাল বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে ভারতীয় কলার ভাস্কর্যশাখা কিরূপে নানা দিকে উন্নত হইয়াছিল তাহা এগুলি হইতে বেশ বোঝা যায়। এই ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনামূলক অনুশীলন করিবার জন্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম কতকগুলি গান্ধার ভাস্কর্যের নিদর্শন সমিতিকে দান করিয়াছেন। গুপ্তযুগের বুদ্ধ ও দ্বারপালের যে দুইটি মূর্তি গৌড়ে পাওয়া গিয়াছে সে দুটি অন্যান্য বড় বড় যুগের ভাস্কর্যের



উমা-মহেশ্বর



সূর্য

নিদর্শন স্বরূপ বোধিসত্ত্ব, তারা, মরীচি, হারিতি প্রভৃতির মূর্তিগুলি মহাযান দেবসমাজের সুন্দর ছবি। এই মূর্তিগুলি আবার নেপালি কলার সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। ইহারা গৌড় বা মগধের ভাস্কর্যের সহিত নেপালি ভাস্কর্যের সাদৃশ্যের পরিচয় দিতেছে। যাহা কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে প্রাচীন বঙ্গীয় ও গৌড়ীয় কলাই নেপালে গিয়া অধিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গ এবং জাভায় কলার উন্নতি কিরূপে হইয়াছিল তাহা দেখাইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র ও অপরাপর পণ্ডিতগণ যেরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন সেরূপ পরিশ্রম নেপালি কলার সহিত গৌড়ীয় কলার সম্বন্ধ দেখাইতে ব্যয়িত হয় নাই। কলার প্রাদেশিক সম্পর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে দেখিলেও এই সংগ্রহকার্য অন্যদিকে অনুসন্ধান করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে, বিশেষত প্রতিমা-নির্মাণ-বিদ্যায়। সূর্য বিষ্ণুর যে-সব মূর্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিমা-নির্মাণ-বিদ্যা কিরূপ উন্নত হইয়াছিল তাহা বোঝা যায় ; বাংলার ভাস্কর্যের দুইটি অগ্রণী ধীমান

ও বীতপালের খোদিত কোন মূর্তি সমিতি পান নাই। সমিতি কিন্তু ইহাদের নিজের হাতে খোদিত মূর্তি লাভ করিবার আশা ছাড়েন নাই।



অর্ধনারীশ্বর



চণ্ডী

গৌড়ীয় ভাস্কর্যের প্রকৃতি নিরূপণ করিবার দিন বোধহয় এখনও আসে নাই। কিন্তু যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। গৌড়ীয় কলা যে সম্পূর্ণরূপেই দেশজ জিনিস তাহা স্থূলতঃ একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকের মতে প্রাচীন বাংলা হইতে জাগিয়া ইহা পার্শ্ববর্তী দেশের, যেমন উড়িষ্যা, জাভা প্রভৃতি স্থানের কলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উড়িষ্যার ভাস্কর্যের যে-সব নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতে মনে হয় না যে উহা গৌড়ীয় প্রভাবে গঠিত, কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। উড়িষ্যার কলার মধ্যে এমন সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে যাহা হইতে ধারণা হয় না যে ইহা বঙ্গীয় কলা হইতে উৎপন্ন বা তাহা সহজাত।

গৌড়ের সহিত ইহার কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কি না তাহা নানা উপকরণ ও প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে হইবে। উড়িষ্যার কলার গতিবিধি ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল ধারারই অনুরূপ, এবং মনে হয় ইহা মধ্য ভারতের ও মথুরার কলা-পদ্ধতির ফল। এদিকে গৌড়ীয় কলাবিদ্যা মগধীয় কলাবিদ্যার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহার মধ্যে যে অনেক অভিনব ও দেশজ উন্নতির লক্ষণ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তির ক্রমাগত একছাঁচের পুনরাবৃত্তির নিদর্শন দেখিয়া যারা গৌড়ীয় কলাকে তত মূল্যবান মনে করেন না তাহারা কিন্তু সমিতির সংগৃহীত মূর্তিগুলি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কতকগুলি নূতন ধরনের এমন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাংলার বাহিরে যার সমতুল্য মূর্তি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সমিতি সম্প্রতি মূর্তিগুলির শ্রেণিবিভাগ করিয়া যে তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং আমরা প্রবন্ধের সহিত যে ছবিগুলি দিলাম তাহা হইতে নূতন অনুশীলনের অনেক উপাদান পাওয়া যাইবে। মূর্তিগুলি শ্রেণি বিভাগ ঃ—

১. বৌদ্ধমূর্তি। (ক) বুদ্ধ, (খ) বোধিসত্ত্ব, (গ) তারা, (ঘ) মরীচি, (ঙ) হারিতি, (চ) বুদ্ধের মাতা, (ছ) ভোগীশ্বরী।

২. জৈন মূর্তি।

৩. শৈব মূর্তি। (ক) শিবলিঙ্গ, (খ) সদাশিব, (গ) অর্ধনারীশ্বর, (ঘ) উমা-মহেশ্বর, (ঙ) নটেশ্বর, (চ) শিব-ভৈরব, (ছ) কার্তিকেয়।

৪. শাক্ত মূর্তি। (ক) চণ্ডী, (খ) মহিষমর্দ্দিনী, (গ) দুর্গা, (ঘ) চামুণ্ডা, (ঙ) মাতৃকা।

৫. বৈষ্ণব মূর্তি। (ক) বিষ্ণু, (খ) অবতার, (গ) গরুড়, (ঘ) বলরাম।

৬. সৌর মূর্তি। (ক) সূর্যদেব, (খ) নবগ্রহ, (গ) রেবন্ত।

৭. গাণপত্য মূর্তি। (ক) উপবিষ্ট গণেশ, (খ) নৃত্যপর গণেশ।

৮. বিবিধ মূর্তি। ব্রহ্মা, যম, গঙ্গা, মনসা, সরস্বতী ইত্যাদি।



নবগ্রহ

যে-সব স্মৃতি-চিহ্ন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ও মুসলমান বাস্তু-বিদ্যার দৃষ্টান্তরূপে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি দেখিলে সহজেই জানা যায় যে এমন অনেক মন্দির ঘর-বাড়ি বা মসজিদ ছিল, যাহা বাস্তবিকই মনোহর ও অভিনব। এই দিক হইতে বিচার করিলে মাহিসন্তোষের ভগ্নাবশেষগুলি যথেষ্ট মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। এগুলি হইতে দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ লইয়া মাহিসন্তোষে একটি বড় মসজিদ তৈরি হইয়াছিল। এমন কি তার অনেক ভগ্ন অংশের একদিকে হিন্দু ঠাকুর-দেবতার মূর্তি কোঁদা দেখা যায় আর একদিকে দেখা যায় মুসলমান মীরাবের কারুকার্য। যে-সব ধাতু-মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সংখ্যায় প্রস্তরমূর্তির সমান না হইলেও তার দু'তিনটি খুব সুন্দর। সংগৃহীত তাম্রপাত্র হইতে বাংলার

রাজবংশের ইতিহাস বেশ জানা যায়। এদের মধ্যে একটি খুবই প্রাচীন, তত প্রাচীন ভারতবর্ষে এই বোধ হয় প্রথম পাওয়া গিয়াছে।

বাংলার কীর্তিকলাপের এই-সমস্ত অভিনব নিদর্শনে বাংলার অতীত ইতিহাসের অনেক গুপ্ত দিক আলোকিত হইয়া উঠিতে পারে। নানা রাজনৈতিক বিপত্তির মধ্য দিয়া বাংলার জীবন অতিবাহিত হইলেও তার কর্মপটুতা যে যথেষ্ট ছিল—বিশেষত সাহিত্যে ও কলায় তার যে যথেষ্ট সুদিন গিয়াছে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ত এই সকল মূর্তি।



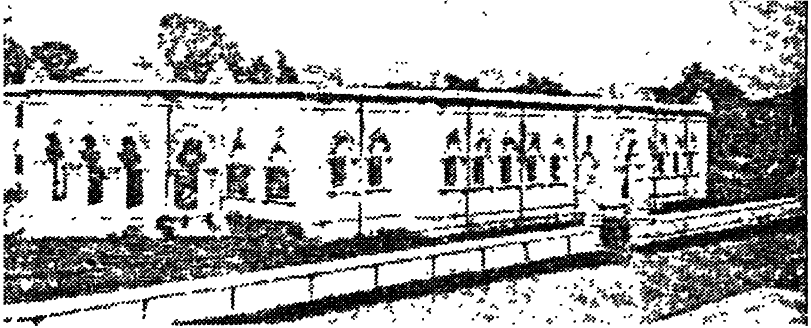
বিষ্ণু



বিষ্ণু

যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় আজ এমন এক একটি প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আলোচনার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল সে সমিতির উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের কথা বলিতে আমাদের আনন্দ ও গৌরব হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের হাওয়ার কি এক গুণ যে এখানে মিউজিয়ম বা পাঠাগার বেশি দিন বাঁচিয়া কাজ করিতে পারে না। খোলা হইবার পর এসব অনুষ্ঠান জীবনের চাঞ্চল্যে কিছুদিন নড়াচড়া করিয়া ধীরে ধীরে নীরব নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। বরেন্দ্র সমিতি কিন্তু তাদের অনুষ্ঠানকে একটি জীবন্ত অধ্যয়নের কেন্দ্র করিয়া রাখিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাহা 'গৌড় রাজমালা' (গৌড়ের রাজাদের ইতিহাস) ও 'গৌড়-লেখমালা' (গৌড়ের শিলালিপিব কাহিনী) নামে দুইটি উপাদেয় বই ছাপাইয়াছেন,—বই দুইটি সাধারণের কাছে পরিচিত। সমিতির ইচ্ছা আছে তারা 'গৌড়শিল্পমালা' নাম দিয়া গৌড়ের শিল্পের একটি কাহিনী প্রকাশ করেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

ও সভাপতি ১৯১৭ সালে সমিতিকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন তার মৃত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য সবিতা স্মৃতি-পুস্তক পর্যায়ক্রমে বাহির করিতে। এই পর্যায়ের প্রথম প্রকাশিত 'ভাষাবৃত্তি'। বইখানি লক্ষ্মণসেনের আদেশে লিখিত পাণিনির টীকাপুস্তক। আরো দুইখানি প্রকাশিত হইতেছে— 'ধাতুপ্রদীপ' ও 'অলঙ্কার-কৌস্তভ'। সমিতির দ্বারা প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের লিখিত 'হিন্দু-আর্য জাতি' বইখানি সকল জাতির আদরের জিনিস। এই পুস্তকে চন্দ মহাশয় ভারতীয় আদিম জাতিগণের স্তরবিভাগ ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে যে প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন নেপ্‌লস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব-শরীর-বিজ্ঞানবিৎ প্রফেসর ভি গুফ্রিদা-রুগেরি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। সমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্দেশক্রমে প্রতিমা-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র সরকারি পোস্টগ্রাজুয়েট রিসার্চ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন ঐ কার্যে সমিতিতে নিযুক্ত আছেন। বাংলার অতীত ইতিহাসে জ্ঞানলাভ করিলে বাংলার যুবকদের শিক্ষা ভবিষ্যতে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমিতির বর্তমান বাড়ি খুলিবার সময় লাটসাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে দুইটি কারণে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির কাজ অমূল্য ; প্রথম—নানা প্রয়োজনীয় গুপ্ত তথ্যকে প্রকাশিত করার জন্য, দ্বিতীয়—অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন ও দেশের অন্যান্য অংশের শিক্ষিত লোকের কৌতূহল ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য। সমিতির আবিষ্কার-সকল বাংলার ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে কিরূপ নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা সাধারণে সহজেই বুঝিতে পারেন। এইরূপ অনুসন্ধানের কাজ শিক্ষাকে জীবন্ত করিয়া তুলে এবং শিক্ষিত লোকের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া দেয়।



বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৃহ

আমাদের বিশ্বাস বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে জ্ঞানমুখী ও ভাবানুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে। আমাদেরই জাতির অতীত কর্মশীলতার নিদর্শনগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া সমিতি আমাদের বর্তমানকে আমাদের গৌরবময় অতীতের সহিত গাঁথিয়া ফেলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ঐরূপ অধ্যবসায় ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কাটাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। কিন্তু শিক্ষার উন্নতির দিক ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র সৌন্দর্য-প্রিয় লোকের কাছে এ যাদুঘর কম আনন্দের জিনিস হইয়া উঠে নাই। কারণ, প্রাচীন গৌড় ও তার কার্যাবলী মৃত ও অতীত হইলেও আজ তারা বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির কল্যাণে আমাদের সম্মুখে বিচিত্র পাষাণ-চিত্রবলীর সৌন্দর্যের মধ্যেই জীবন্ত ও জাগ্রত রহিয়াছে।*

১. শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ও মডার্নরিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য

তারাদেবী

রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ নাটোর নগরীতে পুণ্যহৃদয়া মহারাণী ভবানীর গর্ভে অনুমান ১৭৪০ খ্রিঃ অব্দে তারাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৎকালে দাক্ষিণাত্যবাসী বর্গীনামধারী মহারাষ্ট্র জাতি বঙ্গদেশে প্রজার উপর চৌথ আদায়ের ধুমধাম করে, যখন ন্যায়বান মুসলমান তিলক সুপ্রসিদ্ধ আলিবর্দি খাঁ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা শাসন করিতেন, সেই সময়ে তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান সাহায্যকারী বা সামন্ত ছিল, রাণী ভবানী তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। নাটোরের জমিদারি হইতেই আধুনিক বঙ্গের সমস্ত প্রধান জমিদারদিগের মূল ভিত্তি প্রোথিত হয়। রাণীর পঞ্চদশ এবং রাজা রামকান্তের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তারাদেবী নাটোর বংশে একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য লোকে তারাদেবীকে "কুড়ন মেয়ে" কহে। তারাদেবীর ন্যায় পরমা রূপসী রমণী তৎকালে বঙ্গে দ্বিতীয় ছিল না। তাহার অতুল্য রূপের জ্যোতিতে সমস্ত বঙ্গভূমি আলোকিত হইয়াছিল। এমন কি তাহার অনুপম রূপমাধুরীর ব্যাখ্যা শুনিয়া দিল্লির তদানীন্তন সম্রাট একটি গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। (যে গ্রাম এখন "তাহিরপুর" নামে অভিহিত তাহা তারাদেবীর যৌতুকের স্থান। বর্তমান সময়ে তাহিরপুর একটি জমিদারির মধ্যে গণ্য হইয়াছে।) তারাদেবীর রূপ সম্বন্ধে অনেকানেক জন প্রবাদ আছে। রাজসাহী জেলার কোন কোন স্থানে আমি ভ্রমণ করিবার সময় শুনিয়াছি এখনও কেহ কোন বালিকার রূপের ব্যাখ্যা করিতে হইলে কহিয়া থাকে "আহা মেয়েটি যেন দেখতে তারাদেবী"। যে সময় তারাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন রাজা রামকান্ত তাহার বিলাসিতার জন্য দয়ারাম কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া হীনভাবে মুরশিদাবাদে অবস্থিতি করিতেন, এবং রাণী অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য রাণী ভবানী কহিতেন যে "এই কন্যা হইতে কখনই আমার সুখ হইবে না, অনেক যাতনা সহ্য করিতে হইবে"। বাস্তবিকও মহারাণী ভবানী তারাদেবীর জন্মের পর হইতে একদিনের জন্যও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমে দয়ারাম কর্তৃক রাজ্য বিচ্যুতি, দ্বিতীয় তারাদেবীর রূপ লাবণ্য দর্শনে... সিরাজদৌল্লার অত্যাচার, তৃতীয় সেই অত্যাচার সূত্রে পাপিষ্ঠের সিংহাসন বিচ্যুতির চিন্তা, তাহার পর তারাদেবী স্থাপিত বিগ্রহ আরাধনায় পুত্র রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য—ইত্যাদি প্রকার নানা চিন্তায় রাণী সর্বদা চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এইরূপ সত্ত্বেও তারাদেবীর জন্মের অন্যূন ৩/৪ মাস পরে রাজা রামকান্ত আবার জমিদারি ফিরিয়া পাওয়াতে কন্যার সম্মান বাড়িতে থাকে। তারাদেবীর ছয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়। রাণীর হাতেই সমস্ত জমিদারির কার্য আসিয়া পড়ে। তারার আট বৎসর বয়সের সময় রাণী তাহার বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ করেন, কেন না এই সময় "গৌরীদানের ফল"। অনেক অনুসন্ধানের পর বর্তমান নাটোরের উত্তরাংশে বাসুদেবপুরের নিকটবর্তী "খাজুরা" গ্রামে বিশ্বনাথ লাহিড়ির পুত্র রামচন্দ্র লাহিড়ির সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়।

বঙ্গে তিন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। গঙ্গা ও তীরবর্তী ভূমিই পূর্বে রাঢ়ীয়দিগের বাসভূমি ছিল। মহানন্দা ও করতোয়া নদীর নিকটবর্তী ভূমিকে "বাগড়ি" বা বারেন্দ্র কহে, রাজসাহী জেলা এই প্রদেশের অন্তর্গত, এই স্থানের ব্রাহ্মণেরাই বারেন্দ্র নামে অভিহিত—এই দুই সম্প্রদায় কান্যকুব্জের পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্ততি, বৈদিকেরা এই দেশের আদিম অধিবাসী। রাণী ভবানী রাজসাহীর ব্রাহ্মণকুল মধ্যে লাহিড়ি বংশে কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন, কেন না রাঢ়ীদিগের ন্যায় ইহাদিগের কৌলীন্য প্রথা যদিও তত আঁটা আঁটি নহে, তথাপি বারেন্দ্রদিগের সম্মানিত কুলীন মৈত্র মহাশয়েরা রাণী "কাপ" অর্থাৎ বংশজ বলিয়া কৌলীন্যাভিমানে রাজকন্যা বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন, এই জন্য লাহিড়ি বংশে তারাদেবীর বিবাহ হয়।

বিবাহ মানবজীবনের এক মহোৎসব ; নাটোর রাজকন্যার মহাসমারোহে বিবাহ উদ্যোগ হইতে লাগিল। একমাস পর্যন্ত বিবাহের ফর্দ হইল! প্রাজ্ঞচেতা দয়ারাম তখন রাণীর অভিভাবক ছিলেন। ফর্দ লিখিত হইলে রাণী তাহাকে কহিলেন "পুঁঠিয়ার রাজ দেওয়ানকে ডাকিয়া ফর্দ দেখান আবশ্যক ; কেন না বিবাহের ফর্দ কোন প্রাচীন প্রাজ্ঞ লোককে দেখান চির প্রচলিত প্রথা"। এই কথায় দয়ারাম একটুকু অপমান বোধ করিয়া অগত্যা পুঁঠিয়ার দেওয়ানকে ফর্দ দেখাইলেন। তৎকালে পুঁঠিয়া নগরীতে বর্তমান পাবনা জেলার অন্তঃপাতী "তাড়াসের" জমিদার বংশের আদি পুরুষ দেওয়ানি কার্য করিতেন। এই বংশে বাবু বেনোয়ারীলাল রায় চৌধুরী অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ছয় মাস পর্যন্ত বিবাহের ফর্দ দেখিয়া প্রাচীন দেওয়ান মহাশয় রাণীকে কহিলেন—"মা আর সমস্ত ঠিক ধরা হইয়াছে, কেবল বোধ হয় আর কিছু "আবির" এবং বাবুয়ের বাসা দরকার হইবে"। তখন রাণী ভবানী দয়ারামকে কহিয়াছিলেন "শুনুন, দেওয়ান মহাশয় কি কহিতেছেন।" অভিমানী দয়ারাম তখন কোন উত্তর না দিয়া কিছু পরে কহিলেন "আমি যাহা ফর্দ করিয়াছি তাহাই ঠিক। একজনকে দেখাইলে একটি কথা কহিতে হয় তাই উনি ঐ কথা বলিলেন। আপনার চিন্তা নাই কিছুরই অপ্রতুল হইবে না।" কিন্তু বিবাহের সময় সত্যই আবির এবং বাবুয়ের বাসা কম পড়িয়া গেল। তৎকালে বিবাহকালীন সভা সমাবেশ সময় প্রথমে আবির ছড়াইয়া তাহার উপর বসিবার আসন স্থাপিত হইত,—একবার যে আবির ছড়ান হইত তাহা আর পুনর্গৃহীত হইত না। আর তখন বিবাহ সমারোহের শান্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্য সামন্ত পাহারায় নিযুক্ত থাকিত—যে তাহাদের অশ্বগাত্র পরিষ্কার করিবার জন্য বাবুয়ের বাসার আবশ্যক হইত—তখন খররা বা বুরুস ছিল না। এই বিবাহে অনুমান ৫০ লক্ষ মন আবিরে পদ্মার জল রঞ্জিত হইয়াও আবিরের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। আর অন্যূন দুই হাজার সৈন্য সহ স্বয়ং মুর্শিদাবাদের নবাব দিল্লির সম্রাট কর্তৃক শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকায় বাবুয়ের বাসারও অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব সৈনিকেরা একবার একটি বাসা ঘোড়ার গায় দিয়া ফেলিয়া দিবার পর আর সে বাসা দ্বিতীয়বার লইত না। একজন সামান্য মুসলমান কর্মচারি এই সময়ে বাবুয়ের বাসা সংগ্রহ করিয়া রাণীর লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি পাবনা জেলার 'উল্লাপাড়ার" তালুকদারদিগের আদি পুরুষ ; ইহারা চৌধুরী নামে বিখ্যাত। এইরূপে দয়ারাম অপ্রতিভ ভাবেও মহাসমারোহের সহিত কার্য সম্পূর্ণ করেন। শুনা যায় এরূপ সমারোহের কার্য বঙ্গভূমে আর কখন হয় নাই। হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ।

এ সম্বন্ধে আর একটি গল্প এইরূপ শোনা যায়—বিবাহের পরদিন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে এমন সময় রাণী কহিলেন আপনাদের আর যাহা আহারে রুচি হয় বলুন। তখন কোন একজন পেটুক ব্রাহ্মণ কহিলেন "মা আমার আর কিছু আহারে ইচ্ছা নাই, কেবল ইচ্ছা হচ্ছে যে "চাক চুষিয়া কিঞ্চিৎ মধু পান করি"। এই কথায় রাণী ভবানী অপ্রতিভ হওয়ায়

তৎক্ষণাৎ তাহার একজন কর্মচারী কহিলেন "মা চিন্তা কি, অনুমতি করুন আমি এই দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে এক একখানি চাক-সহ মধু দিতেছি। রাজবাটিতে স্থান হইল না জানিয়া চাক বোঝাই তিন শত নৌকা আমি পদ্মার মধ্যে রাখিয়াছি।" অমনি রাণীর মুখ প্রসন্ন হইল। ডাক বসাইয়া পদ্মা হইতে মধু চক্র আনীত হইল, ব্রাহ্মণগণ পরিতোষপূর্বক ভোজন করিলেন, আর সেই দিন হইতে সেই কর্মচারির অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। কালে এই ব্যক্তি নাটোর বাটির দেওয়ানি করিয়া জমিদারি করিয়া গিয়াছেন। ইনি যশোহরের নড়ালের জমিদারদিগের আদি পুরুষ, নাম "কালিশঙ্কর রায়"। ইনি তদানীন্তন নাটোরের অধীন "চাকলা ভূষণার" নায়েব ছিলেন। সুন্দরবন হইতে প্রভূত মধুচক্র সংগ্রহ করিয়া তারাদেবীর বিবাহে আপনার সৌভাগ্য করিয়া লইলেন।

তারাদেবীর বিবাহ কার্য শেষ হইয়া গেল। কিছুকাল অতীত হইলে বঙ্গের নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হইল। তাহার ভাবি উত্তরাধিকারী দুর্দান্ত সিরাজ কতকগুলি অসচ্চরিত্র নির্বোধ অনুচরবর্গের বেষ্টিত হইয়া বঙ্গের রমণী কুলের শত্রু হইয়া উঠিল। তারাদেবীর রূপের কথা ইতিপূর্বেই সিরাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এতদিন আলিবর্দির শাসনে যে মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই এখন স্বয়ং নবাব হইয়া তারাদেবীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় তারাদেবী বিধবা। মাতা কন্যা সর্বদা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনে রত। তাহারা নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিবেন না জানিয়া নৌকাযোগে গোপনে যশোহরের মধুমতী তীরে মহাম্মদপুর নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এই—নবাবের অত্যাচার হইতে তারাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় বঙ্গের প্রধান প্রধান গণ্যমান্য লোক সমূহ মন্ত্রণা করিয়া একমাস পর্যন্ত তারার শরীরে মৎস্যের তৈল মাখাইয়া শেষে নবাবের নিকট তাহাকে উপস্থিত করেন, নবাব ঘৃণায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দান করেন। যাহা হউক তারাদেবী নবাবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ মামুদপুরে কাটাইতেই সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তারাদেবীর ভ্রাতা রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র "রাজা রামকৃষ্ণ" এক সন্ন্যাসীর নিকট "বৈরাগ্য ধর্ম" শিক্ষা করিয়া জমিদারি কার্য অবহেলাপূর্বক বঙ্গের তৎকালিক প্রধান প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (ইহার জীবন বৈরাগ্যের কাহিনীতে পূর্ণ)। ভ্রাতার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তারাদেবী নিতান্ত মর্মাহত হইলেন, বিষয়ে অনুরাগ সত্ত্বেও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জননী ভবানীর সঙ্গে হিন্দুর মহাতীর্থ কাশীধামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যতদিন তারাদেবী মামুদপুরে ছিলেন—তিনি নিজেই জমিদারির তত্ত্বাবধান করিতেন—তিনি দেওয়ান দয়ারাম প্রদত্ত, নিষ্কর জমিগুলি জমিদারিভুক্ত করিয়া লন, দেবতার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া একজন নায়েব নিযুক্ত করেন। এখনো তারাদেবীর সেই প্রথানুযায়ী মামুদপুরে দেবতার বৃত্তি আদায় হইয়া পূজা হয়। এখনো এই নগরীতে তারাদেবীর স্থাপিত কতকগুলি দেবালয় আছে। এখনো তাহার স্বামীর নামানুসারে "রামচন্দ্র বিগ্রহ" নিয়মমত পূজিত হইয়া থাকেন। তারাদেবী হিন্দু রমণীর আদর্শ স্বরূপ। তাহার ন্যায় অল্প বয়স্কা ধর্মশীলা রমনী সংসারে বিরল। তারাদেবী মামুদপুরে যে গৃহে বাস করিতেন অদ্যাপিও সেই গৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভারতী ও বালক, ১২৯৩ শ্রাবণ

Kishori Chand Mitra

THE RAJAS OF RAJSHAHI

RA'JSHA'HI is bounded on the North by Dinajpur, on the East by Pabna, on the West by Maldah and on the South by the Padma. It lies between latitude 24° 6'–24° 58', longitude 88° 18'–89° 20', is 62 miles in length from East to West, and 50 in breadth.

It was ceded to the East India Company by an imperial grant of the Diwani, dated Delhi, 1765.

Rajshahi is one of the most important districts of Bengal. At once populous and productive, it has been and still is the seat of the nobility of Bengal. Situated on the Great Ganges and separated by that river from Murshidabad, the former Muhammadan capital of the province, it commands of strong position. It is the head-quarters of the Commissioner of the Murshidabad Division, and may be regarded as the chief district of Eastern Bengal.

There is a conclave of Rajas and untitled noblemen in Rajshahi. Most of the families represented by them have decayed, but they at one time were large Zamindars and performed important functions.

The Thakurs, or as they are commonly called, the Rajas of Patiya constitute the oldest territorial aristocracy of Rajshahi. They reside in Patiya which is now a police substation and situated half way between Nator the former, and Boaliya the present, sadr station of the district. Their principal estate is Lashkarpur, a Pargana extending over a large tract of country and situated on both sides of the Padma. They are said to have acquired it from Shaikh Lashkar, an officer attached to the court of Murshidabad.

The origin of the Patya family is as follows :

There lived, according to tradition, in his asram at Patiya a Rishi named Batsaracharjya, who spent his days in devotion. During his time Lashkar Khan, who had got a grant of Jagir called pargana Lashkarpur from the Emperor of Dehli, having died, his estate lapsed to the Government. At this period, Bengal was governed by eighteen Subahdars,

who collected the rent and transmitted the same to the Emperor. After some time the Subahdars conspired against the Emperor, and determined to withhold the rents. For the purpose of checking their insubordination, the Emperor sent a General with a suitable force. On his arrival, he had a secret interview with the Saint Batsaracharjya, who entertained him and his officers, and questioned them as to their mission. After being acquainted with it he wished them success, and pointed out the means of attaining it. The General fought with the Subahdars and brought them to their senses. Having accomplished his mission, he saw Batsaracharjya and received his congratulations on his success. In recognition of the good services and wishes of the Saint, the General obtained the permission from the Emperor to grant him Lashkarpur, which had escheated on the demise of the former proprietor. Batsaracharjya leading a religious life, did not appreciate the pecuniary advantages of the grant or take any pains to develope its resources. His son Pitambar was a clever man, who ingratiated himself with the Emperor and took possession of his paternal estate Lashkarpur. On the death of Pitambar his younger brother Nilambar succeeded him in his estate, and by his exertions enhanced the value of the estate. His youngest son Ananda during the life-time of his father, had received the title of Raja from the Emperor. His son Ratikanta in consequence of certain unpopular acts, did not inherit the title of Raja, but was known among the people as "Thakur", a title which still distinguishes the family, For the support of necessitous people, his son Ramchandra established the idol Radhagovind. He died leaving three sons, viz., Naranarain, Darpanarain, and Jaynarain Thakur During the time of Naranarain, Kamdeva, the father of Raghunandana–the founder of the Nator family—was employed as a Tahsildar of Baraihati.

It was when Darpanarain became the head of the family that Raghunandana, the founder of the Nator Raj, experienced a change of fortune, being promoted from a humble gatherer of flowers to the office of Vikil of the Patiya family in the Court of Murshidabad. Of his career full details will be given in the proper place.

During the regime of Lord Cornwallis, Anandanarain was the head of the Patiya family. With him the Permanent Settlement of Lashkarpur was made the estate was assessed at Rs. 1,89.592-4-0. One of the successors of Anandanarian, Rajendranarain, received from the Government of the title of Raja Bahadur. Jagannarain, another successor of the family in the Bengali era 1214, made the following additions of the Patiya estate by purchase, *viz.*, Pargana Pukharia in Zila Maimansinh, Parganas Kaligram Kalisapha, and Kazihata in Zila Rajshahi, Bhabanandadiar in Zila Nadiya and several small zamindaris. Having thus enhanced his profits, he devoted a portion thereof to the establishment of the religious endowment

at Benares ; he also built a ghat and a guest-house in that city. He erected another guest-house on the banks of the river Phalgu in Behar. In the year 1216, B.S., his hereditary title of Raja was confirmed. He died in Paush in 1223, B.S. His widowed wife erected at Patiya a temple dedicated to Siva, and celebrated the occasion by large grants of Lakhiraj lands to learned Brahmans. He used to distribute in the cold weather clothes to the poor, and during the rainy season to feed both men and cattle, an example which is followed by the amiable, excellent and benevolent young Rani Saratsundari, widow of the late Jogendranarain Rai ; the latter was educated at the Wards' Institution and gave ample promise of pursuing an exemplary career, but died a premature death. We give below the pedigree of the Patiya family.

Batsaracharjya
Pitambar
Nilambar
Ratikanta
Ramchandra
Naranarain
Darpanarain
Jaynarain
Premnarain
Chandranarain
Pratapnarain
Anupnarain
Kisorinarain
Brajendranarain
Bhupendranarain
Mahesnarain
Girisnarain
Iswarnarain
Ishannarain
Ramnarain
Mathurendranarain
Rani Bhubanmayi Devi,
widow of Jaja Jagannarain
Harendranarain
Bhairabendranarain
Brajendranarain Rai
Raja Paresnarain Rai
Ramesnarain
Narendranarain
Modanarain
Rupendranarain
Prannarain Thakur
Kesabnarain
Gokulendranarain Rai
Bhubannendranarain
Rudranarain
Lakchminarain
Raja Rajendranarain
Anandanarain
Jagannarain
Krishnendranarain
Gloakendranarain
Nimnarain
Ramnarain
Taraknarain
Kedarnarain
Jadabnarain Rai
Srinarain Rai
Jogendranarain Rai
Debendranarain Rai
Bhubendranarain Rai
Gopalendranarain Rai
Baikunthanarain Rai
Angesnarain Rai
Kasinarain Rai
Kumar Jyotindranarain Rai

There lived in Mauza Nator, in Pargana Lashkarpur, a Brahman, named Kamdeva. He had three sons, namely, Ramjibana, Raghunandana

and Vishnuram. Raghunandana was employed in the Patiya family. He at first served in an humble capacity, but he subsequently rose to power and affluence, partly through the influence of that family, and partly through his own intelligence, cunning and unscrupulousness. It was originally his business, as we have already stated to gather flowers for the performance of the Puja of the family idols. Tradition says that on one occasion while he was employed in his vocation, he was fatigued and fell asleep in a garden, and a snake was observed to spread its hood over his head to protect him from the scorching sun. This circumstance being reported to Darpanarain Rai, the head of the Patiya family, he was surprised at it, and predicted from it the future greatness of Raghunandana. He sent for Raghunandana, assured him that he would be a great Raja and extorted from him a promise not to dispossess his family by fair or foul means, of the Pargana Lashkarpur. Not dreaming that he would be a Zamindar, he readily gave the required promise and said that if he were to own the whole of Rajshahi, he would except Lashkarpur from his possessions. He was true to his word. When he became the largest Zamindar in Bengal, and his landed possessions embraced nearly the whole of Rajshahi and large portions of Jessor, Faridpur, Pabna, Maimansinh and other districts, he did not lay his hands on Lashkarpur.

Darpanarain Rai assisted in the fulfilment of his own prophecy. Finding Raghunandana to be an intelligent person, and far above his position he employed him as his Mukhtar and representative in Dhaka (Dacca), or as it was then called Jahangira, the then seat of Government. He was afterwards empolyed in a similar capacity in Murshidabad when the Government was transferred from Dhaka (Dacca). It was the custom, as observed in the Fifth Report of the Select Committee on the Affairs of the East India Company, "for the landholders of distinction and other principal inhabitants to maintain in proportion to their rank, an intercourse with the ruling power, and in person or by Vakil or agent to be in constant attendance at the seat of Government, or with the officers in authority over the district where their lands or their concerns were situated. To establish an interest at the darbar, and to procure the protection of some powerful patron, were to them objects of unceasing solicitude."

Raghunandana soon mastered the rules and regulations of the Muhammadan Code and ingratiated himself with the officers of the Nawab. He particularly won the golden opinions of the Kanungo, the most influential offcer of the Court. Being satisfied with his rare abilities both as a lawyer and a financier, the Kanungo empolyed him as his assistant or Naib Kanungo, In this capacity it was his duty to prepare statements of account and stamp them with the seal of his master before submission to the Nawab and then to the Emperor. He enjoyed the entire confidence of

the Kanungo, and was entrusted with his seal. The Kanungo was the registrar of the land and expounder of the customs and usages in regard to the same. All documents attested by him were received as authoritative and conclusive in disputes regarding the boundaries, rent, and revenue of lands.

About this time the Nawab incurred the severe displeasure of his Suzerain by his careless management of the Subah. With a view to ward off his Majesty's displeasure and win back his favour, the Nawab had a false statement of account prepared. The Kanungo being called upon to sign and stamp it with his seal, he refused to do so. He said he would not be a party to such a proceeding. The Nawab was placed in a dilemma, for it was then the custom that papers not bearing the signature and seal of the Kanungo were neither accepted nor sanctioned by the Emperor. During this crisis the Nawab, according to tradition, sent for Raghunandana and asked him to put the seal on his account. Unable to resist the terrible temptation of winning the favour of His Excellancy, Raghunandana complied with the requisition. The accounts were sanctioned by the Emperor and the Nawab was saved. His Excellency evinced his gratification and gratitude by appointing Raghunandana as Rai Rayan and Diwan. The Rai Rayan is the principal officer of the province next to the Diwan, and the Diwan represented the Nawab in all matters of detail regarding the Government. These posts opened to him a vista of greatness, and enable him to reap a rich harvest of rupees. The Diwanship was especially a post of great importance and honour. It clothed its incumbent with the powers of the Nawab. In the case of weak-minded Nawabs, the Diwan was the *de facto* Nawab, and in the case of strong-minded Nawabs, he was the Naib or sub-Viceroy, and enjoyed and excercised an authority second to that of his master.

During the Muhammadan *regime*, although the hereditary character of Zamindars was generally recognised, as we will show presently, it was often the custom to deprive defaulting Zamindars, as well as those guilty of murder or rebellion, or having no influence in the Court, of their estates and transfer the same as gifts or for some nominal consideration to some favourite at the Court of Murshidabad or their relatives. In this way Bhagabati and Ganesnarain, the Chaudhris of Pargana Bangachi, being defaulters were dispossessed of their property, and it was made over to Ramjibana, the brother of Raghunandana through the influence of the latter. The transfer was effected in the Bengali era 1113. Thus Ramjibana became the Zamindar of Bangachi and the co-founder of the Nator Raj. In the Bengali era 1115, Raja Uditnarain, a Zamindar of Rajshahi being gathered to his father, his estates were made over in like manner to Ramjibana. The Zamindaris during the days of Raghunandana were

classed under three denominations, namely, Jangalburi, Intikali and Ahkami. The first comprises land which having been reclaimed from waste by the diligence and industry of another person is bestowed upon him on condition of his paying *Khiraj* or the revenue of the Crown. The second class of Intikali may be productive, and in a good state of cultivation, yet on account of the neglect of the Zamindars to pay the arrears of revenue (*Juma Padshahi*) or his dying without issue or leaving no heir, or for committing rebellion, another person may, under the orders of the Emperor obtain a sanad for the estate. The last class Ahkami, meaning by order or authority, is when the Zamindar is ousted for no fault of his own but through the intrigues of the officers about the person of the Nawab for their own benefit. The Zamindaris in this case were granted to the officers in their own names or in those of their relatives.

In 1117 Bengali era, on the death of Ramkrishna, the Zamindar of Bhitaria, &C., Raghunandana got the management of the Zaimindari which remained in the name of Rani Sarbani, the Zamindar's widow ; but she dying soon after without heirs, the Zamindari was transferred in the name of the brother Ramjibana. In 1120 Uditnarain, the Zamindar of Rajshahi, being discontented with the oppression of the officers of the Nawab, rebelled, collected his adherents, and retired to the hills of Sultanuba. Reghunandana was deputed to arrest him. He sized and confined him in prison for which service he was rewarded with the Zamindari of Rajshahi, which he took in 1121 in the name of his brother Ramjibana. A year after this, the Pargana Naldaha was conferred by the Nawab upon his brother Ramjibana. Some time afterwards, Sitaram, the Zamindar of Jessor, was apprehended and confined for the murder of the Fauzdar, Abutarab, but dying in confinement, his Zamindari Bhushna, together with that of Ibrapimpur, &c., was given to Ramjibana. In the course of a few years the entire district of Rajshahi, save and and except Pargana Lashkarpur, became the property of Ramjibana. When it is remembered that the Rajshahi of Ramjibana's days embraced the whole of Pabna and Bagura and portions of other districts, some idea of the extent of his Zamindari may be formed. The large estate of Sutar which had been in the possession of Sitaram. was wrested from him for his rebelliousness and bestowed on Ramjibana. In process of time, the Nator Raj developed into gigantic dimensions. It embraced the Pargana of Shahujial in the west, and the Zamindari of Bhusana, the Pargans Naldi and Mukimpur on the east, and immense portions of other estates in other districts. It constituted unquestionably the largest Zamindari during the last century. It was commonly called an estate of 52 lakhs. Such were the origin and the progress of the Nator Raj.--Its real founder was unquestionably Raghunandana, but its grandeur and reputation were due

not so much to his capacity and cunning as to the management and energy of Ramjibana and his Diwan.

The estate of Bhushna was very large and comprised the bulk of Faridpur and Pargana Naldi in Jessor. It was assessed at, the Permanent Settlement at Rs. 3,30,000. The assessment was very high, and was in excess of the proceeds of the estate.

Raghunandana died in 1131, and his infant son, Bhawani Prasad, expired after a short period. The management of the Nator Raj then devolved on Deviprasad, the son of Vishnuram and Kalikaprasad, the son of Ramjibana, the latter exercising a controlling authority, At about this time, Kishwas Khan, Shamsher Khan, and Inayat Khan, &c., Zamindars of Havili, Mahmudabad, Shahujial, Tunji and Saruppur, and Isfindar Beg, Zamindar of Pargana Pukparia, being thrown into confinement for murder, the Zamindaris were escheated and conferred on Ramjibana. Afterwards Inayat Ulla, Zamindar of Jalalpur, falling in arrears, sold Havili, Fathiabad, &c. to Ramjibana to make good his revenues.

We have now to describe a man who played no insignificant part in the annals of Rajshahi.

Dayaram Rai was an extraordinary man. Of his antecedents nothing is known. Though he did not receive a high education, yet he was endowed with uncommon intelligence. What school had denied him, nature supplied him with Sharp, shrewd and sagacious, he could read men as scholars read books. He could deal in his own way with those with whom he was brought into contact. He was a first-rate man of business, and he throughly understood the principles as well as the details of it. He was large of heart and large of brain. He first appears on the stage of Nator as an inferior officer of the Raj under its founder Ramjibana. But the consummate tact and clear judgement he evinced in the transcation of zamindari affairs soon won him the golden opinions of his chief and he was soon appointed the Diwan of the Raj. Were it not for his good management, Ramjibana could not have extended or preserved his zamindari. In truth, while Raghuram at Murshidabad was the creator of the Nator estate, Dayaram was the consolidator of it. While one was the Clive, the other was the Hastings of the Raj. Dayaram was a skilled and experienced financier and was able so to husband the resources of the Raj as to add funded to landed wealth. He was also a valiant man. When the expedition against the reble Raja Sitaram Rai of Mahmudpur in Jessor was organised, Ramjibana with the permission of the Nawab, appointed Dayaram to head the same. Sitaram showed fight, but Dayaram at last captured him and brought him to Nator-where he died after a short imprisonment. The successful issue of the expedition earned for Dayaram the unqualified satisfaction of the Nawab. His excellency was also pleased

with him for the admirable was in which he carried out several orders entrusted to him directly. In recognition of his merits, the Nawab conferred upon him the title of "Rai Rayan" which is tantamount of Raja Bahadur.

Raja Dayaram received from Ramjibana substantial tokens of the gratification of the latter, in the shape of several valuable zamindaris. He was so entirely trusted by Ramjibana that he was appointed guardian to his successor Ramkanta and manager of the Raj after his death.

Kaliprosad having died during the life time of his father in 1131, corresponding to A.D. 1725, Ramjibana wanted to give ten annas of his estate to his great-grandson Ramkanta, and the remaining six annas to his nephew Deviprasad, but the latter not being agreeable to this partition, the whole was bestowed on Ramkanta.

In 1737, Ramjibana died, leaving the temporary charge of the Raj in the hands of his friend and counsellor Dayaram Rai. His management of the Raj during the interregnum was admirable and evinced great sagacity and impartiality. In process of time Dayaram made it over to Ramkanta. In 1146, corresponding to 1740 the estates of Saruppur and Patlada came into the possession of Ramkanta. The latter estate scarcely yielded at that time Rs. 7,000, but the profits of it and its adjoining zamindaries were enhanced by the late Hon'ble Prasanna Kumar Thakur to more than three lakhs of rupees per annum.

When Ramkanta succeeded to the Raj, he was 18 years old. He was a pious man and devoted his time to the performance of the Pujas and religious duties, but he had no capacity for business. He had been married to a girl of uncommon sagacity. She was 15 years old when she became, as the consort of the Maharaja, Maharani Bhabani. She was the most celebrated personage in the whole family and her administration of the Raj, during the last half of the last century, was memorable, If Ramkanta had something of the intelligence and far-sightedness of his wife, he would have succeeded in managing the Raj, but he had not in his whole composition a particle of that strong common sense and clear judgment which distinguished the Maharani Bhabani. He was destitute of the faculty of appreciating the merits of men and he could never distinguish friends from foes. A few months after he succeeded to the estate, he quarrelled with Dayaram Rai who had been the firm friend, the trusted adviser and confidential agent of Ramjibana. The Raj being in arrears, Dayaram remonstrated with the Maharaja against his careless management and pointed out to him the necessity and importance of collecting and punctually forwarding the revenue to the Nawab. Ramkanta being unable to appreciate this disinterested advice was offended with his out-spokenness. He first ceased to be guided by the advice of Dayaram,

then ceased to show common courtesy to him, whom he had been taught by Ramjibana to regard and address as his *Dada* or elder brother and at last he dismissed him from the post of Diwan. Surrounded by a band of flatterers he was led by them to believe Dayaram to be more an enemy than a friend. Dayaram was astounded and disgusted with this treatment. Unable to brook this insult and wishing to bring the young Maharaja to his senses, he proceeded to Murshidabad where he represented the real state of things to the Nawab, Having entire confidence in the Rai Rayan, His Excellencey deprived Ramkanta of the management of the Raj, and made it over to Deviprasad, the son of Vishuram and the nephew of Ramjibana. Ramkanta was helpless and solicited the interference of his quondam Diwan for the restoration to the Raj. Dayaram compassionating the condition of Ramkanta, and especially of his wife, Maharani Bhabani, for whom he had great regard, moved, and with success, the Court of Murshidabad to restore the rightful owner to the Gadi. Dayaram returned to the old post of Diwan after having taught his young master a lesson which he was not in a hurry to forget.

In 1153, corresponding to 1748, Ramkanta died without male issue, but had given permission to his wife to adopt a son and heir in accordance with the provisions of the Hindu law. The Raj came into the possession of his widow the Maharani Bhabani. She at first made over the management of Raghunath, her daughter's husband, but he dying in 1158, she resumed it. In 1165, corresponding to 1760, she was deprived of the Raj through the intrigues of Nandakumar Rai, and it was given to Gauriprasad, son of Deviprasad. Gauriprasad held the Raj for a few months, and then it was made over to the Maharani. The Maharani Bhabani was endowed with a large capacity for business. She thoroughly understood zamindari affairs, and the tact and judgement with which she managed the Raj were most admirable. She wisely availed herself of the experience of Dayaram Rai. Unlike her husband she fully appreciated his rare qualities and was always guided by him in matters of difficulty. She enhanced the profits of several estates and arrested the ruin of others. She was gifted with genius–with the talent of governing and managing men, and her *regime* was the culminating period of the influence and wealth of the Nator family. She as a strong-willed and large-brained woman, but she was amenable to the advice of those whom she trusted. She was a proud woman, but her pride was defensive and not aggressive. It was the pride of a princess who could condescend to be familar with her Amla and officers, but could when necessary keep them at arm's length. On one occasion when she instituted an enquiry into the validity of the tenures of lakhiraj lands granted to Brahmans by Ramjibana, she found the Sanads of several either not forthcoming or bearing the signature not of the donor Ramjibana, but of

Dayaram Rai. Referring to the latter she said to Dayaram half jestingly and half seriously, that she intended to resume them. Dayaram replied that it was not competent to her to do so, inasmuch as the *Pan Patra* or letter of her betrothal to the late Maharaja bore his (Dayaram's) signature and not that of Ramjibana. If therefore she disallowed Sanads signed by him, she must also be prepared tc repudiate her marriage contract with Ramkanta. The Maharani smiled, and not only gave up resumption, but under the advice of Dayaram she made an immense number of grants of lakhiraj lands to learned Pandits. Dayaram had thus the satisfaction of being the means of providing for the learned poor of his district.

During the trial of Warren Hastings of member of the House of Lords in his reply to the accusation alluded to the charge of His excellency having received money from the Maharani Bhabani and expressed his utter disbelief of the same. His Lordship said, "With respect to the Rani Bhabani, from whom Mr. Hastings is accused of having received the large sum of forty-four thousand pounds sterling, there certainly is not one tittle of evidence to support the charge, nor can I find even the name of this person mentioned in any part of the evidence."

The Maharani's knowledge of worldly affairs did not prevent her from spending enormous sums of money in the establishment of charities and religious edifices. Her mind was manysided, and while she transcated business, she could design. Atithisalas or Asylums for the poor and provide foı the support of the same. The established in Benares 380 Asylums, Guesthouses, and Thakur-baris, some of which are richly endowed and are still kept up. She laid out a road surrounding the site of Benares and extending to more than ten miles. It led from Benares proper, under the portals of the temple of Biseswar and reached Surnath, the former seat of Buddhism. At Murshidabad she established an idol called Syam Rai and endowed it with a large zamindari called Dihi Phulbaria, now under the management of Rani Sibeswari Devi. She erected temples and other religious edifices in other districts, and endowed the same with large lands. The seat of the Raj teems with such edifices. She covered Nator with temples and minarets, above which towered the Kali Bari. But "decay's effacing fungers" have been at work. The religious establishments at Benares standing as they do in the name of the *Guru* or spiritual guide of the family are gone to wreck and ruin, because the and *Guru* and his descendants are extinct. Rani Sibeswari the real *Shabaeth* will do well to apply to the Collector for the restoration of the Debottar properties with a view to their proper management.

The Maharani Bhabani was pious, liberal, and actively benevolent. She was not slow in performing the duties of her station, as she understood them according to the lights of her age and country.

There is an anecdote regarding the family of the Maharani which illustrates the unbridled lust of Nawab Sarajuddaula. Her daughter whose husband had been for some time entrusted by her with the management of the Raj, but who had died a premature death had left his wife in the fulness of youth and ripeness of beauty. She was in truth a woman of rare and lustrous beauty, and the news of it reached the ears of Sarajuddaula who longed to have possession of her person. The Maharani was paralysed by astonishment and fear. That the Nawab, under whose protection she lived, should so far forget himself and the duties of his exalted station, as to be desirous to violate the chastity of the Rajkumari of the first house in Bengal, a girl who had lost her husband and was according to the *Sastras* doomed to perpetual widowhood indicated in her opinion an absence of all moral obligetion and a depth of degradation not easily paralleled. She was resolved to rescue this fair young flower. She therefore took her daughter *Tara* with her and fled from the Rajbari to Benares. She left at night in order that her retreat might be covered by the darkness. But Sarajuddaula soon came to grief in his encounter with the English and had to give up his diabolical purpose.

The Maharani had the gratification of witnessing the extinction of the Muhammadan Government and the substitution for it of the English Government.

The first notice that we find taken by the English authorities regarding the Maharani Bhabni is as follows :–

Mr. Holloway thus speaks of the Maharani, "At Nator about ten days travels North-East of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu Princes of Bengal. Raja Ramkunt of the race of Brahmins who deceased in the year 1748, and was succeeded by his wife, a Princess named Bhobanee Ranee, whose Dewan or minister was Doyaram of the Teely caste or tribe ; they possess a tract of country about thirtyfive days travel and under a settled Government ; their stipulated annual rent to the crown was seventy lakhs of Sicca Rupees, the real revenues about one krore and a half."

Mr. Warren Hastings in his "Memoirs relative to the state of India" mentions that "the Zamindari of Rajshahi, the second in rank in Bengal and yielding an annual revenue of about twentyfive lakhs of rupees has risen to its present magnitude during the course of the last eighty years by accumulating the property of a great number of dispossessed Zamindars, although the ancestors of the present possessor had not by inheritance a right to the property of a single village within the whole zamindari." Mr. Hastings himself did not spare the Raj, as he wrested from Rani Bhabani the large estate of Baharband in Rangpur and vested the same in his Banian Kanta Babu.

Before we proceed further with the history of the Nator Raj, we desire to glance at the status and condition of the old Zamindars under the Muhammadan *regime*, as illustrating those of the founder of the said Raj and his immediate successors.

At the time of the Permanent Settlement of Chief of the Nator Raj exercised civil and criminal powers and was also unmolested in the collection of revenue. On him rested the power of farming the lands, collecting the rents from the villages, and keeping the accounts. He was independent of the interference of the Government in the details of fiscal and criminal administration.

The other large Zamindars who then practically ruled Bengal were vested with similar powers. It was only when they were remiss in the payment of the sadr jama that officers were deputed to enforce the above payments. The revenues were at first paid by eight and then by twelve instalments. The phrase Zamindar is derived from *Zamin*, signifying land, and from *dar* which is an inflexion of the Persian verb *Dashten* signifying to hold or possess, without reference to time. The phrase Talukdar which in Bengal now means the holder of a *Pattani* or other subordinate tenure, and in Oudh means a Zamindar, comprised formerly in this Province two classes of land-holders, namely, the *Sanadi* Talukdar and those having none. The former was considered as independent of the Zamindar and paid his revenue direct to the Government, but the latter were generally subordinate to the Zamindar. The import of Talukdar is the holder or possessor of a *Taluk*, the Arabic word signifying attachment and dependence. Mr. C. Wm. Boughton Rouse in his Dissertation on the landed property of Bengal written in 1791, thus describes the manner in which the revenues were paid by Zamindars and Talukdars : "It appears upon a reference to all the correspondence of the times, and is universally known, that when the Diwani of the three Provinces was ceded to us, the country was distributed amongst the Zamindars and Talukdars, who paid a stipulated revenue by twelve instalments to the Sovereign power or its delegates. They assembled at the capital in the beginning of every Bengal year (commencing in April) in order to complete their final payments, and make up their annual accounts ; to settle the discount to be charged upon their several remittances in various coins for the purpose of reducing them to one standard, or adjust their concerns with their Bankers ; to petition for remissions on account of storms, drought ; innundation, disturbances, and such like ; to make their representations of the state and occurrences of their districts : after all which they entered upon the collections of the new year : of which, however, they were not permitted to begin receiving the rents from their own farmers, till they had completely closed the

accounts of the preceding year, so that they might not encroach upon the new rents to make up the deficiency of the past."

But whether Zamindars or Talukdars they occupied a tenure which was essentially hereditary but modified by the circumstances we have before mentioned. Of this the history of the Nator Raj affords a signal illustration. Although some members of the family were dispossessed for their mismanagement, and others were vested with the chiefship of the zamindari, yet the property was never given away to outsiders. Even those tyrants, Jafar Khan, Alivardi, and Kasim Ali, never thought of ousting the Zamindars. They plundered, fleeced, and punished the defaulting Talukdars and Zamindars and others guilty of accumulating wealth, yet, as soon as their avarice and rapacity were satisfied, they allowed the old proprietors to resume the management of the Zamindaris. The principle of hereditary descent was thus recognized by the Subahdars of Bengal. The position that we maintained in our paper on the "Bardwan Raj" that the large Zamindars were not mere rent-collectors or financial officers, but hereditary chiefs and vested with imperial offices, is supported by several authorities since consulted by us. Mr. Rouse after expressing his conviction derived from a searching inquiry "that the state in which we received the rich Provinces of Bengal, Behar and Orissa, was a general state of hereditary property," confesses his inability to fix the period when Zamindari Sanads were first issued by the Muhammadan Government. He is, however, inclined to think that they have not been in use much above a hundred years beyond his time, and ascribes their origin to Aurangzeb. He says this Emperor may very probably have judged it expedient, after the suppression of the civil war in Bengal by the final defeat of his brother Sultan Shuja in 1660, and the subjection of the Deccan in 1687, to issue these patents of investiture for the land-holders, who had been faithful to his interest. "It may be presumed, that in general, the former occupants were confirmed in their possession upon a settled tribute ; because we do not find, although Aurangzeb was an enthusiast for his own religion, that he made any disposition of the conquered lands amongst his own followers and adherents ; but gave them altogether to the Native Hindus." The Sanad usually concluded thus "Let him encourage the body of the ryots in such a manner that signs of an increased cultivation and the improvement of the country may daily appear." It did not, however, prescribed the annual valuation or the enhancement of the revenue.

Mirza Moshin, an experienced Muhammadan officer during the early English *regime,* thus bears his testimony to the hereditary tenure of Zamindars. "At present the children of a Zamindar take the land possessed by their fathers and grand-fathers, as an in-heritance ; it is done upon the strength of the ancient custom and institutions ; according to

which the Zamindari of the father was transferred by Sanad to the son. If the office of Zamindari, in the nature of other offices were limited to the life of the incumbents, they would never have exerted themselves to promote the improvement and prosperity of the country. Nor would the population and revenue have been advanced, as they are now from what they were in former times. But when the Emperors thought it politic upon the decease of a Zamindar, to continue the office of Zamindari to his children, the Zamindars on their part felt a confidence and satisfaction in discharging the duties of their situation, and always employed their strenuous endeavours to promote the prosperity of their districts." The Zamindars, according to the same authority, were invested with three officers ; "first, the preservation and defence of their respective boundaries from traitors and insurgents ; secondly, the tranquillity of the subjects, the abundance of cultivation, and increase of the revenue ; thirdly, the punishment of thieves and robbers, the prevention of crimes, and the destruction of highwaymen." Mr. J. Sulivan in his observations upon the Sarkar of Masulipatam printed in the year 1780, observes that, "at his demise in 1707, the whole country was possessed by the ancestors of the present Zamindars;"—an observation that is born out by the Aini Akbari which has a distinct column descriptive of the title and religion of Zamindars.

It is mentioned in the Fifth Report of the Select Committee that "the Zamindars of Bengal were opulent and numerous in the reign of Akbar, and they existed when Jafar Khan was appointed to the administration, under him and his successors their resprective territorial jurisdictions appeared to have been greatly augmented, and when the English acquired the Diwani, the principal Zamindars exhibited the appearance of opulence and dignity."

Such was the condition of the landed properties of Bengal when the permanent settlement come into operation. How that settlement operated on zamindaris in general and on the Nator estate in particular will be presently told.

Maharaja Ramkrishna, the adopted son of Ramkanta, succeeded his mother the Maharani on her death. Like his father he was very pious and devoted his whole time of Pujas. He did not like his mother combine piety with business, but entirely neglected the latter and was in fact incapable of understanding it. It is, theretore, not to be wondered at, that the decadence of the Raj and the disintegration of the vest zamindaris constituting it commenced from his time. His officers, Amla, and even his menial servents robbed him on every side and accumulated wealth for themselves. Among the Kalisankar Rai, the ancestor of the Narail family, was the principal. He was regarded as a friend, philosopher and guide. But

he was unfortunately neither a faithful friend, a good philosopher nor an infallible guide. He was on the contrary a principle of evil introduced into the Nator Raj for its destruction. He was an individual cloud of gloom hovering on the horizon of Ramkrishna, ultimately to enshroud his estates in darkness and ruin.

The Maharaja sold to Kalisankar, for a song, the Pargana Kadihati and also let out to him the rest of Bhushana in *Ijara*. Being a thoroughly bad manager of Zamindaris he believed Bhushna would prove profitable under the control of Kalisankar. The *Ijara* commenced in April 1793, and during the first year the *Ijaradar* enhanced rents from 3,24,000 to 3,48,000. In the second year he demanded Rs. 3,88,000 but his demand although supported by violence and oppression, was resisted by the *rayats*, some of whom instituted suits against the enhancement and obtained decree "authorising them a refund of three times the amount taken." The prestige of Kalisankar was at this time lowered by another circumstance, *viz*., an accusation of murder preferred against him. He was for four months in jail during the trial but he was afterwards acquitted. The Maharaja being disappointed in his expectations of profiting by the *zabardast* proceedings of Kalisankar, resorted to another plan to guard against his estate being sold for arrears of revenue. In December 1795, he transferred by *hibanama* or deed of gift, his right, title and interest in Bhushna, to his minor son Biswanath. The estate becoming the property of minor was taken charge of by the Court of Wards. Although the estate was in arrear, yet it was thus saved for a time from the Collector's hammer. The Maharaja also executed another deed by which he suspended for six months the enforcement of his claim for Kalisankar for Rs. 50,000, being the amount due from him as *Ijaradar*. The object of this document was to give time to Kalisankar and prevent the Court of Wards from demanding that amount. The estate being mismanaged, Mr. Earnest was appointed in May 1797, Commissioner of Bhushna, and was vested with full authority to revise the settlement and make arrangement for the realization of rent. He commenced by announcing his intention to abolish the whole of Kalisankar's second increase of rents and one-half of his first in crease. He, however, met with great opposition from the Rayats in and out of Court, but he at last overcame it, and effected the settlement. He fixed the entire revenue at Rs. 3,27,800 assessing the sadr jama at Rs. 2,48,118 and awarding a Zamindari allowance, provided it could be realised. The Rajkumar Biswanath when he attained his majority, was offered the estate, but he refused to receive it back, because it was a losing concern. But the Court of Wards ruled that the estate was responsible for its revenue whether he took charge of it or not. They therefore proceeded to sell it piecemeal for the recovery of the arrears of revenue.

The following sales in Bhushan were effected in the office of the Collector of Jessor in 1799 :—

Pargana	*Assessed*	*Date of sale*	*Purchasers*
Havili	Rs. 36,613	15-2-1799	Ramnath Rai
Mukimpur	" 25,347	25-2-1799	Ditto.
Nasibshahi	" 16,937	25-2-1799	Bhairab Nath Rai
Sator	" 39,968	28-2-1799	Sibprasad Rai
Naldi	" 66,760	23-3-1799	Bhairab Nath Rai

Smaller parts were also sold in the same year. The sales took place in Jessor because Bhushna was added to that district in 1793. The other large estated of the Raj shared the same fate as Bhushna. The largest purchasers of those estates was Kalisankar Rai, the friend and *Ijaradar* of the Maharaja Ramkrishna. Pargana Pukharia was purchased by the Chaudhris of Maimausingh and other parties. Dihi Arpara by Kenaram Mukherji of Gobardanga, Dihi Kanespur and Dihi Saruppur by Gopimohan Thakur the ancestor of the Thakur family.

The permanent settlement precipitated the ruin of the Nator Raj. Based upon the *Lawazima papers* of the Zamindari sarishta and the records of the Kanungos as well as the previous periodical settlements, it assumed a rental in excess of the reality. It formed an exaggerated estimate of the resources of zamindaris and assessed them at a rate far beyond their power. The estimate of the local officer or rather of the Sarishtadar was generally sanctioned by the Sadr Board and the Government, the former seldom making an enquiry.

It is mentioned in the Fifth Report of the Select Committee—that "they (the Court of Director) censured the ineffectural attempts that had been made to increase the assessment of revenue, whereby the Zamindars (or hereditary superintendents of the land) had been taxed to make room for the introduction of farmers, sazawuls and amins who having no permanent interest in the lands had drained the country of its resources. They disapproved the rule, recently established, which prohibited the Collector from having any concern in the formation of the settlement of his district ; and noticed the heavy arrears outstanding on the settlement of the last four years, which had been formed under the immediate direction of the Committee of Revenue ; and expressed their opinion, that the most likely means of avoiding such defalcations in future, would be by introducing a permanent settlement of a revenue estimated in its amount on reasonable principles, for the due payments of which the hereditary tenure of the possessor would be the best and in general the only necessary security. They therefore directed that the settlement should be made in all practicable instances with the Zamindar ; and that in cases of his established incapacity for the trust, a preference should be given to

a relation or agent over a farmer. They apprehended the design of the legislature was to declare general principles of conduct ; and not to introduce any novel system, or to destroy those rules and maxims of policy which prevailed in well regulated periods of the Native Government. With respect to the amount of the assessment, the Directors were of opinion, that the information already obtained might be sufficient to enable their Government in Bengal to fix it, without having recourse to minute local scrutinies ; and they suggested the average of former years collections to be the guide on the present occasion ; and on this point concluded their instructions with remarking that "a moderate jama or assessment, regularly and punctually collected, unites the consideration of our interest with the happiness of the natives and security of the land-holders, more retionally than any imperfect collection of an exaggerated jama to be enforced with severity and vaxation."

Though the permanent settlement has been declared to be the *Magna Charta* of the Zamindars, yet it did not in the beginning prove to them such an unmitigated blessing as is generally supposed. The assessment of several of the large estates, and notably of the Nator Raj, was excessive as shown by the settlement given by Mr. Westland in his report on Jessor. Yusafpur was settled at Rs. 3,02,372 that is about Rs. 5,000 more than the demand of the previous year (taking sayer deductions into account) ; the Sayyidpur estate was made to pay Rs. 90,583 or Rs. 2,000 more than the previous year. The natural and inevitable result of the settlement was the inability of the Zamindars to meet the increased Government demand and their impoverishment. It is no wonder that the administration of Ramkrishna is a blurred record of arrears of revenue, of sale of estates, of decadence and ruin.

There is no doubt that the permanent settlement has improved the old Rajas and Zamindars off the face of the land and has substituted in their stead a different class of men,—men of active business habits who have risen in life from small beginnings—men who have been Sadrmates and Banians—Dealers in shares and Government Securities—men who are desirous of exchanging their funded wealth for the profit and prestige arising from the possession of landed wealth.

Mr. George Dallas was one of the earlist Collectors of Rajshahi, but he tendered his resignation in the beginning of the year 1786. On the 19th January of that year, his resignation was accepted, and Mr. P. Speke was appointed Collector in his stead. On the 4th February 1786, Mr. Speke took over charge of the collections of the districts as also the balance of cash in the Treasury, amounting to Sic. Rs. 89,028-8.

Mr. Henckell was appointed Collector, Judge and Magistrate of Nator in 1789. It was during his time that the permanent settlement came into

operation. He was a very intelligent and clear-headed officer and completed the settlement to the satisfaction of the Government, but he was not satisfied himself, inasmuch as he knew that the information at his disposal was scanty. He was the innocent cause of the down-fall of the house of Nator. With the ablest management the Maharaja Ramkrishna could not have paid the amount of revenue at which he was assessed under the permanent settlement, but being a wretched manager he could not wait patiently and passively witness his ruin.

During the time the chiefs of Nator exercised criminal powers, crime was considerably repressed. Regulations and Acts, Penal Codes and Procedures there were none, and if they had existed, they would have been ignored and over-ridden. What was wanted and what was administered was sharp and summary justice. The remains of a jail and the spot where the gibbet had stood attest the activity as well as severity with which the criminal authority of the Rajas of Nator was exercised. But during the English *regime* all this was changed. The Rajas were deprived of the powers of magistrate and a single officer was appointed as Magistrate, Judge and Collector of Nator. The consequence was that he had more to do than he could perform. As a Magistrate he had to deal summarily with petty offences and commit the grave ones such as burglary, dacoity, and murder for trial to the Court of Circuit. As a Collector he had to look to the collection and administration of revenue. As a Judge he was the head of the Judicial Department and had to revise and overlook the decisions of the Munsifs or Commissioners as they were then called. Being overwhelmed with these multifarious avocations and ignorant of the language and customs of the country, he was both unable and incompetent to hunt out crime.

In the time of Maharaja Ramkrishna crime was very rife, there was little or no security of life and property. Thefts, burglary, and dacoity were very prevalent. Among the dacoits Pandita, Kartika and Fathu may be mentioned as the principal ; Jitu was another sardar dacoit and murderer. The connivance and collusion of the Police, and the assistance and protection afforded by the Naibs and Gumashtas of the Zamindars enabled the dacoits to pursue their nefarious avocations with impunity. Not only the zamindari Amla but several petty land-holders were *Thangidars* or receivers of stolen property ; and as they were in the habit of melting down gold and silver ornaments as soon as they came into possession of the same, it was difficult to indentify the articles. Several families in Sulop and other villages in Rajshahi accumulated wealth by Thangidari. The ignorance and the negligence of the Magistrate as well as his utter want of experience of the manners and customs of the people, was another cause of the security enjoyed by the dacoits and murderers. The

Sarishtadar was often the *de facto* Magistrate, and his master was a tool in his hands. He could not only "decree and dismiss" in civil cases, but acquit prisoners charged with the gravest offence. Of the power and influence of the Sarishtadar to suppress complaints and prevent their being brought to a decision, the following instance is given by Mr. E. Strachey, the third Judge of the Calcutta Court of Circuit. It appears that the Sarishtadar and one Rahimuddin monopolised all magisterial power and sheltered several sardar dacoits who were their rayats. Referring to these two men, Mr. Strachey says "I mention this, to introduce a more daring instance of their interference, which, with the facts of their mufassal connection with dacoits, leaves no doubt in my mind that these two men are the chief causes of the dacoity here, and the chief obstacles to its suppression. Anup Munshi, who is not friendly to Rahimuddin, or the Sarishtadar, seized Ata, a notorious dacoit of Pandita's gang, an inhabitant of Sonadighi, which belongs to the Sarishtadar and Rahimuddin, and appears to be a nest of dacoits. Ata confessed to the Daroga, three dacoities, two of them attended with burning ; and he was sent to the Magistrate, who took evidence of his confession, and instead of committing the prisoner, as he usually does in such cases, ordered the proceedings to be kept with those of Jhampra and others. The Magistrate does not know why they were joined with Jhampra's ; probably it was, because Ata was of the same gang as Jhampra ; this happened in February. Among the proceedings held in April in the case of Fathu and others, notorious dacoits, it is said in the examination of some of the witnesses, 'the witness then looking at Ata, who was apprehended on another charge, said this Ata is a notorious dacoit.' In fact there was no charge against Ata that had been joined with Jhampra's case, and the Magistrate can give no account of the introduction of Ata among the prisoners in Fathu's."

"On the 2nd of May, without any further evidence for or against Ata is an order on Jhampra's case, in the record of which was the confession of Ata, stating that there was nothing proved against Ata, but that as there was another charge against him, he must not be released till that should be decided. On the 4th of May the case of Fathu was brought on, and among the prisoners was Ata, placed there, I suppose by a thick of the Amla that he might be regularly discharged ; for there was nothing against him––then order was passed for the commitment of Fathu and others, and for the release of the other prisoners ; so Ata escaped."

The same officer thus reports to the Sadr Court the prevalence of crime in Rajshahi.

1. "It is with much diffidence that I address the Nizamat Adalat on the present occasion for I have to propose measures, the nature of which they are, I know, generally averse to."

2. "As the Nizamat Adalat, the Government, and the people of the country look to the Judges of Circuit, as well as to the Magistrates, for the establishment of an efficient Police, I consider it to be my duty to call the attention of the superior court to this subject."

3. "I do not wait till the end of the circuit, when, in the course of official routine, I should have to make a report to the court ; because the evil which I complain of is great and increasing, and every instant of delay serves only to furnish new victims to the atrocities which are daily practised."

4. "That dacoity is very prevalent in Rajshahi, has been often stated ; but if its vast extent were known, if the scenes of horror, the murders, the burnings, the excessive cruelties, which are continually perpetrated here were properly represented to Government, I am confident that some measures would be adopted to remedy the evil ; certainly there is not an individual belonging to the Government who does not anxiously wish to save the people from robbery and massacre, yet the situation of the people is not sufficiently attended to. It cannot be denied that in point of fact, there is no protection for persons or property ; and that the present wretched, mechanical, inefficient system of Police is a mere mockery."

5. "The dacoits know much better than we how to preserve their power ; they have with great success established a respect for their order, by speedy, certain and severe punishments, and by judicious arrangements for removing obstacles and for facilitating the execution of their plans."

6. "Such is the state of things which prevails in most of the Zilas in Bengal ; but in this, it is much worse than in any other I have seen. I am fully persuaded that no civilised country ever had so bad a Police, as that which Rajshahi has at present."

This report is dated Nator, 13th June 1808. and addressed to Mr. William Butterworth Bayley, the then registrar of the Sadr Court.

In another report dated Murshidabad, Zila Rajshahi, 19th August 1808, Mr. Strachey thus describes the organisation of a band of dacoits. "What does a gang of dacoits consist of? There is the Sarder ; the leader of the party when he is present, and their director when he is absent. He is a professed robber and murderer. He is not only the conductor of the atrocities that are committed, but he is the point of union of many inferior criminals. He finds recruits for his party not only by accepting the services of wretches like himself, but he has recourse to persuasion, to force and terror : some of his party are pressed to carry bundles or torches ; some are severely beat : some threatened with death ; some with dacoity, if they refuse to join. Many thus initiated against their inclination, are gradually corrupted, till the greatest crimes are familiar to them, and they become at last hardened dacoits. A gang of dacoits, then, does not

consist entirely of professed robbers ; many of the party are poor, honest industrious people who are seized for the service of the night ; some assist willingly but not actively ; and some are regularly established robbers. It is right that so heterogeneous a set as this would be jumbled together, and be all liable to the same punishment? It is the duty of the legislature to protect those ignorant and helpless creatures, who cannot protect themselves :—one part of the system should not denounce against an unfortunate wretch, death or other exceedingly severe punishment for a crime, which owing to the defects of another part of the system he is compelled to commit. If you refuse him protection, and leave him to the uncontrolled power of robbers and murderers will you inflict severe punishment on him, after the offence has been forced upon him? If you could not check the power, how could he resist it? But the duty of the legislator is not confined to this coarser sort of protection, he must consider that this is a weak and ignorant race, and it is a duty to save them from temptation, to prevent corruption from spreading around them ; and if this duty is neglected and crimes are generated in consequence, with what justice can the criminal be punished?"

We thus see that those whose duty it was to put down crime encouraged it by every means in their power for their lawless gain. We see corruption pervading every grade of the Police establishment : the Darogas, the Jamadars, the Muharrirs, the Barkandazes and the Chaukidars. We see the Magistrate was overwhelmed with work. The consequence was, the people preferred quiet submission to extortion and robbery as a lesser evil than the operation of the Police. The union of the offices of Magistrate and Collector in the same person operated most prejudicially in the performance of the Police duty. Referring to this evil, Babu Dwarkanath Thakur in his evidence before the Police Committee says, "the first and principal Judges of the Mufassal Courts are the Amla, who lead the inexperienced Judges as they pleased." Mr. W. P. Grant observes : "We hear a great deal of the excellence of the East India Company's Government, and the improvement which has taken place in the country since it has been under them. I firmly believe that their Government continued to exist only because it is better than that of the Mughul was, and with the exception of the Government of the Mughul, I think the Company's Government the worst I ever knew."

With a view to put down dacoity, Mr. Strachey recommends that while the leaders of the gang should be severely dealt with, their followers should not be punished indiscriminately, but that preventive and not punitive measures should be resorted to in respect to them. He also recommends that criminal Judges should be appointed from no other consideration than that of the fitness of the man for the place.

Among the offcers who served with distinction in Nator as Judges and Magistrates may be mentioned James Pattle, James Grant and Mr. Duncan Campbell.

In those happy-go-lucky days, when the Amla exercised irresponsible power, the following characteristic example will be interesting. Muhammad Zaman Khan, originally an inhibitant of Bardwan, was the Nazir of the Fauzdari Court and in that capacity accumulated large wealth and bequeathed it to his son Chaudhri Dost Muhammad Khan, who set himself up as an independent gentleman and bought several Zamindaris. He however bore his faculities very meekly and was a very courteous and gentlemanly person. His eldest son Muhammad Ali Khan was learned in the Kuran, and was a pious and abstemious person. His son Rashid Miyan now represents the family.

On the 6th March 1793, Mr. J. H. Harington, the Commissioner of the Rajshahi Division, being unable to realise from Maharaja Ramkrishna the revenue due from him had him confined in a suitable place "under the guard of Sepoys instructed to treat him with all due regard to his situation as well as to allow free access to his officers and servants." The Commissioner vested the temporary charge of his estate in Ramjimall as Sarbarahkar on his part during his imprisonment. The aggregate sum due from the Maharaja after deducting the payments already made by him, was Sa. Rs. 2,68,842-15-14, (*viz.*, Rs. 1,70,335, account Nij Rajshahi, and Rs. 98,507-15-14, account Bhitaria, Bhushna and the Boga Mahals). The Commissioner having reported the above circumstance to the Board, the latter wrote back as follows :— "We approve your having put the Raja in confinement conformably to the Regulations and of your having vested the management of his estate in Ramjimall, to whom you will afford every necessary assistance to secure the realization of the sums now remaining outstanding." But on the 15th March 1793, the Governor-General gave the Maharaja further time for the payment of the Government demand, and authorise the Commissioner to release him "in the event of his executing an engagement to pay the balance of this *kist.*" On the 18th March the Maharaja executed the engagement and was released. But being unable to fulfill his engagement in due date, a portion of his estate was sold, pursuant to previous advertisement. Thus commenced the dismemberment of the Nator Raj. The estates first sold were the following : — Pargana Patladah, Pargana Ambari, Kismat, Pargana Kotwali, Chaugharia Manikdi.

The Maharaja being convinced of the necessity of letting out his estates at a fixed jama in perpetuity as the only means of paying off the Government demand, applied to the authorities for their sanction, but it was withheld "as coming under the prohibition against Istimraris." There

being then neither permanent settlement nor Pattani tenure, the Board expressed the following opinion regarding the application of the Maharaja :— "If, however, it be only his intention to grant leases, fixing the rent for the period of his own engagement with the Government, he is of course at liberty to do so, but with regard to your affixing your signature to any engagement between the Zamindar and his under renters, we are of opinion that it is liable to objection."

In 1822 the Zila or the fiscal, criminal and chief judicial courts were removed from Nator to Rampur Boaliya owing to the low and unhealthy situation of the former. The Judges of the Provincial Court of Appeal and Circuit for the Division of Murshidabad, under orders of the Government of Bengal, called upon Mr. J. A. Pringle, the Judge and Magistrate of Rajshahi, to report upon a new site where the civil station may be removed from Nator, Mr. Pringle in his report, dated 23rd April 1822, stated that he had examined the ground in the vicinity of Nawabganj and Boaliya, and believed it to be a centrical spot, a populous place and well adapted for the civil station. On this the Provincial Court, wrote to Mr. Secretary Holt Mackenzie, "that in our opinion there is land in the vicinity of Boaliya calculated for the erection of the civil buildings of Rajshahi." The proposition of the Provincial Court having received the sanction of the Government, the civil station was removed to Rampur Boaliya. But the Padma has recently swept away most of the civil buildings, and the civil station has been further removed to the vicinity of Nawabganj.

Of the Magistrates who sat on the Bench at Rampur Boaliya, the following gentlemen may be mentioned as having displayed conspicious ability and zeal : Mr. Vibart, Mr. F. J. Halliday, Mr. Loch and Mr. Swinton. Mr. Vibart was an energetic detective officer. Mr. Halliday was a very clever officer, conducting the duties alternately of the Collector and the Magistrage. While he sat as a Collector he spoke Bengali fluently, but as Magistrage he spoke Urdu. Mr. Loch, now a Judge of High Court, was also an able officer. He was succeeded by Mr. A. A. Swinton, who was a zealous and conscientious officer and threw his whole heart into his work. After the separation of the offices of Magistrate and Collector, Mr. A. Forbes proved one of the ablest Collectors, and his reports on *Batwara* and other subjects evinced a thorough knowledge of the revenue administration. Among the Judges Mr. G. C. Cheap may be considered one of the cleverest and most experienced officers. He presided over the Judical Department for many years and was the Nestor of the District. He was the son of the Mr. Cheap who was the Commercial Resident of the Hon'ble East India Company and resided at Surul in Birbhum. Mr. Cheap was very hospitable and a hail-fellow-well-met with both officials and non-officials.

Biswanath the quondam proprietor of Bhushana succeeded his father Ramkrishna. But his inheritance which at one time comprised the most maginificent estate in Bengal, now consisted of only *debottar* lands. The most remarkable act of his life was his change from one phase of Hindu religion to another. His ancestors had been *Saktas*, and he himself had been a confirmed worshipper of *Sakti*, but he became a Vaishnava.

Biswanath had three wives, namely, Rani Krishnamani, Rani Govindamani, and Rani Jaymani. The two former following the example of their husband, renounced Saktaism and embraced Vaishnavism. But Rani Jaymani refused to secede from Saktaism and migrated to Murshidabad where she settled. Biswanath died without male issue, but in accordance with the *Anumati patra* or deed of permission, Rani Krishnamani adopted a son named Govinda Chandra. Rani Jaymani also adopted a son.

Govinda Chandra succeeded his father Biswanath, but he lived only a few years. During his last illness he executed two deeds, namely *Dattak patra* authorizing his wife to adopt a son, and *Katritta patra* in favour of his mother Rani Krishnamani, vesting in her the management of the estate.

On the death of her son Govinda Chandra, Rani Krishnamani assumed the management of the estate. She was a very able woman and evinced great capacity for business. Her efforts to rescue to residue of the estate from being swallowed up by litigation and rival claims were unceasing and at last crowned with success. Govinda Chandra was succeeded by his adopted son Govindanath. The validity of the adoption of Govindanath by Rani Shibeswari being contested during the life time of Rani Krishnamani, the case was first heard in the Court of Rajshahi, and the Presiding Judge Mr. Louis Jackson pronounced against the adoption. But the High Court reversed the judgement of the lower tribunal and held the adoption to be valid. The Privy Council have just confirmed the decision of the High Court. But Rani Krishnamani and Govindanath had died with the decision of the Privy Council was telegraphed. The one could not witness the success of her exertions, nor the other enjoy the fruits of the property adjudicated to him after such a protracted litigation.

The judgement of the High Court was affirmed by the Privy Council on the 8th June 1872. The case for the Bara Taraf is thus described by the Privy Council :—

"It appears that Govinda Chandra died in 1836, having the Raj in full right and possession.

"He died leaving his mother Krishnamani, his wife, who was then about the age of 20, and an infant daughter about two years old, and it is

material to bear in mind this state of his family in weighing the presumptions which arise from the subsequent conduct of the parties.

"The Raja Govinda Chandra had himself been adopted into this family by Krishnamani in the year 1814, and he came of age in 1829. During his minority Krishnamani managed the property, and there were disputes between the Raja and his adoptive mother which when he came of age, led to what has been called by the learned counsel for the appellant 'exasperated litigation.' There can be no doubt that there was fierce litigation between the mother and the adopted son. In that litigation insults were heaped by one upon the other, and the fair result of the evidence seems to be that they continued for a considerable time in a state of hostility. From conversation held with the Raja himself, it appeared that only a short time before his death he was not on visiting terms with his mother. She had left the palace at Nator and had gone to live at Sayyidabad on the other side of the Ganges. But although that state of hostility between mother and son is proved beyond all dispute by the evidence, it is also proved and, with equal certainty to the minds of their Lordships, that on the eve of his death the Raja became sincerely desirous of seeing his mother and becoming reconciled with her. He was taken ill some few days before the 9th of December. On the 9th of December, or as one witness says, on the day before the 9th, when several family physicians were present, when one of his relatives, Hariprasad, the father of his young wife was also present, the evidence is that the deeds which are now in dispute were executed. attested one by nine and the other by eleven witnesses, and the deed of adoption (*Anumati patra*) given by the Raja to Hariprasad, who at once delivered it to his daughter, the Raja's wife, who was behind the screen in the same room. The other deed the Raja put in his seal box, intending himself to take it to his mother.

"Their Lordships having given very careful consideration to the evidence in this case, have come to the conclusion that the judgement of the High Court is perfectly right ; that there is direct evidence of the execution of the instruments, which is, if not so clear as to remove all doubt, at least so satisfactory that in the absence of contrary evidence or very strong presumptions to the absence of country evidence or very strong presumptions to the contrary it ought to prevail. Their Lordships also think that whilst the direct evidence is satisfactory, the presumptions which exist on the one side and on the other, when they come to be weight, very strongly preponderate in favour of the execution of these deeds.

"Several witnesses have been called who were present when these deeds were executed, and in considering the witnesses who were called, and the absence of witnesses, the length of time which had elapsed from

the period when the deeds were executed to the time of the enquiry must be borne in mind. The deeds were executed in December 1836 ; and these witnesses were examined before Mr. Jackson in 1860, 25 years after the event.

"The Privy Council thus concludes that the judgment of the High Court on the question of succession is right ; that decision will dispose of the two appeals of Raja Chandra Nath Rai. They will therefore advise Her Majesty to dismiss those appeals with costs, they will only advise Her Majesty wholly to affirm the decree of the High Court made on appeal in the suit originally brought and Ananda Nath, No. 28 of 1861, and also to affirm the decree of the High Court made on appeal in the suit originally constituted by Krishnamani Devi against the Collector of Murshidabad, and others in 1849, in which Ananda Nath Rai intervened so far as the question of succession is concerned."

Govindanath was one of nature's noblemen. He was instinctively polite and invariably attentive to the wants and wishes of others, he was respected and loved by those who came into intimate and familiar contact with him. But unfortunately he died a premature death. Both before and since his demise his mother Rani Sibeswari has assumed the management of the estate. Like her mother-in-law Rani Krishnamani, she has shown an aptitude for business. She has been indefatigable in saving the zamindaris and enhancing their profits.

It may be here noticed as the great peculiarity of the Nator family that the women have been immeasureably superior to the men. While the male members have been mediocrities, the female members have been celebrities. The Maharani Bhabani was an extraordinary woman and exhibited business talent of the highest order. She occupied a proud and prominent position among her contemporaries. Rani Krishnamani was endowed with more than average capacity and her efforts as well as those of Rani Sibeswari, for the salvation of the estate, evinced rare capacity and unflagging energy.

During the time of Biswanath, the Nator family was divided into two branches, *viz.*, the senior and the junior, or the Bara Taraf and Chhota Taraf. Sibnath, younger brother of Biswanath, represented the Chhota Taraf. His son, the late Raja Ananda Nath Rai, was a sharp and shrewd man and won his way to rank and distinction. He was orthodox and conservative, and at first was wedded to old world prejudices and generally opposed to reforms. He did his best in rendering ineffectual the efforts of the Deputy Magistrate for the introduction of the first Municipal Act, and generally was antagonistic to reformatory movements, but he subsequently rose above the prejudices of his nursery and inaugurated several undertakings, aiming at the good of the public. At Rampur Boaliya

he erected at a cost of Rs. 10,000 a building for a Library and supplied the books at his own expense. The Library is called after his name. He received from the Government the title of Raja Bahadur and was also made a C.S.I.

Raja Ananda Nath died in 1866, leaving four sons ; the eldest son, Chandranath, was two years ago invested with the title of "Raja Bahadur," and has just been appointed an *Attache* of the Foreign Office of the Government of India. It is to be hoped that he will in this capacity open a new path of distinction for himself and for his countrymen.

We shall now carry our readers to the Dighapatia Raj, the history of which is interwoven with that of the Nator Raj. We have already seen the founder of it Dayaram Rai, proving the good genius of the early chiefs of Nator and the salvation of the Nator estate. We have seen him winning the favour of the Nawab by the courage, activity, and fidelity with which he executed the commissions entrusted to him and receiving from His Excelency the title of *Rai Rayan*. We have seen him the chief mover and main spring of the charities of the Nator family. After his retirement from the service he established several charities in his own estates. In those days the acquisition of the English language and English literature was not as now the passport to wealth and distinction. The Bengali language had not been enriched and it was not thought worth while to cultivate it. The cultivation of the Sanskrit language was then the one thing needful for scholars and gentlemen, and the Rajas and Chiefs of the country thought it their duty to encourage it. Accordingly Dayaram established several *Chatushpathis* in Rajshahi. He founded several religious establishments, namely, the idol Krishna Chandra at Muhammadpur in Jessor, another named Gopal Deb at Binadin in Murshidabad ; he also founded in his Rajbari at Dighapatia three separate idols, namely, Krishnaji, Govindaji, and Gopal. He endowed these establishments with lands. He did his best in supplying the poor with water. He excavated a large Dighi at Gorphu and another at Haguria. He excavated several tanks in his zamindaris and also a Chauki or moat around his Rajbari.

Dayaram was an uncommon man and stood out from the mass of his countrymen as a leader and a guide. He was an illustration of what Goethe says, "we will not say that man is the creature of circumstance ; it would be nearer the mark to say man is the architect of circumstances. Our strength is measured by our plastic power. From the same materials one man builds palaces, another hovels, one ware-houses, another villas ; bricks and mortar are bricks and mortar until the architect makes them some thing else."

The estates Dayaram acquired were as follows :— 1.—Taraf Nandkuja in Pargana Bhaturia. 2.—Taraf Dumai, including Nakhila situated partly

in Bagura and partly in Maimansingh. 3.—Taraf Maul Kalna and Taraf Bharsut situated in Zila Jessor. 4.—Taraf Salimpur situated in Zila Nadiya. Taraf Dumrai is unquestionably the most profitable property of the family ; when it was first let out in *ijara* to Mr. John C. Abbot, it only yielded Rs. 35,000, but thanks to his good management, the accretion of the river and increased cultivation, it now yields Rs. 1,75,000 per annum.

Dayaram Rai died, leaving six children, namely, one son and five daughters ; the son Jagannath Rai succeeded his father but he died a premature death. He had sixteen children, but fifteen of them died successively. The surviving son Prannath Rai succeeded his father. He was a very charitable person and celebrated his mothers' *Sraddha* with great *eclat.* He was succeeded by his adopted son Prasannanath Rai who infused new blood into the family and proved an extraordinary man, achieving for himself the most conspicious position among the contemporaneous Zamindars and Rajas, and standing out from them as a singularly liberal and benevolent representative of the Nobility of Bengal. He was educated in the Zila School at Rampur Boaliya, but did not remain long to acquire a mastery of the English language. But nature supplied him with what he lacked in school learning. He was endowed with a strong common sense and an intimate knowledge of human nature. He could thoroughly appreciate the merits and demerits of those with whom he was brought into intimate and familiar contact. After leaving school he fell into a bad set of Europeans, who tried to tempt him to sensual indulgences and fleece him, but he soon shook off their influence and learned to think and judge for himself. He at last stumbled into the right path and found for himself a field for active usefulness.

At about this time the Sub-divisional system having come into operation, Government determined on establishing a sub-division at Nator the former sadr station of Rajshahi, as it continued to be the seat of the nobility and gently of the district. Owing to be removal of the civil station, the Jail, the Kachharis, and the dwelling houses of the Officers were left to decay and were in a state of complete dilapidation, when a sub-division was established in Nator. At first Mr. Elphinstone Jackson was deputed to Nator, but he did not like the place and stopped there a few days only. In 1848, a Hindu gentleman who had served as an Assistant Magistrate for two years in Rampur Boaliya, was appointed Deputy Magistrate of Nator, and vested with the full powers of a Magistrate. He organized the sub-division, comprising the most populous and important portion of Rajshahi. In the Schools, Dispensaries, Horticultural Exhibitions and other Institutions established by him at Nator, he received valuable assistance from Planters and Zamindars, and especially from the late Prasannanath Rai, the richest as well as the most benevolent

individual in the district.[1] The Commissioner, the Judge, the Magistrate and the Civil Surgeon heartily supported him in his efforts to ameliorate the condition of the people and frequently visited him in his station.

The Deputy Magistrate submitted to the Ferry Fund Committee of Rajshahi a proposal for making a carriage road from Dighapatia to Boaliya, and laid before them an approximate estimate of the cost. While the proposition was under consideration Prasannanath Rai came forward with an offer to the Deputy Magistrate for defraying the entire expenses of the road.

To the Deputy Magistrate of Nator,

Beaulia

Sir,

Being deeply impressed with the conviction that a good road from Diggaputia to Beaulia, would prove a great boon to the district, and understanding that the local subscriptions and the sum of Rs. 7,000 sanctioned by the Government for the repair of the road and the erection of the bridges will be inadequate for the proposal, I therefore request the favour of your communicating to the Ferry Fund Committee, my offer to pay the whole expenses for the road and bridges.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
(Sd.) Prosononauth Roy.

Diggaputtia ;
The 25th June 1850.

The offer was thankfully accepted and the amount paid by the public-spirited Zamindar was Rs. 35,000. The road was first extended from Boaliya to Nator, but has since been further extended to Dighapatia, a distance of three miles.

The time has now arrived for taking an educational survey of Rajshahi.

In 1835 Lord William Bentinck appointed Mr. William Adam, as Government commissioner to conduct enquiries into the state of native education, regarding them to be the first step "to know with all attainable accuracy the present state of instruction in the native institutions and native society." Mr. Adam was eminently qualified for the task. Deeming it impracticable to traverse the entire surface of every district, and personally to inspect the state of education in every thana and village, he restricted his personal enquiries to a thorough examination of the state of education in one of the principal thanas or country towns of each district, which might be accepted as a fair sample of the whole, taking care at the same time, to ascertain the state of education generally in the other thanas and towns. In accordance with this plan, he conducted his enquiries in six districts, and in one city, namely, that of Murshidabad. His returns are the most reliable of the kind hitherto obtained in this country, and comprise a

mass of valuable information illustrative of the moral and intellectual condition of the people. Nator, formerly the capital or sadr station of Rajshahi, and now the most important subdivision of that district, was selected by Mr. Adam for the commencement of his educational survey. Now, as we have had ample opportunities of ascertaining the educational condition of the people, we are well able to appreciate the fidelity of the picture of literary distitution presented by him. He says that the "Bengali Schools in Nator are ten in number, containing 167 scholars, who enter school at an age varying from five to ten years, and leave it at an age varying from ten to sixteen. The teachers consist both of young and middle-aged men, for the most part simple-minded, but poor and ignorant, and therefore having recourse to an occupation which is suitable both to their expectations and attainments, and on which they reflect as little honour as they derive emolument from it." There were those who believed that Mr. Adam erred in one important detail, namely, the comparative numbers of the Hindu and Muhammadan population. But the late census corroborates the calculations of the educational Commissioner. It shows that the Muhammadans of Rajshahi exceed a million, while the Hindus are less than two hundred and ninety thousand, The proportion is almost that of four to one in favour of Muhammadans. We entirely agree with him in thinking that the proportion of Muhammadan to Hindu children receiving instruction is less than one to four. In most of the districts of Bengal, we have found a similar disproportion to prevail ; and it may be sufficiently accounted for by the fact that the Muhammadans constitute the bulk of the rayats, coolies, and Jaliyas, who are unable from their condition in life to secure for themselves or their children any education however rudimentary.

Mr. Adam thus impressively sums up the results of his enquiries at Nator :—"The conclusions to which I have come on the state of ignorance, both of the male and female, the adult and the juvenile population of this district, require only to be distinctly apprehended in order to impress the mind with their importance. No declamation is required for that purpose. We cannot, however, expect that the reading of the report should convey the impressions which we have received from daily witnessing the mere animal life to which ignorance consigns its victims, unconscious of any wants or enjoyments beyond those which they participate with the beasts of the field, unconscious of any of the higher purposes for which existence has been bestowed.—society has been constituted and government is exercised We are not acquainted with any facts which permit us to suppose that in any other country subject to an enlightned Government, and brought into direct and immediate contact with European civilisation, in an equal population there is an equal

amount of ignorance with that which has been shown to exist in this district." And Rajshahi was not a backward or an exceptionally illiterate district. It was and is occupied by an industrious and intelligent population; it boasts of several influential Rajas and large Zamindars, and is the seat of an extensive trade in silk and cereals. In 1835 when Mr. Adam visited the district, there was no well-organised English school.

The Rajshahi of Mr. Adam is only an average specimen of all the districts of Bengal. Similar enquiries in the other localities selected by him led to nearly similar results exhibiting a vast and nearly illimitable intellectual waste.

It thus appears that the aggregate average under instruction of the teachable population of the districts is only 7¾ per cent, thus leaving 92¼ out of every 100 children destitute of any instruction whatever. Our readers can now realise the enoromus amount of educational destitution of Bengal 32 years ago. It is not to be wondered at that, while ignorance was so extensive, organised crime should have prevailed so universally, and Government should have been unable to reckon with confidence on the support of the community. Knowledge is not only power but is a source of safety to the State, while ignorance is a source of weakness and danger to it. Of this truth, the sepoy insurrection affords a striking illustration. The moral and intellectual enlightenment of the people of this country cannot be effected without additional security being thereby given against delusions such as those which shook in 1857 the empire to its foundation. It has been so ordanied by the Almighty and beneficent Author of our being that the development of the mental faculties with which he has endowed us cannot be effected without dispersing those prejudices and errors which menace the peace of society as well as of individuals.

Soon after this investigation a zila school was established and placed in charge of Babu Saradaprasad Bose, who proved an able and successful head-master. The school has produced several excellent and successful young men, of whom Babu Kunjalal Banarji, the Judge of the Small Cause Court of Calcutta, Babu Siba Prasad Sannyal, a Deputy Magistrate of 24-Parganas, and Babu Rudrakanta Lahuri, the late Diwan of the Dighapatia Raj, may be mentioned. In 1847, Babu Loknath Maitri founded an Anglo-Vernacular school at Rampur Boaliya. In 1851, a school was established at Nator by the Deputy Magistrate of the sub-division. It was afterwards amalgamated with the Prasanna Nath Academy, which was inaugurated on the 24th January 1852. There was a large gathering of the European and Native gentry of the district on the occasion. The Deputy Magistrate having been voted to the chair rose and said, "Gentlemen, I thank you for the honour you have done me in voting

me to the chair, and though I could wish you had selected and abler person to fill it, yet I must not shrink from the duty you have imposed on me. I welcome you, gentlemen, a right hearty welcome, to this hall in the name of the enlightened proprietor of the institution, whose inauguration we are assembled to celebrate in the name of the pupils who have this day been admitted there, and in the name of the great cause of education. I conceive it is the duty of every person interested in the welfare of the country, especially of every Native, to endeavour his best to promote that cause. The happiness and prosperity of the people are intimately connected with it. I do not pretend to believe that education is the *panacea* for all the evils with which they are afflicated, for the disease of India is a complicated disease, and requires both moral and physical remedies. I know also that climate and centuries of Muhammadan oppression have largely contributed to produce her degradation, but I am strongly persuaded that ignorance and superstition have had more to do with it than anything else. Why is it that the people are oppressed by the zamindars, fleeced by the mahajans and victimised by the police? Why does the appearance of the chapras frighten the whole village and enable its holder to extort money with impunity? Why is the thana barkandaz so much dreaded in the mufassal that when he is deputed to investigate a death by snake bite, or drowning, his threat to report it as murder and *chalan* the villagers to the *huzur* as implicated in its commission and concealment, elicits a bribe from them? Why? but because the people are ignorant of their rights. Teach them their rights and they will assert them manfully. Give them knowledge and they will realise the Baconian aphorism. Educate them and they will cease to be oppressed and trampled upon. There are, however, those who contend that education would unfit the people for their position in life ; but it is not a liberal but a sound and industrial education that I advocate for the great mass. I would teach them things and not words. I would give a liberal education only to the patrician classes, who will have leisure enough to pursue their studies in after life and render them subservient to the intellectual enlightenment of their countrymen ; but I would inoculate the minds of every class with those generous and elevated principles of religion and morality which are recognised by all creeds and are equally necessary for all men."

"Impressed with these sentiments, I hail the establishment of the 'Prasanna Nath Academy' as a harbinger of better days for Rajshahi. That an opulent and influential zamindar of this district should consecrate a portion of his resources to the maintenance and endowment of a school on such a large scale affords a cheering and auspicious illustration of the growing conviction in this country that those must hold the *masal* who are to walk by its light. Happily the patronage extended by native gentlemen

to the cause of native education has ceased to be an uncommon event; but Babu Prasanna Nath Rai has also entitled himself to the lasting gratitude of the people of this district by another praiseworthy and public-spirited act. I allude to the Nator road towards the repairs of which he has contributed the whole expenses, amounting to, I believe, about thirty-five thousand rupees. He has thus set a nobel example of enlightened liberality to other zamindars. If, instead of fighting with each other to gratify old grudges, or to contest the possession of a single bigha or katha and frittering away vast sums of money in Sraddhas and ceremonies in Naches and *Nam-ka-waste* pujas, they were to emulate each other in performing deeds of public utility and ameliorating the condition of the prostrate and pauperised rayats who toiled for them and ministered to their comforts and luxuries ; I am sure the country would soon exhibit a different aspect. We should soon see every district boasting of its College, its Hospital, its Alms-house, and its Serai. We should see the footsore Jatris, thousands and tens of thousands of whom in hurrying to the Bhagirathi are now annually carried off by cholera, dying on the road side, uncheered by the presence and attentions of those near and dear to them, sungly sheltered under the roof of the local caravanserai. We should see the sick poor of every village receiving medical aid instead of falling victims to the empiricism of the Kabirajs. We should see the stream of knowledge permeating every corner of the country, irrigating and fertilizing the mental soil and, like 'Ganga Mayi,' carrying plenty and happiness in its irresistible and beneficent course."

The Prasanna Nath Academy has turned out severl educated young men and continues to be in an efficient condition.

A dispensary at Nator was founded in 1849 by the Deputy Magistrate of the station. At the first annual meeting of the subscribers to the dispensary, held in 1850, Dr. J. R. Bedford, who presided, pointed out to the institutions founded by the Deputy Magistrate, and compared him to the "Man of Ross." At the second annual meeting of the subscribers of the Nator dispensary, presided over by Prasanna Nath Rai, and held on the 21st April 1851, Dr. J. R. Bedford, as Superintendent to the dispensary, addressed the following letter to the Deputy Magistrate as Secretary to that institution. "Sir, I had fully anticipated the pleasure of being present at the meeting of your committee, summoned for the 14th instant, but the existence of cholera in the jail of this station forbids my quitting it. I regret this the more from your having been good enough to alter the date of meeting for my convenience. I beg you will assure the gentlemen composing the committee of the pleasure which I feel at being associated with them in so truly charitable an undertaking as the promotion of the Nator dispensary, and of my sincere desire to benefit the institution by

every exertion in my power.

"You have the proud satisfaction of feeling that you are in advance in that mightly social change which is now working in HIndustan, and that the wheel of progress has received one of its earliest impulses from your hand, for we may rest assured that no great moral improvement of any race of people can ever be effected unless preceded by physical advantages.

"Whilst urging you onward, however, in this good course you are forwarding so zealously, you will not be discouraged if I say that, you and I, and the whole world have, until within the last few years, been beginning at the wrong end ; our only end has been to cure diseases, altogether overlooking the duty of averting it. Europe is, however, happily awakening from this sleep of apathetic ignorance, and striving hard to make up for lost time. How urgently a similar course of proceeding is required for our Indian towns, none know better than ourselves. At the present time that fell scourge of your countrymen, cholera, is prostrating its victims in all directions. The hale street-labourer of to-day is the corpse of tomorrow ; whole families are swept recklessly away. Are we to look on year by year, fold our hands, and do nothing? Most assuredly not. The Great Creator who permits such a plague to strike down his children, has, you may be sure, provided us with the means of combating or even exterminating so terrible a foe, in resources open to intellectual research. Its origin now is doubtless mainly to be found in the filth and dirt which flank every highway in our Indian cities. The remedy is to be found in the judicious application of sanitary laws,—laws which should be as regorously enforced as those bearing upon moral evil. The source of malaria, and circumstances producing or aiding contagion should be as zealously watched at the origin of crime. The secret pestilence, which steals your child from you in the dead of night, should be as carefully grarded against as the less formidable thief who robs you of your worldly goods. By what means you ask me can such desirable measures be achieved. I reply by the institution of a strict system of Medical Police. Cleanse your streets, purify your tanks, fill up the holes near your houses, which abounding with dirt and jungle, reek with diseases and deaths in every corner. If your present local funds be sufficient for the purpose, let me urge upon you the taking advantage of Act X. of 1842, passed by a paternal Government for your benefit, and forming a Municipal Committee out of the resident householders. As you already stand forward in the race of medical improvement, let it be your boast to be first in the formation of the Municipal Institution I advert to. Once established you will find many imitators, and I venture to took forward to the time when cholera and small-pox shall be spoken of only in connection with the past.

"Should you be induced to carry out my recommendations, I can only say that it will afford me the greatest pleasure to give every possible assistance and to be your officer of health.

"I beg to return the half-yearly statement of cases receiving treatment in your dispensary, and report of the Sub-Assistant Surgeon up to September 1850.

"The first is very satisfactory as evidencing an increased appreciation by the people of the medical advantages offered them, whilst the second affords favourable proof of the ability and zeal of Babu Chandra Kumar Maitri, in charge of the dispensary.

"I would beg to recommend his suggestion of in-door accommodation to your notice, such an addition to your charity is very essential. His inclination to avail himself of efficient native medicine is judicious and should be encouraged."

Dr. Bedford was the earliest sanitarin an in India. He enquired into the practical and scientific condition of sanitary matters in Bengal long before the breaking out of cholera at Mian Mir led the Government of India to adopt measures for the promotion of sanitary progress. He was deeply impressed with the necessity of the removal of ignorance regarding sanitary matters. He advocated the registration of deaths, the variations of climates, the prevalence of particular types of disease, and laid great stress on the clearance of jungles.

Being anxious to perpetuate the school founded by him at Dighapatia, and the dispensary at Nator, as well as to found and endow another dispensary at Rampur Boaliya, Prasanna Nath Rai made over to the Commissioner on the 5th July 1852, a lakh of rupees for the purpose. He addressed the following letter on the subject :—

To

H. STAINFORTH, ESQ.,

Commissioner of the 14th or
Murshidabad Division, Boaliya.

SIR,

With the view of promoting the welfare of the inhabitants of the district of Rajshahi, I am desirous of making over to Government the sum of Co's Rs. (1,00,000) one hundred thousand in Government Promissory Notes, which amount I enclose as subjoined below for the purpose of endowing the existing charitable dispensary at Nator, the school I have recently established at Dighapatia, and of founding a dispensary at Boaliya, which I shall feel obliged by your accepting and administrating for me according to my expressed wishes, at the same time acknowledging the above amount by the usual receipt.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
PRASANNA NATH RAI.

DIGHAPATIA ;
The 5th July 1852.

This generous offer having been communicated to the Government, the following letter was addressed :- –

FROM
THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL,
To
THE OFFICIATING COMMISSIONER OF REVENUE,
14th Division, Murshidabad.
Dated Fort William, the 16th July 1852.

Judicial.

SIR,

I am directed by the Most Noble the Governor of Bengal to acknowledge the receipt of your letter, No. 177, dated the 5th instant, reporting the receipt from Babu Prasanna Nath Rai, Zamindar of Nandkuja, of Government Promissory Notes to the amount of a lakh of rupees, with a year's interest thereon, amounting altogether to Rs. 1,04,567-2 pie, which that gentleman desires to be devoted towards the endowment of the Charitable Dispensary at Nator, and of the school recently established by him at Dighapatia, and also to the foundation of a Dispensary at Boalia.

2. The Governor of Bengal has been pleased to accept this munificent donation, and directs me to convey through you to Babu Prasanna Nath Rai, the high sense which His Lordship entertains of his enlightened charity.

3. His Lordship approves of the measures proposed by you for carrying out the wishes of the Babu in regard to the above Institutions, and is accordingly pleased to appoint a Committee[2] consisting of the officers and gentlemen named in the margin, to superintend the School and Dispensary at Nator, and the Dispensary to be founded at Boaliya under the rules applicable to such Institutions.

The schools and the dispensaries thus endowed by Prasanna Nath Rai will remain monuments of his philanthropy.

In recognition of the valuable services rendered by him to the cause of humanity he received from the Government the title of Raja Bahadur. The Sanad is dated 20th April 1854, but the letter communicating the bestowal of the title is dated 17th May 1854, and is as follows :—

From

THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL,

To,

RAJA PRASANNA NATH RAI BAHADUR.

Dated Fort William, the 17th May 1854.

General
Political.

SIR,

I am directed by the Lieutenant-Governor of Bengal to inform you that the Most Noble the Governor-General of India in Council has been pleased to confer on you the title of Rajah Bahadur.

You will at the time of your investiture receive a *khilat,* consisting of the articles named in the margin.

&c., &c., &c.
(Signed) W. GREY.

The investiture was held at Government House amidst the gathering of different nationalities. The late Maharaja of Patiala and other Chiefs were present. The writer of this paper has a vivid recollection of the Darbar, which was one of the grandest ever held. As soon as Lord Dalhousie entered the Hall the Band struck up. When the Darbaris had resumed their seats, the Governor-General, after a few kingly utterances, invested the Raja Prasanna Nath Rai with the insignia of the title.

On the 10th September 1857, Raja Prasanna Nath Rai was appointed an Assistant Magistrate in the District of Rajshahi; and a body of Police consisting of one Jamadar and twenty Barkandazes was placed under his orders.

The career of Raja Prasanna Nath Rai is an unanswerable refutation of the cry raised some time ago aginst the zamindars as men who have done nothing for the cause of education. We have no hesitation in declaring our conviction that the truth lies exactly in the other way. Far from having done nothing, they have done a great deal in furtherance of that cause. They have been foremost in organizing schools, libraries, dispensaries, and in promoting and extending popular education in every possible way. Their exertions in this direction have been most indefatigable and laudable, and instead of evoking the obloquy of a clique deserve the lasting gratitude of the public. Since the time of Raja Prasanna Nath Rai hundreds of zamindars and educated Hindus have signalized themselves by establishing schools. To illustrate this position would be to cite the thousand and one schools with which the length and breadth of Bengal is studded. There is scarcely a station or sub-station which is without its school or dispensary. Whereas in 1855 and 1856, the year when the grant-

in-aid system came into operation, the number of schools was 145, and the number of pupils attending them was 13,229, we find that in 1866-67, the number of schools increased to 2,907, and the number of pupils attending them was 1,21,108. These figures are a sufficient answer to the charge preferred against the Zamindars and educated natives as non-educationists, a charge which we have no hesitation in pronouncing to be a fiction. The unselfish life of the Raja, devoted to patriotic objects, challenges our unqualified admiration. The ancestors of the Raja Prasanna Nath Ray were no doubt charitable. But his charity was discriminating. It was not exercised on Sraddhas and Naches. It was not displayed in ostentatious manifestations. It sought proper objects and aimed at proper means.

Raja Prasanna Nath was both a generous and a genial man. His social qualities were of a high order. He freely mixed with Europeans and was almost an Englishman in his tastes and habits. His hospitality was kept up in a fine old mufasul style. The scene where this hospitality was exercised was the Rajbari of Digghapatia which the Raja had enlarged and decorated, having built on one side a fine *Nachghar,* and on the other a *Singhi Dalan.* He also built a magnificent gateway. The Rajbari was the rendezvous of the officials, the planters, and the zamindars. These reunions always took place during the *Huli* and *Jhulan* festivals, when the Rajbari and the compound around were beautifully illuminated, and the scene was further enlivened by rich displays of fireworks and music.

Raja Prasanna Nath Rai died in 1861, and his demise was universally regretted, being considered a national calamity. In 1863, his adopted son, Pramatha Nath Rai was, under the provisions of his father's will, admitted as a boarder student at the Calcutta Wards' Institution. He was the only student of the institution who succeeded in passing the University Entrance Examination. During the time he studied at Calcutta, he was under the eye of his mother, a lady uniting rare sagacity with an overflowing benevolance. In November 1867, he attained his majority ; and the first act of his majority was to erect suitable *pakha* buildings for the accommodation of the hospital and dispensary at Rampur Boaliya at an expense of Rs. 10,000, founded by his father. The Lieutenant-Governor in noticing this liberal act expressed his desire that an expression of his gratification might be communicated to Kumar Pramatha Nath Rai at the "earnest he has given by his liberality in this matter" of his intention to make a good use of his ample-fortune. The road from Rampur Boaliya to Dighapatia having fallen into disrepair, Kumar Pramatha Nath Rai followed the example of his father in coming forward to defray the expenses of the road.

In April 1868, he offered to endow the Rajshahi Girls' Aided School

with an amount yielding Rs. 180 per annum. The Lieutenant-Governor accepted the offer and acknowledged the liberality of the Kumar in suitable terms. In the same year he founded three scholarships for the Girl's School at Boaliya.

In 1871, the Commissioner of the Division reported to the Government that Kmmar Pramatha Nath Rai was one of the most intelligent and well behaved Zamindars of Lower Bengal ; that he managed his zamindaries admirably well, and was favourably spoken of by every person coming in contact with him. He therefore recommended that the Kumar should receive from the Government the title of Raja Bahadur. Lord Mayo accordingly granted the Sanad.

The investiture took place at Rampur Boaliya under the auspices of the Commissioner acting as the representative of the Government. The Raja has recently established at his sole expense of Charitable Dispensary at his Kachhari at Nakhila. It has proved an inestimable boon to the sick poor of that part of the country.

There are several Zamindars in Rajshahi who call themselves Rajas. They have certainly not been ennobled by the Government, but they possess large landed properties, on the strength of which their retainers and rayats address them as Rajas. Among them may be mentioned Haranath Chaudhri of the Sunri caste, commonly called Raja of Dobalhati ; Maheswar Rai, a high-cast Brahman, commonly called Raja of Taharpur ; and Ruhinikant Rai, also a Brahman, is commonly called Raja of Chauganga. There is a Muhammadan family at Bagha of which the representative is called the Khankar ; he is unquestionably the rais or chief of the Muhammadan community.

The Padma or Great Ganges touches on Rajshahi on the south-west side and holds a course south-east for 65 miles. The Mahananda flowing from the north continues its southerly course and falls into the Padma at Godavari, which is a police station and a great rice mart. The other principal rivers traversing Rajshahi are the Narad, the Baral, the Atrai, the Jamuna and Gadai. The district is drained by a large lake called the Bhilchalan extending to about 30 miles. The peculiarity of this *bhil* is, that it not only grows rice, but that the plants rise in proportion to the height of the water. There are two other *bhils,* called Dulabari and Manda. Besides these rivers and *bhils,* the district is intersected by an infinity of jhils and minor streams, rendering intercommunication during the rains very easy. Besides rice which is the staple crop, there are other agricultural products, such as wheat and barley, pulse and cereals ; the fibrous plants and oil seeds have of late been extensively cultivated. Of fruit trees the mango may be mentioned as the principal. This is not to be wondered at, as Rajshahi adjoins Maldah, the land of the mangoes. Sherel

Motakharim, a historical narrative of India, mentions Bagha in Rajshahi, the seat of the Khankar, as famous for mangoes. Cocoanut does not grow in this district as it is not penetrated by sea air ; there being only one garden-house at Rampur Boaliya, called Nimai Shaw's house where a few plants may be found. The most important manufactured articles are indigo and silk. In former days, Government carried on the manufacture of silk on a large scale. The sadr manufactory was situated at Rampur Boaliya, and the house is now known as the bara kuti ; Mr. Robert Burney being for a long time commercial Resident. It was situated at some distance from the Padma, but the river has now come up to its gate. It is now owned by Messrs. J. and R. Watson, who are the largest silk manufacturers and indigo planters.

The following are the marts :—Tagachi, Taharpur, Suryapur, Sardah, Nandangachi, Chaurghat, Pankai, Bagatipara, Galimpur, Dhobul, and Raipur ; most of these are rice marts, while others are centres of trade in *dhal* and cereals. The articles chiefly exported are linseed, musur and kansari *dhal*, sissamums, rye, and the produce of other spring crops.

The bhils and jhils above mentioned abound with game as well as fish. Of wild animals the tiger, deer, and buffalo may be mentioned. They inhabit a large jungle called the jungle of Chaplai, extending to sixteen miles.

Nator, once the head-quarters of the largest zamindari, has vanished, as have greater cities in India,—Gaur for example.

But the altered condition of Rajshahi is not a source of unmitigated regret. The former state of the district contrasts in many respects strikingly with her present condition. During the days of the founder of the Nator Raj and him immediate successors, every thing, the buildings and the bazars. the mandirs and minarets, conveyed an impression of wealth but not of culture. Then came the collapse of the estate of Nator during the time of Maharaja Ramkrishna. The ability which had founded the Raj was extinct ; Ramkrishna was helpless to arrest its disintegration. Out of that disintegration rose several Zamindars large and small. Contemporaneous with its downfall was the prevalence of crime and lawlessness, usurping the place of order. Then the removal of the sadr station from Nator to Rampur Boaliya deprived the former of its grandeur. But the genius that had consolidated the Nator Raj and founded the house of Dighapatiya was not extinct in the family of Dayaram. His immediate successors, although neither so able nor so clear-headed, were not destitute of capacity for business. They never lost a bigha of land, but on the coutrary made additions to their zamindaries. When the English Government took root, things changed for the better, crime was repressed and education was promoted ; so that the Rajshahi of the present day is an

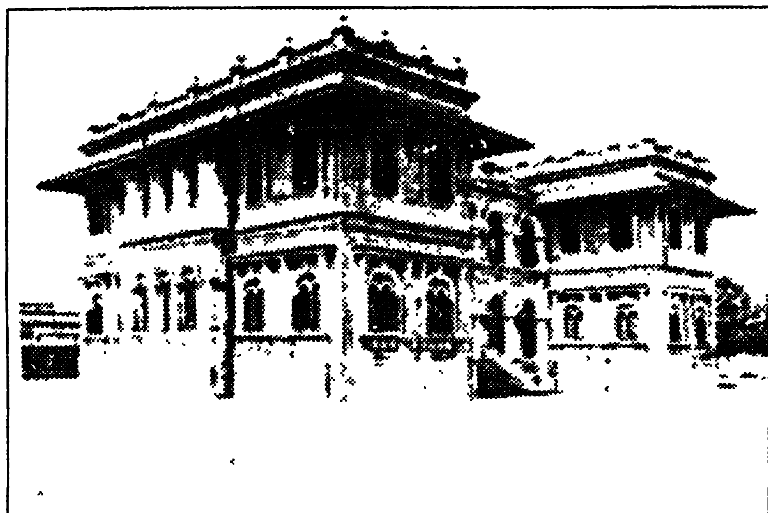
improvement upon the Rajshahi of Ramkrishna. The police which was a disgrace and a scandal has been superseded by a comparatively efficient and pure administration of criminal justice. Dispensaries have been established for the sick poor of the district, and schools and libraries have multiplied. Thus we see retrogression has been followed by progress.

Calcutta Review, 1873

—

1. When the Office of Deputy Magistrate was first created, a superior class of young men was appointed to it. They were picked persons of birth and education, cadets of leading families and distinguished alumni of the Hindu College who made their stations the centres of new life and light. This class was afterwards supplemented by an admixture of Sarishtadars and Peshkars, Darogas and Muharrirs, *et hoc genus omne*. The reason of the appointment of the latter persons was their local experience; but the efficiency and respectability of the Uncovenanted Civil Service has much suffered.

2. Commissioner, Judge, Collector.
Magistrate, Civil Surgeon, *Ex-officio*.
Babu Prasanna Nath Rai.
Babu Loknath Maitri.
Maulvi Abdul Ali.
Babu Gopal Lal Mitra.
Babu Nilmani Basak.
Babu Mathuranath Banerji.

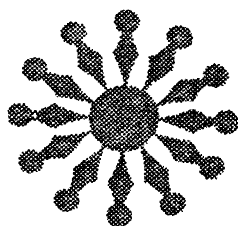


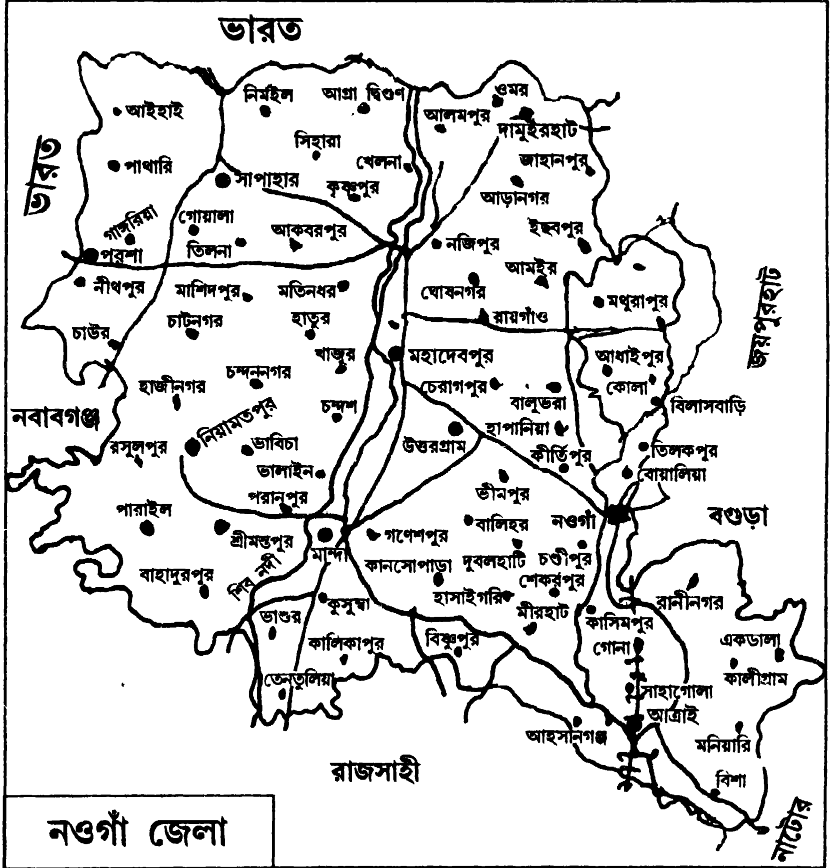
রাজসাহী কলেজ

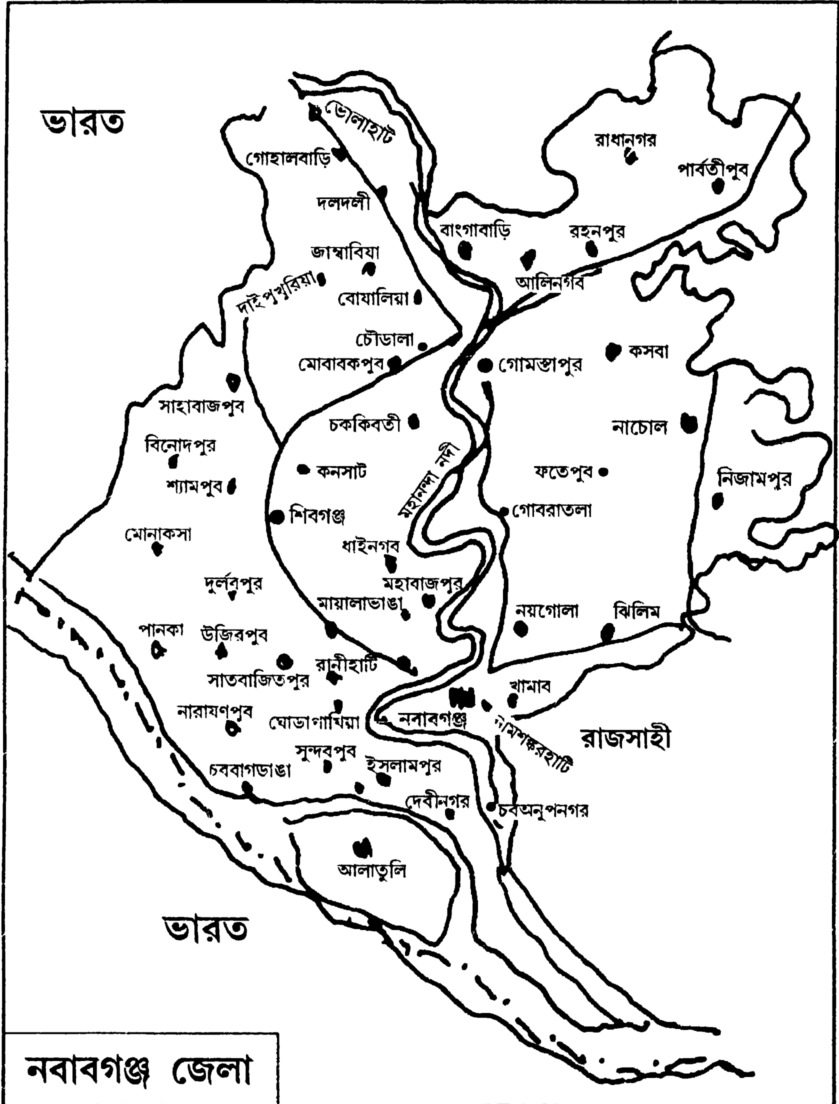


নাটোর রাজপ্রাসাদ

মানচিত্র




ভারত
ভারত
জয়পুরহাট
নবাবগঞ্জ
বগুড়া
রাজসাহী
নাটোর
নওগাঁ জেলা
আইহাই
নির্মইল
আগ্রা দ্বিগুণ
ওমর
আলমপুর
দামুইরহাট
পাথারি
সিহারা
খেলনা
জাহানপুর
সাপাহার
কৃষ্ণপুর
আড়ানগর
গাঙ্গুরিয়া
গোয়ালা
আকবরপুর
ইছবপুর
পরশা
তিলনা
নজিপুর
আমইর
নীথপুর
মাশিদপুর
মতিনধর
ঘোষনগর
মথুরাপুর
চাউর
চাটনগর
হাতুর
রায়গাঁও
খাজুর
মহাদেবপুর
আধাইপুর
হাজীনগর
চন্দননগর
চেরাগপুর
কোলা
বালুভরা
বিলাসবাড়ি
নিয়ামতপুর
চন্দশ
হাপানিয়া
রসুলপুর
ভাবিচা
উত্তরগ্রাম
কীর্তিপুর
তিলকপুর
ভালাইন
বোয়ালিয়া
ভীমপুর
পরানপুর
পারাইল
বালিহর
নওগাঁ
শ্রীমন্তপুর
গণেশপুর
মান্দা
চণ্ডীপুর
দুবলহাটি
কানসোপাড়া
বাহাদুরপুর
শিব নদী
শেকরপুর
কুসুম্বা
হাসাইগরি
রানীনগর
মীরহাট
কাসিমপুর
ভাণ্ডর
কালিকাপুর
বিষ্ণুপুর
একডালা
গোনা
তেঁতুলিয়া
কালীগ্রাম
সাহাগোলা
আত্রাই
আহসানগঞ্জ
মনিয়ারি
বিশা

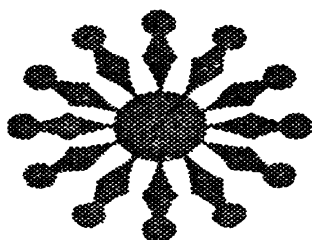

ভারত
ভোলাহাট
গোহালবাড়ি
দলদলী
রাধানগর
পার্বতীপুর
বাংগাবাড়ি
রহনপুর
জাম্বাবিয়া
আলিনগর
দাইপুখুরিয়া
বোযালিয়া
চৌডালা
মোবারকপুর
গোমস্তাপুর
কসবা
সাহাবাজপুর
চককিবতী
নাচোল
বিনোদপুর
কনসাট
ফতেপুর
নিজামপুর
শ্যামপুর
মহানন্দা নদী
শিবগঞ্জ
গোবরাতলা
মোনাকসা
ধাইনগর
দুর্লভপুর
মহারাজপুর
মায়ালাভাঙা
নয়গোলা
ঝিলিম
পানকা
উজিরপুর
রানীহাটি
সাতবাজিতপুর
খামার
নারায়ণপুর
ঘোড়াপাখিয়া
নবাবগঞ্জ
রামশঙ্করহাটি
রাজসাহী
সুন্দরপুর
ইসলামপুর
চরবাগডাঙা
দেবীনগর
চরঅনুপনগর
আলাতুলি
ভারত
নবাবগঞ্জ জেলা


রাজসাহী জেলা
নওগাঁ
নবাবগঞ্জ
কলমা
কামাবগাঁও
বাধইর
পচান্দর
তালোন্দা
নরডাস
গোবিন্দপাড়া
আচপাড়া
শুভডাঙা
বসুপাড়া
তাহেরপুর
ঝিকবা
মারিয়া
হামিরকুৎসা
গোয়ালকান্দি
তানোর
ঘাসীগ্রাম
মোহনপুর
বাগমারা
ধুবাইল
সবণজাই
জাহানাবাদ
গোনীপুর
পাকবি
ঋষীকুল
বকসীমইল
কিসমতগামাকৈর
গোদাগারী
গোগরাহ
দর্শনপাড়া
জয়নগব
নেওপাড়া
হরমাপুব
সিলমারিয়া
মাটিকাটা
দেওপাড়া
দুর্গাপুব
বড়গাছি
দেলুয়াবাড়ি
চবশারিয়াদহ
পারিল
ঝালুকা
ভালুকগাছি
সপুবা
হরিয়ান
হবিপুব
পবা
বেলপুকুবিয়া
বানেশ্বব
পুথিয়া
কাজলা
সরদহ
সারদা
নাটোর
চারঘাট
লক্ষ্মীপুর
মনিগ্রাম
বাঘা
বাওসা
ভারত
পাকুবিয়া
গড়গড়ি
কুষ্টিয়া

বগুড়া
নওগাঁ
ছাতরদিঘি
রমানন্দ জোড়া
সুকাশ
খাজুরিয়া
মাধবনগর
সিংড়া
ইটালী
লালোর
ব্রমাপুর
আত্রাই
পিপরুল
কদম
ঢাহিয়া
বড়াল নদী
হাতিয়ানদহ
বিপ্রাবেল্ঘরিয়া
চামরি
সিরাজগঞ্জ
দিঘাপতিয়া
চাটনী
নাজিরপুর
বিয়াঘাট
নাটোর
কাফুরিয়া
হালসা
গুরুদাসপুর
তেবাড়িয়া
বড়হারিশপুর
চাপিলা
জামনগর
ধরাবরিয়া
মোসিন্দ
লক্ষ্মীপুর
বাগাতিপাড়া
দয়ারামপুর
বড়াইগ্রাম
নন্দকুজা নদী
পাকা
জোনাইল
জোয়ারী
মাজগাঁও
পাবনা
কদম
নগর
ওয়ালিয়া
চংটপইল
চণ্ডাই
আরবাব
গোপালপুর
দুরদারিয়া
দুয়ারিয়া
গোপালপুর
বিলমারিয়া
ঈশ্বরদি
গঙ্গা নদী
কুষ্টিয়া

নাটোর জেলা

সং যো জ ন



আজকের রাজসাহী

১.

বৃহত্তর রাজসাহী

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
১. রাজসাহী	১. পবা	১. হড়গ্রাম
	২. পবা	২. হুজুরীপাড়া
	৩. গোদাগাড়ি	৩. গোগ্রাম
	৪. গোদাগাড়ি	৪. গোগ্রাম
	৫. তানোর	৫. সরনগর
	৬. তানোর	৬. সরনগর
	৭. মোহনপুর	৭. মৌগাছি
	৮. বাগমারা	৮. মাড়িয়া
	৯. দুর্গাপুর	৯. দেলুয়াবাড়ি
	১০. পুঁঠিয়া	১০. কান্দ্রা
	১১. চারঘাট	১১. ইউসুফপুর
	১২. বাঘা	১২. মণিগ্রাম
	১৩. বাঘা	১৩. মণিগ্রাম
২. নাটোর	১. বড়াই গ্রাম	১. কালিকাপুর
	২. লালপুর	২. বিলমাড়িয়া
	৩. নাটোর	৩. তেবাড়িয়া
	৪. নাটোর	৪. ছাতনী
	৫. গুরুদাসপুর	৫. চাপিলা
	৬. গুরুদাসপুর	৬. নাজিরপুর
	৭. গুরুদাসপুর	৭. মশিন্দা
৩. নওগাঁ	১. রাণীনগর	
	২. নিয়ামতপুর	
	৩. নওগাঁ সদর	
৪. নবাবগঞ্জ	১. নবাবগঞ্জ সদর	
	২. শিবগঞ্জ	
	৩. গোমস্তাপুর	
	৪. নাচোল	
	৫. জেলাহাট	

* সূত্র : বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার-বৃহত্তর রাজসাহী ১৯৯১। ঢাকা
* Satistical Account of Bengal W. W. Hunter, Vol. VIII
* চাপাই নবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি—মাঘ হারুল ইসলাম তক

উপজেলাগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা : ১৯৮১

রাজসাহী

উপজেলা	আয়তন (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা : ১৯৮১
১. বাগমারা	১৪১	২৩৫১৬৬
২. বোয়ালিয়া	২০	১৪২১১৭
৩. চারঘাট	১৩৫	২৫৯১৩০
৪. দুর্গাপুর	৭৫	১১১৭৬৪
৫. গোদাগাড়ি	১৮৪	১৭২২৪০
৬. মোহনপুর	৬৩	১০০০৭৪
৭. পবা	১৯০	১৮০৪৯০
৮. পুঁঠিয়া	৭৫	১২৬৯৯৪
৯. তানোর	১১৫	১১৩২৩০
১০. বাঘা	—	—

নাটোর

১. বাগাতিপাড়া	৫৩	৮৭৪৬৭
২. বড়াইগ্রাম	১১৬	১৭০৮০৭
৩. গুরুদাসপুর	৭৭	১৩৩৭৭৪
৪. লালপুর	১১৪	১৭৫৭৫১
৫. নাটোর	১১৫	২৭৪৩৪০
৬. সিংড়া	৭৭	২২৪০১৯

নওগাঁ

১. আত্রাই	১১০	৮০৯৬১
২. বাদলগাছি	৮৯	১৬২৬৬৯
৩. ধামইরহাট	১১৬	১২৪৩৮৪
৪. মান্দা	১৫৮	২৪৭০২৬
৫. মহাদেবপুর	১৪৩	১৯৬৭৮৮
৬. নওগাঁ	১০৬	২৫৭৮৭৯
৭. নিয়ামতপুর	১৭৪	১৫০২৯৭
৮. পত্নীতলা	১৪৭	১৫২৯৮৭
৯. পোরশা	৯৮	১৩৯৫৬১
১০. রানিনগর	৯৯	১২৪৫৬১
১১. সপাহার	৯৫	৮৪৮৪৬

নবাবগঞ্জ

১. ভোলাহাট	৪৮	৫৫৩৩৮
২. গোমস্তাপুর	১৩৬	১৫৩৭৬৭
৩. নাচোল	১১০	৭৪৮৮৮
৪. নবাবগঞ্জ	১৮১	৩১৫৬৯৬
৫. শিবগঞ্জ	১৯২	৩৩৩৫১০

পুলিশ সার্কেল ও থানা

জেলার নাম	সার্কেল	থানা
রাজসাহী	সদর	১. কোয়ালিয়া
		২. পবা
		৩. তানোর
		৪. মোহনপুর
		৫. গোদাগাড়ি
	পুঁঠিয়া	৬. পুঁঠিয়া
		৭. দুর্গাপুর
		৮. চারঘাট
		৯. বাগমারা
		১০. বাঘা
নাটোর	নাটোর	১১. নাটোর
		১২. বাগাতিপাড়া
		১৩. সিংড়া
	বড়াইগ্রাম	১৪. লালপুর
		১৫. বড়াইগ্রাম
		১৬. গুরুদাসপুর
নওগাঁ	নওগাঁ	১৭. নওগাঁ
		১৮. আত্রাই
		১৯. রানিনগর
	মহাদেবপুর	২০. মান্দা
		২১. নিয়ামতপুর
		২২. মহাদেবপুর
	পত্নীতলা	২৩. পত্নীতলা
		২৪. ধামইরহাট
		২৫. বাদলগাছি
		২৬. সাপাহার
নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ	২৭. নবাবগঞ্জ
		২৮. শিবগঞ্জ
		২৯. ভোলাহাট
	গোমস্তাপুর	৩০. নাচোল
		৩১. পোরশা
		৩২. গোমস্তাপুর

জেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস : ১৯৮২

১. রাজসাহী সদর	১০. গুরুদাসপুর	১৯. বড়াইগ্রাম
২. সদর জয়েন্ট	১১. ভবানীগঞ্জ	২০. বাদলগাছি
৩. নাটোর	১২. সিংড়া	২১ বোনপাড়া
৪. নওগাঁ	১৩. আবদুলপুর	২২. নিয়মতপুর
৫. আত্রাই	১৪. প্রসাদপুর	২৩. মোহনপুর
৬. মহাদেবপুর	১৫. পুঁঠিয়া	২৪. রানিনগর
৭. নবাবগঞ্জ	১৬. ধামুইরহাট	২৫. নাচোল
৮. গোমতীপুর	১৭. শিবগঞ্জ	২৬. তানোর
৯. পত্নীতলা	১৮. পোরশা	২৭. বাঘা
	২৮. ভোলাহাট	

২.
শিক্ষায় অগ্রগতি

রাজসাহীর জমিদারদের বেশিরভাগই ছিলেন শিক্ষানুরাগী। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তারা ছিলেন আগ্রহী। নানা ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন, শিক্ষিত মানুষের মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, নারী শিক্ষার প্রসার, দুর্ভিক্ষ দুর্দিনে দুঃস্থ প্রজাদের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নানাবিধ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সার্বিক মঙ্গলের উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছিলেন।

রাজসাহী সভা নামে যে সংগঠনটি গড়ে ওঠে, তার সভাপতি ছিলেন জেলার কালেক্টর। ১৮৭১ সালে এই সভায় সদস্য ছিলেন ২০ জন স্থানীয় শিক্ষিত মানুষ। পাক্ষিক সভায় মিলিত হয়ে সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন সদস্যরা। প্রতিটি সদস্য আলোচনার জন্য এক একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থিত করতে পারতেন।

নাটোরের জমিদার আনন্দনাথ রায় রামপুর বোয়ালিয়ায় যে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, সেখানে জমিদার পরিবারের নিয়মিত অনুদান ছাড়াও ছিল সদস্যদের চাঁদা। বাংলা সরকার গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি পত্রপত্রিকা পাঠাতেন। ১৮৭১-৭২ সালে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি রিপোর্টে জানা যায়, গ্রন্থাগারে তখন বইয়ের সংখ্যা ৩২৪৭। ৬টি পত্রিকা আসত নিয়মিত। ১৮ জন গ্রাহকের মধ্যে ৬ জন ছিল য়ুরোপীয় এবং ১২ জন দেশীয় ব্যক্তি। এদের ছিল তিন শ্রেণি। ২ টাকা ৮ আনা, এক টাকা ৮ আনা এবং ৮ আনা—মাসিক চাঁদার ভিত্তিতে সদস্যদের ভাগ করা হয়েছিল। সদস্যরা বই বা পত্রপত্রিকা বাড়িতে নিয়ে পড়াশুনা করতে পারত। গ্রন্থাগার সদস্যদের জন্য ৬ ঘণ্টা খোলা থাকত। একজন গ্রন্থাগারিক ছিল সবেতন। তাহলেও আর্থিক অনটন ছিল প্রবল—যা গ্রন্থাগারটি সুষ্ঠু পরিচালনার অনুকূল ছিল না।

এক সময়ে রাজসাহী থেকে প্রকাশিত হত ধর্মসভার মুখপত্র "হিন্দুরঞ্জিকা" নামে একটি সাময়িক পত্র। ১৮৭১ সালে এর প্রচার সংখ্যা ছিল ২৭৫ কপি। ধর্মসভার ধর্মীয় আলোচনা ছাড়াও পত্রিকায় সাধারণ সংবাদ এবং কখনও কখনও রাজনীতির আলোচনাও থাকত। "রাজসাহী নিউজ" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। ১৮৭১ সালে প্রচার সংখ্যা ছিল ১৫০ কপি। ধর্মীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সংবাদও থাকত এই পত্রিকায়।

ইংরেজ শাসন প্রসারে সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে। পাঠশালা শিক্ষার ক্ষেত্রেও

প্রসারিত হতে থাকে। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ একটি ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন ১৮৬৮ সালের অক্টোবর। তারপর ধীরে ধীরে হলেও নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটে। পাঠশালায় মেয়েরা পড়তে যেত। তাদের আগ্রহ বাড়লেও, বহু পরিবারই ছিল নারী শিক্ষায় অনাগ্রহী। নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রগতি না ঘটার অন্যতম কারণ ছিল এদের প্রতিবন্ধকতা।

কিন্তু সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার জন্য তখনও নানারকম ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথায়' (১ম খণ্ড) রাজসাহীতে রাণী ভবানীর বার্ষিক অর্থ সাহায্যে যে সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হত তার উল্লেখ করেছেন।

১. বাসুদেবপুর—শ্রীনাথ সার্বভৌমর ব্যাকরণ—চতুষ্পাঠী।
২. সামসখালি—কালীনাথ বাচস্পতির ব্যাকরণ—চতুষ্পাঠী।
৩. বোরিয়া (চৌগাঁ থানা)—রুদ্রকাণ্ড ভট্টাচার্যেব—চতুষ্পাঠী।
৪. বেজপাড় আমহাটিতে গদাধর সিদ্ধান্ত ও কাশীনাথ ন্যায় পঞ্চাননের চতুষ্পাঠী।
৫. শ্রীপতি বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী।

হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৮৫৬ সালে রাজসাহী জেলায় যে দুটি বিদ্যালয় ছিল, এর একটি ইংরেজি বিদ্যালয়, অপরটি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ভার্নাক্যুলার স্কুল। সেখানে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৬০-৬১ সালে আরও ৫টি ভার্নাক্যুলার স্কুল স্থাপিত হয়। দেখা যাচ্ছে ১৮৭০-৭৩ সালের মধ্যে শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটে। বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও বাড়তে থাকে। উচ্চবিদ্যালয়, মিডল স্কুল, প্রাইমারি স্কুল, নর্মাল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে জেলার বিভিন্ন স্থানে।

ও'ম্যালির গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, ১৯১৫ সালের মধ্যে জেলার শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। সেসময়ে ৯২২টি সরকারি এবং ২৩টি বেসরকারি বিদ্যালয় ছিল। সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৬,২২৬ জন এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১,২৩৮ জন। মোট ৯৪৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ছিল :

	সংখ্যা	শিক্ষার্থী
চারুকলা বিদ্যালয়	১	৭৩০
উচ্চবিদ্যালয়	৯	২৮১৪
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়	৩৬	৪১১৫
মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৭	৩৭৩
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৮	৩৬৩৩
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬৪	২৪৬০৩
অন্যান্য বিদ্যালয়	৫০	১১৯৬

কলেজ : ১৯৪৭

	স্থাপনের সময়	স্বীকৃতি পায়
১. রাজসাহী সরকারি কলেজ, রাজসাহী	১৮৭৩	১৮৭৮
২. আদিনা ফজলুল হক কলেজ, আদিনা, নবাবগঞ্জ	১৯৩৮	১৯৬৪

কলেজ : ১৯৪৭-১৯৭১

১. প্রেমতলী কলেজ, প্রেমতলী, রাজসাহী সদর	১৯৬৭	১৯৭২
২. রাজসাহী সিটি কলেজ, রাজসাহী	১৯৫৮	১৯৬১
৩. রাজসাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজসাহী	১৯৬২	১৯৬৩
৪. রাজসাহী সিটি কলেজ (নৈশ), রাজসাহী	১৯৫৮	১৯৫৮

	স্থাপনের সময়	স্বীকৃতি পায়
৫. শাহ মখদুম কলেজ, রাজসাহী	১৯৬৯	১৯৬৯
৬. আদর্শ মহাবিদ্যালয়, হরিয়ান, রাজসাহী	১৯৭০	১৯৭০
৭. মোহনপুর কলেজ, খোর্দমোহনপুর, রাজসাহী	১৯৭০	১৯৭০
৮. তাহেরপুর কলেজ, তাহেরপুর, রাজসাহী সদর	১৯৬৭	১৯৭২
৯. বানেশ্বর কলেজ, বানেশ্বর, রাজসাহী সদর	১৯৬৪	১৯৭০
১০. রাজসাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজসাহী সদর	১৯৬৮	১৯৬৮
১১. নওগাঁ ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ	১৯৬২	১৯৬৩
১২. আরানী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, আরানী, রাজসাহী	১৯৬৮	১৯৬৮
১৩. মান্দা এম. এম কলেজ, মান্দা, নওগাঁ	১৯৭০	১৯৭০
১৪ জাহাঙ্গীর কলেজ, মহাদেবপুর, নওগাঁ	১৯৬৭	১৯৬৭
১৫. রাইগাঁও মহাবিদ্যালয়, রাইগাও, নওগাঁ	১৯৭০	১৯৭০
১৬. ধামইরহাট এম. এম. কলেজ, পানসিপাড়া, নওগাঁও	১৯৭০	১৯৭০
১৭. মোল্লা আজাদ এম. কলেজ, আহসানগঞ্জ, নওগাঁ	১৯৬৮	১৯৬৮
১৮. নবাবগঞ্জ কলেজ, নবাবগঞ্জ	১৯৫৫	১৯৬৬
১৯. চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহিলা কলেজ, নবাবগঞ্জ	১৯৬৯	১৯৬৯
২০. কৃষ্ণগোবিন্দপুর কলেজ, কৃষ্ণগোবিন্দপুর, নবাবগঞ্জ	১৯৭০	১৯৭০
২১. পোরশা কলেজ, পোরশা, নওগাঁ	১৯৭০	১৯৭০
২২. রহেনপুর ইয়াসিন আলি কলেজ, রহেনপুর, নওগাঁ	১৯৬৭	১৯৭২
২৩. সোলমান কলেজ, কানসাট, নবাবগঞ্জ	১৯৬৮	১৯৬৮
২৪. নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কলেজ, নাটোর	১৯৫০	১৯৬১
২৫. দিঘাপতিয়া কলেজ, দিঘাপতিয়া, নাটোর	১৯৭০	১৯৭০
২৬. আবদুলপুর কলেজ, আবদুলপুর, নাটোর	১৯৬৮	১৯৭২
২৭. শহিদ আফরোজ কলেজ, সিংড়া, নাটোর	১৯৬৯	১৯৭২
২৮. গোলে আফরোজ কলেজ, সিংড়া, নাটোর	১৯৭০	১৯৭০

১৯৭২-৭৩ সালে স্থাপিত কলেজ

১. ফজর আলি এম. কলেজ, সুন্দাশালা, রাজসাহী সদর	১৯৭২	১৯৭২
২. তালান্দা ললিত মহাবিদ্যালয়, তালান্দা, রাজসাহী	১৯৭২	১৯৭২
৩. আবদুর করিম সরকারি মহাবিদ্যালয়, তানুর রাজসাহী	১৯৭২	১৯৭২
৪. গোদাগাড়ি মহিউদ্দীন মহাবিদ্যালয়, গোদাগাড়ি, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
৫. নিউ গভর্ণমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, রাজসাহী	১৯৭২	১৯৭২
৬. রাজবাড়ি কোর্ট মহাবিদ্যালয়, রাজসাহী কোর্ট, রাজসাহী	১৯৭২	১৯৭২
৭. কফিলউদ্দিন মেমোরিয়াল কলেজ, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
৮. সাউহাটা মহাবিদ্যালয়, ললিতগঞ্জ, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
৯. ভবানীগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, ভবানীগঞ্জ, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
১০. দাওকান্দি মহাবিদ্যালয়, ধোপঘাটা, রাজসাহী	১৯৭২	১৯৭২
১১. লস্করপুর মহাবিদ্যালয় নিকেতন, পুঁঠিয়া, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
১২. নাজমুল হক মহাবিদ্যালয়, মণিগ্রাম, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
১৩. শাহদৌল্লাহ, কলেজ, বাঘা, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩

	স্থাপনের সময়	স্বীকৃতি পায়
১৪. সারদা মহাবিদ্যালয়, সারদা, রাজসাহী	১৯৭৩	১৯৭৩
১৫. নওগাঁ বি.এম.সি. কলেজ, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
১৬. কীর্তিপুর কলেজ, কীর্তিপুর, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
১৭. নওগাঁ কলেজ, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
১৮. শহিদ মেজর নাজমুল হক মহাবিদ্যালয়, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
১৯. বালাতৈর এম. এইচ. কলেজ, বালাতৈর, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
২০. বাদলগাছি কলেজ, বাদলগাছি, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
২১. নাজিরপুর মহাবিদ্যালয়, পত্নীতলা, নওগাঁ	১৯৭৩	১৯৭৩
২২. শেরে বাংলা মহাবিদ্যালয়, রানিনগর, নওগাঁ	১৯৭২	১৯৭২
২৩. নাচোল কলেজ, তিলনা, নওগাঁ	১৯৭৩	১৯৭৩
২৪. সাপাহার মহাবিদ্যালয়, সাপাহার, নওগাঁ	১৯৭৩	১৯৭৩
২৫. তিলনা কলেজ, তিলনা, নওগাঁ	১৯৭৩	১৯৭৩
২৬. শহিদ নামুল হক কলেজ, নলদানাঘাট, নাটোর	১৯৭২	১৯৭২
২৭. বাসুদেব কলেজ, বাইদা, বেলগাছিয়া, নাটোর	১৯৭২	১৯৭২
২৮. রানি ভবানী মহাবিদ্যালয়, নাটোর	১৯৭৩	১৯৭৩
২৯. মধ্যনগর মহাবিদ্যালয়, মধ্যনগর, নাটোর	১৯৭২	১৯৭৩
৩০. লালপুর মহাবিদ্যালয়, লালপুর, নাটোর	১৯৭২	১৯৭২
৩১. গোপালপুর মহাবিদ্যালয়, গোপালপুর, নাটোর	১৯৭২	১৯৭২
৩২. ধনপাড়া মহাবিদ্যালয়, হারুয়া, নাটোর	১৯৭৩	১৯৭৩
৩৩. বরাইগ্রাম মহাবিদ্যালয়, বরাইগ্রাম, নাটোর	১৯৭৩	১৯৭৩
৩৪. কালাম মহাবিদ্যালয়, কালাম, নাটোর	১৯৭৩	১৯৭৩

রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্নাতক কলেজ : ১৯৭৭-৭৮

১. রাজসাহী সরকারি কলেজ
২. রাজসাহী নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ
৩. সরকারি মহিলা কলেজ
৪. রাজসাহী সরকারি সিটি কলেজ
৫. বাণেশ্বর কলেজ
৬. তাহেরপুর কলেজ
৭. নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা কলেজ
৮. শহিদ সামসুজ্জোহা কলেজ
৯. আবদুলপুর সরকারি কলেজ
১০. নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ
১১. আদিনা ফজলুল হক সরকারি কলেজ
১২. নবাবগঞ্জ মহিলা কলেজ
১৩. রহনপুর ইউসুফ আলি কলেজ
১৪. সোলেমান কলেজ
১৫. নওগাঁ সরকারি ডিগ্রি কলেজ
১৬. বি. এম. সি. কলেজ

রাজসাহী সরকারি কলেজ

রাজসাহী শহরের মধ্যস্থ ও সুপ্রস্ত ভূখণ্ডের ওপর কলেজের সুবৃহৎভবন, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ও মনোরম উদ্যান। এক সময় রাজসাহী সরকারি কলেজ ছিল অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। এর জন্ম ১৮২৮ সালে একটি বেসরকারি ইরেজি স্কুল হিসাবে। স্থানীয় জমিদারদের আর্থিক সহযোগিতা এবং স্থানীয় মানুষের আগ্রহে ১৮৭৩ সালে স্কুলটি সরকারি কলেজে পরিণত করা হয়েছিল। সেই সময় দুবলহাটার রায়বাহাদুর হরনাথ রায় এবং স্থানীয় জমিদাররা আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন। যার ফলে কলেজের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। ১৮৭৭ সালে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন কলেজের

উন্নতির জন্য। কলেজের সার্বিক উন্নয়নে এই অর্থের প্রয়োজন ছিল। তখন বাংলার যাবতীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিতে হত। এই কলেজের পক্ষে অনুমোদন লাভে কোন অসুবিধা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর নতুন অনুমোদনে কলেজের পাঠক্রম এগিয়ে যেতে থাকে। দেশ ভাগের পর ১৯৫৩ সালে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, বিশ্ববিদ্যালয় এই সরকারি কলেজকে অনুমোদন দেয়। কলেজে কলাবিভাগ স্নাতক পর্যায়ে এবং আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু হয় যথাক্রমে ১৮৮১ এবং ১৮৮৩ সাল থেকে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৯ সালে কলেজের পাঠক্রমে এইসব বিষয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে দেওয়ায়, এই অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারে সংকট দেখা দিয়েছিল।

এইভাবেই কলেজ সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম নিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে জটিলতা মুক্তি পেতে থাকে। দেশ ভাগের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পর রাজসাহী কলেজে নতুন নতুন বিষয় পাঠ্যসূচীভুক্ত হযেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর চালু হলেও, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে তা বন্ধ করে দিতে হয়।

রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান আমলে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ আই. এইচ. জুবেরী। সে সময়ে নিজস্ব ভবন ছিল না। বড় কুঠিতে ছিল প্রশাসনিক দপ্তর এবং রাজসাহী কলেজের ভবনে স্নাতকোত্তর কোর্সের পড়াশোনা হত। রাজসাহী শহরের তিন মাইল পূব দিকে মতিহারে নিজস্ব ভবন তৈরি হয়। প্রথম দিকে শিক্ষা ও আইন অনুষদে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন।

১৯৫৫-৬৪ সনে ৩৫ এবং ১৯৭৭ সনে ৩৭৭ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। এখন এই শিক্ষক সংখ্যা বেড়েছে। প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয় ২০টি কলেজকে অনুমোদন দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ব্যাপক রূপ পেয়েছে। পাঠক্রমও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৫৪-৭২ সনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অনুষদে (কলা, বাণিজ্য), বিজ্ঞান ও আইন অনুষদে ৩০টি কোর্সে পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছে। বাণিজ্য অনুষদ বর্তমানে দুভাবে বিভক্ত : হিসাব শাস্ত্র ও ব্যবস্থাপনা।

কলা অনুষদ	স্নাতকোত্তর কোর্স	সম্মান কোর্স
১. বাংলা	১৯৫৫-৫৬	১৯৬২-৬৩
২. ইংরেজি	১৯৫৪-৫৫	ঐ
৩. আরবি	১৯৬৫-৬৬	১৯৭২-৭৩
৪. সংস্কৃত	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৯-৬০ সাল থেকে বন্ধ
৫. দর্শন শাস্ত্র	১৯৫৪-৫৫	১৯৬২-৬৩
৬. ইতিহাস	১৯৫৪-৫৫	ঐ
৭. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১৯৫৫-৫৬	ঐ
৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৩-৬৪
৯. সমাজ বিজ্ঞান	১৯৬৪-৬৫	১৯৭০-৭১
১০. সমাজ কর্ম	১৯৭০-৭১	১৯৭০-৭১
১১. অর্থনীতি	১৯৫৪-৫৫	১৯৬২-৬৩

বাণিজ্য অনুষদ		
১. বাণিজ্য	১৯৫৭-৫৮	১৯৬২-৬৩
২. হিসাব শাস্ত্র	১৯৭১-৭২	১৯৭১-৭২
৩. ব্যবস্থাপনা	১৯৭১-৭২	১৯৭১-৭২
বিজ্ঞান অনুষদ		
১. পদার্থ বিদ্যা	১৯৫৮-৫৯	১৯৬২-৬৩
২. ফলিত পদার্থ বিদ্যা	১৯৬৬-৬৭	১৯৭১-৭২
৩. রসায়ন	১৯৫৮-৫৯	১৯৬২-৬৩
৪. ফলিত রসায়ন	১৯৬৬-৬৭	১৯৭১-৭২
৫. উদ্ভিদবিদ্যা	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬
৬. প্রাণীবিদ্যা	১৯৭১-৭২	১৯৭০-৭১
৭. ভূতত্ত্ব ও খনিজ	—	১৯৭৫-৭৬
৮. পরিসংখ্যান	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
৯. অংকশাস্ত্র	১৯৫৪-৫৫	১৯৬২-৬৩
১০. ভূগোল শাস্ত্র	১৯৫৫-৫৬	ঐ
১১. মনোবিজ্ঞান	১৯৫৭-৫৮	১৯৬২-৬৩
আইন অনুষদ		
১. এল. এল. বি.	১৯৫৪-৫৫	......
২. এল. এল. এম	১৯৭০-৭১	......
৩. ব্যবহার শাস্ত্র *		
শিক্ষা অনুষদ		
১. ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৮-৫৯ সালে থেকে বন্ধ
২. এম. এড.	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১ সাল থেকে বন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস

১. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক হল
২. শাহ মখদুম হল
৩. সৈয়দ আমির আলি হল
৪. মুন্নুজান হল
৫. নুয়ার আবদুল লতিফ হল
৬. শহিদ শামসুজ্জোহা হল
৭. শহিদ হাবিবুর রহমান হল
৮. মাদার বকাস্ হল

অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্র ঃ

বৃহত্তর রাজসাহী জেলায় প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৌশল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন ও বয়নবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

* এই বিষয়টি ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে এল. এল. বি. অনার্স হিসাবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (বি. আই. টি) (রাজসাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়)— ১৯৪৬ সালে স্থাপিত। ছাত্র সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ছাত্রদের জন্য আছে মূল্যবান গ্রন্থাগার, খেলার মাঠ এবং ব্যায়ামাগার।

রাজসাহি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় ১৯৮২-৮৩ সালে।

রাজসাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট—১৯৬৩ সালে স্থাপিত হয়েছে। বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বিষয়ে কমার্শিয়াল ও ট্রেড কোর্স চালু আছে। সঙ্গে আছে ছাত্রাবাস ও গ্রন্থাগার।

ডায়মন্ড জুবিলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল—১৮৯৮ সালে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থাপিত। এখান থেকে গুটিপোকার বীজ রপ্তানি হত জাপান, ইতালি ও ইংলন্ডে। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে। বোর্ডকে আর্থিক সাহায্য করতেন নাটোরের মহারাজা। কাসিমপুরের রায় কেদার প্রমথ লাহিড়ী বাহাদুর ১৫ হাজার টাকা, পুঁঠিয়ার মহারাণী হেমন্তকুমারী ৬ হাজার টাকা এবং রাণী মনোমোহিনী ৫ হাজার টাকা দান করেন। এছাড়াও বহুজনের দান ছিল। রেশম শিল্পের অবনতির পর বিদ্যালয়টির প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পায়। ১৯৫৫ সালে এই বিদ্যালয়কে ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুলে পরিণত করার পর এখানে সাব-ওভারশিয়ার, আমিন, সার্ভেয়ার ও কানুনগোদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। রেশম শিল্প ও গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয় একটি সিল্ক টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নবকলেবরে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে।

পশমবয়ন বিদ্যালয়—১৯২৯ সালে যাত্রা শুরু। ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় — ১৯২৭ সালে স্থাপিত। জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যার ফলে, বৃহত্তর রাজসাহী জেলায় তাঁত শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

রাজসাহী জেলায় ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই শুরু। দরগাপাড়ায় মখদুম মসজিদে ও হাতেম খাঁ-র ওহাবি মসজিদের সংশ্লিষ্ট মক্তব দুটিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মেহেদিপুর কাদিরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ মসজিদে মক্তব ছিল। রাজসাহী সরকারি কলেজ আরবি ও ইসলামি শিক্ষাপ্রদানের অনুমোদন পায়। রাজসাহী সরকারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমে সবকারি কলেজের প্রাঙ্গণে। ১৯২৮ সালে মাদ্রাসা উঠে আসে বর্তমান স্থানে। এবং সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩০ সালে মাদ্রাসা পরিচালনা করতে থাকে জনশিক্ষা দপ্তর। ১৯৪০ সালে পরিণত হয় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। ১৯৭৭-৭৮ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪১০ জন। ১৯৭৪-৭৫ সালে সরকারি পরিচালিত একটি হাই মাদ্রাসাসহ জেলায় মোট ২৮৭টি মাদ্রাসা ছিল। এর মধ্যে মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭,৩৯০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১,২৬৮ জন। এই সময়ে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪,২৫.৩৯৫। বেসরকারি ভাবে পরিচালিত দুটি আলিয়া মাদ্রাসা আছে রাজসাহী জেলা ও নবাবগঞ্জ জেলায়।

১৯৭৫-৭৬ সালে মাদ্রাসা দুটির চিত্র

স্থাপিত		ছাত্র	শিক্ষক	আয়	ব্যয়
১৯৫৭	১. দারুল সালাম আলিয়া মাদ্রাসা রাজসাহী	১৬৫	২০	৫২,২০৪.৫৬	৪৬,৮০৮.৭৬
১৯৩৯	২. সবুকরটি হেফজল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ	১৯২	১৭	৯০,৫৩২.৯২	৮৩,৯১৫.২৮

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের মাদ্রাসা : ১৯৭৮-৮৭

বছর	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল	মোট
১৯৭৮	৭৫	২০	১৬	২	১১৩
১৯৮২	৯৫	২১	২২	২	১৪০
১৯৮৩	৯৭ (বালিকাদের)	২১	২২	২	১৪০
১৯৮৫	১৪১	২৫	২৩	২	১৯১
১৯৮৬	১৬৪	৩৪	২৭	৩	২২৮
১৯৮৭	১৩৯	৩৫	২৮	৪	২০৬

সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা

বিভিন্ন প্রকার মাদ্রাসা	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
দাখিল	৭৭৬	১৪,৫৫০
আলিম	২৫২	৫,২৫০
ফাজিল	৩৩০	৬,৬০০
কামিল	৩৬	৭০০

মাদ্রাসা শিক্ষক এবং ছাত্র সংখ্যা ঃ ১৯৮৪-৮৫

জেলা	মাদ্রাসা			শিক্ষক			ছাত্র					
	দাখিল	আলিম	কামিল	দাখিল	আলিম	কামিল	দাখিল		আলিম		কামিল	
							ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
নওগাঁ	৪৭	১৮	২	৩০৭	১২০	৬২	৩৯৫৮	১১৯৭	১৯৪৩	৩৭৮	১৪৫৫	৪০০
নাটোর	৬১	৭	—	২৭১	৭৯	—	৪৩১৪	৮১৪	৮২৯	৬৯	—	—
নবাবগঞ্জ	৪৬	১৫	১	৬৬৪	২৪৭	১৬	৭৪৭৫	২২৫	৩০৯০	২৫০	৩৯০	—
রাজসাহী	৪২	৩	৩	৩৪৭	৪৫	৫৮	৬৭২০	৯৬৪	৮৮৩	২০০	৯১০	৩৭০
বৃহত্তর রাজসাহী	১৬৯	৪৩	৬	১৫৮৯	৪৯০	১৩৬	২২৪৬৭	৩২০০	৬৭৪৫	৮৯৭	২৭৫৫	৭৭০

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবতেদায়ি মাদ্রার শিক্ষক ও ছাত্র : ১৯৮৪-৮৫

জেলা	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট
নওগাঁ	৭৯	২৮১	৩৮০৮	১৫৯২	৫৪০০
নাটোর	৩২	১৪৭	২৪৭৫	১১৮৫	৩৬৬০
নবাবগঞ্জ	১৯	৬৭	২৬৬০	১০৫০	৩৭১০
রাজসাহী	৯৩	২৭৭	৪৯৩৬	২৪৪১	৭৩৭৭
বৃহত্তর রাজসাহী	২২৩	৭৭২	১৩৮৭৯	৬২৬৮	২০১৪৭

হামেজিয়া মাদ্রাসা, শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা : ১৯৮৪-৮৫

জেলা	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট
নওগাঁ	২৬	৮৩	১০৪৬	২০৩	১২৪৯
নাটোর	৪	১২	৩৫৪	১৪৫	৪৯৯
নবাবগঞ্জ	১৩	৫৯	৬৬৭	১৮৮	৮৫৫
রাজসাহী	১৭	৩৯	৮৮৭	৪৮	৯৩৫
বহত্তর রাজসাহী	৬০	১৯৩	২৯৫৪	৫৮৪	৩৫৩৮

৩
চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা

পূর্ববাংলার অন্যান্য জেলার মত রাজসাহীর সর্বত্র ছিল জ্বর প্লীহারোগে ও কলেরার প্রকোপ। তবে জেলার সর্বত্র অবস্থা একরকম ছিল না। সব থেকে অস্বাস্থ্যকর ছিল নাটোর। বিশেষ করে জেলার দক্ষিণাংশ। সেখানে বিলাঞ্চলের জমা জল ছিল রোগের উৎস।

হান্টারের বিবরণে আছে : "The diseases epidemic to Rajshai are those most commonly met with other Districts of Lower Bengal : viz. fevers, both remittent and intermittent; hepatic affections; splenic enlargements ; dysentery and diarrhoea, Elephantiasis is not common, nor is bronchocele, although a few cases of the latter are met with in the country to the east of Nattor. Cholera accured rather extensively in some parts of the district in 1869, but nowhere in an epidemic form. The year 1871 was a particularly in healthy one; cholera is reported as having been present almost throughout the year. Fevers and swallpox were also present in an epidemic form. The following year 1872, on the alter hand, is reported as having been of the healthiest on recored"*

হান্টার রোগের উৎস হিসাবে বৎসর ব্যাপী নানাধরনের ধর্মীয় ও ব্যবসাভিত্তিক মেলাগুলির উল্লেখ করেছেন। বড় শহরে বা গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত এইসব মেলা। যার পরিণতিতে দেখা দিত কলেরা বা অন্যান্য রোগ। জঘন্য নোংরা পরিবেশে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হত। যেখানে স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন ব্যাপারই ছিল না। যেসব সাধুসন্ন্যাসী বা ব্যবসায়ীরা সমবেত হত, তারাও নানারকম সংক্রামক রোগ বহন করে আনত। সে সময়ের বড় আকারের মেলাগুলির অন্যতম কয়েকটি হল :

১. মান্দা— চৈত্র মাসের মেলা।
২. খেতুব (বড়গাছির কাছে)— কার্তিক মাসের মেলা।
৩. বুদপাড়া (লালপুর থানার কাছে)— দেওয়ালি উপলক্ষে মেলা।
৪. কাশিমপুর (সিংড়া থানা)— পনের দিনের মেলা।
৫. তাহিরপুর— জগন্নাথের রথ যাত্রার মেলা।
৬. গোদাগাড়ি থানা— মুসলমানদের অধ্যুষিত অঞ্চলে সমাবেশ ও মেলা।
৭. বাঘা— ইদের মেলা।

এই সময়ে পরিবেশ দূষিত হয়ে রোগের প্রকোপ বাড়ত। আবদ্ধ জলরাশিতে মশা জন্ম নিত। পানীয় জল সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। নদী-নালা-খাল-বিলের জল গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যেত। স্বল্প জলই ছিল মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কাপড় কাচা, বাসন মাজা থেকে গরু স্নান করা সবই হত ঐ জলে। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তখন লোকে মশারিও ব্যবহার করত না। রোগ সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। ম্যালেরিয়া রোগ ব্যাপক আকার নিয়ে গ্রামের পর গ্রামের মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। রাজসাহী তার থেকে বাদ পড়ত না।

*Statistical Account of Bengal-- W. W. Hunter. Vol VIII. P. 122

ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রান্ত বিবরণ : ১৯১৬

স্থান	মোট রোগীর সংখ্যা	রোগের প্রাদুর্ভাব কাল
বালিহার	৬১৯	শ্রাবণ ও কার্তিক
ভান্দারপুর	১১,২৭২	আষাঢ় ও আশ্বিন
রুকুৎসা	১,২৬৬	আষাঢ়
চৌগ্রাম	১,৮৫৫	শ্রাবণ ও আশ্বিন
গোদাগাড়ি	৪,০৬০	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
ঘোয়াড়ি	৭০২	আষাঢ় ও শ্রাবণ
কালিয়াগঞ্জ	৪,৩৫১	শ্রাবণ
কামারগাঁও	১,৯৮৩	শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ
কাসিমপুর	১,০১৮	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
লালপুর	১,২০৪	কার্তিক ও অগ্রহায়ণ
মহাদেবপুর	১,৩৩৬	শ্রাবণ
মান্দা	৩৪১	আশ্বিন
নওগাঁ	২,৮২০	শ্রাবণ ও আশ্বিন
নাটোর	৫,৭৪০	আষাঢ় ও ভাদ্র
পানানগর	১,২৬২	শ্রাবণ
পুঁঠিয়া	৩,৭৮২	কার্তিক
রামপুর-বোয়ালিয়া	১০,৭৩৩	ভাদ্র আশ্বিন, কার্তিক
তাহিরপুর	২,৬৭২	শ্রাবণ

এই অঞ্চলের মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। স্থানীয় ধনবান ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সরকার কেবলমাত্র ওষুধপত্র ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি সরবরাহ করত। হান্টারের বিবরণে এরকম কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্রে উল্লেখ আছে।

১. **নাটোর ব্রাঞ্চ ডিসপেনসারি**— ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয়েছিল। সরকার থেকে ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি দেওয়া হত। খরচ চলত প্রসন্ননাথ রায়ের জনহিতকর ভাণ্ডার থেকে। ডিসপেনসারির বাড়িটি ছিল অস্বাস্থ্যকর।

২. **রামপুর বোয়ালিয়া ডিসপেনসারি**— ১৮৬৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল। একজন দেশীয় ডাক্তারের বেতন বছরে ৭২ পাউন্ড (অর্থাৎ ৭২ টাকা) এবং চিকিৎসার ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সরকার থেকে দেওয়া হত। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের জনহিতকর ভাণ্ডারের দান থেকে এবং অন্যান্য স্থানীয় দান থেকে খরচ চালানো হত। ডিসপেনসারি বাড়িটি ছিল সন্দরভাবে তৈরি। স্থানও ছিল পর্যাপ্ত। ১৮৭১ সালের জ্বর ও কলেরার প্রকোপের সময় এখান থেকে ব্যাপক সাহায্য করা হয়েছিল।

৩. **করচামারিয়া ব্রাঞ্চ ডিসপেনসারি**— ১৮৬৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল। সরকার থেকে পাওয়া যেত ওষুধ এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি। দুজন ধনবান জমিদার বাবু রাজকুমার সরকার এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দানে ডিসপেনসারি চলত। এখানে কেবল বহিরাগত রোগীদেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি ছিল একটি বিল ও জলাভূমি অঞ্চলে। কারণ বছরের প্রায় সাত মাস অঞ্চলটি এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত যে, এখানে চিকিৎসার উপযোগী ওষুধপত্র পৌঁছাত না। জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকত

না। সে কারণে এখানে চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। বাড়িটি ছিল শক্ত ও মজবুত। বেশ কয়েকখানি ঘরও ছিল। রোগী দেখা, ওষুধ দেওয়া এবং মহিলা রোগীদের দেখার ব্যবস্থা ছিল এইসব ঘরে। স্থানীয় জমিদাররা চিকিৎসালয়টির তদারক করত।

৪. **পুঁঠিয়া ব্রাঞ্চ ডিসপেনসারি**— ১৮৬০ সালে স্থাপিত হয় পুঁঠিয়ার জমিদার পরেশনারায়ণ রায়ের উদ্যোগে। স্থানটি তখনই ছিল জনবহুল। সরকার থেকে ওষুধ ও অস্ত্রোপচার উপযোগী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হত।

৫. **লালপুর ব্রাঞ্চ ডিসপেনসারি**— ১৮৬৭ সালে স্থাপিত হয় পঁটিয়ার জমিদারদের সহযোগিতায়। সরকার থেকে ওষুধপত্র এবং অস্ত্রোপচার উপযোগী যন্ত্রপাতি দেওয়া হত। এই চিকিৎসালয়টি এমন একটি স্থানে স্থাপিত হয়েছিল, যার আশপাশের বহু দূর পর্যন্ত চিকিৎসার কোনও সুযোগই ছিল না।

এসব ছাড়াও বারিন্দ, গোদাগাড়ি, নওগাঁ, ঠাকুরমান্দা এবং চৌগ্রাম ও কালিগঞ্জে চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল। যখন সেটেলমেণ্ট হত; তখন জেলা বোর্ড একজন ডাক্তার নিয়োগ করত চিকিৎসার জন্য। বহু দূরদূরান্ত অঞ্চল থেকে রোগাক্রান্ত মানুষজন আসত সেখানে।

জেলার বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রের আন্তবিভাগে রোগীর সংখ্যা : ১৮৭২

চিকিৎসালয়	স্থাপিত	মোট রোগীর সংখ্যা	সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রাপ্ত	সুস্থ না হওয়া রোগী	মৃত	বছর শেষে আবাসি রোগী	মৃতের শতকরা হার	দৈনিক গড়পড়তা রোগী
১. রামপুর-বোয়ালিয়া চিকিসালয়	১৮৬৩	২৭৭	২০৮	২১	৪১	৭	১৮.৮০	১৩.৩৭
২. নাটোর ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	১৮৫১	১০০	৭২	১৩	১৩	২	১৩.৯০	৫.৮৭
৩. করচামারিয়া ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	১৮৬৯	—	—	—	—	—	—	—
৪. পুঁঠিয়া ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	১৮৬০	১৫	১২	—	৩	—	২০.০০	.০৫
৫. লালপুর ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	১৮৬৭	২৫	১৬	৮	—	১	—	১.৫৬
মোট		৪১৭	৩০৮	৪২	৫৭	১০	১৩.৬৩	—

বহির্বিভাগে রোগী ও অন্যান্য তথ্য : ১৮৭২

চিকিৎসালয় রোগীর সংখ্যা পাঃ	মোট রোগীর হাজিরা শিঃ	প্রতিদিন জটিল ফাঃ	শৈলকরণ সাধারণ পাঃ		সরকারি বিনামূল্যের ওষুধ শিঃ	সরকারি আর্থিক সাহায্য ফাঃ	অন্য খরচ পাঃ	মোট খরচ শিঃ
১. রামপুর বোয়ালিয়া চিকিৎসালয়	২,৯৫৫	৩৮.৩৪	১৫	১৭	১১৩০০	১৫১৪০	১১৮১৪০	১১৪৮০
২. নাটোর ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	৩,৭৫০	৩১.২৭	২৯	১৫৭	১৫৭৮০	২২১৪০	১৭১১৪০	১৯৪৮০
৩. কারচামারিয়া ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	১,০৯৩	১৬.৭০	১	২৮	৬৬০০	১৬১০০	৬৬০০	৮২১০০
৪. পুঁঠিয়া ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	২,৬৪৪	১৯.৬৫	৪	১৩০	১১৩২০	১৯১৬০	১১৩২০	১৩২১৮০
৫. লালপুর ব্রাঞ্চ চিকিৎসালয়	৮৫৭	১১.২১	৩	—	১১২০০	১০৪০	১১২০০	১২২৪০

দাতব্য চিকিৎসালয় : ১৯১৪

জেলাবোর্ড পরিচালিত চিকিৎসালয়	সরকার পারিচালিত ডাক্তারখানা	বেসরকারি চিকিৎসালয়	সরকারি চিকিৎসালয়	পৌরসভা চিকিৎসালয়
ভানুদারপুর	কালিহার	দীঘাপতিয়া	সারদা	নাটোরের রামপুর
চৌগ্রাম	কাসিমপুর	ধৃবালহাটি		বোয়ালিয়া
		লালপুর		
গোদাগাড়ি	কালিগঞ্জ	নওগাঁ মিশন		
যোয়াড়ি	কাসিমপুর	নাটোর (ব্রজ-সুন্দরী)		
		পাতুল হাপানিয়া		
কামারগাঁও	...	রামপুর বোয়ালিয়া মিশন		
মন্দা (ঠাকুর)	মহাদেবপুর			
নওগাঁ	পুঁঠিয়া			
পালানগর	তাহিরপুর			

১৯৬১ সাল পর্যন্ত রাজসাহীতে ম্যালেরিয়া ছিল প্রধান রোগ। সারা বছরে এই রোগেই মারা পড়ত বেশির ভাগ মানুষ। শরৎকালে যখন বন্যার জল শুকিয়ে আসত, তখন অর্থাৎ আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া ছড়াত বেশি। জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কমিশন নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের পর এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আসে।

ম্যালেরিয়া ছাড়াও কলেরা, বসন্ত, আমাশয় ও উদরাময়, যক্ষা, কালাজ্বর, কুষ্ঠরোগ, ক্যান্সার, নানাবিধ রোগের প্রকোপও ছিল।

রোগ প্রতিরোধে ১৮৬৫ সালে রাজসাহীতে স্থাপিত হয়েছিল সদর হাসপাতাল। পরবর্তীকালে প্রায় ১০০ বছর পরে ১৯৬২ সালে এই হাসপাতালই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সময়ে হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ছিল ১৫০। নবপর্যায়ে হাসপাতাল উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। সদর হাসপতালে ৯০ একর জমির ওপর তৈরি হয় নতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। শয্যাসংখ্যা হয় ৫০০। পরে বেড়ে হয়েছে ৬৭০। সদর হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বাদে সব বিভাগ নিয়ে আসা হয় এখানে। এই দুটি বিভাগও ১৯৮৩ সালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখনও সদর হাসপাতালে বেশ কয়েকটি রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

দাতব্য চিকিৎসালয় সংক্রান্ত তথ্য : ১৯১৪

ডাক্তারখানার নাম	শয্যা সংখ্যা পুরুষ	শয্যা সংখ্যা নারী	আন্তর্বিভাগীয় রোগী	বহির্ভাগীয় রোগী	মোট	আয়	ব্যয়
রামপুর বোয়ারিয়া	২৪	৯	৭৬৩	২৭,৮১২	২৮,৫৭৫	১৭,৮১৭	১১,৪৯১
নাটোর	১২	৪	৩২৩	১৩,৬১০	১৩,৯৩৩	৪,৪৬২	৩,৩০৭
নওগাঁ	৪	২	১২২	১১,৬২৪	১১,৭৪৬	৫,৫৭৩	৪,২৭৫
বালিহার	২	২	৬	৮,৩৬৩	৮,৩৬৯	২,৯৭৮	২,৯৭৮
ভান্দারপুর	..	...	...	৪,৬৯০	৪,৬৯০	১,৩৮২	১,১২৩
রুক্যুৎসা	...	...	...	৬,০৬৬	৬,০৬৬	১,১৭০	৮৩৭
গোদাগাড়ি	...	...	...	৯,১৪০	৯,১৪০	৩,৫০১	৩,২১৬
যোয়ারি	...	...	...	৬,১১৬	৬,১১৬	২,০২৬	১,৩৩৭

ডাক্তারখানার নাম	শয্যা সংখ্যা পুরুষ	নারী	আন্তর্বিভাগীয় রোগী	বহির্ভাগীয় রোগী	মোট	আয়	ব্যয়
কালিয়াগঞ্জ	...	...	...	১০,৮৪৮	১০,৮৪৮	১,৬৪৫	১,৬৪৫
কামারগাঁও	...	...	...	৬,৪২৪	৬,৪২৪	১,১৪৭	১,০৫৩
কাসিমপুর	...	...	...	৩,৭৯৭	৩,৭৯৭	৮৮৮	৮৮৮
লালপুর	...	...	...	৩,১৮০	৩,১৮০	৯৩৫	৯৩৫
মহাদেবপুর	...	...	...	৪,৪৪০	৪,৪৪০	৮৮৪	৮৮৪
মান্দা	...	...	...	৫,৬৩৪	৫,৬৩৪	১,৭৪২	১,৩১৬
পানানগর	..	...	...	৫,৮৫০	৫,৮৫০	১,৩০৭	১,১৪৫
পুঁঠিয়া	...	...	...	১১,০৬০	১১,০৬০	১,৮৫০	১,৮৫০
পাতুয়াল	...	...	...	৪,১৪০	৪,১৪০	৮৩৭	৮২৪
তাহিরপুর	...	..	...	৭,৭০৪	৭,৭০৪	১,৮০০	১,৮০০

দীঘাপতিয়ার জমিদার রাজা প্রসন্ননাথ রায় ১৮৪৭ সালে স্থাপন করেছিলেন নাটোর জেলা হাসপাতাল। এই হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয় ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বহন করতেন রায় পরিবার। তারপর এই হাসপাতাল সরকার অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে হাসপাতালের উন্নয়ন ঘটেছে। শয্যাসংখ্যাও বেড়েছে।

জেলা বোর্ড পরিচালিত নওগাঁ হাসপাতাল ১৮৯১ সালে স্থাপিত। কিন্তু হাসপাতালের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৪৪ সালে সরকার হাসপাতালটি অধিগ্রহণ করে। চিকিৎসা সম্প্রসারিত হয়েছে।

একটি দাতব্য চিকিৎসালয় হিসাবে চাঁপাই নবাবগঞ্জ হাসপাতাল ১৯১৬ যাত্রা শুরু করে। ১৪ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল ১৯৪৯ সালে সরকার অধিগ্রহণের পর উন্নয়ন কার্যে হাত দেওয়া হয়। শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৫০। চিকিৎসার সুব্যবস্থার কারণে আবাসিক ও বহির্বিভাগীয় রোগীয় সংখ্যা বাড়তে থাকে।

রাজসাহী শহরের খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল ১৮৭৭ সালে যাত্রা শুরু করলেও, নিয়মিতভাবে চিকিৎসা শুরু হয় ১৮৯০ সাল থেকে। কিন্তু দক্ষ কর্মচারীর অভাবে চিকিৎসার কাজ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলত মন্থরভাবে। ১৯৪৭ সালের পর কাজ বাড়তে থাকে এবং ১৯৫০ সালে বর্তমান ভবনটি নির্মাণের পর নানাবিধ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। আন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগ হয়েছে। দূর-দুরান্ত থেকে বহু রোগী আসে এখানে। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত শয্যা সংখ্যা ছিল ১২০।

জেলা রাজসাহীর আরও কয়েকটি হাসপাতাল হল :

১. পুলিশ হাসপাতাল
২. পুলিশ ট্রেনিং কলেজ হাসপাতাল— সারদা
৩. কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল
৪. যক্ষ্মা ক্লিনিক— রাজসাহী। ১৯৫৬ সালে স্থাপিত।

মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র : ১৯৮০

৫. আবদুলপুর মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।—সরকারি
৬. মোতজারহাট মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।—সরকারি
৭. নওগাঁ মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।—সরকারি

৮. নওগাঁ মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।
৯. নবাবগঞ্জ মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র। —বেসরকারি
১০. নবাবগঞ্জ মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র। —বেসরকারি
১১. রাজসাহী সদর মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র।—বেসরকারি

সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় : ১৯৮০

১২. নওহাটা দাতব্য চিকিৎসালয়	নওহাটা	পবা
১৩. দুর্গাপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর
১৪. বাগমারা দাতব্য চিকিৎসালয়	বাগমারা	বাগমারা
১৫. শিবপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	বানেশ্বর	পুঁঠিয়া
১৬. সারদা দাতব্য চিকিৎসালয়	সারদা	চারঘাট
১৭. আড়ানি দাতব্য চিকিৎসালয়	আড়ানি	চারঘাট
১৮. বাঘা দাতব্য চিকিৎসালয়	বাঘা	চারঘাট
১৯. কামারগাঁও দাতব্য চিকিৎসালয়	কামারগাঁও	তানোর
২০. মাদারীপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	কামারগাঁও	তানোর
২১. তালান্দা দাতব্য চিকিৎসালয়	তালান্দা	তানোর
২২. ঋষীকুল দাতব্য চিকিৎসালয়	ঋষীকুল	গোদাগাড়ি
২৩. পাকরি দাতব্য চিকিৎসালয়	পাকরি	গোদাগাড়ি
২৪. নাড়াইল দাতব্য চিকিৎসালয়	ঋষীকুল	গোদাগাড়ি
২৫. হাটরা দাতব্য চিকিৎসালয়	বায়গাহী	মোহনপুর
২৬. নসরতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	বেলগাড়িয়া	নাটোর
২৭. মাধনগর দাতব্য চিকিৎসালয়	মাধনগর	সিংড়া
২৮. হালুহুলিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়	হালশুলিয়া	সিংড়া
২৯. চৌদ্দগ্রাম দাতব্য চিকিৎসালয়	চৌদ্দগ্রাম	সিংড়া
৩০. জামনগর দাতব্য চিকিৎসালয়	জামনগর	বাগাতিপাড়া
৩১. আওলিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়	আওলিয়া	লালপুর
৩২. লালপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	লালপুর	লালপুর
৩৩. রাণীনগর দাতব্য চিকিৎসালয়	রাণীনগর	রাণীনগর
৩৪. বালিয়াডাঙা দাতব্য চিকিৎসালয়	বালিয়াডাঙা	নবাবগঞ্জ
৩৫. মহারাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	মহারাজপুর	নবাবগঞ্জ
৩৬. নমসবকারবাটি দাতব্য চিকিৎসালয়	নমসরকারবাটি	নবাবগঞ্জ
৩৭. আয়হায় দাতব্য চিকিৎসালয়	আয়হায়	গোরশা
৩৮ শাহগোরশা দাতব্য চিকিৎসালয়	শাহগোরশা	গোরশা
৩৯. মনোহর দাতব্য চিকিৎসালয়	তেতুলা	গোরশা
৪০. মনাকশা দাতব্য চিকিৎসালয়	কনাকশা	শিবগঞ্জ
৪১. দাইনগর দাতব্য চিকিৎসালয়	দাইনগর	শিবগঞ্জ
৪২. মোবারকপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	হামাতকুড়ি	শিবগঞ্জ
৪৩. ময়নাম দাতব্য চিকিৎসালয়	ময়নাম	মান্দা
৪৪. প্রাসাদপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	প্রাসাদপুর	মান্দা
৪৫. নরুল্লাবাদ দাতব্য চিকিৎসালয়	নুরুল্লাপুর	মান্দা
৪৬. বাঘা বিষ্ণুপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	আরানগর	ধামইরহাট

৪৭. খেল্না দাতব্য চিকিৎসালয়	খেল্না	ধামইরহাট
৪৮. কাসিমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়	আগ্রাদিগ্রাম	ধামইরহাট
৪৯. ইসলামঘাট দাতব্য চিকিৎসালয়	বিশা	আত্রাই

রাজসাহী জেলার আজকের মানচিত্রে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে যেভাবে চিহ্নিত করা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। সে সময় পর্যন্ত স্থানীয় কবিরাজরা নানারকম গাছগাছড়াকে রোগ উপশমের জন্য ব্যবহার করতেন। সেই সব ভেষজ উদ্ভিদের বেশ কিছু জন্মাত এই জেলায়। কয়েকটি উদ্ভিদের উল্লেখ করেছেন হাণ্টার :

Adhatoda vasica	বাসক
Aegle marmelos	বেল
Aloe Indica	ঘৃতকুমারী
Andrographils paniculata	কালমেঘ
Argemons mexicana	শিয়ালকাঁটা
Aristolochia Indica	ঈশ্বরমূল
Cassisa alata	দাদমর্দন
Calotropis gigantea	মশার/মান্দার
Cannabis sativa	গাঁজা
Cocculus cordifolius	গোলঞ্চ
Corchorus olitorius	পাট/লালিজপাট
Euphorbia lingularia	মিমসা সিজ
Zepidium sativum	হালিম
Mentha sativa	পুদিনাপাতা
Plumbago Zeylanica	চিতা
Plubago rosea	লালচিতা
Trichosapnthes diocia	পটল
Clerodendron visosum	ভাঁট

৪

শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য

আজও রাজসাহী জেলার শতকরা ৮৫.৮৫ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। একসময় রাজসাহীর রেশমের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। বর্তমানে কুটির শিল্প প্রাধান্য লাভ করলেও, অর্থনৈতিক জীবনে কৃষিপণ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জেলার বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১. নর্থবেঙ্গল সুগার মিল
২. রাজসাহী সুগার মিল
৩. রাজসাহী জুট মিল
৪. আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরি
৫. রাজসাহী সিল্ক ফ্যাক্টরি

মোঘল আমলে রেশমশিল্পের জন্য রাজসাহী ছিল বিখ্যাত। সব থেকে উৎকৃষ্ট মানের রেশম উৎপন্ন হত। জেলার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট মানের রেশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করত। বিদেশের বাজারে রাজসাহীর রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশমের চাহিদা ছিল বিপুল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রামপুর বোয়ালিয়া ও সারদায় দুটি রেশমের সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়নের কারখানা স্থাপন করে। তারা পাইকার ও দালালদের মাধ্যমে তুঁতচাষীদের দাদন দিয়ে রেশম গুটি সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করত। ১৮৩৫ সালে কোম্পানি ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার পর, তাদের কারখানা আর. ওয়াটসন কোম্পানি কিনে নেয় এবং রেশম ব্যবসায়ও তারা চরম উন্নতি করে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে রাজসাহীর রেশম শিল্পের অবনতি ঘটতে থাকে। ক্রমশ তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। দেশ ভাগের আগে একমাত্র কাঁচা রেশমই এখানে পাওয়া যেত। দেশভাগের পর বেশিরভাগ পলুপালনকারী ও কারিগর দেশ ত্যাগ করায় রেশম শিল্প যে সংকট সম্মুখীন হয় ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তা ছিল অব্যাহত। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে নবগঠিত সিল্ক অ্যান্ড ল্যাক রিসার্চ-কাম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং সিল্ক টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। জেলার শিল্পীদের তৈরি মটকা কাপড় ও গরদের চাহিদা বেড়েছে। রেশম সুতা তৈরির যে কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেখানে বস্ত্র বয়নও হয়ে থাকে। রেশম শিল্পের উন্নয়ন তদারকির জন্য ১৯৭৭ সালে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড। রাজসাহী শহরে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়। বোর্ড ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

উনিশ শতকে জেলার একটি লাভজনক ব্যবসায়িক উপকরণ ছিল নীল। মেসার্স ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানির নীলের ব্যবসা ছিল সব থেকে বড়। বিভিন্ন য়ুরোপীয় সংস্থার নীলকুঠি ছিল বড়গাছি, তালাইমারি, বিলমারিয়া, মীরাগঞ্জ, খরচকা, চারঘাট, খাজাপুর, শাহপুর, ভারতীপাড়া, মরদাহ, বালুয়া অঞ্চলে। প্রায় ৮,০০০ একর জমিতে নীল চাষ হত। কিন্তু নীলকরদের নিষ্পেষণ ও অত্যাচারে ১৮৫৯-৬১ সালে চাষীদের আন্দোলনে এদেশে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কিছু নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

রাজসাহী কাঁসা শিল্পের জন্যও বিখ্যাত। নবাবগঞ্জ, কালাম ও বুধাপাড়ায় কাঁসার বাসন-কোসন তৈরি হত। সারা দেশ জুড়ে ছিল কাঁসার দ্রব্যাদির বিপুল চাহিদা। হাঁড়ি, কলস, ঘটি, কড়াই, বালতি, পানপাত্র, গেলাস, চামচ নানান দ্রব্য পাওয়া যেত। তাছাড়া ছিল নানরকম সৌখিন দ্রব্য। এখনও জেলায় ১০০টির বেশি কারখানায় তামা ও কাঁসার দ্রব্য তৈরি হয়।

কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে রাজসাহীর ভূমিকা অনুল্লেখ্য নয়। বিড়ি শিল্প বাদে হাজার কুটির শিল্প কেন্দ্র রয়েছে। সোনা ও রূপার দ্রব্যাদি নির্মাণে জেলার সুনাম আছে। নানারকম জরদা ও খয়ের তৈরি হয়ে থাকে।

বর্তমানে রাজসাহী থেকে রপ্তানি দ্রব্যাদির মধ্যে আছে চিনি, কাঁসা-পিতলের দ্রব্য, রেশমজাত দ্রব্য, খেজুর ও আখের গুড়, খয়ের, জরদা, লিচু, তামা প্রভৃতি। নানারকম উৎকৃষ্ট আম পাওয়া যায় এই জেলায়। জেলার আলুর উৎপাদন কম হওয়ায়, নিত্য প্রয়োজনীয় আলু আসে বগুড়া থেকে। রংপুর থেকে আসে তামাক। একসময় পদ্মা ও তার শাখানদীগুলির মাছ জেলার চাহিদা মেটাত। এখন ও সব নদী শুকিয়ে যাওয়ায়, মাছের স্থানীয় চাহিদাপূরণ করতে হয় সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দের মাছ আমদানি করে।

জেলা ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক

১. নাটোরে : শাখা : ১২

১. বগতীপাড়া শাখা	৫. লক্ষীপুর শাখা	৯. রাজাপুরহাট শাখা
২. দয়ারামপুর শাখা	৬. এন. বি. সুগার মিলস্ শাখা	১০. সুকেশ শাখা
৩. গোপালপুর শাখা	৭. নাটোর শাখা	১১. লোকমানপুর শাখা
৪. হালশা শাখা	৮. নাজিরপুর শাখা	১২. নাটোর সুগার মিলস শাখা

২. নওগাঁয় : শাখা : ১৩

১. আহসানগঞ্জ শাখা	৫. মাতাজিহাট শাখা	৯. পাটনিতলা শাখা
২. আইহাই শাখা	৬. নওগাঁ শাখা	১০. পোরসা শাখা
৩. বোয়ালিয়া শাখা	৭. নিথপুর শাখা	১১. সাপাহার শাখা
৪. কাশাব শাখা	৮. পার নওগাঁ শাখা	১১. ময়নাহাট শাখা

১৩. বাকরাইল শাখা

৩. নবাবগঞ্জ : শাখা : ১৪

১. আলীনগর শাখা	৫. চাপাইনবাবগঞ্জ শাখা	৯. মোবারকপুর শাখা
২. আমনুরা শাখা	৬. চৌডালা শাখা	১০. মোনাকষা শাখা
৩. বড়ঘোড়িয়া শাখা	৭. গোবরাতলা শাখা	১১. রাজারামপুর শাখা
৪. বিনোদপুর শাখা	৮. খামার শাখা	১২. রোহানপুর শাখা

১৩. সদরঘাট শাখা ১৪. শিবগঞ্জ শাখা

৪. রাজসাহী : শাখা : ১৮

১. বাজুবামা শাখা	৭. মাদ্রাসা মার্কেট শাখা	১৩. রাজসাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখা
২. বালিয়াঘাটা শাখা	৮. মালোপাড়া শাখা	১৪. রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
৩. বিরালদাহ শাখা	৯. নওহাট্টা শাখা	১৫. সাহেব বাজার শাখা
৪. চারঘাট শাখা	১০. নিউমার্কেট শাখা	১৬. তালাইমারি শাখা
৫. হরিয়ান শাখা	১১. পুঁঠিয়া শাখা	১৭. ওয়াপদা জলসেচ শাখা
৬. লক্ষ্মীপুর শাখা	১২. রায়ঘাটি শাখা	১৮. নন্দনগাছি শাখা

জনতা ব্যাংক

নাটোর : শাখা : ২৩

১. আবদুলপুর জংসন শাখা	৮. গুরুদাসপুর শাখা	১৫. নাটোর আকাদমি শাখা
২. আলাইপুর শাখা	৯. হাতিআন্দা শাখা	১৬. পটুয়াপাড়া শাখা
৩. বালাধর শাখা	১০. জোনাইল শাখা	১৭. রাজাপুর বাজার শাখা
৪. বাসুদেবপুর শাখা	১১. কাঁচিকাটা শাখা	১৮. সালামপুর শাখা
৫. দয়ারামপুর শাখা	১২. কলম শাখা	১৯. স্টেশনবাজার শাখা
৬. ধানাইদহ শাখা	১৩. মদনগর শাখা	২০. নাটোর মেইন শাখা
৭. দীঘাপতিয়া শাখা	১৪. মৌকহরা শাখা	২১. বগতীপাড়া শাখা

২২. সিংগ্রাবাজার শাখা ২৩. বনপাড়াবাজার শাখা

২. নওগাঁ : শাখা : ২৫

১. আগ্রাদিগান শাখা	৯. সোবরচাপাহাট শাখা	১৭. নিয়ামতপুর শাখা
২. বৈদ্যপুরবাজার শাখা	১০. হাপানিয়া শাখা	১৮. নিতপুর শাখা

৩. বলিহার শাখা
৪. বনদৈখড়া শাখা
৫. চকগোরীহাট শাখা
৬. দেলুয়াবারিঘাট শাখা
৭. ধামোরিহাট শাখা
৮. গগনপুর শাখা
১১. জোতেবাজার শাখা
১২. কাজীর মোড় শাখা
১৩. মধাইল শাখা
১৪. মান্দাশাখা
১৫. মঙ্গলবারি শাখা
১৬. নওগাঁ শাখা
১৯. পথকাটা শাখা
২০. সাহেবগঞ্জ শাখা
২১. সরস্বতীপুর শাখা
২২. শিবপুর শাখা
২৩. তাজের সর্ত শাখা
২৪. তিলনা শাখা
২৫. নাজিপুর শাখা

৩. নবাবগঞ্জ : শাখা . ১১

১. আদিনা শাখা
২. চাপাই নবাবগঞ্জ শাখা
৩. ছত্রা শাখা
৪. দেওপাড়া শাখা
৫. ধৈনগর শাখা
৬. হুজরাপুর শাখা
৭. কনছটি শাখা
৮. মল্লিকপুর শাখা
৯. নাচোল শাখা
১০. রাণীহাটি শাখা
১১. রোহনপুর শাখা

৪. রাজসাহী : শাখা : ২৮

১. আরনি শাখা
২. বাণেশ্বর শাখা
৩. ভবানীগঞ্জ শাখা
৪. বীরকুৎসা শাখা
৫. চৌবাড়িয়া বাজার শাখা
৬. ঝলমলিয়া শাখা
৭. কাদিরগঞ্জ শাখা
৮. কাজিরহাট শাখা
৯. ললিতানগর
১০. মোহনপুর শাখা
১১. দাওকান্দি শাখা
১২. দুর্গাপুর শাখা
১৩. ঘোড়ামারা মহিলা শাখা
১৪. গোদাগাড়ি শাখা
১৫. হৌলদাগাছি শাখা
১৬. হরগ্রাম শাখা
১৭. হরিয়ান শাখা
১৮. হাটগণকপাড়া শাখা
১৯. হাতেমখান শাখা
২০. মোহনগঞ্জ শাখা
২১. নওদাপাড়া শাখা
২২. প্রেমতলী শাখা
২৩. রাজাবাড়িহাট শাখা
২৪ রাণীবাজার শাখা
২৫. রাজসাহী মেইন শাখা
২৬. সিটলাই শাখা
২৭. তাহিরপুর শাখা
২৮. বাসুদেবপুর শাখা

রূপালী ব্যাঙ্ক

১. নাটোর : শাখা : ৬

১. আবদুলপুর শাখা
২. দয়ারামপুর শাখা
৩. নলডাঙারহাট শাখা
৪. নাটোর শাখা
৫. নিচাবাজার শাখা
৩. শেরকোল শাখা

২. নওগাঁ : শাখা : ৫

১. বাদলগাছি শাখা
২. হসপিটাল রোড শাখা
৩. নিমাটপুর শাখা
৪. সদর রোড শাখা
৫. চকআটিতা হাই স্কুল শাখা

৩. নবাবগঞ্জ : শাখা . ৫

১. বালিয়াডাঙা শাখা
২. ভোলাহাট শাখা
৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা
৪. নামাশঙ্কর বাড়ি শাখা
৫. স্টেশনবাজার শাখা

৪. রাজসাহী : শাখা : ৯

১. আলুপটি শাখা
২. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শাখা
৩. কে এন. ইসলাম রোড শাখা
৪. ককনহাট শাখা
৫. ডি. সি. সুপার মার্কেট শাখা
৬. রাজসাহী ক্যান্টনমেন্ট শাখা
৭. সাহেববাজার শাখা
৮. তানোর শাখা
৯. মহিলা শাখা

সোনালী ব্যাংক

১. নাটোর : শাখা : ১২

১. আহমেদপুর শাখা
২. বাগাতিপাড়া শাখা
৩. বারইগ্রাম শাখা
৪. ছলছাঁকের শাখা
৫. দয়ারামপুর শাখা
৬. গুরুদাসপুর শাখা
৭. মহিলা শাখা
৮. লালপুর শাখা
৯. নাটোর শাখা
১০. সিংগরা শাখা
১১. স্টেশনবাজার শাখা
১২. নাটোর উপ-জেলা কমপ্লেক্স শাখা

২. নওগাঁ : শাখা : ১৯

১. আবাদপুকুর হাট শাখা
২. আহশানগঞ্জ শাখা
৩. তারাই শাখা
৪. বাদলগাছি শাখা
৫. ভবানীপুর বাজার শাখা
৬. ধামইরহাট শাখা
৭. কলিকাপুর শাখা
৮. মহিলা শাখা
৯. মান্দা শাখা
১০. মহাদেবপুর শাখা
১১. মহিষবাথান শাখা
১২. মঙ্গলবাড়ি হাট শাখা
১৩. নওগাঁ শাখা
১৪. পাট্নীতলা শাখা
১৫. পোরশা শাখা
১৬. রাণীনগর শাখা
১৭. সাপাহার শাখা
১৮. বন্দেরপুর শাখা
১৯. রাণীনগর টি.টি.ডি.সি. শাখা

৩ নবাবগঞ্জ : শাখা : ৮

১. ভোলাহাট শাখা
২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা
৩. গোমস্তাপুর শাখা
৪. মহিলা শাখা
৫. নাচোল শাখা
৬. রোহনপুর শাখা
৭. শিবগঞ্জ শাখা
৮. নয়গোলা শাখা

৪. রাজসাহী : শাখা : ২৩

১. বাঘা শাখা
২. ভবানীগঞ্জ শাখা
৩. ছাড়ঘাট শাখা
৪. বি. সি. এস. আই. আর শাখা
৫. কোর্ট বিল্ডিং শাখা
৬. ডাকরা শাখা
৭. ধোপাঘাটা শাখা
৮. দুর্গাপুর শাখা
৯. গোদাগাড়ি শাখা
১০. গ্রেটার রোড শাখা
১১. মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখা
১২. মীরাগঞ্জ শাখা
১৩. মোহনপুর শাখা
১৪. মানগ্রাম শাখা
১৫. মতিহার শাখা
১৬. পবা শাখা
১৭. পুলিশ আকাদমি শাখা
১৮. পুঁথিয়া শাখা
১৯. রাজসাহী শাখা
২০. রাজসাহী ক্যাডেট কলেজ শাখা
২১. রাণীবাজার শাখা
২২. সাপুরা ১/ই শাখা
২৩. তানোর শাখা

রূপালি ব্যাংক

১. নাটোর : শাখা : ২

১. কুসুম্বি শাখা
২. নাটোর শাখা

২. নওগাঁ : শাখা : ২

১. নওগাঁ শাখা
২. শিবগঞ্জ হাট

৩. নবাবগঞ্জ : শাখা : ২

১. মহারাজপুর শাখা
২. নবাবগঞ্জ শাখা

৪. রাজসাহী : শাখা : ৪

১. বি. সি. আই. সি. সেরিকালচার শাখা
২. মির্জাপুর শাখা
৩. নিউ মার্কেট শাখা
৪. রাজসাহী শাখা

উত্তরা ব্যাংক

১. নাটোর : শাখা : ৩

১. বোনাপাড়া শাখা
২. লালপুর শাখা
৩. নাটোর শাখা

২. নওগাঁ : শাখা : ১

১. নওগাঁ

৩. রাজসাহী · শাখা : ৫

১. জিউপাড়া শাখা
২. মাটিকাটা শাখা
৩. রাজসাহী স্টেডিয়াম শাখা
৪. সাহেববাজার শাখা
৫. রাণীবাজার শাখা

রাজসাহী কৃষি ব্যাংক

১. নওগাঁ : শাখা : ২১

১. আত্রাই শাখা
২. বাদলগাছি শাখা
৩. ধামইরহাট শাখা
৪. দুবলহাটি শাখা
৫. হাজীনগর শাখা
৬. জোতবাজার শাখা
৭. কীর্তিপুর শাখা
৮. মহাদেবপুর শাখা
৯. নওগাঁ শাখা
১০. নিয়ামতপুর শাখা
১১. পাহাড়পুর শাখা
১২. পাটনীটোলা শাখা
১৩. পোরসা শাখা
১৪. প্রসাদপুর শাখা
১৫ রাংগামাটির হাট শাখা
১৬. রাণীনগর শাখা
১৭. শৈলগাছা শাখা
১৮. সাপাহার শাখা
১৯. সাথিহাত শাখা
২০. উত্তরগ্রাম শাখা
২১. সামোসপাড়া হাট শাখা

২. রাজসাহী : শাখা : ১৫

১. বাঘাহ শাখা
২. ভবানীগঞ্জ শাখা
৩. দুর্গাপুর শাখা
৪. গোদাগাড়ি শাখা
৫. হুজুরপাড়া শাখা
৬. মোহনপুর শাখা
৭. পবা শাখা
৮. পনছন্দর শাখা
৯. পুথিয়া শাখা
১০. রাজসাহী শাখা
১১. সারদা শাখা
১২ তানার শাখা
১৩. বড়গাছি শাখা
১৪. খোরখোরী শাখা
১৫. মোল্লাপাড়া হাট শাখা

রাজসাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

নাটোর : শাখা : ১৫

১. আবদুলপুর শাখা
২. আহমেদপুর শাখা
৩. বগাতিপাড়া শাখা
৪. বরইগ্রাম শাখা
৫. চৌগ্রাম শাখা
৬. গোপালপুর শাখা
৭. গুরুদাসপুর শাখা
৮. হালসা শাখা
৯. কাফুরিয়া শাখা
১০. খোলাবাড়িয়া শাখা
১১. লালপুর শাখা
১২. নাটোর শাখা
১৩. সিংড়া শাখা
১৪. বোয়ালিয়া শাখা
১৫. কদমছিলান শাখা

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক

১. রাজসাহী শাখা

বাংলাদেশে শিল্প ব্যাংক

১. রাজসাহী শাখা

ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ

১. রাজসাহী শাখা

সিটি ব্যাংক লিঃ

১. রাজসাহী শাখা

আই. এফ. আই. সি. ব্যাংক লিঃ

১. রাজসাহী শাখা

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ

১. রাজসাহী শাখা

জেলার হাট বাজার : ১৯৬১

থানা	হাট বাজার	বাজারের ধরন	হাটের দিন	পণ্যদ্রব্য
রাজসাহী				
১. পুঁঠিয়া	বাণেশ্বর হাট	আড়তদারী	মঙ্গলবার/শনিবার	ধান, চাল পাট, হলুদ, খেজুর গুড়
২. বোয়ালিয়া	সাহেববাজার	—	প্রতিদিন	চাল, ডাল, মশলা, ফল, ডিম, হাঁস-মুরগি
৩. পুঁঠিয়া	কালীগঞ্জ হাট	—	মঙ্গলবার/শুক্রবার	ধান, চাল, আম, ডিম, ফল, পাট
৪. তালোর	মহিশালবাড়ি হাট	প্রাথমিক	রবিবার	চাল, গরু-বাছুর, মহিষ, মাছ, শাক-সবজি
৫. পবা	গোদাগাড়ি হাট	প্রাথমিক	বুধবার/শুক্রবার	ধান, চাল, ছোলা, শাক-সবজি, পিঁয়াজ, কলাই
৬. পবা	ডালকুড়া হাট	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, গুড়, ছোলা, খেসাড়ি, মাষ-কলাই
৭. পবা	বড়গাছি হাট	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, ডাল, শাক-সবজি
৮. চারঘাট	আড়ানি বাজার	আড়তদারী	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, পাট, হলুদ, ডাল
৯. চারঘাট	নারায়ণপুর হাট	প্রাথমিক	মঙ্গলবার/শুক্রবার	ধান, চাল, পাট, হলুদ, গুড়
১০. চারঘাট	ঝিকরা হাট	প্রাথমিক	মঙ্গলবার/শুক্রবার	মাছ, গুড়, মরিচ, পিঁয়াজ, হাঁস-মুরগি
১১. চারঘাট	বালাপুর হাট	প্রাথমিক	মঙ্গলবার/শুক্রবার	চাল, মরিচ, ডাল, ছোলা
১২. বাগমারা	মহোদগঞ্জ হাট	প্রাথমিক	বৃহস্পতি/রবিবার	ধান, ডাল, চাল, পাট, পিঁয়াজ, মরিচ, ছোলা
১৩. বাগমারা	একদোনা হাট	প্রাথমিক	মঙ্গলবার	ধান, চাল, পিঁয়াজ, পাট, আলু, ছাগল
নওগাঁ				
১৪. নওগাঁ	নওগাঁ হাট	আড়তদারী	বুধবার	ধান, চাল, পাট, ডাল, গরু, ছাগল, ভেড়া
১৫. নওগাঁ	দুবলহাটি	প্রাথমিক	শনিবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, হাঁস-মুরগি, পিঁয়াজ, রসুন, গরু, ভেড়া, ছাগল

থানা	হাট বাজার	বাজারের ধরন	হাটের দিন	পণ্যদ্রব্য
১৬. রাণীনগর	রাণীনগর বাজার	—	প্রতিদিন	ধান, চাল, ডাল, গম, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন
১৭. আত্রাই	কাশিয়াবাড়ি হাট	আড়তদারী	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, পাট, ডাল, তৈলবীজ, গম, ছাগল, ভেড়া
১৮. মান্দা	পরিয়ারভাঙা হাট	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ, গরু, ছাগল, ভেড়া
১৯. মান্দা	কাউবাড়িয়া হাট	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, গরু, বাছুর, ছাগল ভেড়া
২০. মান্দা	প্রসাদপুর হাট	প্রথামিক	রবিবার/বৃহস্পতি	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল ভেড়া
২১. মান্দা	পত্রিমলোচান	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, রসুন, গরু, ছাগল ভেড়া
২২. পত্নীতলা	পত্নীতলা হাট	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, পাট, ডাল, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, গরু,
২৩. পত্নীতলা	মাধাই হাট	প্রাথমিক	শুক্রবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, গরু, ছাগল, ভেড়া
২৪. পত্নীতলা	কাঁটাবাড়ি হাট	প্রাথমিক	শুক্রবার	চাল, ডাল, পাট, গরু, ছাগল, ভেড়া
২৫. পত্নীতলা	ত্রিমোহনী হাট	প্রাথমিক	বৃহস্পতিবার	ধান, চাল, পাট, ডাল, গরু, ছাগল, ভেড়া
২৬. ধামুইর হাট	ধামুইর হাট	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতি	ধান, চাল, পাট, শাক-সবজি
২৭. ধামুইর হাট	রাংগামাল হাট	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতি	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, গুড়, গরু, ছাগল, ভেড়া

থানা	হাট বাজার	বাজারের ধরন	হাটের দিন	পণ্যদ্রব্য
২৮. বাদলগাছি	বাদলগাছি	প্রাথমিক	শনিবার/বুধবার	ধান, চাল ডাল, পাট, পিঁয়াজ, রসুন, হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া
২৯. মহাদেবপুর	মাতাজী হাট	আড়তদারী	শনিবার/বুধবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, মহিষ গরু, ছাগল, ভেড়া, কড়ি, কাঠ
৩০. মহাদেবপুর	মহাদেবপুর হাট	আড়তদারী	শনিবার/বুধবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, মহিষ গরু, ছাগল, ভেড়া, কড়ি, কাঠ
নাটোর				
৩১. নাটোর	তেবাড়িয়া হাট	প্রাথমিক	রবিবার	ধান, চাল, পাট, মাছ, ডিম, হাঁস-মুরগি, ডাল, ছোলা
৩২. নাটোর	লালপুর হাট	প্রাথমিক	শনিবার/বুধবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, গরু, ছাগল, ভেড়া
৩৩. লালপুর	বৈদ্যনাথপুর হাট	প্রাথমিক	মঙ্গলবার	ধান, চাল, ডাল পাট, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ছোলা গরু, বাছুর, ভেড়া
৩৪. লালপুর	গুরুদাসপুর	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ. রসুন, মরিচ, আলু, হাঁস-মুরগি, ছোলা, হলুদ, গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া
৩৫. গুরুদাসপুর	কালীগঞ্জ	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, ছোলা, মরিচ, ধনে, গরু, ছাগল, ভেড়া
৩৬. বড়াইগ্রাম	নওখারা হাট	প্রাথমিক	শুক্রবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, ছোলা, মশলা, ধনে, মরিচ, রসুন, পিঁয়াজ, হলুদ, হাঁস-মুরগি

থানা	হাট বাজার	বাজারের ধরন	হাটের দিন	পণ্যদ্রব্য
৩৭. বড়াইগ্রাম	মাহিমল হাট	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতি	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে, মরিচ, গরু, ছাগল, ভেড়া
নবাবগঞ্জ				
৩৮. নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ বাজার	প্রাথমিক	প্রতিদিন	ধান, চাল, ডাল, পিঁয়াজ, মরিচ, শাক-সবজি, পটল, আলু, আম, লিচু, ছোলা, কলাই, মশলা, ডিম, হাঁস-মুরগি
৩৯. নবাবগঞ্জ	বটতলা হাট	প্রাথমিক	শুক্রবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, ছোলা, কলাই, মটর, মশলা, সবজি, হাঁস-মুরগি, গুড়, পিঁয়াজ, ছাগল, গরু, ভেড়া
৪০. নবাবগঞ্জ	রামচন্দ্রপুর	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	চাল, ডাল, সরিষা, কলাই, ধনে, গুড়, গরু, বাছুর, গুড়
৪১. গোমস্তাপুর	রোহনপুর হাট	আড়তদারী	সোমবার	ধান, চাল, ডাল, সবজি, ডিম, গুড়, পিঁয়াজ, রসুন, হাঁস-মুরগি, গরু, বাছুর, ভেড়া, আম, সরিষা
৪২. ভোলাহাট	গোহালবাড়ি হাট	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতি	ধান, চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া
৪৩. পোড়সা	মাপাহার হাট	প্রাথমিক	শনিবার	ধান, চাল, ডাল, সবজি, হাঁস, মুরগি, সরিষা, কড়ি, মাছ, গরু, বাছুর
৪৪. শিবগঞ্জ	আরপাড়া হাট	প্রাথমিক	রবিবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, হাঁস-মুরগি, সরিষা, আম, গরু, ছাগল, ভেড়া

থানা	হাট বাজার	বাজারের ধরন	হাটের দিন	পণ্যদ্রব্য
৪৫. শিবগঞ্জ	ধাসের হাট (বিনোদপুর)	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	ধান, চাল, ডাল, পাট, পিঁয়াজ, রসুন, হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া, আম (বিনোদপুর)
৪৬. নাচোল	নাচোল হাট	আড়তদারী	রবিবার	ধান, চাল, ডাল, মাছ, হাঁস-মুরগি, গুড়, শাক-সবজি, ডিম
৪৭. নাচোল	সোনাইচণ্ডী হাট	প্রাথমিক	বুধবার	ধান, চাল, ডাল, মাছ, সবজি, হাঁস-মুরগি, গরু, মহিষ
৪৮. নাচোল	মল্লিকপুর হাট	প্রাথমিক	শনিবার	ধান, চাল, ডাল, মাছ, সবজি, হাঁস-মুরগি, সরিষা

৫
নাটোর

আজও রাজসাহী জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি নাটোর বর্তমান। রাজসাহী-জমিদারির রাজধানী নাটোর শহরের পত্তন করেছিলেন রামজীবন ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে। লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত স্থানটি ছিল নিচু জলাজমি। লোকে বলত "ছাই ভাঙা বিল"। মাটি ফেলে তৈরি করা শহরের সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল ১৫০ বিঘা জমির ওপর তৈরি রাজবাড়ি। খরস্রোতা নারদ নদীর তীরে এই রাজবাড়ি ছিল সুরক্ষিত। চারপাশে ছিল ৮০/৯০ গজ চওড়া পরিখা। মাঝখানে রাজবাড়ি। প্রাসাদ, বড়বড় দিঘি, মন্দির, সুসজ্জিত বাগান—এক অসাধারণ সৌন্দর্যপুরী তৈরি করেছিল নাটোর জমিদার পরিবার।

রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, ধীরে ধীরে সমগ্র এলাকা জনাকীর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। শহরটি জমজমাট হয়ে ওঠে। হান্টারের বিবরণে আছে ঃ The town built on low marsh land reclaimed from the river, has always been noted for its insalubrity. It is centrally situated, however and on that account was first selected as the administrative capital of the District. As stated above, the unhealthiness of the place compelled the removal of the seat of administration to Rampur Beauleah. Nattor is a close and compact town, clinging close around the Rajbari, one palace of the Nattor Rajas. This family first rose into power in the earlier half of the last century, and gradually obtained possession of almost the entire Districe, besides large estates (Zamindaris) in other parts of the country. At the time of the Permanent Settlement of Lord Cornwallis, the celebrated Rani

Bhawani was the representative of the family ; and her piety and indiscriminate charity induced her to make large alienations of property for religious or charitable purposes, which combined with improvidence and neglect on the part of some of her seccessors, have seriously diminished the estate. At present the Nattore Estate holds only the third or fourth rank in Rajshahi in point of size ; although the historical importance of the family gives considerable prestige"...*

বর্গীর হাঙ্গামার শুরু থেকে গঙ্গার পশ্চিম পারের মানুষ নিরাপত্তার কারণে নাটোর শহরে এসে ভিড় জমাতে থাকে। নাটোরের জমিদারদের ওপর তখন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভার। কিন্তু কাজটি ছিল যথেষ্ট দুরূহ। জমিদারির উত্তর দিকে বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলে দস্যু ও ডাকাতদের আস্তানা। নিরীহ মানুষের ওপর তাদের অত্যাচার ছিল ক্রমবর্ধমান। স্থানীয় জমিদারদের অনেকেই ছিল এইসব ডাকাতদের আশ্রয়দাতা। সেই হিসাবে ডাকাতির ধনসম্পদে তারাও ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। আর ছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল। অবাধে লুঠতরাজ চালাত তারাও। ঘোড়া, হাতি, উট, বন্দুক ও নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাদের। একবার রাণী ভবানীর বরকন্দাজরা ফকিরদের হাতে পরাস্ত হয়। কিন্তু রাণী ভবানীর পর রাজা রামকৃষ্ণের সময় জমিদারির পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। একে দুর্বৃত্তদের হামলা, তার ওপর স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রে চারদিকে শুরু হয় চরম অরাজকতা। এই সময়ে কোম্পানি সরকার রামকৃষ্ণের হাত থেকে রাজসাহীর (১৭৭৫ খ্রিঃ) পুলিশি ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নিলেও, সমস্যার কোন সমাধান হল না। দেশের সর্বত্র তখন চরম বিশৃঙ্খলা।

চারদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। ১৭৬৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাউটন রাউস রাজসাহীর ইংরেজ প্রতিভূ হয়ে নাটোরে আসেন। কানাইখালিতে একটি চালা ঘরে ছিল তার দপ্তর। সেখানেই কাছারি আর তার বাসস্থান। এইভাবে জেলাসদরে পরিণত হল নাটোর। রাউস ছিলেন 'সুপারভাইজর'। ১৭৭১ সাল থেকে সুপারভাইজাররা হলেন কালেক্টর। তারা রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের ভার পান। ফৌজদারি বিচার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার তখনও ছিল দেশীয়দের ওপর। কালেক্টর পদ উঠে যায় ১৭৮১ সালে। বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেলেন ম্যাজিস্ট্রেট। ১৭৯৩ সালে সৃষ্টি হল জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ।

১৭৭৫ সালে রাজসাহীর শাসনভার হাতে নিয়ে সমগ্র জেলায় ২১টি থানার সৃষ্টি হয়। এই থানার সংখ্যা বেড়ে ২৭ হয় ১৮০১-০২ সালে। প্রত্যেকটি থানায় দারোগাও সিপাই নিযুক্ত হল। জেলার উত্তর সীমান্ত, বগুড়া অঞ্চল ছিল সব থেকে বেশি উপদ্রুত। ঐ অঞ্চলে ১৮০৮ সালে একজন অতিরিক্ত জেলা শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৭৯৪ সালে আদালত ভবন ও জেলখানা এবং ১৭১৭ সালে ট্রেজারি নির্মিত হয়। কিন্তু ১৭৯৭ সালে আকস্মিক অগ্নিদগ্ধে সমস্ত সরকারি ভবনসহ মোট ৪০০টি গৃহ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ১৮০৬ সালে নতুন ভাবনে আদালত ও সার্কিট কোর্টের কাজ শুরু হয়। সেখানে ছিল সারি সারি সরকারি ভবন। স্থানটি ফৌজদারী পাড়া নামে পরিচিত। পরে এইসব ভবন প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বিক্রি করে দেওয়া হয়। ১৮৪৫ সালে নাটোর মহকুমা সদর দপ্তরে পরিণত হলে নতুন দোতলা আদালত ভবন তৈরি হয় নারদ নদের দক্ষিণ তীরে। কিন্তু ১৮৯৭ সালে আদালত ভবন ও জেলখানা ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। এইস্থানে পরে নতুন ভবনের জন্ম।

* Statistical Account of Bengal–W. W. Hunter. Vol. VIII. P. 54-55

১৯০১ সালে নাটোর মহকুমার আয়তন ছিল ৮১৬ বর্গ মাইল।

গ্রাম	১৭২৭
জনসংখ্যা	৪২২,৩৯৯
„ (পুঃ)	২১১,০০৭
„ (না)	২১১২৯২
হিন্দু	৯৪৯৫৫
মুসলমান	৩২৭৩১৫

১৯৩১ সালে নাটোর মহকুমার আয়তন ছিল ৮৩৫ বর্গমাইল

১৯০১ সালের আদমসুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় থানা ও তার আয়তন

নাম	আয়তন
১. নাটোর	১৯৮ বর্গমাইল
২. সিংড়া	৩১০ বর্গমাইল
৩. বড়াইগ্রাম	১৯৪ বর্গমাইল
৪. লালপুর	১১৪ বর্গমাইল

১৯৩১ সালের রিপোর্টে উল্লেখ আছে :

নাম	আয়তন	চৌকিদার	দফাদার
১. নাটোর	১৫৬ বর্গমাইল	১৮৩	১৩
২. সিংড়া	২০৩ বর্গমাইল	১৭৬	১৬
৩. বড়াইগ্রাম	১৫২ বর্গমাইল	১৫২	২৩
৪. লালপুর	৯০ বর্গমাইল	৭৯	৯
৫. বাগাতিপাড়া	৫৩ বর্গমাইল	৬৬	৫
৬. গুরুদাসপুর	৭৭ বর্গমাইল	৯৩	৬
৭. নন্দীগ্রাম	১০৪ বর্গমাইল	৬৯	৬

নন্দীগ্রাম পরে বগুড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।

নাটোর : জল সরবরাহ ব্যবস্থা

চরম অস্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে নাটোরের কুখ্যাতি ছিল প্রথম থেকেই। উদরাময়, কলেরা, আমাশয় সারা বছর মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এর অন্যতম কারণ, স্থানীয় মানুষ পানীয় জলের জন্য নির্ভর করত পুকুর, কুয়া ও দিঘির ওপর। নাটোরের এস ডি ও থ্যাকটিল এই জটিল সমস্যা সমাধানে তৎপর হন। নাটোর মহারাজার প্রাসাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর সভাপতিত্বে। সভায় গৃহীত হয় জলসরবরাহ ব্যবস্থা করার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব। আনুমানিক খরচ ও নক্‌শা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় দিঘাপতিয়া রাজার ইঞ্জিনিয়ার ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামীর ওপর। তিনি যে হিসাব দাখিল করেছিলেন, তা কার্যকরী করার সামর্থ পৌরসভার ছিল না। সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, অবশেষে ১৯১০ সালে জলের কল বসাবার অনুমোদন এবং পাঁচ হাজার টাকা সরকারি সাহায্য মেলে। স্থির হয় কাছারির পুকুরগুলি সংস্কার করে জলের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু কাজটি নানা টালবাহানায় অনেক পিছিয়ে যায়। ১৯১৩ সালে নতুন করে আবার প্রস্তাব নেওয়া হয়। জল সরবরাহের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৬৭,৭০০ টাকা। সরকার দেয় ৪০,০০০, পৌরসভা ৯০০০ এবং বাকি টাকা চাঁদা থেকে আসে। নাটোরের ছোট তরফের রাণী হেমাঙ্গিণী দেবীর দান করা জমিতে ৪৫০ বর্গ ফুটের একটি পুকুর খনন করে জলের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এসব করতে আরও ১০ বছর পেরিয়ে যায়।

৬
পতিসর

রাজসাহীর ইতিহাসের পাতায় পতিসরের স্বতন্ত্র উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের আজও মুগ্ধ করে। কোথায় এই পতিসর, কোন মানুষটির অমর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গ্রাম জীবনের পাতায় পাতায়, তা নতুন করে বলে দিতে হয় না কোন বাঙালিকে। কালীগ্রাম পরগণায় ছিল ঠাকুর পরিবারের জমিদারি। পতিসরে ছিল কাছারি। জমিদারি তদারকির কাজে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন পতিসর। তার অনন্য সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পতিসরের স্মৃতি। প্রকৃতি প্রেমিক কবির পত্রাবলীতে আজও জীবন্ত এই পতিসর।

পতিসরের পথ ধরে এগিয়ে যেতে আজও কোন বাধা নেই। সেই গ্রাম, সেই নদী রেখা বেঁচে আছে আজও। পতিসর গ্রামের একটি অপরূপ বিবরণ তুলে ধরেছেন আহমদ রফিক। "... কালীগ্রাম পরগণার জমিদারির সদর কাছারি এই গ্রামে বলেই এর গুরুত্ব ভিন্ন। তা না হলে পাখি-ডাকা, ছায়া ঘেরা, গাছগাছালি ভরা পতিসরকে বাংলাদেশের অন্য গ্রাম থেকে আলাদা করা যায় না। এই পতিসরকে বুকে চেপে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে নিতে এগিয়ে গেছে নাগর নদী, কখনও ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে, কখনো কোন কিষাণ বাড়ির উঠানের পাশ কাটিয়ে, বনজঙ্গল বা বুনো ঝোপ ঝাড়ের ছায়া বুকে নিয়ে।... পতিসরে যাতায়াত রবীন্দ্রনাথের আমলে সহজ ছিল না, একশ বছরেরও বেশি সময় পর এখনও প্রায় তেমনই আছে। নওগাঁ মহকুমা (এখন জেলা) সদর থেকে ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণে আত্রাই রেল স্টেশন; সেখান থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার পূর্বদিকে পতিসর। এছাড়া রয়েছে রাণীনগর রাতোয়াল আবাদপুকুর হয়ে পতিসর যাওয়ার রাস্তা। নওগাঁ থেকে এ পথের দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। অতি সম্প্রতি রবীন্দ্রানুরাগী স্থানীয় সাংসদের চেষ্টায় নওগাঁ-রাণীনগর পতিসর পর্যন্ত রাস্তার অধিকাংশই পাকা হয়েছে, বাকিটা হওয়ার অপেক্ষায়। আত্রাই থেকে পতিসর পর্যন্ত সড়কও এখন যানবাহনযোগ্য অবস্থায় পৌঁছেছে।

"অবশ্য বগুড়া জেলার আদমদিঘি থেকেও পতিসর যাওয়ার কাঁচা রাস্তা রয়েছে, যেমন রয়েছে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরের সিংড়া থানা হয়ে কিংবা বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানা হয়ে পতিসর যাওয়ার কাঁচা রাস্তা। শুধু কাঁচাই নয়, এগুলো বড় জরাজীর্ণ, চলাচলের অনুপযোগী। তবে আদম দিঘি থেকে রাতোয়াল হয়েও পতিসর পৌঁছনো চলে। বর্ষার সময়ে অবশ্য যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজ। মোটরচালিত নৌকা (স্থানীয় ভাষায় 'স্যালো') তখন চলাচলের প্রধান বাহন। আর শুকনো মরশুমে মোটর সাইকেল বা জিপ, কষ্ট করে মোটর গাড়ি। আবার আত্রাই থেকে বর্ষাকালে আত্রাই নদী ধরে নাগর নদীতে ভেসে সহজে পতিসর যাওয়া চলে যেমনটা রবীন্দ্রনাথ যেতেন তাঁর বোটে চড়ে। শুকনোর দিনে আত্রাই থেকে মাঝে মাঝে তার তৈরি রাস্তা দিয়ে পালকি কিংবা হাতিতে চড়েও পতিসর কাছারিতে পৌঁছেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে অন্য কাছারি থেকে নদী পথে বোটে করে চলাটাই ছিল তার পছন্দসই।*

পতিসর থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু চিঠি আছে 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে। বৈচিত্র্যময় কবিমানসিকতার পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে এইসব চিঠিতে। কয়েকটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৮৯৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি লেখা চিঠি :

"যে পারে বোট লাগিয়েছি এপারে খুব নির্জন—গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধু ধু করছে। নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে, সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে

[1] রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর- আহমদ রফিক। পৃঃ ২৩

ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এপারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে।..."

১৮৯৪ সালের ১৭ মার্চ লেখা চিঠি :

"জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেকক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এপারের মাঠে কোথাও কিছু সীমা চিহ্ন নেই, গাছপালা নেই—চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধু ধু শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়—সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে—এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, বৈচিত্র নেই, প্রাণ নেই—ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলেছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহুদূরের মাঠে এক-এক জায়গায় যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেইখানে চাষীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণি দেখা যাচ্ছে। এমন একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদ শোকের ভাব মনে আসে—যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপর একটি সাদা-কাপড় পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিত প্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।"*

আর একটি চিঠির দুটি পংক্তিতে কবি পৃথিবীর চিরন্তন সত্যকে উদঘাটন করেছেন পতিসরের নিভৃত প্রকৃতির অসীম পটভূমিতে ঃ "... এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনো কালেই কিছুতেই পুরনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনোকালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।"**

দিঘাপাতিয়া যাওয়ার সময় ১৮৯৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কবির লেখা চিঠিতে পাই গ্রামবাংলার এক অসাধারণ চালচিত্র। বর্ষাস্নাত জলপ্লাবিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনযাত্রা কবিকে অভিভূত করেছিল। তিনি লিখেছেন : "পদ্মার ওদিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এদিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বিল-খাল নদী-নালা কতরকম জলপথের মধ্য দিয়েই চলেছি তার ঠিক নেই। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখা প্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকা বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারিপার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল খাল নদী-নালা কতরকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্ সর্ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সেখানে আর ধান নেই—নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুট ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোট নদীর মধ্যে এসে পড়ে—সেখানে এক তীরে ধানের ক্ষেত, আর এক তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম—মাঝখান দিয়ে একটা পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকেবেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে—স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনো দেখিসনি। বড়ো বড়ো গেলি মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে—ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর

* ছিন্নপত্রাবলী। পত্র সংখ্যা ১১৫

** ছিন্নপত্রাবলী। পত্র সংখ্যা ১১৬

একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে—তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক-হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়ে ঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার—তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানব-গৃহের আবর্জনা সমস্ত চারদিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্ ভন্ করতে থাকে—এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মত ঘরকন্যার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভাল লাগে না। এতকষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে—এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাত ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকলরকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত—এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই, এবং সুবিধেও নেই।"*

এতো একখানি গ্রাম নয়, বাংলার বুক জোড়া অসংখ্য গ্রামের ছবিই যেন চিরকালের মত এঁকে রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালীগ্রাম, চলন বিল, পতিসর চেনবার জন্য আমাদের অজানার বুকে বিচরণের কোন প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাকে চিরন্তন করে রেখেছেন দিগন্ত বিস্তৃত ক্যানভাসের বুক জুড়ে। এমন করে বাংলার গ্রামের ছবি কে তুলে ধরেছেন, জানা নেই।

নাগর নদীর ঘাট থেকে ১৮৯৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর কবি আর একখানি চিঠিতে লিখেছেন : "....কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌন মুখে শ্রান্ত পদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ...।"**

* ছিন্নপত্রাবলী। ১৫৩ নং পত্র

** ছিন্নপত্র। ১৫২ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলীতে এই চিঠিটির উল্লেখ আছে ২৪৬ নং পত্রে। কালীগ্রাম থেকে লেখা ৬ ডিসেম্বর এবং উদ্ধৃত অংশটি ২৪৬ নং পত্রের অংশবিশেষ।

পতিসর ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জমিদারি। আটপৌরে নাগর নদীর পারে কাছারি বাড়ি পৌঁছাতে হত অনেক পথ পেরিয়ে। শাহজাদপুরের কাছারি বাড়ির মত না হলেও, পতিসর কাছারিবাড়ির আভিজাত্য কম ছিল না। জমিদারি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা পর্ব এখানে উদ্‌যাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আজ পতিসরে গিয়ে কি রবীন্দ্রযুগের কিছু স্মৃতি চোখে পড়বে? সে বিষয়ে আহমদ রফিক একটি স্বচ্ছ বিবরণ তুলে ধরেছেন, তাঁর গ্রন্থে। সেই বিবরণ অনুসরণ করে, আমরা পতিসরের চিত্র তুলে ধরতে পারি।

পতিসরের কাছারিবাড়ি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করেছে। কাছারিবাড়ি মূল ভবনে ঢোকার সময় সিংহদরজার ওপরে, দুপাশে দুটো দাঁড়ানো সিংহ মূর্তি। সিংহ দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে পড়বে একটা চত্বর। সেখানে বসত গানের আসর। অন্যতম শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বারান্দায় থামগুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ। মূল ভবনের পাশে একটা ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি। আরো বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে। সকলেরই দশা একই রকম রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। একটি পুকুর আছে। নাম তার কালীঘাট। এইসব ছোটখাট বাড়ির কোনটায় ছিল কর্মচারীদের বাস, কোনটায় দাতব্য চিকিৎসালয়। কিছুদূরে একটি শিক্ষায়তন। আহমদ রফিক আরও বলেছেন :

"পতিসর কাছারি বাড়িটা এখন জীর্ণ, তবু বুঝতে পারা যায় তার একদা সুদর্শন চেহারা। এখানে যেখানে ফাটল-রেখা, আস্তর-ওঠা মোটা গোলাকার থাম তাদের রাজকীয় রূপ হারিয়েছে। দেখে দুঃখ লাগে। সরকারি তহশিল অফিস সত্ত্বেও কক্ষগুলোতে গুমোট ও জীর্ণতা ছায়া ফেলে আছে। দীনতার প্রকাশ চাপা পড়েনি। ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দুরবস্থা দেখলে মায়া লাগে। প্রবেশ পথের মাথায় সিংহমূর্তি দুটো মনে হয় রাজমহিমা প্রকাশের বৃথা চেষ্টা করে চলেছে।

"কাছারিবাড়ির সামনে একদা মনোরম উদ্যান এখন এক বিবর্ণ ঘেসো মাঠে পরিণত। এ মাঠ দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে নাগর নদীর উঁচু পাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। প্রবেশপথে দক্ষিণমুখী হয়ে ডানদিকে তাকালে চোখে পড়বে "রবি সরোবর" নামের পুকুরটি—এখন শ্যাওলা ঢাকা কালচে সবুজ জলে ভরা ডোবার মতই দেখায়। পদ্ম দূরে থাক, একটা শাপলাও চোখে পড়বে না। কখনও দু'একটা শীর্ণ পাতিহাঁস সরোবর নামক এ ডোবায় জলকেলির মাধুর্য সৃষ্টি করছে, বড় জোর তেমন কোন দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।...

"পতিসরে এসে কাছারি বাড়ির ডান দিক দিয়ে সামান্য কিছু আঁকাবাঁকা কাঁচা মাটির পথ ধরে এগিয়ে গেলে দেখা মিলবে কবিপুত্রের নাম চিহ্নিত "রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন" স্কুলটির। যে স্কুলে বাধাবন্ধনহীন পরিচালনার জন্য রবীন্দ্রনাথ বরাদ্দ করেছিলেন বিস্তর "ক্ষেতি জমি"—কারো হিসেবে দুশো বিঘা, কারও হিসেবে দেড়শ' বিঘা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংখ্যাটা একটু কম করেই বলেন।..."*

৭

রাজসাহী

রাজসাহী জেলার সদর বর্তমান স্থানে, অর্থাৎ রামপুরবোয়ালিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হয় ১৮২৫ সালে। পদ্মা নদীর তীরে এই স্থানটির সব থেকে বড় আকর্ষণ ১৬৩৪ সালে নির্মিত হজরত শাহমখদুমের সমাধি সৌধ। তাছাড়া স্থানটি রেশম উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে সেকালেই সুপরিচিত ছিল। এই রেশমের আকর্ষণে এখানে বিদেশি বণিকদের আগমন ঘটে। প্রথম আসে

* রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর—আহমদ রফিক। পৃঃ ১০৫—১১১

ওলন্দাজরা। তাদের স্থাপিত কারখানাটি আজও 'বড় কুঠি' নামে পরিচিত। ভূমিকম্পে বাড়িটি বিধ্বস্ত হলেও মূল ভবনটি বর্তমান। ওলন্দাজরা চলে যাওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ভবনটিতে তাদের বাণিজ্য কুঠি বানায়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই ভবনে ছিল ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সদর দপ্তর। পরে মেদিনীপুরের জমিদারদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাদের কাছ থেকে ভবনটি ভাড়া নেয় জেনারেল নেভিগেশন কোম্পানি। এখানে ছিল তাদের অফিস ও কর্মীদের বাসস্থান। দেশ ভাগের পর (১৯৪৭ খ্রিঃ) বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের গুদামঘরে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে এই ভবনে ছিল রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন।

বড় কুঠির প্রাঙ্গণের একধারে আছে বিদেশিদের একটি ছোট গোরস্থান। তাছাড়া বড়কুঠির পশ্চিমদিকে আছে হজরত মখদুমশাহের সমাধি ও একটি ছোট মসজিদ।

রাজসাহী শহরটি বন্যায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে শহরটি রক্ষার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয় সে বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এই বিপর্যয়। পদ্মা এই শহরকে একাধিকবার প্লাবিত করেছে। ষাটের দশকেও একবার চরম বিপর্যয় ঘটে। বর্তমানে ৯ মাইল দীর্ঘ বাঁধটি অনেক উঁচু এবং মজবুত।

রাজসাহী শহরটি ক্রমশ আধুনিক জীবনধারণোপযোগী ব্যবস্থার আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম, মুসলিম ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন শ্রেণির কলেজ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায়তন, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র নিয়ে রাজসাহী একটি আধুনিক শহর। বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র রয়েছে শহরের পশ্চিম প্রান্তে বুলানপুরে।

শহরে পাকা রাস্তা ও যানবাহনের অভাব নেই। বহিরাগত মানুষদের আপ্যায়নের জন্য আছে বহু নামী দামী হোটেল। ক্রীড়া প্রেমিকদের জন্য স্টেডিয়াম।

রাজধানী শহরের সব থেকে বড় আকর্ষণ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম। *(এই মিউজিয়ম সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র লেখা বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। পৃঃ ২৬৯)*

৮
দীঘাপতিয়া

নাটোরের উপকণ্ঠে গ্রামটি বিখ্যাত দীঘাপতিয়া জমিদার (১৬৮০-১৭৬০) পরিবারের জন্য। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় ছিলেন নাটোরের জমিদার রামজীবন রায়ের দেওয়ান। দীঘাপতিয়ার পরিখা বেষ্টিত রাজবাড়ি সযত্নে রক্ষিত আছে। নাটোর থেকে রাজসাহী পর্যন্ত সড়কটি এই পরিবারের রাজা প্রসন্ননাথ রায় নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন। দীঘাপতিয়ার প্রসন্ননাথ উচ্চ বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, রাজসাহীর পি. এন. উচ্চ বিদ্যালয় এই পরিবারের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত হয়। প্রাণনাথ রায় রাজসাহী কলেজকে একটি প্রথম শ্রেণির কলেজে রূপান্তরের জন্য ১,৫০,০০০ টাকা দান করেন। পরে তার পুত্র প্রমদানাথ কৃষি খামার ও রেশমশিল্প শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য যথাক্রমে ৮০ বিঘা ও ৩৪ বিঘা জমি দান করেছিলেন। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা প্রমদানাথের তৃতীয় ভ্রাতা শরৎকুমার রায়। শরৎকুমার বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রত্ন নিদর্শন উদ্ধারে ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

৯

পুঁঠিয়া

বর্তমানে উপজেলা সদর পুঁঠিয়ায় অবস্থিত। রাজসাহী সদরের অন্তর্গত। নাটোর থেকে পুঁঠিয়ার দূরত্ব সাড়ে ১০ মাইল। সারদা রোডের পাশে অবস্থিত পুঁঠিয়ায় আছে উপজেলা সদরের যাবতীয় দপ্তর। তাছাড়া পুঁঠিয়ার ৪ আনী ও ৫ আনী জমিদারদের বাড়ি এখানে অবস্থিত। "পুঁঠিয়ার জমিদারদের রাজবাড়ির আশেপাশে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে ভুবনেশ্বর মন্দির, শিবমন্দির, দোলমণ্ডপ, দুটি গোবিন্দমন্দির এবং ঝুলন মন্দিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষোক্ত অট্টালিকাটি স্থাপত্যরীতির থেকে বিশিষ্ট ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এটি ধ্বসে পড়ে। দুটি গোবিন্দ মন্দিরই ইটের তৈরি এবং পোড়ামাটির চিত্রদ্বারা শোভিত ছিল। সুপ্রচলিত বাংলা রীতিতে নির্মিত। দুশো বছরের প্রাচীন বলে কথিত আরেকটি মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে পিরামিড আকারের একটি স্তম্ভ আছে। এ মন্দিরটির প্রত্যেক কোণাযও ক্ষুদ্রাকার পিরামিড আকারের স্তম্ভ রয়েছে। এখানে শিবসাগর ও গোবিন্দসাগর নামে দুটি দিঘি আছে। প্রথমটি শিব মণ্ডপের কাছে অবস্থিত। আর দ্বিতীয়টি দোলমণ্ডপের পূর্ব দিকে অবস্থিত। পাঁচ আনী জমিদার বাড়ি দোলমণ্ডপের সামনে অবস্থিত। এটি পাশ্চাত্যরীতিতে তৈরি। ১৮৯৫ সালে রাণী হেমন্তকুমারী দেবী তার স্বামী যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এ বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন।*

১০

পাহাড়পুর**

একটি সুপ্রাচীন স্থান। কালের প্রবাহে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের নানান শিল্প কর্ম। বগুড়া ও রাজসাহী জেলার সীমান্তে অবস্থিত। বাংলাদেশ রেলওয়ের দর্শনা-চিলিহাটি শাখার জামালগঞ্জ স্টেশন থেকে পাহাড়পুর যাওয়া যায়। দূরত্ব মাত্র ৩ মাইল।

"... কয়েক বৎসর হইল ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ এখানে ৮০ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড একটি ইষ্টকময় স্তূপ খনন করিয়া একটি বিশিষ্ট ধর্মায়তনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। পাহাড়পুর নামটি কিন্তু আধুনিক। খনন করিবার পূর্বে এখানকার বিরাট জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপটি পাহাড়ের মত দেখাইত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পাহাড়পুর। এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল সোমপুর। এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি মুদ্রা (Seal) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"সোমপুর ধর্মশালা বিহার"। পাহাড়পুরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম এখনও "ওমপুর" নামে পরিচিত। মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধন ও বানগড় বা প্রাচীন কোটিবর্ষ হইতে যথাক্রমে উত্তরপশ্চিমে ও দক্ষিণপূর্বে প্রায় ৩০ মাইল দূরে এই বিরাট বিহার ও সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নগরীর কোলাহল হইতে বহুদূরে শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে ভিক্ষুগণ যাহাতে ধর্ম সাধনায় মগ্ন থাকিতে পারেন সেইজন্য সম্ভবত এই স্থানে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

"পাহাড়পুরের প্রধানস্তূপের মন্দির বা মহাবিহারটির গঠনরীতি স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে ইহা এক নূতন নিদর্শন। ভারতে এইরূপ পদ্ধতি অন্যস্থানে অনুসৃত না

* রাজসাহী জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৯১
** অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নিবন্ধ। পৃঃ ২৬১

হইলেও ব্রহ্মে, কম্বোজে ও যবদ্বীপের বিরাট মন্দিরগুলিতে যে পাহাড়পুরের আদর্শই গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যবদ্বীপের বরবদুর ও প্রাম্বাণম ও কম্বোজের আঙ্কোরভাট প্রভৃতি জগৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির গঠন রীতির সহিত পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের গঠনরীতির সৌসাদৃশ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাংলার দান অসামান্য। প্রথম পাল রাজত্বের যুগে যবদ্বীপ প্রভৃতির সহিত পূর্ব ভারতের ঘনিষ্ঠতার কথা নালন্দায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

"কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাহাড়পুরের মহাবিহার প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঐ স্থানে বা নিকটে চতুর্মুখ জৈন মন্দির ছিল এবং কতকাংশে তাহার আদর্শে বিহারটি পরে নির্মিত হয়; পাহাড়পুরের সহিত জৈনদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার প্রমাণ এই স্তূপ খননকালে ভালভাবেই পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক চতুর্মুখ জৈন মন্দিরের সহিত বিহারটির প্রাথমিক আকৃতিগত ও কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও বিহারের তিনটি তল, প্রতি তলে প্রদিক্ষণের পথ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইহার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

"প্রধান মন্দির বা বিহারটি ঘিরিয়া পাহাড়পুরের বিরাট সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘারামটি অবস্থিত; ইহার প্রতিটি ভুজ বাইরে ৮২২ ফুট লম্বা। বৌদ্ধভিক্ষুদের এতবড় সঙ্ঘারাম ভারতে আর কোথাও নির্মিত হয় নাই। ইহাতে সারি সারি চারিটি ভুজে ১৮৯ কুঠুরি ও প্রবেশমুখে একটি বড় দালান আছে ও কুঠুরিগুলির সম্মুখে ৮/৯ ফুট লম্বা একটি বারান্দা ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কুঠুরিগুলির মধ্যে ৯২টিতে উচ্চ পূজার বেদী দৃষ্ট হয়; একটি মহাবিহারের নিকট সঙ্ঘারাম মধ্যে এতগুলি পৃথক পূজার স্থান থাকিবার কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা নিরূপিত হয় নাই।

"সঙ্ঘারামের পূর্ব দিকে এবং ইহার বাহিরে প্রাচীর হইতে প্রায় ১০০ ফুট দূরে সত্যপীরের ভিটা নামক ক্ষুদ্র স্তূপ খনন করিয়া তারার মন্দির পাওয়া গিয়াছে। ইহার সহিত দূরবর্তী কালে একটি গ্রাম্য কাহিনী যুক্ত হওয়ায় ইহার সত্যপীরের ভিটা নাম হইয়াছে। কথিত আছে, এই স্থানের রাজা মহীদলনের কন্যা সন্ধ্যাবতীর পুত্র সত্যপীর একজন বিশিষ্ট ধার্মিক ও সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং একটি ভীষণ বন্যায় ইনি ভাসিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের বাহিরের প্রাচীর হইতে ১৬০ ফুট দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন স্নানের ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রাম্যকাহিনী অনুসারে রাজকন্যা সন্ধ্যাবতী এই ঘাটে প্রত্যহ স্নান করিতেন।

"পাহাড়পুরে পাল যুগের পূর্বেকার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গেলেও ইহার মহাবিহার সঙ্ঘারাম প্রভৃতি পাল যুগে খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত।

"পাহাড়পুরের মহাবিহারের পাদমূলে চারিদিকে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ যে ৬৩টি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই অপূর্ব; পূর্ব ভারতে ইহার তুলনা মিলে না। পাল যুগের বিস্ময়কর ভাস্কর্য শিল্পের সূত্রপাত এইগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পালযুগের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধীমান ও বীটপাল ইহার পরবর্তীকালে খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দীর লোক।

"পাহাড়পুরে কয়েকটি খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে একটি রাজা মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালের।

"তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায়, খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সোমপুর মহাবিহার তিব্বতীয়গণের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশের তিব্বতীয় জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে, তিনি বহু বৎসর সোমপুর বিহারে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার গুরু ছিলেন এই বিহারের মহাস্থবির রত্নাকর—শান্তি। নালান্দা ও বোধগয়ায় প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে তথায় এই সোমপুর বিহারের কয়েকজন ভিক্ষুর দানের কথা জানিতে পারা যায়।

"পুরাকালে একটি নদী এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। আজও অধুনালুপ্ত এই

নদীর পার্শ্বস্থিত ঘাট ও তৎসংলগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর পশ্চিমতীরে চারিদিকে উচ্চ দেওয়াল বিশিষ্ট গড়ের মধ্যেস্থলে মূল অধিষ্ঠানটি অবস্থিত। উত্তর দিকস্থ দেওয়ালের মধ্যস্থলে প্রধান প্রবেশ দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রবেশপথের ঠিক সম্মুখভাগে গড়ের মধ্যস্থিত প্রধান অধিষ্ঠানের সুবৃহৎ সিঁড়ি অবস্থিত। উক্ত সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে হয়। এই তলে একটি "প্রদক্ষিণ-পথ" আছে। পথের চারিধারে নক্সা করা টালিতে (Plaques) মানুষ, নানারকম জীবজন্তুর ছবি এবং "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশে" বর্ণিত গল্প চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "বানর-কীলক কথা" ও "সিংহ-শশক-কথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে একটি থামে যে শিলালেখন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে কলেজের গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের সময়ে এই মন্দিরের কিয়দংশের সংস্কার হইয়াছিল। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে যে ১৫৯ গৌপ্তাব্দে অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় সম্রাট বুধগুপ্তের সময়ে এই স্থানে একটি জৈন মন্দির ছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তি খুঁড়িবার সময় বহু পাথরের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে "গিরি গোবর্ধন ধারণ" শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক "ধেনুকাসুর" ও "চাপুর মুষ্টিক বধ" প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্তি সত্যই চিত্তাকর্ষক। তদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত "বালীবধ", বালী সুগ্রীব সংগ্রাম, মহাভারতে বর্ণিত "সুভদ্রা হরণ" ও "মহাদেবের হলাহল পান", বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চিত্র মন্দিরের প্রাচীর ও পাদমূলে শোভা পাইয়াছে। এই স্থানে বিহারগাত্রে রাধাকৃষ্ণের যে অনুপম মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে উহাই প্রাচীনতম যুগলমূর্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

"হিন্দু শাস্ত্রের মতে গৃহ ও মন্দির প্রভৃতির প্রবেশদ্বার উত্তর-মুখী হওয়া শুভ এবং প্রশস্ত। পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রবেশদ্বারও উত্তরমুখী দেখা যায়। এখানে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে প্রত্যেক বাঙালি পর্যটকের এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, এখানকার মন্দির গাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা নির্মিত (Terracotta) যে সমুদয় জীবজন্তুর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—মৎস্য, কুম্ভীর, বিবিধ সরীসৃপ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি তাহাদের প্রায় সমস্তই বাংলাদেশের এবং বাঙালির চিরপরিচিত। এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাহাড়পুরের বিহারাদি বাঙালি স্থপতি ও ভাস্করের কীর্তি।"*

১১

মাহিসন্তোষ

ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ মাহিসন্তোষ ও সাপাহার বর্তমান পত্নীতলা উপজেলার অন্তর্গত। সাপাহারে একটি দিঘির মাঝখানে প্রোথিত আছে লাল গ্রানাইট পাথরে তৈরি ৩০ বা ৩৩½ ফুট দীর্ঘ দিব্যক স্মৃতিস্তম্ভ। বলা হয়ে থাকে কৈবর্তবংশীয় দিব্যক পালরাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করার পর যুদ্ধ জয়ের এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের বালুরঘাট শহরের দু'মাইল পূর্বে মাহিসন্তোষে বহু প্রত্নিদর্শন পাওয়া গেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের ভগ্ন প্রাসাদ, দিঘি ও পরিখা বেষ্টিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ আমলের বিবিধ মূর্তি, শিলালিপি, সুলতানী আমলেব মুদ্রা, একটি কামান ও কয়েকটি তরবারি পাওয়া গেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি মুসলমান শাসকদের আমলেও ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক সাহের নামানুসারে স্থানটি বারবকাবাদ নামে

* বাংলায় ভ্রমণ। পৃঃ ১৩০-১৩৬

পরিচিত হয়। আকবরের সময় বাংলাকে যে ২৪টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়, তার অন্যতম ছিল বারবকাবাদ। এখানকার টাকশালে তৈরি সুলতান সামসুদ্দিন মোজাফ্ফর সাহ (১৪৯০ খ্রিঃ) এবং সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরত সাহের মুদ্রা ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মাহিসন্তোষকে স্থানীয় লোকে মাহিগঞ্জ বলে থাকে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, পালবংশীয় রাজা মহীপালের নামের সঙ্গে যুক্ত।

মাহিসন্তোষে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আশীয়ারা খাতুন। তার আলোচনায় বলেছেন, এখানে প্রাপ্ত শিলালিপির সংখ্যা চার। প্রথম দুটি শিলালিপি তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. ভি. ওয়েস্টমেকট উদ্ধার করেছিলেন। তৃতীয় শিলালিপির আবিষ্কারক বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎকুমার রায়। চতুর্থ শিলালিপিটি সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত। চারটি শিলালিপিতেই আছে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য। প্রথম শিলালিপিটি 'মাহি' বা 'মায়িসন্তোষ' নামক একজন মহিলা পীরের মাজারের ভিতরের দরজার উপর স্থাপিত ছিল। তবে মাজারের সঙ্গে শিলালিপিটির কোন সম্পর্ক নেই। যে মসজিদে শিলালিপিটি ছিল তার কোন সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। এখানে অসংখ্য পাকা ইমারত ও প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দেয়ালগুলি বিনষ্ট। মসজিদটি ধ্বংসের পর পরবর্তী সময়ে লিপিটি মাজারে এনে লাগান হয়েছিল।

দ্বিতীয় শিলালিপিতে উল্লিখিত মসজিদটিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাহিসন্তোষে একটি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ খননকালে তৃতীয় শিলালিপি ও মিহরাব পাওয়া যায়। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে রক্ষিত লিপি থেকে জানা যায় যে, ৯১২ হিজরির (১৫০৭ খ্রিঃ) ৯ রমজান তারিখে বিন সুহাইল এই মসজিদ নির্মিত করেছিলেন। "মিহরাবটির মধ্যভাগে খাড়াভআবে হিন্দু 'শিকল ও ঘন্টা' নকশা খোদাই করা আছে। 'শিকল ও ঘন্টা' নকশাটির উভয় পাশে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ও ফুলের ডাল এবং এর ভূমিখণ্ড পদ্মপামেট দিয়ে অলংকৃত। এ ধরনের পদ্ম, ফুলের ডাল এবং পামেট ছোট সোনা মসজিদের গায়েও দেখা যায়। মিহরাবটির উপরে যে কার্নিশটি আছে এর সম্মুখভাগ 'এরাবেস্ক' নকশায় এবং উপর ও নিম্নভাগ পদ্ম পাতায় সুসজ্জিত। মোট কথা মিহরাবটিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় প্রকার অলংকরণ শৈলীই বিদ্যমান।"

বারবক শাহের আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) নির্মিত মসজিদের আরও একটি শিলালিপি সম্প্রতিকালে পাওয়া গেছে। এ শিলালিপিটিতে উল্লেখ আছে জনৈক উলুঘ হাসান ৮৬৭ হিজরিতে (১৪৬৩ খ্রিঃ) মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা।

"প্রাচীন মসজিদের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দেয়াল ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পশ্চিম দেয়ালের কিছু অংশ এখনও টিকে আছে এবং তা মাটি থেকে প্রায় ৩ ফুট উঁচু। বেশির ভাগ ইট এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মসজিদ প্রাঙ্গনে পাথরগুলি স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই কালো পাথর। তবে প্রত্ন-স্তূপ অবমুক্তির পর এই মসজিদটি একটি আয়তাকার মসজিদ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। মসজিদের উত্তর-দক্ষিণের বহির্বাহুর পরিমাপ ২৪ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিম বাহুর পরিমাপ ১৬.২০ মি.। মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতি বরুজ রয়েছে। নামাজ ঘরটি দুই সারি পিলারের সাহায্যে তিন আইলে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে দুটি করে জানালা। তবে কেন্দ্রীয় দরজাটি পাশের দরজাগুলি থেকে বৃহদাকার। প্রত্নস্তূপ অপসারণের সময় বেশ কয়েকটি অলংকৃত ইট পাওয়া গেছে। সম্প্রতি রাজসাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এখান থেকে পদ্ম, শঙ্খলতা, আরশিলতার মটিফ সংবলিত বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্কৃত ইট

সংগ্রহ করেছেন। এইগুলি দেখে মনে হয় ছোট সোনা ও দরসবাড়ি মসজিদের ড্রামের অভ্যন্তর ভাগে যেরূপ অলংকৃত ইট ব্যবহৃত হয়েছে, এই অলংকৃত ইট তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নামাজ ঘরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি স্তম্ভ পতিত এবং গুটি কয়েক স্তম্ভের অংশ বিশেষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পতিত স্তম্ভের অগ্রভাগে শিকল ও ঘন্টার নকশা দেখা যায়। হিন্দু শিকল ও ঘন্টার নকশা গৌড়ের ফিরোজপুরস্থিত ছোট সোনা মসজিদের গাত্রের শিকল ও ঘন্টা নকশার অনেকটা অনুরূপ ও প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষগুলি বারবক সাহের নির্মিত মসজিদেরই ধ্বংসাবশেষ। এ অনুমান বিদ্যমান তথ্যাবলির ভিত্তিতে করা যেতে পারে।...

"পূর্বেই বলা হয়েছে মাহিসন্তোষ অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় আছে। এগুলির মধ্যে মিঠাপুকুর নামক দিঘিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে যে দুর্গ বা গড়ের কথা আগে বলা হয়েছে, তা মিঠাপুকুর দিঘির উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখানে তিনটি প্রাচীন মাজারকে উজিরের কবর বলা হয়ে থাকে। বাকি দুটি মাজার মিঠাপুকুর নামক একটি দিঘির পশ্চিম তীরে একটি অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে অবস্থিত। বড় কবরটি মাহিসন্তোষ বা মায়িসন্তোষ নামক একজন মহিলা পীর ও পার্শ্বে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত ছোট কবরটিকে তার কন্যার মাজার বলে অভিহিত করা হয়।..."*

১২
চলন বিল

"কথায় বলে বিল দেখবে তো চলন আর গ্রাম দেখবে তো কলম—অর্থাৎ চলনের মত বড় বিল এবং কলমের মত বড় গ্রাম বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। এই বিশাল বিল বা নিম্নভূমি রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা নিয়ে অবস্থিত। আদিতে এর উত্তরের সীমারেখা ছিল আত্রাই স্টেশন থেকে নিমচাঁদপুর, পূর্বসীমারেখা ছিল নিমচাঁদপুর থেকে মালঞ্চি ও পশ্চিম সীমারেখা ছিল মালঞ্চি থেকে আত্রাই স্টেশন। এ ত্রিভুজাকৃতি স্থানটির মধ্যে নাটোর, দিঘাপতিয়া ও কলম প্রধানত অবস্থিত ছিল। ক্রমাগত পলি জমতে জমতে এর সীমা সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং পরিবর্তিত সীমা দাঁড়ায় উত্তর ও পূর্বে ভাঙ্গাজাঙ্গাল থেকে নূরনগর, পশ্চিমে ভাঙ্গাজাঙ্গাল থেকে দিঘাপতিয়া ও দক্ষিণে নন্দকুঁজা ও গদাই নদীর নিম্ন সীমা।"**

ওপরের বিবরণে চলন বিল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া হান্টারের বিবরণে রাজসাহীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নরমানের চলন বিল সম্পর্কে একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"*Bil Chalan* is the name applied to an extensive tract of country situated between the Districts of Rajshahi, Pabna and Bogra. It lies between Singra, a village and Police Station on the road between Nattor and Bogra to the north-west, and the north bank of the Baral river near Chatmohar in Pabna to the south-east-a distance of twenty one miles. The greatest breadth is from Taras on the north to Biaghat on the south-west, a distance of ten miles. The total area is about a hundred and fifty square miles. It is a depressed basin, sunk on all sides below the level of the adjacent country, as shown by the course

বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস—বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজসাহী
নাটোরের কথা ও কাহিনী। পৃঃ ৩৭

of the neighbouring rivers ; except at the southern extremity, towards which its bed slopes, and from which its waters are discharged.In the rains the entire area of the *bil* is covered with a sheet of water, interrupted only by the high lands of the villages situated in it. The principal feeders of the *bil* are the Gur from the north and the Nandakuja from the west. There are also two minor streams–the Bhadra and the Besani–on the east. The Gur empties into the *bil* the waters it drains from the north in its passage through the Districts of Bogra and Dinajpur. The Nandakuja conveys into the *bil* the waters of the Ganges, which it receives through the Baral. The Gur joins the Nandakuja at Nazirpur ; but in the rains, the latter river, swollen with Ganges water, forces back the waters of the Gur, and flowing northwards along the channel of that river, rushes into the *bil* through the Gutiya *jola*. Both rivers, moreover, overflow their banks, and pour masses of water across the fields into the *bil*. The outlet for the waters of the *bil* is through the Nandakuja, which from Katchikata southwards flows through the centre of the *bil* and empties itself again into the Baral at Nun-nangar." [Mr Norman, here and throughout this extract, uses the name Nandakuja for the united waters of the Atrai and Nandakuja, which, under the name of the Gumani, find their way into the Baral after crossing the Chalan *bil*. The Nandakuja proper only runs from the Baral northwards into the Atrai.] "The Baral falls into the Harasagar, which, in its turn, discharges itself into the Brahamputra (Jamuna). When the Brahmaputra is in flood, the current of the Baral is forced back, and the water of the *bil* remains pent up until the Brahmaputra falls again.

"During the dry season the greater portion of the *bil* dries up, leaving a water-basin of about twenty square miles, which extends from Tajpur and Doiva on the north to Masinda and Kachikata on the south, a distance of about seven miles ; and from Pipla on the east to Kadamtali, Mirzapur, Sapgari and Durgapur on the west, a distance of from three and a half to four and a half miles This area is not, however, covered with an uninterrupted sheet of water, but with a collection, as it were, of shallow pools, connected with each other by tortuous channels, and interspersed with patches of high ground, on some of which stand villages. The water averages about three feet in depth. The water-basin under description is traversed from north to south by an exceedingly sinuous central channel, known as the Banganga. This, as well as the network of subsidiary channels which communicated with it, is from six to twelve feet in depth.

"In the dry season, the streams which fall into the *bil* on the east disappear. Only two rivers maintain any volume of water during the dry season, namely, the Gur and the Nandakuja. By the former it is fed, and by the latter its waters find exit.

"The Gur is the name given to the united streams of the Atrai and Jamuna. which drain the northern District of Dinajpur. It also receives the Nagar, which flows from Bogra District. If confined to its proper or direct bed, the Gur falls into the Nandakuja at Nazirpur. If not artificially restrained, however. its waters are attracted by the low level of the *bil*, and feed it through three natural canals, as follow—(1) The Katuabari *jola*, which falls into the northern end of the Banganga, the central channel of the *bil*. Formerly the Banganga was connected with the Gur near Singra, but its bed between that place and its junction with the Katuabari has now silted up. (2) The Padhoyar *jola*, which leaves the Gur opposite Raninagar, and after a very sinuous course discharges itself into the Banganga. This is the smallest of the three *Jolas*. (3) The Gutiya *jola*, which leaves the Gur at Maheshmari, is the largest of the three channels, and is the main feeder of the *bil*. It is eight or nine feet in depth in most places, is about forty yards broad, and has a current of about three-quarters of a mile per hour. This *Jola* carries off by far the greater portion of the waters of the Gur. The remaining portion, which finds its way along the straight bed of the river into the Nandakuja at Nazirpur, is quite insignificant, and is barely sufficient to float boats of the smallest size. Thus, the waters of the Gur pass into the *bil* on the north and west, and find exit through the channel of the Banganga.

"The Nandakuja is an offshoot of the Baral, which it leaves at Nandakuja factory ; and after a nearly semicircular course, for the last six miles of which it passes through the centre of the *bil*, it discharges into the same river. During the dry season this river confines itself strictly to its own channel, and no water escapes from it over any part of the surface of the bil. Its only point of contact with the waters of the *bil* is at Kachikata, where it receives them through the Banganga, and carries them with it on its way to the Brahamputra. The confluents of this river are the Baranai and the Atrai, the waters of the latter being divided between it and the Gur. This river is locally known as the Gumani, between Syamput and its confluence with the Baral. For the sake of uniformity, however, the name Nandakuja only is used throughout this report.

"Both the Gur and the Nandakuja remain open all the year round, being fed by mountain streams from the north. They are navigable by vessels of six or seven hundred maunds burthen (from twenty to twenty-four tons). Having an open communication with the Brahamputra through the Baral and Harasagar, they provide the Districts of Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, and Bogra with most useful channels of intercourse. The Atrai is navigable close up to the station of Dinajpur. The Nandakuja itself is navigable only as far as the village of Anandpur, owing to the circumstance that the Baral mouth has

silted up at Sardah, and that river now receives no water from the Ganges during the dry season ; but its confluent, the Baranaj, carries vessels to the marts of Madariganj and Taherpur, and as far as the village of Naohata. At Biaghat, the Nandakuja is a river eighty-five yeards in width and twelve feet in depth, but the great difficulty for traffic is at Kachikata, the point where it debouches into the *bil*. At this place the water is not more than two feet eight inches in depth. These rivers convey to the Northern Districts the miscellaneous commodities of Calcutta, and carry back return cargoes of rice."*

"নাটোরের কথা ও কাহিনী" থেকে জানা যায় চলন বিল সংলগ্ন বিলগুলির অন্যতম হল হালতি বিল, রেড়ি বিল, বিন্নাগুড়ি বিল ও বোসেখালি বিল। একসময় যে চলন বিলের আয়তন ছিল ৪১২ বর্গমাইল, এখন তার আয়তন মাত্র ১৪২ বর্গমাইল। অর্থাৎ ২৭৯ বর্গমাইল পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে। যে সব নদীবাহিত জল এসে জমে এই বিলে, তার অন্যতম হল নন্দকুঁজা, গদাই, পাঙ্গাল, বড়াল, আত্রাই, নাগর ও ভাদাই। এইসব নদীবাহিত পলিমাটির পরিমাণ দেওয়া হয়েছে ঃ

নদী	জলবহনের পরিমাণ	প্রতি ঘনফুট জলে পলির পরিমাণ
নন্দকুঁজা	১৪,৩৪০ কিউসেক	.১১৮
পাঙ্গাল	৫,৯২২ "	.০৭৯
বড়াল	২,৩৮০ "	.১০৮
আত্রাই	১২,৯৩৭ "	.০০৬
নাগর	১,৯০০ "	.০০৯
ভাদাই	৮৬০ "	.০০৬

বর্তমান চলন বিলের ১৪২ বর্গমাইল এলাকার ভূপ্রকৃতি ও জলের গভীরতা হল :

	বর্গমাইল	ভূপ্রকৃতি	জলের গভীরতা
১.	৩৮	অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি—চাষ হয় নভেম্বর মাসে	১ থেকে ৫ ফুট
২.	২২	এই জমিও বেশ উঁচু—চাষের সময় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৫ থেকে ৮ ফুট
৩.	৪৯	এই জমিতে চাষ হয়—ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলে	৮ থেকে ১২ ফুট
৪.	৩৩	এই জমি সারা বছরই থাকে জলের নিচে	৮ থেকে ১২ ফুট

চলন বিলে নদী বাহিত জল ও পলি এসে জমা হয়। আবার গুড় ও মতিদহ (অষ্টমনীষা) নদীপথে জল ও পলি বেরিয়েও যায়। তার পরিসংখ্যান হল :

নদী	জল নিকাশের পরিমাণ	এক ঘন ফুট জলে পলির পরিমাণ
গুড় নদী	১৫,০৬৪ কিউসেক	.০২১ পাউন্ড
মতিদহ	২২,৮৮৭ "	.০১২ "

দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর চলন বিলে যে ২২২ মিলিয়ন ঘন ফুট পলি আসে, তার মধ্যে ৫৩ মিলিয়ন ঘন ফুট বেরিয়ে যাওয়ার পর, বিলে ১৬৯$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন ঘন ফুট পলি জমে থাকে। এই সঞ্চিত পলির ঘনত্ব হল $\frac{৩}{৪}$"। পলি জমে বিলের নানা স্থান বেশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। বহুকাল যাবৎ এখানে নতুন নতুন গ্রাম গড়ে উঠেছে। প্রচুর মূল্যবান ফসলি জমিও পাওয়া গেছে।

* Statistical Account of Bengal, Vol III.

চলন বিল মাছ চাষের অন্যতম ক্ষেত্র এবং যোগাযোগের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী।*

সাজাদপুর-কালীগ্রামের জমিদারি পরিদর্শনে দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথকে নদীপথ পারাপার করতে হয়েছে। সেই সময়ে চলন বিলের বুকের ওপর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে বহুবার। এই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির বুকের ওপর বোটে ভেসে চলার সময় কবির সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত থেকেছে গান ও কবিতার জগতে। অন্য রচনায়ও। চলন বিল কবির ভাল লাগেনি। ১৮৯৩ সালের ১১ আগস্ট একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন :

"অনেকগুলো বড় বড় বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই। জলে স্থলে একাকার—পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে—পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে, জাল ফেলবার জন্য বড় বড় বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড় বড় চিল বসে আছে—ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মত অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দুধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার যো নেই।..."**

১৩ আগস্টের আর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন : "এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেকদিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে তেমন শোভা থাকে না—অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল এক ঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয় ; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক একটি স্বতন্ত্র লোকের মত মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেই রকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই ; সে একটা বৃহৎ বিশেষত্ব বিহীন বিলের মত। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয় ; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল—তার কোন ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায় ; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেইরকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে। সেই জন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। ওটা একটা কৃত্রিম-অভ্যাস-জাত সুখ দেবার জন্যে নয়—ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবদ্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়—ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র! কিন্তু সে ভারী ভুল।

* নাটোরের কথা ও কাহিনী। পৃঃ ৩৬—৩৭

** ছিন্নপত্রাবলী। ১০৮ নং পত্র

কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দর্যের এমন অনির্বান শক্তি। আর, সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়েছিলুম অমনি আমার মনে এই তথ্যটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠেছিল।"*

১৮৯৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পতিসর থেকে লিখেছেন : "কাল সকাল থেকে জল পথে রয়েছি। চারিদিকেই কেবল বিল, ধানের ডগাগুলি জেগে রয়েছে,—গুটিকতক ঘনবদ্ধ কুটির নিয়ে গ্রামগুলি দূরে দূরে ভাসছে— মৃদু সুগন্ধ বিশিষ্ট সবুজ শৈবাল অনেক দূর পর্যন্ত জমাট বেঁধে রয়েছে, হঠাৎ ডাঙা বলে বোধ হয় ; তার মধ্যে বিচিত্র জলচর পাখির আড্ডা। ভাদ্র মাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে এবং নৌকোটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে নিতান্ত উদাসীনের মত চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলবাদ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্তদিন কেবল গুনগুন্ করে গান করছি। রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু আভাস মাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা যায়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে।..."*

এতো গেল রাজসাহী জেলায় বিস্তৃত চলন বিলের প্রসঙ্গ। বিলটি কেবল রাজসাহীতে সীমাবদ্ধ নয়। নাটোর সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার আটটি থানা জুড়ে চলন বিল। থানাগুলি হল নাটোর জেলার সিংড়া, গুরুদাসপুর ও বড়াই গ্রাম, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া থানার অংশবিশেষ এবং পাবনার ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর থানা। সব মিলিয়ে ৮০০ বর্গ মাইলের চলন বিল পূর্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩২ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থে সাড়ে ২৪ মাইল। চলনবিলের উত্তরে বগুড়ার নন্দীগ্রাম ও শেরপুর থানা, দক্ষিণে পাবনার আটঘরিয়া ও ঈশ্বরদী থানা, পূর্বদিকে সারা-সিরাজগঞ্জ রেল লাইন এবং পশ্চিমে নাটোর সদর থানা ও নওগাঁ জেলার আত্রাই ও রাণীনগর থানা। "এককালে চলন বিল ছিল তৎকালীন নাটোর মহকুমার তিন চতুর্থাংশ, নওগাঁ মহকুমার রাণীনগর ও আত্রাই থানা এবং পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা ও সদরের চাটমোহর। ফরিদপুর ও বেড়া থানায় বিস্তৃত। বগুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তের আদম দিঘি ও নন্দীগ্রাম থানা চলনবিলের মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে বছরের পর বছর ধরে ক্রমশ পলি জমার ফলে বিলের উত্তরাঞ্চল উন্নত হওয়ায় চলনবিল ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরে পড়েছে।... নন্দকুজা, গুমানী ও বড়াল নদী চলন বিল অঞ্চলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। গুরুদাসপুর থানার উত্তরাংশ, সিংড়া, তাড়াস, রায়গঞ্জ থানা ও উল্লাপাড়া থানার পূর্বোক্ত পাঁচটি ইউনিয়ন এলাকাকে উত্তর চলন বিল এবং দক্ষিণাংশের বগুড়া, চাটমোহর ও বড়াইগ্রামে থানাত্রয় এবং গুরুদাসপুর থানার দক্ষিণাংশে এলাকাকে 'দক্ষিণ চলন বিল' বলা হয়। চলন বিল অঞ্চলের ইউনিয়ন সংখ্যা—৫৭, পৌরসভা—১, গ্রাম দেড় হাজারের অধিক। লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ।"**

* ছিন্নপত্রাবলী। ১০৯ নং পত্র

* চলনবিলের ইতিকথা—এম. এ. হামিদ। বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস। পৃঃ ৬৫—৬৮

১৩

মেলা*

জেলার ২৯টি মেলার নাম পাওয়া যায়। তবে সব মেলা এখন প্রচলিত নেই। আবার নতুন নতুন মেলারও সৃষ্টি হয়েছে।

১. বারুনী মেলা—পুঁঠিয়া
২. খেতুর মেলা—গোদাগাড়ি—দুর্গাপূজা উপলক্ষে— ৬ দিন
৩. কারুন মেলা—গোদাগাড়ি
৪. প্রেমতলী মেলা—গোদাগাড়ি—চৈত্র মাসের শেষ ও বৈশাখের প্রথমে—১ মাস
৫. বারখরিয়া মেলা—নবাবগঞ্জ—ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে
৬. শারজোমার মেলা—নবাবগঞ্জ—ফাল্গুন মাসের শেষ দিন
৭. ততীপুর মেলা—শিগঞ্জ—মাঘ মাসের প্রথম দিন
৮. বাহাদুরগঞ্জ হাট মেলা—নবাবগঞ্জ—কালীপূজা উপলক্ষে
৯. মুমিনগঞ্জ হাট মেলা—নবাবগঞ্জ—দুর্গাপূজা উপলক্ষে
১০. পোল্লাডাঙা মেলা—নবাবগঞ্জ—ভাদ্র মাসে নৌকাবাইচ উপলক্ষে
১১. মহারাজপুর মেলা—নবাবগঞ্জ—ঈদ্-উল-ফিতর উপলক্ষে
১২. রথের মেলা (পৌর পার্ক)—নবাবগঞ্জ
১৩. তরীপাড়া মেলা—নবাবগঞ্জ—মাঘ মাসের শেষ দিন থেকে
১৪. শাহার জুম মেলা—নবাবগঞ্জ—শুরু হয় ৩রা ফাল্গুন
১৫. বারোঘরিয়া মেলা—নবাবগঞ্জ—দুর্গাপূজা উপলক্ষে
১৬. মান্দার মেলা (ঠাকুরমান্দা)—নওগাঁ—চৈত্র সংক্রান্তি— ১২ দিন
১৭. বাঘার মেলা—পীর শাহদৌলার ওরস—২রা রমজান
১৮. ভক্তিপুরের মেলা—জ্যৈষ্ঠ মাস
১৯. সুলতানগঞ্জের মেলা—মাঘ মাস
২০. বাঘশারের মেলা—চৈত্র মাস
২১. পীরগাছির মেলা—চৈত্র মাস
২২. পরানগড়ের মেলা—চৈত্র মাস
২৩. তাহিরপুরের মেলা—আষাঢ় মাস
২৪. সালোড়ের মেলা—আষাঢ় মাস
২৫. কুরবের মেলা—আষাঢ় মাস
২৬. মাঝিপুরের মেলা—বৈশাখ মাস
২৭. কানসাটের মেলা—বৈশাখ মাস
২৮. শিবগঞ্জ ও চন্দ্রাপুরের মেলা—বৈশাখ মাস
২৯. কুঁজেলের মেলা—শ্রাবণ মাস

১৪

মসজিদ ও মন্দির

বৃহত্তর রাজসাহী জেলার মসজিদ :

১. ফিরোজপুর (গৌড়), দরসবাড়ি মাদ্রাসা এবং মসজিদ—১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

* ৩০ ২২৪ ও ৩০৬ পৃঃ দেখুন।

২. রাজবিবি মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী।
৩. ধনচক মসজিদ—পঞ্চদশ শতাব্দী।
৪. ছোট সোনা মসজিদ—১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ।
৫. শাহ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি ও সংলগ্ন মসজিদ—সপ্তদশ শতাব্দী।
৬. তাহ্‌খানা—সপ্তদশ শতাব্দী।
৭. বাঘা মসজিদ—১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ।
৮. বাঘা দরগাহ—খানকা এবং সমাধি—সপ্তদশ—উনবিংশ শতাব্দী।
৯. কুসুম্বা মসজিদ—১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
১০. নওদা, আটকোণাকার সমাধি—সপ্তদশ শতাব্দী।
রাজসাহী শহর :
১১. শাহ মখদুমের সমাধি—সপ্তদশ শতাব্দী।
১২. সুলতানগঞ্জ, সুলতান শাহের সমাধি—পঞ্চদশ শতাব্দী।
১৩. রোহনপুর, সুফীখানের মসজিদ—পঞ্চদশ শতাব্দী (অবলুপ্ত)।
১৪. রোহনপুর, সদাইপীরের দরগা।
নাটোর :
১৫. দরগা সমূহ—উনবিংশ শতাব্দী।
কানাইখালি :
১৬. ইটের তাজিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ।
নওগাঁ :
১৭. প্রাচীন মসজিদ—ষোড়শ শতাব্দী (অবলুপ্ত)।
সুলতানপুর :
১৮. কাজিবাড়ি মসজিদ—অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী।
চাঁপাই :
১৯. একটি প্রাচীন মসজিদ—আঠার শতক (অবলুপ্ত)।
২০. কুসুম্বা মসজিদ—১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ (অবলুপ্ত)।
গোদাবাড়ি :
২১. কিল্লাবারুইপাড়া। আঠার শতক (অবলুপ্ত)।
মাহিসন্তোষ (মহীগঞ্জ) ঃ
২২. পুরনো মসজিদ, সমাধি, মাজার, দিঘি—পনের-ষোল শতক।
কুমারপুর :
২৩. সমাধি—১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ (অবলুপ্ত)
২৪. মসজিদ—১৫৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দ (অবলুপ্ত)।
বৃহত্তর রাজসাহী :
২৫. বাগধানী মসজিদ—১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
২৬. চুনিয়াপাড়া, মোহনপুর উপজেলা মসজিদ—আঠার-উনিশ শতক।
২৭. অচিনঘাট, বাগমারা থানা, মসজিদ—অবলুপ্ত*

দরস মাদ্রাসা ও মসজিদ :

সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁপাইনবাবগঞ্জে দরসবাড়ি

* বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি—ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

মসজিদটি নির্মিত হয়। তার আগে এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। যে কারণে মসজিদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মাদ্রাসা শব্দটি। মসজিদটির অবয়ব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এক সময়ে আয়তন ছিল বিশাল। মসজিদটির অবস্থান উমর গ্রামের নিকটবর্তী কোতয়ালী-দরজা ও ছোট সোনা মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে। দেওযালের গায়ে নকশা আঁকা।

"দরসবাড়ি মসজিদের চারকোণায় চারটি বুরুজ ছিল এবং সম্মুখের বারান্দার দুই পাশে দুইটি সর্বমোট ছয়টি কারুকার্যমণ্ডিত বুরুজ ছিল। বারান্দা বহুদিন পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই মসজিদের বারান্দাটি সম্মুখে ৭টি কৌণিক খিলান সম্বলিত প্রবেশপথ ছিল, মধ্যস্থলে চারচালা এবং দুই পাশে তিনটি করে গম্বুজ ছিল। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য ৭টি প্রবেশপথ কিবলা প্রাচীরের ৭টি মিহরাবের দিকে চলে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মসজিদে প্রবেশের জন্য ৩টি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের প্রধান মিহরাবটি অন্যান্য মিহরাব অপেক্ষা বড় এবং সব মিহরাবই অবতলাকৃতি। মিহরাব ইটের তৈরি এবং কারুকার্য মণ্ডিত। এগুলি উপরে অর্ধগোলাকার পোড়ামাটির ফলক মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। কারুকার্য অত্যন্ত উঁচুমানের এবং লতাপাতা ফুল-ফলের বিন্যাস দেখা যাবে। মিহরাবের পাশে কিবলা প্রাচীরের সংলগ্ন অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত মিনবার ছিল। অন্যান্য মসজিদের মত এতে জানানা গ্যালারির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কতিপয় স্তম্ভ ছাড়া এই গ্যালারির আর কোন চিহ্ন নেই।..."*

ছোট সোনা মসজিদ :

শিবপুব থানার ফিরোজপুর গ্রামের ছোটসোনা মসজিদটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯০—১৫১৯) ওয়ালী মোহাম্মদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদে আছে পাথরের ওপর সুদৃশ্য খোদাই কাজ। হোসেনশাহী আমলে পাথরকাটা শিল্পের যে অসাধারণ নৈপুণ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিদর্শন ধরা আছে মসজিদের সর্বত্র।

কুসুম্বি মসজিদ :

রাজসাহী জেলায় মান্দা-থানার এলাকায় কুসুম্বিগ্রামে একটি মসজিদ আছে। ইহার আকার প্রায় বাঘার মসজিদের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা-কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং ইষ্টকের পরিবর্তে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। কুসুম্বি মসজিদের ছয়টি চূড়া এবং অভ্যন্তরভাগের ঠিক মধ্যস্থলে দুইটি থাম আছে। ইহার খিলান বাঘা-মসজিদের ন্যায়; লম্বাভাবে নয়টি এবং তেরচা ভাবে আটটি খিলান আছে। মসজিদের প্রত্যেক কোণে দুটি করিয়া ছোট জানালা এবং পূর্বদিকে তিনটি দ্বার বর্তমান আছে। পশ্চিম দিকে মৌলনাদিগের উপাসনার নিমিত্ত ঘন সবুজ বর্ণের প্রস্তর নির্মিত কারুকার্যময় দুইটি সুন্দর বক্রাকৃতি বেদী বর্তমান। মসজিদটি প্রায় ৪০ হস্ত লম্বা, ৩০ হস্ত প্রস্থ এবং দেওয়াল প্রায় পৌনে পাঁচ হাত গভীর। মসজিদের বহির্ভাগে স্থপতিকার্যকুশলতার কোন নিদর্শন নাই। মধ্যম প্রবেশদ্বারে এই লিপিটি খোদিত আছে—"মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি ভগবানের অর্চনার নিমিত্ত পৃথিবীতে স্থান করিয়া দেন, তিনি শেষের সেই বিচারের দিনে ভগবান কর্তৃক পরিতুষ্ট হন',—ভগবান তাহার মস্তকে আশীর্বাদধারা বর্ষণ করুন। এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন ক্ষমতাশালী এবং সদাশয় সম্রাট তিনি সাংসারিক ও পারলৌকিক কার্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তাহার নাম আবুল মোজাফফার বাহাদুর, পিতার নাম সোলতান মহম্মদ গাজী। পরমেশ্বর তাহাকে এবং তাহার দেশ ও সম্রাজ্য নিরাপদে রাখুন। তিনি গৌরব দৃপ্ত প্রভাবশালী সম্রাট ও প্রভূত সেনানির অধীশ্বর ছিলেন। ৯০৩ হিজরীতে সোলেমনরাম কর্তৃক নির্মিত।"

* *বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি—ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ৩০*

মসজিদের ভিতরে পশ্চিমপার্শ্বে, কিন্তু পূর্বোক্ত বেদীর উত্তরে, প্রথমে আরোহনোপযোগী সিঁড়ি সমন্বিত একটি মঞ্চ এবং তথা হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে একটি প্রস্তরময় দরগহ (Dorgah) আছে। স্তম্ভগুলি প্রকাণ্ড; ছাদের উপর গুরুভার জঙ্গল ও আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া সমগ্র মসজিদটিকে ধরণীবক্ষে পাতিত করিবার জন্য ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে। রাজসাহী জেলার এই মসজিদটি অতীব প্রাচীন ও সুন্দর। মসজিদের সংলগ্ন প্রায় ৭০ বিঘাব্যাপী বৃহৎ একটি পুষ্করিণী স্বচ্ছসলিল বুকে করিয়া টল্‌টল্‌ করিতেছে। মসজিদ ও পুষ্করিণীটি পুনঃসংস্কার হইলে ইহা একটি বেশ দর্শনীয় স্থান হয়। শুনিতে পাই, উহার কর্তৃত্বভার নাকি একজন হিন্দু মোক্তারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। মোক্তার মহাশয় এদিকে যে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা মসজিদ ও পুষ্করিণীর বর্তমান অবস্থা দেখিয়াই বুঝা যায়।

মসজিদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনশ্রুতি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে;— কালিসফা (রাজসাহীর একটি পরগণা) নিবাসী চিলমন (Chilman) মজুমদার নামক এক জমাদার নিরূপিত সময়ে খাজানা দিতে না পারায় নবাব কর্তৃক মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। আশ্বিন মাস,— বঙ্গদেশ শারদীয়া উৎসবে উন্মত্ত। এই আনন্দের সময়ে একদা রজনীতে মজুমদার, কারাগৃহ বসিয়া মনের আবেগে অতি করুণ-স্বরে গান গাহিতেছেন, তাহার সেই সঙ্গীতের সুমোহন স্বর লহরী অনন্ত আকাশ পথে বায়ুতাড়িত হইয়া নবাবের এক বেগমের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরদিবস প্রত্যুষে নবাব, বেগমের মুখে এই সঙ্গীতের বিষয় অবগত হইয়া, বন্দিকে সম্মুখে হাজির করিতে কারাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। অধ্যক্ষ, মজুমদারকে নবাবসকাশে উপস্থিত করিলে নবাব বলিলেন, তুমি মোসলমান ধর্ম অবলম্বনপূর্বক যে বেগমকে গানে বিমুগ্ধা করিয়াছ, সেই বেগমকে বিবাহ কর। মজুমদার প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করিলে, নবাব তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে মজুমদার জীবনরক্ষার অভিপ্রায়ে নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মোসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সোলেমন খাঁ নামধারণপূর্বক বেগমকে বিবাহ করেন। তৎপরে বেগম সম্রাটকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহাদের স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কিছুই নাই। ইহাতে সম্রাট তাহাদিগকে কালিগাঁ পরগণা লাখেরাজস্বরূপ প্রদান করিয়া সনন্দ দিলেন এবং একপ্রহরের মধ্যে তাহারা যত টাকা লইতে পারেন তাহা-রাজ-কোষ হইতে লইতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে বেগমও তাহার নবস্বামী কোষাগারে প্রবেশ করিয়া নিরূপিত সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ লইতে সক্ষম হইলেন তাহা সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে তাহারা কুসুম্বি গ্রামে উপনীত হইয়া পুরাতন বাস্তুভিটার নিকট একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং নিবিড় জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মনুষ্যের অগম্য স্থান হইয়া আছে। পরে তাহারা যে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেন, তাহাও পূর্বোক্ত-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে এই আলোচ্য মসজিদটি নির্মিত হয়। খাঁ, দুইটি পুষ্করিণী খনন করান; একটি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার গুরুঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন এবং অপরটি তাহার বেগম সোনাবিবির নামানুযায়ী সোনাদিঘি নামকরণ করেন। সোনাবিবি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন, এই পুত্র বহুদিবস সুখেস্বচ্ছন্দে তাহাদের বিপুল ধনৈশ্বর্য ভোগ দখল করে। কিন্তু সলিমের প্রপৌত্রের রাজ্য সময় দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ লুটতরাজ দ্বারা কালীগাঁ পরগণা অধিকার করিয়া লন। পরে এই পরগণা ইংরেজরাজের হস্তগত হইলে কতিপয় জমিদার তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লন।

এই দিঘির জল অতি পরিষ্কার। উহাতে কোন শেওলা বা জঙ্গলাদি জন্মে নাই। তদ্ধেতু এবং শীতঋতুতে জলের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় লোকে অনুমান করে যে, উহার গহ্বরে ধাতু প্রোথিত আছে।

রামপুরবোয়ালিয়ার উত্তরে নওগাঁ মহকুমার পশ্চিমে আত্রাই নদীর তীরে মান্দাগ্রাম

অবস্থিত। এই মান্দারের প্রায় চারিমাইল দক্ষিণে কুসুম্বি গ্রামে কুসুম্বি-মসজিদ অবস্থিত আছে*। দুঃখের বিষয় এই পুরাতন মসজিদটি অতি শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। ছয়টি-চূড়ার মধ্যে এখন মাত্র তিনটি অবশিষ্ট আছে, তাহাও অভগ্ন নহে। দেওয়ালগুলি খাড়া হইয়া আছে সত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছে। খিলানের উপর রক্ষিত একটি প্ল্যাটফরমের উপর মসজিদের ভিত্তি সংস্থাপিত; নীচের এই খিলানের ভিতর গমনাগমনের সরু রাস্তা ছিল। নানারূপ আগাছা-দ্বারা এই পথ অবরুদ্ধ হইলেও পথের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। মসজিদটি ভগ্নপ্রবণ হইলেও ১৮৯৭ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইতে মস্তকের তিনটি চূড়ার বিনিময়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ঐ চূড়ার পতনাঘাতে দুইটি ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই ভূমিকম্পের সময় ইহার নিকটে 'তাজিয়া' মিশিল সমবেত হইয়াছিল। প্রস্তরের সিঁড়ি বহিয়া 'মিম্‌বারে' পৌঁছান যায়, কিন্তু তথায় যাওয়া এখন নিরাপদ নহে।

মসজিদের পশ্চাৎভাগে ঘনতৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে গড়খাই, ছোট পুকুর এবং মোসলমান ওমরাহদিগের ইস্টক-নির্মিত ২/৩টি আবাসবাটির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

মিঃ কারস্টেয়ার্স গ্রামবাসীদিগের নিকট শুনিয়া মসজিদের উৎপত্তির যে বিবরণ তাহার রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা যায় কি না? তৎকালে মুরশিদাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; গৌড় নগরীর প্রাধান্যই অত্যধিক ছিল। জমিদারগণ রাজস্ব-আদায়কারী নবাব কর্মচারীর বিষ-নজরে পড়িলে নানারূপে বিড়ম্বিত হইতেন, তাহাও সত্য। ইহাতে কিছুই বিস্ময়কর ব্যাপার নাই। সোনাবিবি নাম যদি সত্য হয়, তবে বোধহয় সে বেগম ছিল না, খুব সম্ভবত বেগমের দাসী হইবে। পূর্বোক্ত জনশ্রুতিটি বোধহয় নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বিকৃত হইয়া থাকিবে— পূর্বোক্ত জমিদারটি সুন্দর গান-বাজনা করিতে পারিতেন। সোনাবিবি তাহার সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নবাবের নিকট তাহার মুক্তির নিমিত্ত এবং তাহার সহিত উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। সোনাবিবি মোসলমান রমণী এবং জমিদার হিন্দু পুরুষ, কাজেই নবাব এই বিসদৃশ্য সম্মিলন অনুমোদন করেন নাই। জমিদার ধর্মান্তর আশ্রয় করিলে নবাব তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষরূপে বিদায় করেন। প্রস্থানকালে রাজভাণ্ডার হইতে বিপুল ধনরত্ন ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত ৩২৭ খানি গ্রামসহ কুসুম্বি মৌজা জায়গির দান করেন। বন্দি জমিদারটি যদি নবাবের কোনো বেগমকে মুগ্ধ করিতেন তবে বোধ হয় তিনি এভাবে নিষ্কৃতি পাইতেন না। কোনো নবাবই বেগমের প্রার্থনাক্রমে তাহাকে পরপুরুষের করে অর্পণ করেন না।

নীচে যে লিপিটি উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে জানা যায় যে, এই মসজিদে বাঘার মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৩৫ বৎসর পর ৯৬৬ হিজরীতে (১৫৫৮-৯ খ্রিস্টাব্দে), শূর আফ্‌গান পরিবারের মহম্মদ শাহ খাজীর পুত্র সোলতান গিয়াসউদ্দীন আবুল মজাফর বাহাদুর সাহের রাজত্বকালে সোলাইমন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। সোলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরসাহ ৯৬২ হইতে ৯৬৮ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সোলাইমন মসজিদ নির্মাণের উপকরণ সমূহ, বিধ্বস্ত এবং অব্যবহার্য হিন্দুমন্দিরাদি হইতে সংগ্রহ করেন। কিন্তু নূতন ও ব্যবহার্য মন্দিরগুলি রক্ষাকল্পেও যত্ন করিয়াছিলেন।

রাজসাহীর ভূতপূর্ব ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কুসুম্বিতে যাইয়া এই মসজিদ দেখেন। তিনি বলেন যে, মসজিদের ভিত্তি-গাত্রে যে প্রস্তর-লিপিখানি ছিল

* এই স্থান হইতে ৬/৭ মাইল দূরে রাজসাহীর অন্তর্গত বাগমারা থানার অধীনেও অনেকগুলি পুরাতন পুষ্করিণী, সমাধি ও দেবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাদারিগঞ্জ গ্রামে দুইটি এবং নমাজ গাঁয়ে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে।

তাহা কালপ্রভাবে স্থানচ্যুত হইয়া মসজিদের মধ্যম প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে ঝুলান ছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জানা যায় যে, ঐ শিলালিপিখানি খুদীমুন্সি নামক এক গ্রামবাসী লইয়া গিয়াছে। এখন উহা ঐ মুন্সির বাড়িতেই আছে।

মৌলবি আবদুলওয়ালী বলেন যে, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ রক্ষার নিমিত্ত এখন উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, সেই সঙ্গে এই প্রাচীন মসজিদটির সংস্কার করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা উচিত।

উক্ত শিলা-লিপিখানির অর্থ এইরূপ,— "ভগবান সেই মহাপুরুষের প্রতি শান্তিকণা বর্ষণ করুন, যিনি বলিয়াছেন,— 'যে পরমেশ্বরের সম্মানার্থে পরমেশ্বরের অর্চনার নিমিত্ত মসজিদ নির্মাণ করে, সে স্বর্গে তদনুরূপ পরমেশ্বরের নির্মিত আবাসস্থান প্রাপ্ত হয়। মহাম্মদ সাহ গাজীর পুত্র মহামহিমান্বিত ও সর্বগুণান্বিত সোলতান গিয়াসউদ্দীন্ (Ghiyasu-d-Dunyaw-din) আবুল মোজাফর বাহাদুরসাহের রাজত্ব সময়ে (ভগবান তাহার রাজ্য ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং তাহার মর্যাদাও প্রভাব বর্ধিত করুন), ৯৬৩ সালে সোলাইমন কর্তৃক নির্মিত হইল।"*

বাঘা মসজিদ :

রাজসাহীর ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ জে. এস. কারস্টেয়ার্স (J. S. Carstairs) মহোদয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৮৬ নম্বর পত্রযোগ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট বাঘার জোম্বা-মসজিদ এবং কুসুম্বির মসজিদের বিবরণ সম্বলিত এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। কারেস্টয়ার্স মহোদয় মসজিদ দুটির প্রতিকৃতি ও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত মসজিদ দুইটির বর্তমান অবস্থাও অতি শোচনীয়। রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেটের সেরেস্তাদার মসজিদের প্রতিকৃতি দুইখানি ও রিপোর্টটি অতি সযত্নে মহাফেজ থানায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সেরেস্তাদার মহাশয় নিজেও মোসলমান, কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতীয়ের কীর্তিরক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবি আব্দুল আলী রাজসাহীতে কোনো কার্যোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেরেস্তাদার মহাশয়ের অনুগ্রহে মহাফেজ থানা হইতে ঐ রিপোর্ট ও প্রতিকৃতির নকল করিয়া লইয়া যাইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু মসজিদের প্রতিকৃতি দুইটি অতি জরাজীর্ণ হেতু অস্পষ্ট হওয়ায় সোসাইটির সম্পাদক তাহা মুদ্রিত না করিয়া কেবল রিপোর্টটুকু ১৩০৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট হইতে মসজিদ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির হইলেও তাহা ভিত্তিশূন্য। কিন্তু আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে ভাবিয়া আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টখানি অনূদিত করিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট এইরূপ :— * * * সর্বপ্রথম বাঘার পুরাতন মসজিদ উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, ইহা নাকি হিজরী ৯৩০ সালে নির্মিত হইয়াছে। মসজিদের ছাদের উপর দশটি চূড়া (domes) আছে, তাহা বাহির হইতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মসজিদের অভ্যন্তরে, ঠিক মধ্যস্থলে চারিটি প্রস্তরের থাম আছে তদুপরি খিলান দ্বারা সমগ্র মসজিদের ছাদটি রক্ষিত।

এতৎসংলগ্ন প্রতিকৃতি হইতে খিলান ও থামের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইবে। পশ্চিমের দেওয়ালে মৌলানাগণের উপাসনার নিমিত্ত তিনটি-সুচিত্রিত বেদী আছে। মধ্যটি কেবল ইমামের জন্য। মসজিদ ৫৪ ফিট দীর্ঘ, ৪৫ ফিট প্রস্থ; ইস্টক নির্মিত দেওয়াল ৭ ফিট পুরু (thick)। দূর হইতে উহা যেন লোহিত ইস্টকের বর্তুলাকার গোলা বলিয়া মনে হয়। * * * মসজিদের মধ্যে দ্বারের উপর একটি লিপি খোদিত আছে, তাহার অর্থ এই ঃ—

---

* ব্রজসুন্দর সান্যাল—ভারতী, ১৩১২ কার্তিক

মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে— যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পরমেশ্বরের নিমিত্ত একটি স্থান প্রস্তুত করে, সে তাহার পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে ভগবানের নির্মিত স্থান পায়। এই জোম্বা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন প্রতাপান্বিত ও সদাশয় সম্রাট, তিনি আবার এক সম্রাটেরও পুত্র। তিনি সাংসারিক ও পরলৌকিক যাবতীয় কার্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তাহার নাম— আবুল মোজ্জাফর নুজারাৎ শাহ (আবু-ল-মোজ্জাফর নুজারৎ শাহ) ভগবান যেন তাহার মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। ভগবান যেন তাহাকে এবং তাহার দেশ ও সাম্রাজ্য চিরকাল নিরাপদ রাখেন। ৯০৩ হিজরী।

বাঘা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনপ্রবাদ শ্রুতিগোচর হয় ঃ— গৌড়ের এক সম্রাট ঢাকা যাইবার কালে বাঘায় শিবির স্থাপন করেন। পরে একটু আগুনের প্রয়োজন হওয়ায় সম্রাটের ভৃত্যগণ লোকালয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। ধূমরাশি আকাশপথে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহারা তদনুসারে অগ্রসর হইয়া এক জঙ্গলের নিকট উপনীত হয়, তথায় তাহারা দেখে যে, একজন ফকির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রশান্তচিত্তে ভগবানের উপাসনা করিতেছেন। ফকিরের চারিপার্শ্বে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ তর্জন গর্জন করিতেছে। সম্রাটের অনুচরগণ তথা হইতে অগ্নি লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাট সকাশে ফকিরের কথা নিবেদন করিল। সম্রাট আশ্চর্যান্বিত হইয়া ফকিরকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন অনুচরগণের কথা সত্য। তৎপরে সম্রাট ফকিরের ধ্যানভঙ্গের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফকিরের নাম— সাহ মহাম্মদ দুল্লা (শা মহাম্মাদ-দৌল্লা)। সম্রাট বিনীতভাবে ফকিরকে বলিতে লাগিলেন,— "হে মানবেশ্বর। আপনার দাসগণ ঢাকায় যাইবে কি এই স্থানেই অবস্থান করিবে?" ফকির উত্তর করিলেন, —'তুমি এখানে একদিন অপেক্ষা কর।' তদনুসারে সম্রাট একদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন। সেই দিবসেই সন্ধ্যার সময় ঢাকা হইতে সম্রাটের নিকট সংবাদ আসিল,— 'যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আপনারই জয় হইয়াছে।' সম্রাট অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভৃত্যগণকে বলিলেন,— 'দেখ, এখানে একজন মহাপুরুষ আছেন।' তৎপর তিনি ফকিরের নিকট যাইয়া প্রচুর পরিমাণ ভূমি লাখেরাজস্বরূপ দান করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ফকির কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া বলিলেন,— 'জাঁহাপনা! আপনার দাস ও সকল কথা আর শুনিবে না। যে ব্যক্তি সংসারের সহিত একবার সম্পর্কশূন্য হইয়াছে, সেকি পুনরায় সে মায়াতে আবদ্ধ হইতে চায়? আপনার এ অনুগ্রহ আপনার দাসের পুত্রের উপর প্রদর্শিত হউক্'। তাহার পুত্রের নাম— হজরত মৌলানা দানেশ মান্ড ছিল। সম্রাট তাহাকেই ২২০ খানি মৌজা নিষ্কররূপে দান করিলেন। মৌলানা দানেশ মান্ডের পুত্র আবদুল ওহেব। কেহ কেহ বলেন, ইহাকেই ১০৩৩ হিজরীতে দিল্লির সম্রাট শাজাহান, রাজসাহী জেলা দিয়া যাইবার কালে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য মসজিদের পার্শ্বস্থিত জমি লাখেরাজ দান করেন। শুনা যায়, জমি দানের সম্বন্ধে অন্য কোনে শর্তে নাই, কেবল লিখিত আছে যে লাখেরাজের আয় হইতে তাহার ও তাহার বংশধরগণের ভরণপোষ নির্বাহ হইবে। তাহার বংশধরগণ লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ভয়ে নাকি সনন্দের শর্ত পরিবর্তন করিয়া নূতন শর্ত করেন যে, ইহার অর্ধেক ধর্ম-কর্মে ব্যয়িত হইবে এবং ঐ সম্পত্তি কেবল ঐ পরিবারের ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত থাকিবে। আবদুল ওহেবের পুত্র মহাম্মদ রফিক প্রথম রইস (বাঘার মাতোয়াল্লিকে রইস বলে) বা মসজিদের সেবাইত হন।

মসজিদের উত্তর প্রান্তে তিনটি সমাধি বিদ্যমান আছে। মসজিদের নির্মাণ-ভার যে দারোগাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছিল, উহা নাকি তাহাদেরই সমাধিমন্দির। উহারই সন্নিকটে বাঘা পরিবারের মৃতব্যক্তির সমাধিক্ষেত্র। ঐ সকল সমাধিমন্দিরে স্থপতি-কার্য-কুশলতার কিছুমাত্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কারস্টেয়ার্স সাহেবের রিপোর্টে বাঘা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে। রাজসাহী জেলার লস্করপুর পরগণায় বাঘার জোম্বা মসজিদ এবং ঐ বৃহৎ পুষ্করিণী অবস্থিত। এই পরগণা বহু পূর্বে পুঁঠিয়ার ঠাকুর এবং নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজাদিগের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সরকার বারবকাবাদের (Barbakabad) শাসনাধীন ছিল। বিলমাড়িয়া (বর্তমান লালপুর) স্টেশনের অধীন বাঘা অবস্থিত। নাটোব মহকুমার মোতাবেক এবং রামপুরবোয়ালিয়র দক্ষিণ পূর্বকোণে রাজসাহী জেলার বিলমাড়িয়া ও নাটোর থানার অধীন মুসলমান আমলের বহুতর নিষ্কর ও আয়মা আছে। এই সকল আয়মা ও নিষ্কর ভূমি মুসলমান নরপতিগণ কর্তৃক স্বজাতীয় প্রতিপালন ও স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। কালক্রমে প্রথম গৃহীতার বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকল ভূমি বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং সর্বশেষে নানারূপ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় ঐ সকল ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই হিন্দু ভূম্যধিকারগণের হস্তগত হইযাছে।

মসজিদে সুন্দর অক্ষরে ২৪½ ইঞ্চি লম্বা ও ৫½ ইঞ্চি, প্রস্থ স্থানের মধ্যে তিন লাইনে একটি লিপি আছে। তাহার ভাবার্থ এই : —

ভগবানের শান্তিকণা ও আশীর্বাদ ধারা যে মহাপুরুষের উপর বর্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন, — "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ভগবানের নিমিত্ত মসজিদ নির্মাণ করেন, তিনি তদনুরূপ ভগবানের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যে আবাসস্থান প্রাপ্ত হন। এই জোম্বা মসজিদ এক মহাপ্রতাপান্বিত ও সদাশয় সোলতান কর্তৃক নির্মিত হয়, ঐ সোলতান আর এক সোলতানের পুত্র ছিলেন। সোলতান হোসেন শাহ আল-হোসেনির পুত্র সোলতান নসিরুদ্দিন ওয়াজুদ্দিন আবুল মজ্জাফর নুসারৎসাহ। ভগবান তাহার রাজ্য ও শাসন জয়যুক্ত করুন। হিজরী ৯৩০ সাল।

দিল্লির সম্রাট শিকান্দর লোদির সমসাময়িক সোলতান আলাদ্দীন হোসেন শাহ তাহার পুত্র আবুল মোজ্জাফর নসিরুদ্দীন নুসারৎসাহ, ১৫১৮ হইতে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে (৯২৫-৯৩৯ হিজরী) পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। মৌলবি আবদুল আলি লিখিয়াছেন যে, তাহার রাজত্বকালে ৯৩০ হিজরীতে (১৫২৩ খ্রিঃ অঃ) বাঘার মসজিদ নির্মিত ও পুষ্করিণী খনিত হয়। ইহা মসজিদের উৎকীর্ণ লিপি হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বাঘার অনতিদূরে—মকদমপুর গ্রামে তৎকালে অলুবক্স বরখারদার লস্করি বাস করিতেন, তাহার গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও প্রাচীন কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বাঘার খোন্দাকার পরিবার বিশেষ সম্মানশালী। লোকে বলিয়া থাকে শাহদৌল্লা, বোগদাদের আব্বাজী খলিফা হারুন-উল-রসিদের বংশাবতংশ। শাহদৌল্লা বোগদাদ হইতে চলিয়া আসিয়া লস্করপুরের জায়গিরদার অনবক্স বরখারদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার পরিবারকে 'অর্ধপরিবার' বলে, যেহেতু তিনি বোগদাদ হইতে একাকি আসিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে,— 'মনুষ্য স্ত্রীলাভ না করা পর্যন্ত অর্ধ-মনুষ্য থাকে। বিবাহ হইলে পূর্ণ-মানব হয়।'

বাঘার সুবৃহৎ আয়মার আয় সম্পর্কে নানা জনে নানারূপ বলেন। মিঃ আডাম তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, রাজসাহীর কালেক্টরের মতে উহার আয় ত্রিশ হাজার টাকা। মৌলবি আবদুল আলীব মতে বাৎসরিক আঠার হাজারের উপর। এই সম্পত্তি সুচারুরূপে বন্দোবস্ত ও শাসিত হয় না।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে জোম্বা মসজিদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনদিকের দেওয়াল এখনো দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সম্মুখের বা পূর্বদিকের দেওয়াল এবং ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সরকার হইতে দাতব্য-সূত্রে বাঘার বৃহৎ জলাশয়টির পুনঃসংস্কার আরম্ভ হয়, কিন্তু অল্পদিন কাজ চলিতেই বৃষ্টি পড়ায় কার্য বন্ধ হয় এবং তদবধি

তাহাতে আর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, মসজিদ রক্ষা ও অন্যান্য ধর্ম-কার্য্যের নিমিত্ত আয়মা দান থাকিলেও মসজিদটি এই ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া কালের কঠোর নিয়মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রমজান ঈদের সময় বাঘার একটি মেলা বসে, তথায় প্রচুর পরিমাণে আম্র পাওয়া যায়।*

রাজবিবি মসজিদ :

ফিরোজপুরের কোতওয়ালী ফাটকের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই মসজিদটি সুলতানী আমলে নির্মিত। খানিয়া দিঘির পাড়ে অবস্থিত থাকায়, অনেকে বলে খানিয়া দিঘির মসজিদ। পঞ্চদশ শতাব্দী নির্মিত মসজিদের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এই মসজিদটিও একসময়ে সুঅলঙ্কৃত ছিল। অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন আছে।

ধনচক মসজিদ :

রাজবিবি মসজিদের কাছে ধনচক মসজিদটিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত। পাথরের খোদাই কাজ ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। মসজিদটি কালগ্রাসে পতিত হয়েছে।

সাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর সমাধি ও মসজিদ :

সাধক সাহ্ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর সুসজ্জিত সমাধি ফিরোজপুর গ্রামে গৌড় দুর্গের বাইরে অবস্থিত। পাশের মসজিদটি সাধক স্বয়ং নির্মাণ করিয়েছিলেন। সাহ্ সুজার সময় তিনি বর্তমান ছিলেন। মসজিদটি মুঘল আমলের স্থাপত্য কলার নিদর্শন। মসজিদের চারকোণায় আটকোণা বুরুজগুলি উপর চূড়ায় ছোট গম্বুজ (কুপলা) দ্বারা আবৃত। সামনে পূর্ব দিক থেকে ৩টি খিলান পথ আছে এবং দুই পাশে ১টি করে প্রবেশপথ দেখা যাবে। মসজিদের প্রধান আকর্ষণ মিহরাব প্রাচীর, যাতে তিনটি অবতল মিহরাব রয়েছে। সামনের দেওয়ালের উপর প্যানেলের অলঙ্করণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মুঘল ধরনের তিনটি গম্বুজ আটকোণা ড্রামের উপর স্থাপিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুঘল আমলে আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সংখ্যা অন্যান্য ধরনের তুলনায় অনেক বেশি। শাহ নিয়ামতউল্লাহ মসজিদের পূর্বসূরি হিসেবে সুলতানি ও মুঘল যুগের বহু ইমারত রয়েছে। যেমন ধনিচক মসজিদ (ফিরোজপুর), খেরুয়া মসজিদ (শেরপুর, বগুড়া) চট্টগ্রামের জামে মসজিদ, ঢাকার হাজি খাওয়াজা সাহবাজ, লালবাগ এবং সাত গম্বুজ মসজিদ সমূহ। সুলতানি অলঙ্করণ রীতির অনুকরণে এই মসজিদে পোড়ামাটির কিছু নকসা দেখা যাবে।"**

মন্দির :

রাজসাহী জেলায় একসময় ছিল হিন্দু জমিদারদের আধিপত্য। সেইসব জমিদার ইষ্টদেবতার উদ্দেশে যেসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তার সংখ্যাও কম ছিল না। এমনকী স্থাপত্য নিদর্শনেও সেগুলি ছিল বৈশিষ্ট্যময়। পূজাপার্বণ যাগযজ্ঞে এইসব মন্দির চত্বর সারা বছর মুখর হয়ে থাকত। দানধ্যানও কম হত না। জমিদারদের আর্থিক অসচ্ছলতার সূচনা থেকেই এইসব মন্দিরের পূজাপার্বণ ও অনুষ্ঠানাদি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। রতনলাল চক্রবর্তী "বাংলাদেশের মন্দির" গ্রন্থে কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এখানে পাঁচটি মন্দিরের পরিচয় উদ্ধৃত হল তাঁর গ্রন্থ থেকে।

---

* ব্রজসুন্দর সান্যাল—ভারতী ভাদ্র ১৩১২

** বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি—ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ৪৯

পুঁঠিয়ার গোবিন্দ মন্দির : রাজসাহীর পুঁঠিয়ার পাঁচ আনী জমিদার বাড়িতে অবস্থিত গোবিন্দ মন্দির সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন বা পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট। মন্দিরের কার্নিশ ঈষৎ বাঁকানো। অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক রয়েছে মন্দিরের গাত্রে। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও স্থানীয় প্রাণী ও উদ্ভিদের জগতের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এই মন্দিরের অলঙ্করণে। সাধারণভাবে মন্দিরটি আড়াইশত বছরের নির্মাণ হিসেবে জানা গেলেও পোড়ামাটির চিত্রফলক দেখে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে মন্দিরটি উনিশ শতকে নির্মিত।

মঙ্গলবাড়ির শিব মন্দির : রাজসাহী জেলার ধামইরহাট থানা মঙ্গলবাড়িতে শিবমন্দির নামে অতি প্রাচীন কীর্তির অবস্থান রয়েছে। এখানে শিবমন্দিরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হর-গৌরীর মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত চারফুটি উঁচু এবং কিছুটা ভগ্ন। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় এই মূর্তিকেই পূজা করে। তবে এই মন্দিরের বেশ প্রাচীন আমলের, সম্ভবত পাল যুগের।

পুঁঠিয়ার শিবমন্দির : অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত পুঁঠিয়ার শিবমন্দির সম্ভবত উনিশ শতকের নির্মাণ। মন্দিরের উপরে চার কোণে চারটি ও কেন্দ্রস্থলে একটি মোট পাঁচটি রত্ন রয়েছে। মন্দিরের দেয়ালে পলস্তারার মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। ১৮২৩ সালে রাজসাহীর পাঁচ আনী জমিদার বাড়ির রাণী ভুবনময়ী এই মন্দির নির্মাণ করেন। কেউ কেউ এ মন্দিরকে ভুবনেশ্বরী মন্দির বলে থাকেন।*

[জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত শিবসাগর নামক সুন্দর একটি পুষ্করিণীর তীরে ভুবনেশ্বর মহাদেবের একটি চমৎকার সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। গোবিন্দ সরোবর নামক আর একটি জলাশয়ের ধারে দোলমণ্ডপ এবং ইহার সম্পর্কে পাঁচ আনী রাজবাটিতে গোবিন্দদেবের সুন্দর কারুকার্য খচিত ইষ্টকনির্মিত মন্দির আছে।" বাংলায় ভ্রমণ। পৃঃ ১১৯]

গোপাল মন্দির : এক কক্ষ বিশিষ্ট গোপালমন্দির সাধারণ স্থাপত্যের তুলনায় একটু ছোট আয়তনের। উনিশ শতকে নির্মিত এই মন্দিরের গায়ে রাধা-কৃষ্ণের লীলা, বিভিন্ন বিভিন্ন দেবদেবীর ও পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি মৃৎ ফলকের চিত্র অলঙ্কৃত ছিল।

ভীমের পাঠি : ভীমের পাঠি মণ্ডপটি অত্যন্ত পুরানো। একটি স্বতন্ত্র স্তম্ভ ও হরগৌরী মন্দির নিয়ে ভীমের পাঠি গঠিত। স্থানীয়ভাবে জানা যায় যে বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সন্ন্যাসী এখানকার ভগ্নস্তূপ হতে দেবমূর্তি উদ্ধার করে পুনঃ সংস্থাপন করেন। স্তম্ভটি বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয় এবং স্তম্ভটিতে উৎকীর্ণ শ্লোক হতে জানা যায় যে নারায়ণপালের রাজত্বকালে মন্ত্রী ভট্টগুরু মিশ্র এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন।**

---

* দেখুন পৃঃ ৩৭৩

** বাংলাদেশের মন্দির—রতনলাল চক্রবর্তী। পৃঃ ৬৪-৬৫

১৪

লোকসঙ্গীত

পাট কাটার গান

পুবের থনে আইল বাতাস নদী অইল তল।
দ্যাশ পিরথিমি সাগর ভাইসা চরায় নামল জল।।
(জোনা ভাইরে।)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল।
(জোনা ভাইরে।)
পুবের থনে বইছে বাতাস নামছে ম্যাঘের ঢল।
এক নিমেষে দুই না জাহান করব বুঝি তল।।
(জোনা ভাইরে।)
ঝড় বাদলে দিন মজুরী নিব ট্যাহা ট্যাহা।
শিগ্‌গির কইর‍্যা বাইরাও, রে ভাই, চালাও বিষম ঠ্যাহা।।
(জোনা ভাইরে।)
বিহান বিকাল দিব পাবদা বোয়াল কই।
তাহার লগে পাইবা আরও হাটের সরস দই।।
(জোনা ভাইরে।)
কাঁচি বাগি সঙ্গে লইয়া পাট কাটিতে চল।।

আঁকিবার গীত

দুপুইরা ব্যালা উড়ছে রে তুলি
লোকে বলে কি
বাদশার ঘরে আইছে ছাওয়াল
নাম রাখবো কি।
দুপুইরা ব্যালা উড়ছে রে তুলি
লোকে বলে কি
বাদশার ঘরে আইছে ছাওয়াল
নাম রাখো আল্লা-রসুলজীর।

বাউল গান

চেতন মানুষের সঙ্গ না নিলে।
শুধু কথায় অন্ত কি মিলে।।
নৈরাকারে সাঁই ভাসে একেলা,
ওরে সাধ কৈরে করেছেন পয়দা
নবী আদম ছকি ভেদ্ কেবা জানে
তারা সৃষ্টি করে তিনজনে।।
চেতনা মানুষ ধর্‌লে পরে অন্ত সহজে মিলে।
শুধু কথায় অন্ত কি মিলে।।

আলকাপ

ক. কৃষ্ণ : আমি এসেছি রাধে
অভিমান আর কর না।
একবার নয়ন মেলে দেখ না।।
শুন ও গো রাধে পেরি
কেন কর মন ভারি,
আজ কে দিয়েছে মনের বেদনা।
গিয়াছিলাম দূর বনে
আসতে দেরি সেই কারণে
আজ ঘুচাব তোমার মনের বাসনা।।
রাধা : সহে না সহে না সহে না
বিরহ আজ বাজে পরাণে,
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা,
তুমি কি বুঝিবে কালা
রাখাল মনের সরম কি জানে।।

খ. বৃন্দে : হরি করি হে প্রণাম তোমার চরণে
তোমার ঐ চরণের দাসী আমি হে
একবার দেখ ও নয়নে।।
ধর ধর পত্র ধর
তুমি হে শ্যাম নটবর
তুমি রাজা বিচার কর হে
বিচার করবে না কেনে।
কি লিখেছে কমলিনী
পড়ে দেখ চিন্তামণি
ও তোমার মধুর সুখের বাণী হে
আমি শুনিব কানে।।
কৃষ্ণ : বল কে তুমি ধনি, চিনি না তোমায়
তুমি কার রমণী সুবদনী হে
বল যাবে হে কোথায়।।
চিনতে নারি কার রমণী
নাই তোমার সঙ্গের সঙ্গিণী
দেখি তোমায় একাকিনী হে
তোমার সঙ্গে কেহ নাই।
কেবা তোমার মাতাপিতা
বলি ধনি যাবে কোথা
তুমি যুব-নারী কেমন করে হে
বল এসেছ হেথায়।।

রসিকা গান
ডাক সুরা

ওকি হায় হায় রে
হায় পরাণের মাধব রে,
তারা করে ঝিকি মিকি
চন্দ্র করে আলো,
এসেছিল ভাবের বন্ধু
বেজার হয়ে গেলো।
প্রথমে করিলাম প্রেম
তুমি আমি জানি,
এখন কেন সেসব কথা
লোকের মুখে শুনি।
তারপরে করিলাম প্রেম
নিমতরু তলে,
লিহরে ভিজিল তসর
গামছা বিছাও তলে।
তারপরে করিলাম প্রেম
সানবান্ধা ঘাটে,
আসমানের চান্দ যেমন
তুলে দিল হাতে।।

বিয়ের গান

বিবাহের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল গায়ে হলুদ। দীর্ঘদিন উৎকণ্ঠায় কাটাবার পর, এই প্রথম একটি অনুষ্ঠানে বর বা কনে উপস্থিত হল। যা তাকে বা তার হৃদয়কে পুলকিত করে। স্বপ্নের সব ছবি আজ বাস্তব হয়ে ওঠে। তার সর্বত্রই রঙিন ছবির সমাবেশ।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত গায়ে হলুদের গান

ই-পার উ-পার কুসুমের আড়াল,
মধ্যে বেজোপাড়া গো সখি—
মধ্যে বেজোপাড়া।
এতো রাইতে বাজনা গো বাজে,
হলুদ বাঁটে কারা গো সখি—
হলুদ বাঁটে কারা?
সাত ভায়ের বহিন লো যারা;
হলুদ বাঁটে তারা গো সখি—
হলুদ বাঁটে তারা।।
মেন্‌দি তুলো নিক্ লিব রে মাথ্
কি ও — দিনু রে হাত।
মেন্‌দিবাটা নিক্ লিব রে মাথ,
কি ও — দিনু রে হাত।
সেরপুর সহরে মেন্‌দির গাছ,
কি ও — দিনু রে হাত।।

উত্তর পচ্ছিমে হলুদ লাগাইলাম,
　　　ওহি হলুদ কি নাওবে।
মিঞা কা বেটা শহরে শাহাজাদা,
　　　ওহি হলুদ কি নাওবে।
মিঞা কা বেটি পরমা সুন্দরী,
　　　ওহি হলুদ মাখাওবে।।
পিঠের হলৈদ রে বাছা, গোটা আরো গোটা।
মুখের হলদে রে বাছা, সর্ব রঙের ফোঁটা।।
ছাইল্যা খ্যালাইতে রে গ্যালো, নানা-নানীর বাড়ি।
নানাতে গাইলো রে দ্যায়ো — উলু খৈন্যা ছাইল্যা।
নানীতে নিষেধো রে করে — না দিও গাইলো।
কাইলি বিহানে রে হামি, মোনার‍্যা ডাকবো,
গড়িয়্যা দিব রে হামি জোড় হাতের বালা।।

২

হলৈদ, তোমার জরম্ কুন্ খানে হে,
হলৈদ, তোমার জরম্ কুনখানে হে?
হামার জরম্ রাজার বাগানে হে।
হলৈদ, তুমি কি কি কামে লাগো হে?
হামি লাগি ন'শা আরশের মুখে হে?
মেহেদি তোমার জরম্ কুন্ খানে হে?
হামার জরম্ মাইল্যানীর বাগানে হে।
হামি লাগি ন'শা আরশের হাতে হে।
সুর্মা. তোমার জরম্ কুন্খানে হে?
হামার জরম্ মক্কার শহরে হে।
হামি লাগি ন'শা আরশের চোখে হে।।

৩

বাসর জাগার গান

লীলা করিও না হে নাগর
খ্যালা করিও না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।
চুল টানিয়ো না হে নাগর
গাল ধরিও না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।
কথা কাটিও না হে নাগর
গোঁসসা করিও না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।

হাত ধরিয়ো না হে নাগর
জিভ্যা চুষিও না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।
পাঁ ধরিয়ো না হে নাগর
কুতকুতি দিও না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।
আঁচল টানিয়ো না হে নাগর
ছায়া ছিড়িও না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।
বুতাম কাটিও না হে নাগর
চুরি ভাঙ্গিয়ো না
নিন্দে আছে বালা আরোশ
নিন্দ ভাঙ্গিয়ো না।

বরযাত্রী যাত্রা শুরু করছে কনের বাড়ির উদ্দেশে—

ঘোড়ার সোয়ার হয়্যা ন'শারে—
নশা যাইছে শ্বশুর বাড়ি আরে কে।
এ্যাক চাবুক মারে ন'শারে—
ন'শা ডাহিনে বাঁয়ে আরে কে।
আর এ্যাক চাবুক মাইবা ন'শারে—
ন'শা দাঁড়ায় বকুলতলে আরে কে।
ঐ ফুল ঝরিযা পৈলো ন'শারে—
ন'শার ম্যাহারার ওপর আরে কে।
ঐ ফুল কুড়িয়া ন'শারে—
ন'শা পাঠায় আরশের আরশের বাসর-ঘরে আরে কে,
ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশরে—
আরশ হাসে মনে মনে আরে কে।
ঐ ফুল দেখিয়া আরশরে—
আরশ কান্দে মনে মনে আরে কে।
কোন্ বা আশ্রাফের ব্যাটা
আমার যৈবন লুটিতে আসে নারে কে।
কোন্ বা সৈয়দের ব্যাটা
হামার যৈবন লুটিতে আসে আরে কে।।
ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশ রে—
আরশ হাসে মনে মনে আরে কে।
ঐ ফুল দেখিয়্যা আরশ রে
আরশ কাঁদে মনে মনে আরে কে।।

২.

উজান নৈক্যা আইলোরে বোহ্যা ভাটি বোহ্যা যায়,
ধরধর ধররে নৈক্যা ধরা নাহি যায়।
আজকার দিনে কাজ-কাম সাইর‍্যা ন'শা বিহ্যা করিতে যায়,
ব্যান্ট-বাজনা লিয্যারে ন'শ বিহ্যা করিতে যায়।
যতুই দলদলির লোকজন দু'ধারে খাড়া হয়।
ব্যান্টের বাজনা শুইন্যা রে লোকজন মুখে হাসি পায়।
ব্যান্টের বাজনা শুইন্যারে লোকজন হাতে তালি দ্যায়।
মা-মাসি দয়ারে রাখি তারাই দয়া দ্যায়।
জলের কুম্মীর বনের হরিণ তারাই সাথী হয়।।

৩.

ঘাড়ের চাদর দিয়্যা বহিন, ভোলা ঘাজাল্‌ছি—
ও বহিন ডোল্লাতে চড়বে!
ভাইয়া, ডোলায় চড়া ভান্নীকে শোভে রে—
ও ভাইয়্যা, না যাব ডোল্লাতে।
মাল্‌দা যাইব্যা আইন্যাছি জুতা,
ও বহিন, ভোল্লাতে চড় রে!
সেই জুতা ভানীর পায়ে মানায় রে,
ও ভাইয়্যা, না যাব ডোলাতে।
ল'বগঞ্জ থাইক্যা আইন্যাছি আলতা,
ও বহিন, ডোল্লাতে চড়রে।
সেই আল্‌তা ভানীর পায়ে শোভে রে,
ও ভাইয়্যা, না যাব ডোলাতে।
শিবগঞ্জের বাজারে রে হামি চুড়ি কিন্যা দিব রে ;
ও বহিন, ডোল্লাতে চড় রে।
হাসি তেবে ডোল্লায় চোড়্যা যাব রে—
ও ভাইয়্যা, ডোলায় চড়িয়্যা দ্যাও।।

৪.

পাত্রী সাজানো অনুষ্ঠানের গান—

নারাণপুরের লারা ও ডোরা ঘোরাণপুরের কাঁকই,
ও মোর পায়রা রে!
ভাল কৈর‍্যা ঘিংরায়ো পায়রাক্ রাখিও যতনে ;
ও মোর পায়রা রে।।
নারাণপুরের সিন্দুর ও বেশর, ঘোরাণপুরের মালা,
ও মোর পায়রা রে!
ভাল কর‍্যা ঘিংরায়ো পায়রাক, রাখিও যতনে
ও মোর পায়রা রে।।

ইএ মহালে মেরা সিন্দুর ঠিকাই।
শ্যাম জোড়াজোড় বাংলা লালকো ভুলাই।।
লালকে ভুলাই রে হাওলদারকো ভুলাই—
শ্যাম জোড়াজোড় বাংলা লালকে ভুলাই।।
ইএ মহালে মেরা বেশর ঠিকাই।
শম জোড়াজোড় বাংলা লালকে ভুলাই।।

৫.

কন্যা বিদায়ের গান—

বাড়ির শোভা বাগ ওরে বাগিচা,
ঘরের শোভা বিটি—ও মানিক রে ময়না রে!! [ধুয়া]
এক থালি ভাতের জন্যে রে বাপ-মা,
আমাক্ বে'চ্যা খালেন—কি ও মানিক রে ময়না রে!!
এক মাথা ত্যালের জন্যে রে বাপ-মা,
আমাক্ বে'চ্যা খালেন—কি ও মানিক রে ময়না-রে!!
ও এক থালি ভাত দিয়া রে বাপ-মা,
কুটুম্ বিদায় করো—কি ও মানিক রে ময়না রে।।
ও এক মাথা ত্যাল দিয়া রে বাপ-মা,
পড়শী বিদায় করো—কি ও মানিক রে ময়না রে!!
ভাট্যাল সুরের ময়না আমার উদাসে উড়িলো রে,
উদাসে উড়িলো ময়না রে।।

৬.

মা, তোমার শ্বশুর আস্যাছে লিতে রে, মা,
বালাকাটা নংদানা।।
মা, আমি শ্বশুরের সঙ্গে যাব না রে, মা
বালাকাটা নংদানা।।
মা, তোমার ভাসুর আস্যাছে লিতে রে মা,
বালাকাটা নংদানা।।
মা, আমি ভাসুরের সঙ্গে যাব না রে, মা,
বালাকাটা নংদানা।।
মা, তোমার পতি আস্যাছে লিতে রে, মা,
মা, আমি পতির সঙ্গে যাব রে মা,
বালাকাটা নংদানা।।

৭.

আগে চলে সীতাসতী পাছে চলে রাম,
রামের বামে সীতা চলে সোনার গোলোক ধাম।
যাত্রা করে সীতা সতী জনকেরি বালা,
রাম রাজার সাথে চলে হাতে ফুলের মালা।

কাঁদে সীতা, কাঁদে রাণী, কাঁদে পুরনারী,
অঝোরে কাঁদিয়া ফেরে সীতার সহচরী।
কেঁদোনা, কেঁদোনা, মাগো, আবার আসিব,
মা বলে ডাকিয়া, মাগো, পরাণ জুড়াব।

৮.

কন্যার সখীদের গান—
কি ও সখি রে!
রাস্তার শোভা গাছ্ গাছালি সড়কের শোভা গাড়ি।
বাড়ির শোভা ভাই-ভাতিজা ঘরের শোভা নারী।।
লো সখি রে!
দুদ্ মিঠ্যা, ক্ষীর মিঠ্যা আরো মিঠ্যা চিনি।
তারো চ্যাহ্যা আরো মিঠ্যা নারীর মুখের বাণী—
লো সখি রে!!

৯.

দ্যাও বিদায় দ্যাও ও বাপুজী
জরমের মতোন দ্যায় বিদায়
খাইদ পিন্ধনে বড় কইল্যা
জরম ভিঠ্যায় আগন্যায়।
শ্বশুর বাড়ি যাওরে সোনা
জাঁওইয়ের বাড়ি যাওরে যাও
জরমের সাথী হইলে বাপে
কর্মের গোইনে স্বামী পাও।
দ্যাও বিদায় দ্যাও ওমা ওজী
জরমের মতো বিদায় দ্যাও
দশ মাস দশ দিন প্যাটে থুইল্যা
দুধের ধার কি সুধা যায়।
বিদায় দিতে জান ফাইট্যা যায়
তাও বিদায় দিতে হয়
সুখের সংসার গড়িও সোনারে
তাতি দুধের ধার শোধ হয়।
দ্যাও বিদায় দ্যাও দাদোজী
জরমের মতো দ্যাও বিদায়
কোলে পিঠে মানুষ হৈনু
মাফ কইর‍্যা দাও ঘাট অন্যায়।
যাওরে সোনা যাওরে পুঠি
আপন ঘরে যাওরে যাও
চোখের পানতে বিদায় দিতে
দেল কলজায় মস্ত ঘাও।

দ্যাও বিদায় দ্যাও দাদিজী
জরমের মতো দাও বিদায়
হাইগ্যা মুত্যা মানুষ হৈনু
তোমার কাপড় আঁচলাই।
যারে পুঠি যারে পুঠি
সোয়ামীর ঘর কর আলো
শ্যাষের দিনটায় আসিও সোনারে
হামার যেদিন সব কালো।
দ্যাও বিদায় দ্যাও নানা-নানি
জরমের মতো দ্যাও বিদায়
নানির বাড়ি মধুর হাঁড়ি
জান ভোরতোক মিঠ্যা কথায়।
ওরে হামার সোনার চানরে
বুক ফাটেরে সোনার জান
ক্যামুন কইর‍্যা দিবো বিদায়
ঘরে থুইবার লওরে ধন।
দ্যাও বিদায় দ্যাও পাড়া পড়শী
দ্যাও বিদায় ও মোড়ল জী
মাফ করিও সভাই তোমরা
ঘাইট যুতি কইর‍্যা থাকি।
পোঁথল্যা খেলত্যা হাঁর যে সোঁতে
জিন্দা পোঁথল্যা খেলতে যাও
মোড়ল তোমার উকিল বাপু
মোল্লের হৈনে দুয়া ল্যাও।
জমিন কান্দে আসমান কান্দে
কান্দে বাপে মায়ে
বাড়ি ভরা কুটুম কান্দে
পুঁঠির এই বিদায়ে।

গুরুবাদী গান—

১.

জীবন নিয়া জুড়াব রে মন, এল কাল-রজনী।
উজান বইলে যাও বইয়ে, ভাবের ঘাটে ডর পানি।।
নদীর নাহিক পারাবাব, তার জানিস না সাঁতার।
হয় না যেন ভরাডুবি সাবধানে ফেল দাঁড়।।
শুধু গুরুর নামে বইয়ে যাও তনু-তরণী।
গুরু বলে, যদি পারে যাবি, সার কর চরণ দু'খানি।।

২.

তোর মন যদি তুই, না চিনিস
পরকে চিন্‌বে বল কেমনে।
পরকে চিনার বাঞ্ছা কর
আত্মতত্ত্ব ধর শিরে।
গাছ নাই জমিনে পাতা
ফলে ফুলে এক সাথে গাঁথা।
গুরুর চরণে শিষ্যের মাথা
ভবে এমনি মত রয়েছে বাঁধা।।

৩.

হয়েছি দিশেহারা মনের মানুষ খুঁজতে এসে।
ও ভোলামন, প্রাণে মারা যাইরে শেষে।।
যে যাহা যতন করে সে মরে তার তরে।
পালাম না তবু তারে এ জনম ভরে।।
বলি, মন, জানিও এই সার
গুরু বিনা নাই গতি আর।
দারাসুত পবিবার ফেলে যেতে হবে শেষে,
গুরু নামে নিশান তুলে যাই নিজ দেশে।।

৪.

পাগল, তোর পাগলামি গেল না।
মিছা প্রেম রসেতে মত্ত হৈয়ে
গুরুনাম নিলে না।
যখন শমন এসে ধরিবে কেশে
কি করিবে তা বল না।
তোর পিতা মাতা ভাই বন্ধু
কেউ রাখিতে নারিবে না।।
নারীর কুহকে মত্ত হৈয়ে নিত্য ধন হেরিলে না।
যারে চক্ষুর আড়াল করতে নারিস
সে মৃত্যুকালে ছোঁবে না।।
তোরে এত বুঝাই, আমার কথা শুন্‌লি না।
যদি পাবি চরণ কর রে সাধন
কর দয়াল গুরুর সাধনা।।

৫.

মিছে হাল বৈয়ে কাল গেল রে
আমার কৃষি হৈল না।
বাবার ছিল লাখরাজ জমি
ত্রিশ বিঘার নাইরে জমি
ধনাই মণ্ডল কিরষাণ ছিল
জমির আইল ত খুঁজিয়া পাইল না।
যখন জমির লাঙ্গল জুড়ি
বলদ দুইটা ধরে আড়ি
হাল ছেড়ে সবাই পালায়
আপন চিনে না, সে ত ঘুরে দেখে না।
বুদ্ধি আর মঙ্গল এড়ে
পরের জমি খায়রে কেড়ে
খেয়ে দেয়ে হুঙ্কার মারে
সে যে আপন চিনে না।
অমাবস্যার যোগ এল, সে যোগ আমার যায় রে ঠেলে
গুরুর ভাগ্যের ফল না পেয়ে
অঙ্কুর হইল না, প্রেমের অঙ্কুর হইল না।

৬.

ধন পেয়ে মন মত্ত হৈয়ে থেক না।
ও মন, গুরু নাম আর ভুল না।।
ধনে বাড়ে বাসনা হয় না গুরুর সাধনা
অতুল ঐশ্বর্য ভোগে আশা মিটে না।
রিপু ছয়টা বাড়ায় ঘটা
কাহারও কথা মানে না।।

৭.

ভবনদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়!
কোথায় গড়ে হাঁটুপানি কোথায় হাতি তলিয়ে যায়।।
নামিলে পরে বাঁধা ঘাটে আছে কত মহা তায়।
কত সাধু শান্ত হৈয়ে ভ্রান্ত আঁধারে মারা যায়।।
গুরু বলে, ঘোলা জলে ঘাট কি আঘাটা চেনা দায়।
জেনে শুনে নামিলে পরে নাহিক ক্ষতি তায়।।

৮.

ভোমরা যাওরে তুমি তফাতে।
কি হেতু ভাবছ বৈসে মায়াতে।।
কাঁটা পুরা কেয়া বনে কভু যাইও না।
ও যে তাহাতে মধু পাবে না।।
সার কর গুরুর কমল কানন।
মজিও তুমি তাহাতে, ও ভোলা মন।।

৯.

দয়াল, গুরুজী, বৈসে বৈসে ভাবছ কি,
গুরু দিয়াছেন হোঁকা কল্‌কী তামাক টিকা বাতি।
গুরুদত্তা বাতি ভিজায়ে কর্‌লে ডাকাতি
খোঁচাতে খোঁচাতে মশল্লা গেল উধে,
শেষ রাতে জ্বালাবে কি,
হোঁকা কল্‌কী রাধাকৃষ্ণ লইচা হয় জগন্নাথজী।
তার উপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু নীচে আছেন গঙ্গাজী।
শিঙ্গা গুরু কল্পতরু ঘরে আছেন শ্রীমতী,
তাহার কাছে জিজ্ঞাসা কর
তামাক খাওয়ার সন্ধান কি।।

১০.

গুরুর সঙ্গে প্রেম ভক্তি কৈ হৈল মোর হবার কালে।
তোর সাধন ভজন সব ফুরাবে অনুরাগের সময় গেলে।
কমল ফুলে থাকত মধু রে, ভ্রমর আসত দলে দলে।
আর কি ভ্রমর আস্‌বে বল কমল-কলি সুখাইলে।।
আগ বাজারে সওদা কল্লেরে কত মানিক মুক্তা মিলে।
আর কি মানিক পাব বলে বেচাকেনার সময় গেলে।

১১.

যাইয়া মনের মানুষ তলাস কর রে,
মন আপন গুরু না ভজিলে রে
ও তোর মক্কা যাওয়া অকারণ।
ও তোর তীর্থ যাওয়া অকারণ।।
বার মাসে তের ফুল ফুটে
অমাবস্যা পূর্ণিমা তার মধ্যে আছে।
ফুলের বোঁটা কাটা মাকড়ি আঁটা
তার মধ্যে আছে মহাজন।।

১২.

মন, তুমি কারে ভাবছ বৈসে।
কর গুরু সাধন এখনও রিপু আছে বশে।
দেহেতে ছয় কুজনা দেয় তোরে মন্ত্রণা
ভুলেও গুরু বল না হৈয়ে তাদের বশে।
সাধ আগে গুরুজনারে
তার কৃপা হৈলে ভয় পাছে আর কি সে।।
সে ধন সহজে কি মিলে কখন
দেখ বাঞ্ছা কল্পতরু সে জন
এক মনে ভাবে যে জন, লভ্য হয় তার অনায়াসে।
গুরু হয় অন্ধের দর্পণ, তারে যতনে ডাকিলে মিলে অবশেষে।।

১৩.

আমি হৈলাম নিজে অসার,
গুরুর ভাব কিসে পাইব আর,
পারিজাতে কি মধুর ভাণ্ডার
নরকে কীটে কি জানিবে তাই।
চকোর জানে সুধার মরম,
জহুরা জানে রতনের ভরম,
আমি হৈলাম গোষ্পদ সম অধম
সিন্ধুর সংবাদ কেমনে লই।।
গুরুকে ডাকার মত যেবা ডাকে
সে ডাক তাঁর মনে লাগে
প্রেম পাশে বাঁধ তাকে
গুরু প্রেমের টানে আসে তখনি।।

১৪.

আমায় দাও গুরু, তোমার ঐ চরণ।
পারি না যে এ পাপ দেহ করিতে বহন।।
প্রেমামৃত হারে লৈয়ে হৃদয় দ্বারে দাঁড়ায়ে
ডাকি প্রতি সময়ে তুমি কর না শ্রবণ।
চরণ তলে পড়ে থাকি পদধূলি গায়ে মাখি
পাপ তাপ দূরে রাখি জুড়ায় যেন জীবন।।

১৫.

আসব না আর ভবের বাজারে।
আমার বেসাতি হয় না যাই ফিরে।।
এমন আশী লক্ষ বার এসেছি
প্রাণ গেল এই কৈরে।
ভাণ্ডারেতে রতন আছে কেউ নিবে তা যতন কৈ রে।।
থাকি তার কাছে, আমার চক্ষু থাকিতে পাই না দেখিতে
বেড়াই খালি ঘুরে ঘুরে।
হাটের যত জহুরে আত্মসারে, তারা সব গেল মরে।
আমার গরিব বৈলে কেউ দিলে না, লুটে নিল ভাণ্ডারে।
গুরুর কৃপা হৈলে রতন পেলে চৈতন্য হৈবে সংসারে।

১৬.

গুরু, সুভাব দাও আমার মনে
যুগল চরণ আর যেন ভুলি না,
আমার জন্ম-অন্ধ দুই নয়ন।
গুরু, তুই বৈদ্য সচেতন।।
গুরু, সুভাব দাও আমার মনে,
জ্ঞান-অঞ্জন দাও দুই নয়নে।।
গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি,
গুরু, সদাই ধরে তাঁর কুমতি।।
তুমি মনোরথের সারথি,
তুমি না চালালে চল্‌বে কেমনে।
গুরু সুভাব দাও আমার মনে।।

১৭.

শিশু যেমন সরল মনে মাকে ডাকে খনে খনে
তুমি তেমন একমনে ডাকিতে না দিও ফাঁক।
ডাকার মত ডাকিলে পরে অম্‌নি আসে ত্বরা কৈরে
গাভী যেমন আসে দৌড়ে শুনি নিজ বৎসের ডাক।।
শুদ্ধ প্রেমভক্তি ডোরে গুরু বাঁধা সদাই ভক্তের দ্বারে,
তাই বলি নিরন্তরে ভক্তি চন্দন হৃদয়ে মাখ।
কামিনী কাঞ্চন মাটি অঙ্গে না মাখিও সেটি
ছেড়ে মনের খুঁটিনাটি, ও মন, গুরুর ভারে মৈজে থাকে।।

১৮.

ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন,
না হৈলে সাধন হৈবে না।
পরের কথা শুনে গুরু বৈলে নাচ,
গুরু কোথা আছে তারে কি চিনেছ,
কেবল শুনেছ, শুনা কৈ কৈরেছ
নিশ্চিন্ত রহেছ পরিণাম ভাবনা।।
ইষ্টমন্ত্র শুধু করিয়ে গ্রহণ
জপিছ ভজিছ হতেছ সাধন।
জ্ঞান আঁখি যার ফোটে, অষ্টপাশ কাটে।
শুনা কথা মোটে শুন না শুন না।।

১৯.

এ ভবের, হায়, কি কারখানা।
মনের মত কেউ ত হবে না।।
এত কৈরে সাধলে গুরুর সাধনা।
গুরু হয় আপনজন, যায় যাতনা।।

২০.

সাধনের সাধ থাকে যদি
ভজনের সাধ থাকে যদি।
গুরুর বস্তু ঠিক রাখ মন
কর গা সাধনের গতি।।
এখনও তোর সময় আছে
গুরুর কাছে কর গা মিনতি।
দয়াল গুরু আইসা হৃদ-মাঝারে
জ্বালিয়া দেয় জ্ঞানের এক বাতি।।

২১.

গুরু বৈলে ডাক রে জনম সফল কৈলে রাখ রে,
কর্মফলে যা হয় হৈবে মিছে কেন মর ভেবে
মনের আনন্দে গুরু বৈলে স্বচ্ছন্দে থাক রে।।
মুখে ডাক গুরু বলি কর্ণে শুন গুরুর গুণাবলী
গুরু ভক্তের পদধূলি ও মন অঙ্গেতে অঙ্গেতে মাখ রে
দিন গেল রে দেখতে দেখতে
উপায় দেখ দিন থাকতে থাকতে
গুরু বৈলে ডাকতে ডাকতে, প্রাণ যদি যায় তবে থাকবে।।

২২.

ও গুরু, আমার পূর্বের কথা মনে নাই
জানিতে চাই তাই।
পূর্বের কথা মনে হৈলে ভাসি দু নয়নের জলে,
আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই।।
নাক থাকিতে নিঃশ্বাস বন্ধ,
মুখ থাকিতে বাক্য বন্ধ,
ও গুরু, চক্ষু থাকিতে হৈলাম অন্ধ
শেষে কি হৈয়ে থাকিব ভবে জন্মে অন্ধ।।

আধ্যাত্মিক গান—

১.

আজ আমার কাদা মাখা সার হৈল,
ধর্ম মাছ ধরব্ বলে, নাম্‌লাম জলে
আমার ভক্তি জাল চিরা গেল।
কি ক্ষণে বিল গাবালাম, কুসঙ্গে সঙ্গ লইলাম,
ডাঙ্গায় খইল হারালাম,
এখন উপায় কি করি বল।
দুইটা ভূত লাগ্‌ল পিছে,
মাছ ধরার ফাঁদ পৈতেছে,
ভয়ে প্রাণ শুকায়ে গেছে
পিছে আছে গোটা যোল।

২.

নদী উপজাবার উপায় নাই আর,
মন-মালী, উপায় কর তরী পার করিবার।।
নদীর বেগ আসিয়াছে ফিরে।
কূল পাবে সে ভরসা আছে।।
পার না গুণ খাটাতে, পাল খাটাতে
সার ভাটাতে টান ধরেছে।
কত কি হবে গতি যে ভাবগতি
ক্রমেই গতিরোধ হতেছে।।
ক্রমে জল কমে যে রকমে
সব চর জেগেছে।
কি মিছে কর আশা সুখ-প্রয়াসী
বল ভরসা যায় ঘুচে।।
থাক জলের কাছাকাছি
ভক্তি কাছি বাঁধ মন, সাধন গাছে।
ক্রমে জল কমে যে রকমে
সব চর জেগেছে।।

৩.

যদি অমর হৈতে সাধ থাকে, যদি ওরে পাপর মন।
কর সুধা গানের আয়োজন।
সুধাপানের আয়োজন।।
সুধা পানে মরে না প্রাণে চিরজীবী সুরাগণ।
হৈলে সাধনে সিদ্ধ, তবে অসাধ্য সাধ্য,
তবে গুরু সাধন ক্ষীর সমুদ্র।।
করিলে তা মন্থন, পাবে শুদ্ধ প্রেমামৃত এড়াবে জন্মমরণ।
শ্রম হৈবে না-পণ্ড শুন তার কাণ্ড
মনকে কর মন্দার-গিরি মন্থনের দণ্ড
কর, অনুরাগে রজ্জুযোগে বাসুকি নাগের মতন।।
সুধা এমনি কি মিলে, দেবাসুর মিলে
কত কষ্ট কৈরেছিলে মন্থনের কালে।
কর সেই অনুরাগে রিপু ইন্দ্রিয় যোগ মিলে রতন।

৪.

কামিনী-কাঞ্চনে ভুলে সেই ধন অবহেলে,
বাজে খরচে খোয়াইলে
হৈবে তাঁর সঙ্গে কিসে জানা।
পূর্ণ মন তুমি ছিলে ওজন
দিনে দিনে লাঘব এখন,
হৈলে রে তুমি মূঢ় মন,
ওজন কৈরে দেখ যোল আনা।।
বলি ও মন; তোরে প্রেমভক্তি রত্নাকরে।
ডুবে যাও তাঁর অগোচরে
হৈবে বাপে-পুতে জানাশুনা।।

১.

ইসলামি গান

(নবী মাহাত্ম্যমূলক)—

আলেক সোয়ারী নৌকা, মহম্মদ কাণ্ডারী
আল্লা আছে আলে
মহম্মদ আছে কলে
যে নামটি নিয়ে তরব বান্দা।
তিলের মধ্যে তৈল
ঘৃতের মধ্যে ননী
ডিম্বের মধ্যে বাচ্চার জনম।
জান দিয়াছে কেমনে রে সাঁই।।
আলেক রাত্রে উদয় সূর্য দিবসে জ্বালে বাতি
শুনি এক সাধুর-মুখে মশায় খায় হাতী।।

২.

নবী প্রেমে মন মজে না,
তার সমান আর নেই জিন কাণা।।
নবী আমার গুণমণি
নবীর গুণ জানি আমি।।
আমি নবী বিনে দোজাহানে
আর ত কেউ দেখি না,
নবী প্রেমে ধার মন মজে না।।

গৌর পদাবলী—

গৌরকল্প বৃক্ষমূলে বৈস গা যা, রে মন,
সেই না বৃক্ষের ডালে ডালে নানাবিধ ফল ফলে।
খায় ভক্তজন কোকিলে অভক্তে না পায়।
সেবার তুই কি করিলি, সুধা ঠেলে গরল খাইলি।
বিষে অঙ্গ জ্বালাইলে লইলি না বৃক্ষের হেলন।
সেই না বৃক্ষের লাগলে ছায়া
শ্রীগৌরাঙ্গের হবে দয়া
ঘুচে যাবে নিত্য মায়া তত্ত্বজ্ঞানেতে।
পাপ তনু হবে নষ্ট ঘুচে যাবে মনঃকষ্ট--
নয়ন ভরে দেখ্‌ছি স্পষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল চরণ।।

ঘটনামূলক গান—

১.

আগে নায়ে রিমি ঝিমি.
আমার পাছা নায়ে পানি,
ও — আমি ক্যান বা আইলাম নাইতে।
আস্তে আস্তে মা — রো বইঠা,
ওই যে আমার পতির কান্দন শুনি।
ও — আমি ক্যান বা আইলাম নাইতে!
একা ডুবে দু'য়ো ডুবে তিনো ডুবের কালে,
কোন ঠিকার এক ময় ফুল রাজা আস্যা তুল্যা লিলো নায়ে
ও — আমি ক্যান বা আইলাম নাইতে!
কান্দো না কান্দো না, পতি চিত্তে লেও ক্ষেমা,
বাক্সে ভরা রইলো রে গয়না ফির্‌যা কইরো শাদি!
ও — আমি ক্যান বা আইলাম নাইতে!

২.

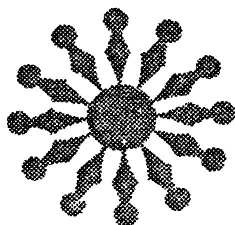
কাঁখে কলস কৈরা গো রমণী
যায় যমুনার ঘাটে না রে কে।
যমুনার ঘাটে য্যায় গো রমণীর
সদাগরের সোঁতে দেখা না রে কে।
সরিয়্যা নোকা বান্ধো গো সদাগোর,
কলসী-ভরিয়্যা উঠি না রে কে।
এত সুন্দরী রমণী গো তুমি,
সিঁথ্যা লাগেরে খালি না রে কে।
একটি জবাব কর গো রমণী,
সেন্দুর পর্য্যাইয়া দিই না রে কে।
আমার সেন্দুর আছে গো সদাগোর,
বাপো-মায়ের ঘরে না কে।
সরিয়্যা নোকা বান্ধো গো সদাগোর,
কলসী-ভরিয়্যা উঠি না রে কে।।

সামাজিক—

মোর বিয়ের বাদী হইলো ননদী সখি না ও মোর সখী রে।
গাছো মধ্যে শিমুল গাছো রে সখী, গগনে ম্যালে ডাল।
নারী হয়্যা যৈবনের জ্বালা সইব কত কাল ও মোর সখী রে।।
দুধো মিঠ্যা ক্ষীরো মিঠ্যা রে সখী আরো মিঠ্যা চিনি,
তাহার থাইক্যা অধিক মিঠ্যা নারীর মিঠ্যা বাণী ও মোর সখী রে।
হালের মিঠ্যা লাঙল জোয়াল রে সখী, নদীর মিঠ্যা বাও,
সখী তাহার চেয়ে অধিক মিঠ্যা ঐ না নারীর গাও।।
ও মোর সখীরে — রাস্তার শোভা বাগিচারে সখী
সড়কেব শোভা গাড়ি,
বাড়ির শোভা ভাই ভাতিজ্যা শয্যার শোভা নারী ও মোর সখী রে।
মোর বিয়ের বাদী হৈলো ননদী সখিনা।
ঢাকো বাজে ঢোলক বাজে সখী আরো বাজে কাঁশী
আজো হতে শেষো হইলো শান্তির বারো মাসী।।

* **ব্যবহৃত গ্রন্থ :**
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর ৩য় খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য
বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত—মাঘহারুল ইসলাম তরু
লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)—ডঃ আশরফ সিদ্দিকী
লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ—আবদুল হাফিজ
বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজসাহী : ১৯৯১

নির্ঘণ্ট



নির্ঘণ্ট



জয়কালী মন্দির, নাটোর



শাহ নিয়ামতউল্লাহর মাজার, চাপাই নবাবগঞ্জ